বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ

তৃতীয় খণ্ড ॥ সাহিত্য ও বিবিধ

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

প্রধান সম্পাদক

শ্রীগোপাল হালদার

সদস্য

শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত শ্রীমণীন্দ্র রায়

শ্রীঅশোক ঘোষ শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি

প্রথম প্রকাশ
৩১শে অক্টোবর ১৯৫৯
১৪ই কার্তিক ১৩৬৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ
৫ই নভেম্বর ১৯৭২
১৯শে কার্তিক ১৩৭৯

প্রকাশক
শ্রীমুক্তিপদ রায়
সাক্ষরতা প্রকাশন
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীমদন সিংহ
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

বাঁধাই
শ্রীঅভয় সাহা মণ্ডল
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীসঞ্জয় সেনগুপ্ত

Vidyasagar Rachana Samgraha
Writings of Vidyasagar
Volume 3 : Literary & Miscellaneous Writings

মুখবন্ধ

বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হলো। এই প্রকাশনার মাধ্যমে যুগন্ধর পুরুষ বিদ্যাসাগরের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজজীবনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকৃপণ অবদান নতুন করে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর চাইতে বড় পণ্ডিত, বড় সমাজ-সংস্কারক অথবা হৃদয়বান মানুষ হয়তো এদেশে জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু একাধারে এত গুণের সমাবেশ আর কোথাও ঘটেনি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষায় ঘটনাবহুল সময়ের মধ্য দিয়ে তাঁর সমগ্র জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই নব নব যুগ-উন্মেষের সচেতন অংশীদার।

তাঁর জন্মকালে সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজের পদানত। শেষতম পেশোয়াও বিদেশী শাসকের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছেন বিদ্যাসাগরের জন্মের দু বছর আগে। ৭১ বছর বয়সে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বয়স তখন ছয় বছর। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ ততদিনে রোপিত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম।

নিরতিশয় দরিদ্র পরিবারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম। সে যুগে ইংরাজী ভাষা এবং সাহিত্য পাঠের সুযোগ ছিল সীমিত। তবু, আপন অধ্যবসায়ে, শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষাতেই নয়, ইংরাজী ভাষাতেও তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত, ইংরাজী এবং আঞ্চলিক ভাষা—এই ত্রি-ভাষার ভিত্তিতে শিক্ষানীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত, এই ছিল বিদ্যাসাগরের অভিমত। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতেও এ মতবাদ যথেষ্ট আধুনিক।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান বিদ্যাসাগর সামাজিক অপপ্রথা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সাহসী সংগ্রাম চালিয়েছেন। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগ্রাম নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। কঠোরতা, কোমলতা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়াবেগের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। অনন্যসাধারণ পণ্ডিত, শিক্ষাসংস্কারক, সমাজসংস্কারক এবং পরম করুণাময় বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনসাধনা আভাসিত হয়েছে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে।

বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের বিবিধ শাখায় তাঁর সচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। শুধুমাত্র সাহিত্যকীর্তির নজির হিসেবেই নয়, বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের জন্য তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া শিক্ষানুরাগী মানুষের অবশ্য কর্তব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মসার্ধশতবার্ষিকীতে বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি যে

কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, তার অন্যতম হচ্ছে, এই রচনাসংগ্রহ প্রকাশ। সাধারণ মানুষের কাছে বিদ্যাসাগরকে আরো বেশি পরিচিত করাবার জন্য যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে রচনাসংগ্রহ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের জীবনসাধনা সাধারণ্যে বহুল প্রচারিত হলেই এই প্রকাশনা সার্থক হবে।

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় এই রচনা-সংগ্রহ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। পরিকল্পনা থেকে প্রকাশনার প্রতিটি স্তরে সমিতির প্রতিটি কর্মী সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শ্রীসন্তোষ মিত্র প্রুফ দেখেছেন। দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেসের কর্মিবৃন্দ এবং কর্মাধ্যক্ষ। এঁদের সকলকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

(উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

সূচী

চিত্রসূচী

বেতালপঞ্চবিংশতি

বিজ্ঞাপন

কালেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ে, তত্রত্য ছাত্রগণের পাঠার্থে, বাঙ্গালা ভাষায় হিতোপদেশ নামে যে পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার রচনা অতি কদর্য্য। বিশেষতঃ, কোনও কোনও অংশ এরূপ দুরূহ ও অসংলগ্ন যে কোনও ক্রমে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হইয়া উঠে না। তৎপরিবর্ত্তে পুস্তকান্তর প্রচলিত করা উচিত ও আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুত মেজর জি. টি. মার্শল মহোদয় কোনও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আমি, বৈতালপচীসীনামক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অবলম্বন করিয়া, এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম।

যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন আশা ছিল না, বেতালপঞ্চবিংশতি সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনকারী ব্যক্তি-মাত্রেই আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়েই প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ, দুই বৎসরের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত সমস্ত পুস্তক নিঃশেষ রূপে পর্য্যবসিত হয়।

প্রায় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইল, পুস্তকের অসদ্ভাব হইয়াছে। কিন্তু, কোনও কোনও কারণবশতঃ, আমি পুনর্ম্মুদ্রাকরণে এ পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ ছিলাম। পরিশেষে, গ্রাহক-মণ্ডলীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে, দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। যে যে স্থান কোনও অংশে অপরিশুদ্ধ ছিল, পরিশোধিত হইয়াছে, এবং অশ্লীল পদ, বাক্য, ও উপাখ্যানভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বেতালপঞ্চবিংশতি পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।
১০ই ফাল্গুন। সংবৎ ১৯০৬।

দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

বেতালপঞ্চবিংশতি দশম বার প্রচারিত হইল। এই পুস্তক, এত দিন, বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী অনুসারে, মুদ্রিত হইয়াছিল; সুতরাং, ইঙ্গরেজী পুস্তকে যে সকল বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে সে সমুদয় পরিগৃহীত হয় নাই। এই সংস্করণে সে সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।

১৯০৩ সংবতে, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রথম প্রচারিত হয়। ২৫ বৎসর অতীত হইলে, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা, শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., তদীয় জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

> "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে বোমান্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে"।

যোগেন্দ্র বাবু, কি প্রমাণ অবলম্বনপূর্ব্বক, এরূপ অপ্রকৃত কথা লিখিয়া প্রচারিত করিলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি বেতালপঞ্চবিংশতি লিখিয়া, মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলাম। তাঁহাদিগকে শুনাইবার অভিপ্রায় এই যে, কোনও স্থল অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন; তদনুসারে, আমি সেই সেই স্থল পরিবর্ত্তিত করিব। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, কোনও কোনও উপাখ্যানে একটি স্থলও তাঁহাদের অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হয় নাই, সুতরাং, সেই সেই উপাখ্যানের কোনও স্থলেই কোনও প্রকার পরিবর্ত্ত করিবার আবশ্যকতা ঘটে নাই। আর, যে সকল উপাখ্যানে তাঁহারা তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই উপাখ্যানে, স্থানে স্থানে, দুই একটি শব্দ মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন ও তর্কালঙ্কার ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই। সুতরাং, "বেতালপঞ্চবিংশতি তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে"; যোগেন্দ্র বাবুর এই নির্দেশ, কোনও মতে, সঙ্গত বা ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। তিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজে সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক। এ বিষয়ে, তিনি, আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে, যে পত্র লিখিয়াছেন, ঐ উত্তরপত্র, আমার জিজ্ঞাসাপত্রের সহিত, নিম্নে নিবেশিত হইতেছে।

অশেষগুণাশ্রয়
শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভ্রাতৃপ্রেমাস্পদেষু
সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিছু দিন হইল, সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমান্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয়

বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে"। বেতালপঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। যোগেন্দ্র বাবুর উক্তি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত করিব, স্থির করিয়াছি। বেতালপঞ্চবিংশতির সংশোধনবিষয়ে তর্কালঙ্কারের কত দূর সংস্রব ও সাহায্য ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার পত্রখানি, আমার বক্তব্যের সহিত, প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় আছে, জানিবে ইতি।

কলিকাতা। ত্বদেকশর্ম্মশর্ম্মণঃ
১০ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল। শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

পরমশ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়
জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিমেষু

শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত ; আমার বিবেচনায়, এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্র বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে, স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে, আমার অথবা তর্কালঙ্কারের, এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্রখানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি।

কলিকাতা। সোদরাভিমানিনঃ
১২ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল। শ্রীগিরিশচন্দ্রশর্ম্মণঃ

যোগেন্দ্র বাবু স্বীয় শ্বশুরের জীবনচরিত পুস্তকে, আমার সংক্রান্ত যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এইরূপ অমূলক। দৃষ্টান্তস্বরূপ আর একটি স্থল প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

> "সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইল। এরূপ শুনিতে পাই, বেথুন তর্কালঙ্কারকে এই পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের যোগ্য বলিয়া বেথুনের নিকট আবেদন করায়, বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তর্কালঙ্কারের ন্যায় সদাশয়, উদারচরিত ও বন্ধুহিতৈষী ব্যক্তি অতি কম ছিলেন। হৃদয়ের বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতর পদে অভিষিক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার বন্ধুত্বের ও ঔদার্য্যের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন"।

গ্রন্থকর্ত্তার কল্পনাশক্তি ব্যতীত এ গল্পটির কিছুমাত্র মূল নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হয়েন; ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের নবেম্বর মাসে, মুরশিদাবাদের জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রস্থান করেন। তর্কালঙ্কারের নিয়োগসময়েও, যিনি (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তর্কালঙ্কারের প্রস্থানসময়েও, তিনিই (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফলতঃ, তর্কালঙ্কার যত দিন সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় মধ্যে, এক দিনের জন্যেও, ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয় নাই। সুতরাং, সংস্কৃত কালেজে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়াতে, বেথুন সাহেব মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, তর্কালঙ্কার, ঔদার্য্যগুণের আতিশয্যবশতঃ, আমাকে ঐ পদের যোগ্য বিবেচনা করিয়া, ও বন্ধুস্নেহের বশীভূত হইয়া, বেথুন সাহেবকে আমার জন্য অনুরোধ করাতে, আমি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, ইহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে, তাহা যোগেন্দ্র বাবুই বলিতে পারেন।

আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারি, শ্রীযুক্ত ডাক্তর মোয়েট সাহেব, আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। (১) আমি, নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি কহিয়াছিলাম, যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি। তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লেখাইয়া লয়েন। তৎপরে

১। এই সময়ে আমি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড রাইটর নিযুক্ত ছিলাম।

১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছু দিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদ পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অবস্থা, ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষাসমাজ আমাকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাকার্য্য, সেক্রেটারি ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি, এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; এই দুই পদ রহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট হইল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।

যোগেন্দ্র বাবুর গল্পটির মধ্যে, "এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়," এই কথাটি লিখিত আছে। যাঁহারা, বহুকাল অবধি, সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত আছেন, অথবা যাঁহারা কোনও রূপে সংস্কৃত কালেজের সহিত কোনও সংস্রব রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও এরূপ জনশ্রুতি কর্ণগোচর করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক, যদিই দৈবাৎ ঐরূপ অসম্ভব জনশ্রুতি কোনও সূত্রে যোগেন্দ্র বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছিল, ঐ জনশ্রুতি অমূলক অথবা সমূলক, ইহার পরীক্ষা করা তাঁহার আবশ্যক বোধ হয় নাই। আবশ্যক বোধ হইলে, অনায়াসে তাঁহার সংশয়চ্ছেদন হইতে পারিত। কারণ, আমার নিয়োগবৃত্তান্ত সংস্কৃত কালেজ সংক্রান্ত তৎকালীন ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। যোগেন্দ্র বাবু সংস্কৃত কালেজের ছাত্র; যে সময়ে তিনি আমার নিয়োগের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, বোধ হয়, তখনও তিনি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। যদি সবিশেষ জানিয়া যথার্থ ঘটনার নির্দ্দেশ করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, আমার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকিত না।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। (২) আমি, বিশিষ্ট হেতুবশতঃ, অধ্যাপকের পদগ্রহণে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করি। (৩) তদনুসারে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। এই প্রকৃত বৃত্তান্তটির সহিত, যোগেন্দ্র বাবুর কল্পিত গল্পটির, বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে।

কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
১লা পৌষ, সংবৎ ১৯৩৩।

২। এই সময়ে, আমি সংস্কৃত কালেজে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলাম।

৩। এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কালেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

উপক্রমণিকা

উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্বজ্যেষ্ঠ শঙ্ক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি, রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহারপূর্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন; এবং, ক্রমে ক্রমে, নিজ বাহুবলে, লক্ষযোজনবিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া, আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।

একদা, রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, জগদীশ্বর আমায়, নানা জনপদের অধীশ্বর করিয়া, অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিতচিন্তার ভার দিয়াছেন। আমি, আত্মসুখে নিবৃ'ত হইয়া, তাহাদের অবস্থার প্রতি ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করি না; কেবল অধিকৃতবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। তাহারা প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, অন্ততঃ একবারও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অতএব আমি, প্রচ্ছন্ন বেশে পর্যটন করিয়া, প্রজাগণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিব। অনন্তর তিনি, নিজ অনুজ ভর্তৃহরির হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বহু কাল, অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি, আপন উপাস্য দেবতার নিকট বরস্বরূপ এক অমরফল পাইয়া, আনন্দিত মনে গৃহে আসিয়া, স্বীয় ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, দেখ, দেবতা, তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, আজ আমায় এই ফল দিয়াছেন; বলিয়াছেন, ইহা ভক্ষণ করিলে, নর অমর হয়। ব্রাহ্মণী শুনিয়া, অতিশয় খেদ করিয়া, কহিলেন, হায়! অমর হইয়া, আর কতকাল যন্ত্রণা-ভোগ করিবে। তুমি, কি সুখে, অমর হইবার অভিলাষ কর, বুঝিতে পারিতেছি না। বরং, এই দণ্ডে মৃত্যু হইলে, সাংসারিক ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ হয়।

গৃহিণীর এই আক্ষেপবাক্য শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি তৎকালে, না বুঝিয়া, এই দেবদত্ত ফল লইয়াছিলাম; এক্ষণে, তোমার কথা শুনিয়া, আমার চৈতন্য হইল। এখন তুমি যেরূপ বলিবে, তাহাই করিব। ব্রাহ্মণী কহিলেন, এই ফল রাজা ভর্তৃহরিকে দিয়া, ইহার পরিবর্তে, পারিতোষিকস্বরূপ, কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আইস; তাহা হইলে, অনায়াসে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিবে।

ইহা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং, যথাবিধি আশীর্বাদ-প্রয়োগের পর, দেবদত্ত ফলের গুণব্যাখ্যা ও পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তের প্রকৃতরূপ বর্ণন করিয়া, বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনি, এই ফল লইয়া, আমায় কিছু অর্থ দেন। আপনি চিরজীবী হইলে, সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল। রাজা, ফল গ্রহণ

করিয়া, লক্ষমুদ্রাপ্রদানপূর্বক, ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন এবং, নিতান্ত স্ত্রৈণতাবশতঃ, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তির চির জীবন ও স্থির যৌবন হইলে, আমি যাবজ্জীবন সুখী হইব, তাহাকেই এই ফল দেওয়া আবশ্যক। অনন্তর, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, রাজা প্রাণাধিকা মহিষীর হস্তে ফল প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি আমার জীবন-সর্বস্ব; এই ফল খাও, চিরজীবিনী ও স্থিরযৌবনা হইবে। রাজ্ঞী, নিরতিশয় আহ্লাদপ্রদর্শনপূর্বক, ফলগ্রহণ করিলেন। রাজা প্রীত মনে, সভায় প্রত্যাগমন করিয়া, অমাত্যবর্গের সহিত রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীর নগরপাল রাজমহিষীর সাতিশয় প্রিয় পাত্র ছিল; তিনি, ঐ ফলের গুণ-ব্যাখ্যা করিয়া, তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। নগরপাল এক বারাঙ্গনাকে অত্যন্ত ভালবাসিত; সে, তাহার হস্তে প্রদানপূর্বক, ঐ ফলের সবিশেষ গুণবর্ণন করিল। বারাঙ্গনা, ফল পাইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি অতি অধম জাতি, কুক্রিয়া দ্বারা উদরপূর্তি করি; আমার চিরজীবিনী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব, এই ফল রাজাকে দেওয়া উচিত; রাজা চিরজীবী হইলে, অসংখ্য লোকের মঙ্গল হইবেক। অনন্তর, রাজার নিকটে গিয়া, বারবনিতা, বিনয়পূর্বক, নিবেদন করিল, মহারাজ! আমি এই এক অপূর্ব ফল পাইয়াছি; ইহা ভক্ষণ করিলে, নর অমর হয়; এই ফল আপনকার যোগ্য; আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা, অমরফল বারাঙ্গনার হস্তগত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং, ফল লইয়া, পুরস্কারপ্রদানপূর্বক, তাহাকে বিদায় দিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এই ফল রাজ্ঞীকে দিয়াছি; ইহা কিরূপে বারাঙ্গনার হস্তগত হইল। পরে, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, তিনি পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং, সাংসারিক বিষয়ে নিরতিশয় বীতরাগ হইয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই; অতএব, বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আর ইহাতে লিপ্ত থাকা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে। অতএব, সংসারযাত্রায় বিসর্জন দিয়া, অরণ্যে গিয়া, জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই; চরমে পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব।

অন্তঃকরণে এইরূপ আলোচনা করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি সে ফল কি করিয়াছ। তিনি কহিলেন, ভক্ষণ করিয়াছি। রাজা, সাতিশয় বিরাগপ্রদর্শনপূর্বক, রাণীকে সেই ফল দেখাইলেন। রাণী, এক কালে, হতবুদ্ধি ও অধোবদন হইয়া রহিলেন, বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিলেন না। রাজা ভর্তৃহরি, অবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, প্রক্ষালনপূর্বক ফলভক্ষণ করিলেন এবং, রাজ্যাধিকারে জলাঞ্জলি দিয়া, একাকী অরণ্যে গিয়া, যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য রহিল। দেবরাজ, উজ্জয়িনীর অরাজকসংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র, এক যক্ষকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। যক্ষ, সাতিশয় সতর্কতা-পূর্বক, অহোরাত্র, নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই, দেশে বিদেশে প্রচার হইল, রাজা ভর্তৃহরি, রাজত্বপরিত্যাগপূর্বক, বনপ্রস্থান করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি, অর্ধরাত্র সময়ে, নগরে প্রবেশ করিতেছেন ; এমন সময়ে, নগর-রক্ষক যক্ষ আসিয়া নিষেধ করিয়া কহিল, তুই কে, কোথায় যাইতেছিস, দাঁড়া, তোর নাম কি বল। রাজা কহিলেন, আমি বিক্রমাদিত্য, আপন নগরে যাইতেছি ; তুই কে, কি নিমিত্তে আমার গতিরোধ করিতেছিস, বল।

যক্ষ কহিল, দেবরাজ ইন্দ্র আমায় এই নগরের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে, আমি তোমায় অসময়ে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না। অথবা, যদি তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য হও, অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধ কর, পরে নগরে যাইতে দিব। রাজা শ্রবণমাত্র, বদ্ধপরিকর হইয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। যক্ষও, তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া, তাঁহার সম্মুখীন হইল। ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে, রাজা, যক্ষকে ভূতলে ফেলিয়া, তাহার বক্ষঃস্থলে বসিলেন। তখন যক্ষ কহিল, মহারাজ! তুমি আমায় পরাভূত করিয়াছ। তোমার প্রভাব ও পরাক্রম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমায় ছাড়িয়া দাও ; আমি তোমায় প্রাণদান দিতেছি।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুই বাতুল, নতুবা এরূপ অসঙ্গত কথা বলিবি কেন। তুই আমায় প্রাণদান কি দিবি ; আমি মনে করিলে, এখনই তোর প্রাণদণ্ড করিতে পারি। যক্ষ শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, মহারাজ! যাহা কহিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ, কিন্তু, আমি তোমায় আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি, এজন্য এরূপ বলিতেছি। যাহা কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তদনুযায়ী কার্য করিলে, দীর্ঘজীবী হইবে, এবং নিরুদ্বেগে, অখণ্ড ভূমণ্ডলে, একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি, অতিশয় বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া, যক্ষের বক্ষঃস্থল হইতে উত্থিত হইলেন। যক্ষও, ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তিপরিহার-পূর্বক, বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া, তদীয় জীবনসংক্রান্ত গূঢ় বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিতে আরম্ভ করিল।

মহারাজ! শ্রবণ কর,—

ভোগবতী নগরে, চন্দ্রভানু নামে অতি প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তিনি, এক দিবস, মৃগয়ার অভিলাষে, কোনও অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এক তপস্বী, অধঃশিরাঃ ও বৃক্ষে লম্ববান হইয়া, ধূমপান করিতেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর, তত্রত্য লোকের মুখে অবগত হইলেন, তপস্বী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না ; বহুকাল অবধি, একাকী এইভাবে তপস্যা করিতেছেন। রাজা, সন্ন্যাসীর কঠোর

ব্রত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন ; এবং পর দিন, যথাকালে, রাজসভায় অধিষ্ঠান করিয়া কহিলেন, হে অমাত্যবর্গ! হে সভাসদ্‌গণ! আমি গতকল্য, মৃগয়ায় গিয়া, বিপিনমধ্যে এক অদ্ভুত তপস্বী দেখিয়াছি ; যদি কেহ তাঁহারে রাজধানীতে আনিতে পারে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিব।

এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, এক প্রসিদ্ধ বারবনিতা, নৃপতিসমীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ! আজ্ঞা পাইলে, আমি, ঐ তপস্বীর ঔরসে পুত্র জন্মাইয়া, ঐ পুত্র তাহার স্কন্ধে দিয়া, আপনকার সভায় আনিতে পারি। রাজা শুনিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং পরম সমাদরপূর্বক, বারনারীর উপর তাপসের আনয়নের ভারার্পণ করিলেন। সে ভূপালের নিয়োগ অনুসারে, যোগীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যোগী যথার্থই মুদ্রিতনয়ন, অধঃশিরাঃ ও বৃক্ষে লম্বমান হইয়া, ধূমপান করিতেছেন ; নিরতিশয় শীর্ণদেহ, কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। তদ্দর্শনে বারযোষিৎ, সহসা সন্ন্যাসীর সমাধিভঙ্গ করা অসাধ্য জানিয়া তদীয় আশ্রমের অনতিদূরে এক সুশোভন উপবন ও তন্মধ্যে পরম রমণীয় বাসভবন নির্মিত করাইল এবং নানা উপায় চিন্তিয়া, পরিশেষে, যুক্তিপূর্বক, মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া, ধূমপায়ী তপস্বীর আস্যে অর্পিত করিল। তপস্বী, রসনাসংযোগ দ্বারা মিষ্ট বোধ হওয়াতে, ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভক্ষণ করিলেন। বারাঙ্গনা পুনরায় দিল ; তিনিও পুনরায় ভক্ষণ করিলেন।

এইরূপে, ক্রমাগত কতিপয় দিবস, মোহনভোগ উপযোগ করিয়া, শরীরে কিঞ্চিৎ বল-সঞ্চার হইলে, সন্ন্যাসী, নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া, তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং বারনারীকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি অভিপ্রায়ে, একাকিনী এই নির্জন বনস্থানে আগমন করিয়াছ। সে কহিল, আমি দেবকন্যা, দেবলোকে তপস্যা করি ; সম্প্রতি, তীর্থপর্যটনপ্রসঙ্গে, পরম পবিত্র কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আসিয়া, যোগাভ্যাসবাসনায়, অনতিদূরে আশ্রমনির্মাণ করিয়াছি ; নিয়ত তথায় অবস্থিতি করি। অদ্য সৌভাগ্য-ক্রমে, এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, আপনকার সন্দর্শন ও সম্ভাষণানুগ্রহ দ্বারা, চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলাম। তপস্বী কহিলেন, আমি, তোমার সৌজন্য ও সুশীলতা দর্শনে, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তোমার মধুর মূর্তি সন্দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি ; যেহেতু জন্মান্তরীণ পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে, সাধুসমাগম লব্ধ হয় না। যাহা হউক, তোমার আশ্রম দেখিবার নিমিত্ত, আমার অতিশয় বাসনা হইতেছে। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, ও অধিক দূরবর্তী না হয়, আমায় তথায় লইয়া চল।

বারবিলাসিনী, তপস্বীর অভ্যর্থনা শ্রবণে কৃতার্থম্মন্য ও অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেল, এবং, সাতিশয় যত্ন ও সবিশেষ সমাদর পুরঃসর, নানাবিধ সুস্বাদ মিষ্টান্ন ও সুরস পানীয় প্রদান করিল। তিনি, বারনারীর কপটজালে বদ্ধ হইয়া, তাহার দত্ত সমস্ত বস্তু ভক্ষণ ও পান করিলেন। এইরূপে, তপস্বী, ধূমপান

পরিত্যাগপূর্বক, যোগাভ্যাসে জলাঞ্জলি দিয়া, বারবনিতার সহিত বিষয়বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। বারাঙ্গনা গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইল। কিছুদিন অতীত হইলে পর, সে সন্ন্যাসীর নিকট নিবেদন করিল, মহাশয়! বহু দিবস অতিক্রান্ত হইল, আমরা নিরন্তর কেবল বিষয়বাসনায় কালহরণ করিলাম; এক্ষণে তীর্থযাত্রা দ্বারা দেহ পবিত্র করা উচিত।

বারবনিতা, এইরূপ প্রবঞ্চনা দ্বারা, তপস্বীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া, তাঁহার স্কন্ধে পুত্র-প্রদানপূর্বক, চন্দ্রভানুর রাজধানীতে লইয়া চলিল। সে রাজসভার সমীপবর্তিনী হইলে, রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া, এবং সন্ন্যাসীর স্কন্ধে পুত্র দেখিয়া, সামাজিক-দিগকে বলিলেন, দেখ দেখ, যে বারনারী যোগীর আনয়নবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল, সে আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। আমি উহার অসম্ভব বুদ্ধি-কৌশলে চমৎকৃত হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব, এই বুদ্ধিমতী বারবনিতা চিরশুষ্ক নীরস তরুকে পল্লবিত এবং পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত করিয়াছে। সামাজিকেরা কহিলেন, মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন; এ সেই বারাঙ্গনাই বটে।

রাজা ও সভাসদ্গণের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে, সহসা বোধসুধাকরের উদয় হওয়াতে, সন্ন্যাসীর মোহান্ধকার অপসারিত হইল। তখন তিনি, পূর্বাপরপর্যালোচনা করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, দুরাত্মা চন্দ্রভানু, ঐশ্বর্যমদে মত্ত ও ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য হইয়া আমার তপস্যাভ্রংশের নিমিত্ত এই দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তারিত করিয়াছিল। আমিও অতি অধম ও অবশেন্দ্রিয়; অনায়াসে স্বৈরিণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, চিরসঞ্চিত কর্মফলে বঞ্চিত হইলাম। অনন্তর, ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া স্কন্ধস্থিত পুত্রকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; অন্য এক অরণ্যে প্রবেশপূর্বক, পূর্ব অপেক্ষায় অধিকতর মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে, যোগসাধন করিতে লাগিলেন, এবং, কিয়ৎ কাল পরে, ঐ নরেশ্বরের মৃত্যুসাধন করিয়া, কৃতকার্য হইলেন।

এইরূপে, আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া, যক্ষ কহিল, মহারাজ! তুমি, ও রাজা চন্দ্রভানু, আর ঐ যোগী, এই তিন জন এক নগরে, এক নক্ষত্রে, এক লগ্নে, জন্মিয়াছিলে। তুমি, রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর রাজত্ব করিতেছ। চন্দ্রভানু, তৈলিকগৃহে জন্মিয়া ভাগ্যক্রমে ভোগবতী নগরীর অধিপতি হইয়াছিল। আর, যোগী, কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন হইয়া যত্নপূর্বক যোগসাধন করিয়া চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়াছে, এবং তাঁহাকে বেতাল করিয়া শ্মশানবর্তী শিরীষবৃক্ষে লম্বিত করিয়া রাখিয়াছে; এক্ষণে, অনন্যকর্মা হইয়া, তোমার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টায় আছে; ইহাতে কৃতকার্য হইলেই, উহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি তুমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাও, বহুকাল অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। আমি, সবিশেষ সমস্ত কহিয়া, তোমায় সতর্ক করিয়া দিলাম; তুমি এ বিষয়ে ক্ষণমাত্রও অনবহিত থাকিবে না।

এইরূপ উপদেশ দিয়া, যক্ষ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজাও শুনিয়া, ত্রস্ত ও বিস্ময়-গ্রস্ত হইয়া, নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে, রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পর দিন প্রভাতে, তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, ভৃত্যগণ ও প্রজাবর্গ, বহুদিনের পর, রাজসন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইল। রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজনীতির অনুবর্তী হইয়া, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে, শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী, শ্রীফল হস্তে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীফলপ্রদানপূর্বক রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া, কক্ষস্থিত আসন পাতিয়া, তদুপরি উপবেশন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথন করিয়া, রাজার নিকট বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী সভা হইতে প্রস্থান করিলে পর, তিনি অন্তঃকরণে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি কিনা। যাহা হউক, সহসা শ্রীফলভক্ষণ করা উচিত নহে। রাজা, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, কোষাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণপূর্বক কহিলেন, তুমি এই শ্রীফল সাবধানে রাখিবে। সন্ন্যাসী প্রত্যহ রাজদর্শন ও শ্রীফলপ্রদান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রাজা, বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে, মন্দুরাসন্দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়া, পূর্ববৎ শ্রীফলপ্রদানপূর্বক, আশীর্বাদ করিলেন। দৈবযোগে, শ্রীফল ভূপতির করতল হইতে ভূতলে পতিত ও ভগ্ন হওয়াতে, তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ব রত্ন নির্গত হইল। রাজা ও রাজবয়স্যগণ তদীয় প্রভা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। রাজা যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কি জন্যে আমার এই রত্নগর্ভ শ্রীফল দিলেন।

যোগী কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে রাজা, গুরু, জ্যোতির্বিদ, ও চিকিৎসকের নিকট রিক্ত হস্তে যাইতে নিষেধ আছে; এইজন্যে, আমি এই রত্নগর্ভ শ্রীফল লইয়া আসিয়াছিলাম। আর, এক রত্নগর্ভ শ্রীফলের কথা কি কহিতেছেন, প্রতিদিন আপনাকে যে শ্রীফল দিয়াছি, সকলের মধ্যেই এতাদৃশ এক এক রত্ন আছে। তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমাকে যত শ্রীফল রাখিতে দিয়াছি, সমুদয় এই স্থানে আন। কোষাধ্যক্ষ, রাজকীয় আদেশ অনুসারে, সমস্ত শ্রীফল তথায় উপস্থিত করিলে, রাজা প্রত্যেক শ্রীফল ভাঙ্গিয়া, সকলের মধ্যেই এক এক রত্ন দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং, তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমনপূর্বক, এক মণিকারকে ডাকাইয়া, ঐ সমস্ত রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এই অসার সংসারে ধর্মই সার পদার্থ; অতএব, তুমি ধর্মপ্রমাণ প্রত্যেক রত্নের মূল্য নির্ধারিত করিয়া দাও।

এইরূপ রাজবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, মণিকার কহিল, মহারাজ! আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্মরক্ষা করিলে, সকল বিষয়ের রক্ষা হয়; ধর্মলোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়। অতএব, আমি ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি,

আপন জ্ঞান অনুসারে, যথার্থ মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিব। ইহা কহিয়া, সে প্রত্যেক রত্নের লক্ষণপরীক্ষা করিয়া কহিল, মহারাজ! বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সকল রত্নই সর্বাঙ্গসুন্দর; কোটি মুদ্রাও একৈকের প্রকৃত মূল্য নহে। এ সকল অমূল্য রত্ন।

রাজা শুনিয়া, সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, সমুচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্বক, মণিকারকে বিদায় করিলেন এবং, হস্তদ্বারা সন্ন্যাসীর হস্তগ্রহণ করিয়া, সিংহাসনার্ধে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, মহাশয়! আমার, সমস্ত সাম্রাজ্যও আপনকার প্রদত্ত রত্নসমূহের তুল্যমূল্য হইবেক না। আপনি, সন্ন্যাসী হইয়া এ সকল অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলেন, এবং কি অভিপ্রায়েই বা আমায় দিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি। যোগী কহিলেন, মহারাজ! ঔষধ, মন্ত্রণা, গৃহচ্ছিদ্র, এসকল সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে; যদি অনুমতি হয়, নির্জনে গিয়া নিবেদন করি। মহারাজ! নীতিজ্ঞেরা বলেন, মন্ত্রণা, ষট্ কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে, অপ্রকাশিত থাকে না, তাহাতে কার্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; চারিকর্ণে হইলে, প্রকাশিত হয় না, অথচ কার্যসিদ্ধি করে; আর, দুই কর্ণের মন্ত্রণা, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না।

ইহা শুনিয়া, রাজা সন্ন্যাসীকে নির্জনে লইয়া কহিতে লাগিলেন, যোগীশ্বর! আপনি আমায় এত রত্ন দিলেন, কিন্তু একদিনও আমার আলয়ে ভোজন বা জলগ্রহণ করিলেন না; এজন্য, আমি আপনকার নিকট অতিশয় লজ্জিত হইতেছি। আপনকার কোনও অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত করুন; আমি প্রাণান্তেও তৎসম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না। সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ! গোদাবরীতীরবর্তী শ্মশানে মন্ত্র সিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; তাহাতে অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবেক। অতএব, তোমার নিকট আমার প্রার্থনা এই, তুমি একদিন, সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্যন্ত, আমার সন্নিহিত থাকিবে। তুমি সন্নিহিত থাকিলেই, আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবেক। রাজা কহিলেন, অবধারিত যাইব; আপনি দিন নির্ধারিত করিয়া বলুন। সন্ন্যাসী কহিলেন, তুমি, আগামী ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দশীতে, সন্ধ্যাকালে, একাকী আমার নিকটে যাইবে। রাজা কহিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন; আমি, নিঃসন্দেহ, যথাসময়ে, আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হইব। এইরূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়া, বিদায় লইয়া, সন্ন্যাসী স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

কৃষ্ণচতুর্দশী উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী, সায়ং সময়ে, আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর সংগ্রহ-পূর্বক, শ্মশানে যোগাসনে বসিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যও, প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া, সাহসে নির্ভর করিয়া, করে তরবারি ধারণপূর্বক, একাকী সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্খিনী, ডাকিনী প্রভৃতি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সন্ন্যাসীর চতুর্দিকে নৃত্য করিতেছে; সন্ন্যাসী, যোগাসনে আসীন হইয়া, দুই হস্তে দুই নরকপাল লইয়া, বাদ্য করিতেছেন। রাজা, এতাদৃশ ভয়াবহ ব্যাপার দর্শনে, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না; যথোপযুক্ত

ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! ভৃত্য উপস্থিত; আদেশ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়। যোগী, আশীর্বাদপ্রয়োগ-পূর্বক, সমীপপাতিত আসনের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিলেন, এই আসনে উপবেশন কর।

রাজা, তদীয় আদেশ অনুসারে, আসন পরিগ্রহ করিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, পুনরায় নিবেদন করিলেন, মহাশয়! ভৃত্যের প্রতি কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, মহারাজ! তোমার বাক্যনিষ্ঠায় নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। বুঝিলাম, সৎপুরুষেরা, প্রাণান্তেও, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। যাহা হউক, যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছ, এক বিষয়ে আমার সাহায্য কর। দুই ক্রোশ দক্ষিণে এক শ্মশান আছে; তথায় দেখিতে পাইবে, এক শিরীষবৃক্ষে শব ঝুলিতেছে; ঐ শব আমার নিকটে লইয়া আইস। রাজা, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। এইরূপে, রাজাকে শবানয়নে প্রেরণপূর্বক, যথাবিধি বিবিধ আয়োজন করিয়া, সন্ন্যাসী পূজায় বসিলেন।

একে কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা; তাহাতে আবার, ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল; আর, ভূতপ্রেতগণ চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয়সঞ্চার হয়। কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশমাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেষে, নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজা নির্দিষ্ট প্রেতভূমিতে উপনীত হইলেন; দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমূর্তি ভূতপ্রেতগণ, জীবিত মনুষ্য ধরিয়া, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে; কোনও স্থলে ডাকিনীগণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চর্বণ করিতেছে। রাজা, ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্যন্ত, প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; আর, চারিদিকে অনবরত কেবল মার্ মার্, কাট্ কাট্ ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও রাজা ভয় পাইলেন না; কিন্তু মনে মনে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যক্ষ যে যোগীর কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি, তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর, তিনি সেই বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, শব রজ্জুবদ্ধ, অধঃশিরাঃ, লম্বমান রহিয়াছে। শবদর্শনে শ্রম সফল বোধ করিয়া, রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং, নির্ভয়ে বৃক্ষে আরোহণপূর্বক, খড়্গাঘাত দ্বারা, শবের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিলেন। শব, ভূতলে পতিত হইবামাত্র, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা, তদীয় কণ্ঠরব শ্রবণে, সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং ত্বরায় তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া, নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি নিমিত্তে তোমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, বল। শব খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজা, দেখিয়া শুনিয়া, সাতিশয়

বিস্ময়াপন্ন ও চিন্তান্বিত হইলেন, এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারের মর্মাববোধে অসমর্থ হইয়া, অন্তঃকরণে অশেষপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন।

এই অবকাশে শব, বৃক্ষে উঠিয়া পূর্ববৎ রজ্জুবদ্ধ ও লম্বমান হইয়া রহিল। রাজাও, তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরোহণ ও রজ্জুচ্ছেদন পুরঃসর, শবকে কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া অবতীর্ণ হইলেন, এবং নিরতিশয় নির্বন্ধ সহকারে, তাহার এরূপ বিপৎপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে কিছুই উত্তর দিল না। রাজা, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যক্ষের নিকট যে তৈলিকের উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি; আর, যোগীও সেই কুম্ভকার, আপন যোগসিদ্ধির উদ্দেশে, ইহার প্রাণসংহার করিয়া, শ্মশানে রাখিয়াছে। অনন্তর তিনি, শবকে উত্তরীয়বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া, যোগীর নিকটে লইয়া চলিলেন।

অর্ধপথে উপস্থিত হইলে, শবাবিষ্ট বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, অহে বীর পুরুষ! তুমি কে, আমায়, কি নিমিত্তে, কোথায়, লইয়া যাইতেছ, বল। ভূপতি কহিলেন, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য; শান্তশীল নামক যোগীর আদেশ অনুসারে, তোমায় তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইতেছি। বেতাল কহিল, মহারাজ! মূঢ়, নির্বোধ, ও অলসেরা কেবল নিদ্রায়, আলস্যে ও কলহে কালহরণ করে; কিন্তু বুদ্ধিমান, চতুর, পণ্ডিত ব্যক্তিরা, সদা সদালাপ, শাস্ত্রচিন্তা, ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা, আনন্দে কাল-যাপন করিয়া থাকেন। অতএব, সমস্ত পথ মৌনভাবে গমন করা অপেক্ষা, সৎকথার আলোচনা শ্রেয়সী বোধ করিয়া, এক এক প্রসঙ্গ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক প্রসঙ্গের পরিশেষে প্রশ্ন করিব; যদি তুমি তত্তৎ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দাও, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইব; আর, যদি জানিয়াও যথার্থ উত্তর না দাও, অবিলম্বে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবেক। রাজা, অগত্যা তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাহাকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে লইয়া চলিলেন এবং বেতালও উপাখ্যানের আরম্ভ করিল।

প্রথম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! শ্রবণ কর,

বারাণসী নগরীতে, প্রতাপমুকুট নামে, এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার মহাদেবী নামে প্রেয়সী মহিষী ও বজ্রমুকুট নামে হৃদয়নন্দন নন্দন ছিল। একদিন রাজকুমার, একমাত্র অমাত্যপুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশপূর্বক, ঐ অরণ্যের মধ্যবর্তী অতি মনোহর সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, ঐ সরোবরের নির্মল সলিলে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগণ কেলি করিতেছে; প্রফুল্ল কমলসমূহের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে; মধুকরেরা, মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন্ ধ্বনি করত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে;

তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব, ফল, কুসুম সমূহে সুশোভিত রহিয়াছে; উহাদের ছায়া অতি স্নিগ্ধ; বিশেষতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা, পরম রমণীয় হইয়া আছে; তথায় উপস্থিতি মাত্র, শ্রান্ত ও আতপক্লান্ত ব্যক্তির শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হয়।

এই পরম রমণীয় স্থানে, কিয়ৎক্ষণ সঞ্চরণ করিয়া, রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সমীপবর্তী বকুলবৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ববন্ধন ও সরোবরে অবগাহনপূর্বক, স্নান করিলেন; অনন্তর, অনতিদূরবর্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্বক, দর্শন, পূজা, ও প্রণাম করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময়মধ্যে এক রাজকন্যাও, স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত, সরোবরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া স্নান ও পূজা সমাপনপূর্বক, বৃক্ষের ছায়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে, তাঁহার ও বজ্রমুকুটের চারি চক্ষুঃ একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য সন্দর্শনে, নৃপনন্দন মোহিত হইলেন। রাজকুমারীও, বজ্রমুকুটকে নয়নগোচর করিয়া, কৃতার্থম্মন্য হইয়া, শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন; অনন্তর, কর্ণসংযুক্ত করিয়া, দন্ত দ্বারা ছেদনপূর্বক, পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন; পুনর্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় প্রিয়বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কুমারী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, রাজকুমার বিরহবেদনায় অতিশয় অস্থির হইলেন, এবং সর্বাধিকারিকুমারের নিকটে গিয়া, লজ্জানম্র মুখে কহিতে লাগিলেন, বয়স্য! আজ আমি এক পরম সুন্দরী রমণী নিরীক্ষণ করিয়াছি; তাহার নাম ধাম কিছুই জানিতে পারি নাই; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে, প্রাণত্যাগ করিব। সর্বাধিকারিতনয়, সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহে প্রত্যানীত করিলেন। রাজকুমার, দুঃসহ বিরহবেদনায় নিতান্ত অধীর হইয়া, শাস্ত্রচিন্তা, সদালাপ, রাজকার্যপর্যালোচনা, ও স্নান ভোজন প্রভৃতি আবশ্যক ক্রিয়া পর্যন্ত পরিত্যাগপূর্বক, একাকী নির্জনে বিষণ্ণ মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে চিত্তবিনোদনের কোনও উপায় না দেখিয়া স্বহস্তে সেই কামিনীর প্রতিমূর্তি চিত্রিত করিলেন। দিন যামিনী, কেবল সেই প্রতিমূর্তির সন্দর্শন করেন; কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দেন না। সর্বাধিকারিপুত্র, নৃপনন্দনের এতাদৃশী দশা নিরীক্ষণ করিয়া, উপদেশচ্ছলে অশেষপ্রকার ভর্ৎসনা করিলেন।

প্রিয় বয়স্যের উপদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজকুমার কহিলেন, সখে! আমি যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি, তখন আমার হিতাহিতচিন্তা ও সুখদুঃখবিবেচনা নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, মনোরথ সম্পন্ন না হইলে, জীবনবিসর্জন করিব। রাজকুমারের ঈদৃশ আক্ষেপবাক্য কর্ণগোচর করিয়া, সর্বাধিকারিকুমার মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর এখন উপদেশ দ্বারা ধৈর্যসম্পাদনের সময় নাই;

ইনি নিতান্ত অধীর হইয়াছেন ; অতঃপর কোনও উপায় স্থির করা আবশ্যক। অনন্তর, তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! প্রস্থানকালে, সেই সীমন্তিনী তোমাকে কিছু বলিয়াছিল, কিংবা তুমি তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে। রাজপুত্র কহিলেন, না বয়স্য! আমি তাহাকে কিছু বলি নাই ; এবং সেই সর্বাঙ্গসুন্দরীও আমায় কোনও কথা বলে নাই। তখন সর্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, তবে তাহার সমাগম দুর্ঘট বোধ হইতেছে। রাজপুত্র কহিলেন, যদি সেই সুলোচনা লোচনানন্দদায়িনী না হয়, আমি প্রাণত্যাগ করিব। তখন তিনি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, পুনরায় কহিলেন, ভাল্ বয়স্য! জিজ্ঞাসা করি, প্রস্থানসময়ে, সে কোনও সঙ্কেত করিয়াছিল কি না।

রাজকুমার কমলবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সর্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, সখে! আর চিন্তা নাই ; আমি তৎকৃত সঙ্কেতের তাৎপর্যগ্রহ করিয়াছি, এবং তাহার নাম ধাম জানিতে পারিয়াছি। এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অল্প দিনের মধ্যেই, তাহার সহিত তোমার সমাগম সম্পন্ন করিয়া দিব। অধিক ব্যাকুল হইলেই, অভীষ্টসিদ্ধি হয় না ; ধৈর্য অবলম্বন কর। তখন রাজপুত্র কহিলেন, যদি বুঝিয়া থাক, সমুদয় বিশেষ করিয়া বল ; শুনিলেও, আপাততঃ স্থির হইতে পারি। তিনি কহিলেন, বয়স্য! শ্রবণ কর, পদ্মপুষ্প, মস্তক হইতে নামাইয়া, কর্ণে সংলগ্ন করিয়াছিল ; তদ্দ্বারা তোমাকে ইহা জানাইয়াছে, আমি কর্ণাটনগরনিবাসিনী ; দন্ত দ্বারা খণ্ডিত করিয়া, ইহা ব্যক্ত করিয়াছে, আমি দন্তবাট রাজার কন্যা ; তৎপরে, পদতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, এই সঙ্কেত করিয়াছে, আমার নাম পদ্মাবতী ; আর, হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।

বয়স্যের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রাজকুমার অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন ; এবং ব্যগ্র হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, বয়স্য! ত্বরায় আমায় কর্ণাটনগরে লইয়া চল। অনন্তর, উভয়ে সমুচিত পরিচ্ছদধারণ ও অস্ত্রবন্ধনপূর্বক অশ্বে আরোহণ করিলেন। কতিপয় দিবসের পরে, কর্ণাটনগরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা রাজবাটীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা আপন ভবনদ্বারে উপবিষ্টা আছে। উভয়ে, অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন, মা! আমরা বাণিজ্যব্যবসায়ী বিদেশীয় লোক ; দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র পশ্চাৎ আসিতেছে ; বাসার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত, আমরা অগ্রসর হইয়াছি ; যদি কৃপা করিয়া স্থান দাও, তবে থাকিতে পাই। বৃদ্ধা, তাঁহাদের মনোহর রূপ দর্শনে ও মধুর আলাপ শ্রবণে প্রীত হইয়া, প্রসন্ন মনে কহিল, এ তোমাদের গৃহ, যতদিন ইচ্ছা, সচ্ছন্দে অবস্থিতি কর।

এইরূপে, উভয়ে সেই বর্ষীয়সীর সদনে আবাসগ্রহণ করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বৃদ্ধা, তাঁহাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া, কথোপকথন আরম্ভ করিলে, সর্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! কয়জন তোমার পরিবার, আর কি প্রকারে বা সংসারযাত্রানির্বাহ হয়। বৃদ্ধা কহিল, আমার পুত্র রাজসংসারে কর্ম করে, রাজার

অতি প্রিয় পাত্র। আর, পদ্মাবতী নামে রাজার এক কন্যা আছেন, আমি তাঁহার ধাত্রী ছিলাম। এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছি, গৃহে থাকি ; রাজা অনুগ্রহ করিয়া অন্ন বস্ত্র দেন। আর, রাজকন্যা আমায় ভালবাসেন ; এজন্য, প্রতিদিন, এক একবার, তাঁহাকে দেখিতে যাই। এই কথা শুনিয়া, রাজপুত্র কহিলেন, কল্য যখন রাজবাটীতে যাইবে, আমায় বলিবে ; আমি তোমা দ্বারা রাজকন্যার নিকট কোনও সংবাদ পাঠাইব। বৃদ্ধা কহিল, যদি প্রয়োজন থাকে, বল, আজই আমি রাজকন্যাকে জানাইয়া আসি। রাজকুমার, এই কথা শুনিবামাত্র, অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি রাজকন্যাকে বলিবে, শুক্লপঞ্চমীতে, সরোবরতীরে, যে রাজকুমারকে দেখিয়াছিলে, সে, তোমার সঙ্কেত অনুসারে, উপস্থিত হইয়াছে।

এই বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র, বৃদ্ধা যষ্টিগ্রহণপূর্বক রাজভবনে গমন করিল। সে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাজকন্যা একাকিনী নির্জনে উপবিষ্টা আছেন। বৃদ্ধা সম্মুখবর্তিনী হইবামাত্র, রাজকন্যা সমাদরপূর্বক বসিতে আসন দিলেন। সে উপবিষ্ট হইয়া কহিল, বৎসে! বাল্যকালে, অনেক যত্নে, তোমায় মানুষ করিয়াছি। এক্ষণে, ভগবানের অনুগ্রহে, তুমি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার অন্তঃকরণের একান্ত অভিলাষ এই, অবিলম্বে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগতা হও। এইরূপ আড়ম্বরপূর্বক ভূমিকা করিয়া, বৃদ্ধা কহিতে লাগিল, শুক্লপঞ্চমীতে, বাপীতটে, যে রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়াছিলে, তিনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং আমা দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন, কমলসঙ্কেত দ্বারা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহা সম্পন্ন কর ; আমি উপস্থিত হইয়াছি। আর, আমিও কহিতেছি, এই রাজকুমার সর্বাংশে তোমার যোগ্য পাত্র ; তুমি যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, তিনিও সর্বাংশে তদনুরূপ।

রাজকন্যা শ্রবণমাত্র, কোপ প্রকাশ করিয়া, হস্তে চন্দন লেপনপূর্বক, বৃদ্ধার উভয় গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন, এবং কহিলেন, তুমি এই মুহূর্তে আমার অন্তঃপুর হইতে দূর হও। বৃদ্ধা, এইপ্রকার তিরস্কার লাভ করিয়া, বিরক্ত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে সদনে প্রত্যাগমনপূর্বক, পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকুমারের কর্ণগোচর করিল। তিনি শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল ও হতাশ্বাস হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, পার্শ্ববর্তী প্রিয় বয়স্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখে! এখন কি উপায় করি ; নিতান্ত বুঝিলাম, বিধি বাম হইয়াছেন ; মনস্কামসিদ্ধির কোনও সম্ভাবনা আছে, এরূপ বোধ হইতেছে না ; নতুবা, সেই বামলোচনা, কি নিমিত্ত, তিরস্কার করিয়া, বৃদ্ধাকে বিদায় করিল। অন্তঃকরণে অনুরাগ সঞ্চার হইলে, দূতীর প্রতি এত অনাদর হয় না। তখন তিনি কহিলেন, বয়স্য! মর্মগ্রহ না করিয়া, অকারণে এত ব্যাকুল হও কেন। শ্রীখণ্ডরসে অভিষিক্ত দশ করশাখা দ্বারা প্রহারের তাৎপর্য এই যে, শুক্ল পক্ষের দশ দিবস অবশিষ্ট আছে ; তদবসানে, অর্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষে তোমার সহিত সমাগম হইবেক।

শুক্ল পক্ষ অতিক্রান্ত হইল। বৃদ্ধা, পুনরায় রাজকুমারীর নিকটে গিয়া, রাজকুমারের প্রার্থনা জানাইল। তিনি শুনিয়া সাতিশয় কোপপ্রকাশ করিলেন; এবং, গলহস্ত-প্রদানপূর্বক, বৃদ্ধাকে, অন্তঃপুরের খড়কী দিয়া, বিদায় করিয়া দিলেন। সে, তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের নিকটে গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইল। তিনি শুনিয়া, নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সর্বাধিকারীর পুত্র কহিলেন, বয়স্য! কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ, আর ভাবনা নাই; এ অনুকূল গলহস্ত, অপ্রশস্ত নহে; তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়াছ। অদ্য রজনীযোগে, তোমায়, সেই খড়কী দিয়া, তাহার অন্তঃপুরে যাইতে সঙ্কেত করিয়াছে। রাজপুত্র, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, নিতান্ত উৎসুক চিত্তে, সূর্যদেবের অস্তগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী উপস্থিত হইল। রাজকুমার, বিহারযোগ্য বেশভূষার সমাধান করিয়া, প্রিয় বয়স্যের সহিত, অন্তঃপুরের খড়কীতে উপস্থিত হইলেন। সর্বাধিকারীর পুত্র বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন; তিনি, তন্মধ্য দিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাজকুমারী তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হওয়াতে, উভয়ে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলেন। রাজকুমারী, পার্শ্ববর্তিনী বয়স্যার প্রতি, দ্বার বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া, রাজকুমারের করগ্রহণপূর্বক, বিলাসভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং সুশোভিত স্বর্ণময় পল্যঙ্কে উপবেশনানন্তর, বল্লভের কণ্ঠদেশে স্বহস্তসঙ্কলিত ললিত মালতীমালা সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং তালবৃন্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার বদনসুধাকরসন্দর্শনেই, আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে, আর এরূপ ক্লেশস্বীকারের প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ, তোমার কোমল করপল্লব শিরীষকুসুম অপেক্ষাও সুকুমার, কোনও ক্রমে তালবৃন্তধারণের যোগ্য নহে; আমার হস্তে দাও; আমি তোমার সেবা দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করি। পদ্মাবতী কহিলেন, নাথ! আমার জন্য, তোমায় অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে; অতএব, তোমার সেবা করাই আমার উচিত হয়।

উভয়ের এইরূপ বচনবৈদগ্ধী শ্রবণগোচর করিয়া, পার্শ্ববর্তিনী সহচরী, পদ্মাবতীর হস্ত হইতে তালবৃন্ত গ্রহণপূর্বক, বায়ুসঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাজকুমার ও রাজকুমারী সহচরীদিগকে সাক্ষী করিয়া, গান্ধর্ব বিধানে, দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অনন্তর, উভয়ের সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া, সহচরীগণ, কার্যান্তরব্যপদেশে, বিলাসভবন হইতে বহির্গত হইলে, কান্ত ও কামিনী কৌতুকে যামিনীযাপন করিলেন।

রজনী অবসন্না হইল। রাজকুমার অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন রাজকুমারী কহিলেন, নাথ! আমার এ অন্তঃপুরে, সখীগণ ব্যতিরেকে, অন্যের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই; তুমি নির্ভয়ে অবস্থিতি কর। আমি, তোমায় বিদায় দিয়া, ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারিব না। রাজকুমার,

প্রিয়তমার ঈদৃশ প্রণয়রসাভিষিক্ত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিয়া, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তাঁহার সহচর হইয়া, পরম সুখে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, রাজকুমার রাজধানীপ্রতিগমনের অভিপ্রায়প্রকাশ করিলেন। রাজকন্যা, কোনও মতে, সম্মত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে, প্রায় মাস অতীত হইয়া গেল; রাজকুমার তথাপি প্রস্থানের অনুমতিলাভ করিতে পারিলেন না। এইরূপে, স্বদেশপ্রতিগমনবিষয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তিনি একদিন, নির্জনে বসিয়া মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, আমি নিতান্ত নরাধম; অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়সুখের পরতন্ত্র হইয়া, পিতা মাতা জন্মভূমি প্রভৃতি সকল পরিত্যাগ করিলাম; আর, যে জীবিতাধিক বান্ধবের বুদ্ধিকৌশলে ও উপদেশবলে, ঈদৃশ অসুলভ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতেছি, মাসাবধি তাঁহারও কোনও সংবাদ লইলাম না; বোধ করি, বন্ধু আমায় নিতান্ত স্বার্থপর ও যার পর নাই অকৃতজ্ঞ ভাবিতেছেন।

রাজকুমার একাকী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজকন্যা তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সাতিশয় বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আজ কি জন্যে তুমি এমন উন্মনা হইয়াছ। তোমার চন্দ্রবদন বিষণ্ণ দেখিলে, আমি দশ দিক শূন্য দেখি। অসুখের কারণ কি, বল; ত্বরায় তাহার প্রতিবিধান করিতেছি। বজ্রমুকুট কহিলেন, পিতার সর্বাধিকারীর পুত্র আমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। তিনি আমার পরম সুহৃৎ; মাসাবধি তাঁহার কোনও সংবাদ পাই নাই; জানি না, তিনি কেমন আছেন। তিনি অতি চতুর, সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, ও নানা গুণরত্নে মণ্ডিত। তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে ও মন্ত্রণাবলে, তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি। তিনিই তোমার সমস্ত সঙ্কেতের মর্মোদ্ভেদ করিয়াছিলেন।

পদ্মাবতী কহিলেন, অয়ি নাথ! ঈদৃশ বন্ধুর অদর্শনে, চিত্ত অবশ্যই উৎকণ্ঠিত হইতে পারে। এত দিন তাঁহার কোনও সংবাদ না লওয়ায়, যৎপরোনাস্তি অভদ্রতা প্রকাশ হইয়াছে। রহস্যবিদ বন্ধু প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তুমি তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়াছ, এবং, যার পর নাই, অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছ। এক্ষণকার কর্তব্য এই, তাঁহার পরিতোষার্থে, আমি স্বহস্তে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া পাঠাই; এবং তুমিও, একবার, কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, তথায় গিয়া, সমুচিত সদ্ভাবপ্রদর্শন করিয়া আইস। রাজপুত্র, তৎক্ষণাৎ, সেই খড়কী দিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং, বহু দিবসের পর, অকপটপ্রণয়পবিত্র মিত্র সহ সাক্ষাৎকারলাভে অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া, তাঁহার নিকট পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রাজপুত্রকে বন্ধুদর্শনে প্রেরণ করিয়া, রাজকন্যা মনে মনে এই আলোচনা করিতে

লাগিলেন, এ কেবল বন্ধুর বুদ্ধিকৌশলেই কৃতকার্য হইয়াছে ; অতএব অবশ্যই সকল কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিবেক ; আর, সে ব্যক্তিও আপন বান্ধবগণের নিকট, সমস্ত প্রকাশ করিবেক, সন্দেহ নাই। এইরূপে আমার কলঙ্কঘোষণা, ক্রমে ক্রমে, জগদ্ব্যাপিনী হইবার সম্ভাবনা। অতএব, এতাদৃশ ব্যক্তিকে জীবিত রাখা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, পদ্মাবতী, অবিলম্বে নানাবিধ বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া সখী দ্বারা রাজকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মিষ্টান্ন উপনীত হইলে, সর্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য। এ সকল কি। রাজপুত্র কহিলেন, মিত্র! আজ আমি তোমার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। রাজকন্যা, আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কারণজিজ্ঞাসু হইলে, আমি তোমার সবিশেষ পরিচয় দিয়া ও অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, প্রিয়ে! আমি এই বন্ধুর অদর্শনে বিষণ্ণ হইতেছি। রাজকন্যা, তোমার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং আমায় অগ্রে পাঠাইয়া দিয়া, স্বহস্তে এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া, তোমার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমায় বলিয়া দিয়াছেন, তুমি আপন সমক্ষে তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া আসিবে। অতএব বয়স্য! কিছু ভক্ষণ কর, তাহা হইলে পরম পরিতোষ পাই, এবং যাইয়া তাঁহার নিকটে বলিতে চাই, আমার বন্ধু, মিষ্টান্ন আহার করিয়া, তোমার শিল্পনৈপুণ্যের অশেষপ্রকার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া, সর্বাধিকারিপুত্র, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর রাজপুত্রের মুখে পুনর্বার মনোযোগপূর্বক পূর্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি আমার জন্যে কালকূট আনিয়াছ ; এ মিষ্টান্ন নহে, সাক্ষাৎ কৃতান্ত, জিহ্বাস্পর্শমাত্রই প্রাণসংহার করিবেক। আমার পরম সৌভাগ্য এই, তুমি খাও নাই। তুমি নিতান্ত ঋজুস্বভাব, কাহার কি ভাব, কিছুই বুঝিতে চেষ্টা কর না। তোমায় এক সার কথা বলি, স্বৈরিণীরা, স্বভাবতঃ, আপন প্রিয়ের প্রিয় পাত্রের উপর অতিশয় বিষদৃষ্টি হয়। অতএব, তুমি, তাহার নিকট আমার পরিচয় দিয়া, বুদ্ধির কার্য কর নাই।

রাজকুমার কহিলেন, বয়স্য। আমি তোমার এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি তাহার স্বভাব জান না, এজন্য এরূপ কহিতেছ। এমন সদাশয় স্ত্রীলোক তুমি কখনও দেখ নাই। তাঁহার নাম করিলে, আমার রোমাঞ্চ হয়। আর, আমি, সমবেত সখীগণ সমক্ষে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া, গান্ধর্ব বিধানে, তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি ; এমন স্থলে, স্বৈরিণীশব্দে তাঁহার নির্দেশ করা, কোনও মতে, ন্যায়ানুগত হইতেছে না। সে যাহা হউক, তিনি যেমন চারুশীলা, তেমনই উদারশীলা, তিনি তোমার প্রাণসংহারের নিমিত্ত, মিষ্টান্নচ্ছলে কালকূট পাঠাইয়াছেন, তুমি কেমন করিয়া এমন কথা মুখে আনিলে, বুঝিতে পারিতেছি না। বলিতে কি, তুমি আর বার এ প্রকার কহিলে, আমি তোমার উপর যার পর নাই, বিরক্ত হইব। ভাল, কথায় প্রয়োজন নাই, আমি তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। এই বলিয়া, এক লাড্ডু লইয়া, রাজকুমার

বিড়ালকে ভক্ষণ করাইলেন। বিড়াল তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন রাজপুত্র চকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এরূপ দুর্বৃত্তার সহিত পরিচয় রাখা কদাচ উচিত নহে। আর আমি, জন্মাবচ্ছেদে, সে পাপীয়সীর মুখাবলোকন করিব না। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, না বয়স্য। তাহারে একবারে পরিত্যাগ করা হইবেক না; কৌশল করিয়া, রাজধানীতে লইয়া যাইতে হইবেক। রাজপুত্র কহিলেন, তাহাও তোমার বুদ্ধিসাধ্য।

অমাত্যপুত্র কহিলেন, বয়স্য! এক পরামর্শ বলি, শুন। আজ তুমি, পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া, পূর্ব অপেক্ষা অধিকতর প্রণয়প্রদর্শন করিবে, এবং বলিবে, বন্ধু, মিষ্টান্ন ভক্ষণের অব্যবহিত পরক্ষণেই, অচেতনপ্রায় হইয়া, নিদ্রাগত হইয়াছেন। আমি, তোমায় দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, চলিয়া আসিয়াছি। আমি এখন, তোমায় এক ক্ষণ নিরীক্ষণ না করিলে, দশ দিক শূন্য দেখি। ফলতঃ, আর আমি, বন্ধুর অনুরোধে এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। এবম্প্রকার মনোহর-বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা, তাহারে মোহিত করিয়া, দিবাযাপন করিবে; অনন্তর, রাত্রিতে সে নিদ্রাগতা হইলে, তদীয় সমস্ত আভরণ হরণপূর্বক, তাহার বাম জঙ্ঘাতে ত্রিশূলের চিহ্ন দিয়া, চলিয়া আসিবে। রাজপুত্র সম্মত হইলেন, এবং পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া বিলক্ষণ প্রীতিপ্রদর্শন করিলেন। পরে, রজনীযোগে, উভয়ে শয়ন করিলে, রাজকন্যা ত্বরায় নিদ্রাভিভূতা হইলেন। তখন রাজকুমার, মন্ত্রিপুত্রের উপদেশানুরূপ সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া, বৃদ্ধার আবাসে উপস্থিত হইলেন।

পর দিন, প্রভাতে, মন্ত্রিপুত্র, সন্ন্যাসীর বেশধারণপূর্বক, এক শ্মশানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বয়ং গুরু হইয়া রাজপুত্রকে শিষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি নগরে গিয়া এই অলঙ্কার বিক্রয় কর। যদি কেহ তোমায় চোর বলিয়া ধরে, তাহারে আমার নিকটে লইয়া আসিবে। রাজপুত্র, তদীয় উপদেশ অনুসারে, নগরে প্রবেশ করিয়া রাজসদনের সমীপবাসী স্বর্ণকারের নিকট, রাজকন্যার অলঙ্কারবিক্রয়ার্থে উপস্থিত হইলেন। সে, দর্শনমাত্র, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কিছুদিন হইল, আমি রাজকন্যার নিমিত্ত এই সকল অলঙ্কার গড়িয়া দিয়াছি; ইহার হস্তে কি প্রকারে আইল। এ ব্যক্তিকে বৈদেশিক দেখিতেছি। অনন্তর, সাতিশয় সন্দিহান হইয়া, স্বর্ণকার কারিকরদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা কহিল, হাঁ, এ সমস্ত রাজকন্যার অলঙ্কার বটে। তখন সে, রাজকুমারকে চোর স্থির করিয়া, কহিল, এ রাজকন্যার অলঙ্কার দেখিতেছি, তুমি কোথায় পাইলে, যথার্থ বল।

স্বর্ণকার, ভয়প্রদর্শনপূর্বক, বার বার এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করাতে, রাজপথবাহী বহু-সংখ্যক লোক, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তথায় সমবেত হইল। ফলতঃ, অল্পকালমধ্যেই ঐ অলঙ্কার লইয়া, বিলক্ষণ আন্দোলন হইতে লাগিল। পরিশেষে, নগরপাল, এই সংবাদ পাইয়া, রাজকুমার ও স্বর্ণকার, উভয়কে রুদ্ধ করিল। পরে, সে অলঙ্কারের

প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, রাজকুমার কহিলেন, শ্মশানবাসী গুরুদেব আমায় এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন; তিনি কোথায় পাইয়াছেন, আমি তাহার কিছুই জানি না। যদি তোমাদের আবশ্যক বোধ হয়, শ্মশানে গিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। পরিশেষে, নগরপাল, গুরু শিষ্য উভয়কে, অলঙ্কার সমেত রাজসমক্ষে লইয়া গিয়া, পূর্বাপর সমস্ত বিজ্ঞাপন করিল।

রাজা, অলঙ্কার দর্শনে, নানাপ্রকারে সন্দিহান হইয়া, যোগীকে, নির্জনে লইয়া গিয়া বিনয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি এই সমস্ত অলঙ্কার কোথায় পাইলেন। যোগী কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণচতুর্দশী রজনীতে, আমি নগরপ্রান্তবর্তী শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সিদ্ধ করিয়াছিলাম। মন্ত্রপ্রভাবে ডাকিনী, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, প্রসাদস্বরূপ স্বীয় অলঙ্কার সকল উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন; এবং আমিও তাঁহার বাম জঙ্ঘাতে, যোগসিদ্ধির প্রমাণস্বরূপ ত্রিশূলের চিহ্ন করিয়া দিয়াছি। এ সমস্ত সেই অলঙ্কার। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজমহিষীকে বলিলেন, দেখ দেখি, পদ্মাবতীর বাম জঙ্ঘাতে কোনও চিহ্ন আছে কি না। রাজ্ঞী সবিশেষ অবগত হইয়া, রাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন, এক ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।

রাজা, এবম্প্রকার অঘটনঘটনা দর্শনে, হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এতাদৃশী দুশ্চারিণীকে গৃহে রাখা কদাচ উচিত নহে; ইহাতে অধর্ম আছে। অতএব, এখন কি কর্তব্য। অথবা, পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া, সবিশেষ কহিয়া জিজ্ঞাসা করি; তাঁহারা, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন, তদনুরূপ কার্য করিব। কিন্তু, শাস্ত্রে গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিলে, আমার এই কলঙ্ক, ক্রমে ক্রমে দেশে বিদেশে প্রচারিত হইবেক। তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, সেই সন্ন্যাসীকেই ইহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। সন্ন্যাসী সবিশেষ সমস্ত অবগত আছেন; ধর্মতঃ প্রশ্ন করিলে, অবশ্যই যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবেন। অনন্তর, রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! ধর্মশাস্ত্রে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বিষয়ে কিরূপ দণ্ড নিরূপিত আছে। সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ! ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে স্ত্রীলোক, বালক, ব্রাহ্মণ ইহারা অত্যন্ত অপরাধী হইলেও, বধার্হ নহে; রাজা ইহাদের নির্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন।

রাজা, এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, অন্তঃপুরে গিয়া, রাজ্ঞীকে কহিলেন, পদ্মাবতী অতি দুশ্চরিত্রা; এজন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে, আমি উহারে দেশবহিষ্কৃতা করিব। রাজ্ঞী কন্যার প্রতি নিরতিশয় স্নেহবতী ছিলেন; কিন্তু, পতিব্রতাত্বগুণের আতিশয্য-বশতঃ রাজার মতেই সম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। অনন্তর নরপতি, কন্যাকে শিবিকারোহণের আদেশ দিয়া, তাহার অগোচরে, বাহকদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা, পদ্মাবতীকে কোনও অরণ্যানীতে পরিত্যাগ করিয়া, ত্বরায় আমায় সংবাদ

দিবে। বাহকেরা রাজাজ্ঞাসম্পাদন করিল। অমাত্যপুত্রও, তৎক্ষণাৎ, রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া, রাজকুমারীর উদ্দেশে চলিলেন; এবং, ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে সেই অরণ্যানীতে প্রবেশিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতী, একাকিনী বৃক্ষমূলে বসিয়া, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, বিষণ্ণবদনে রোদন করিতেছেন। অশেষবিধ আশ্বাস-প্রদান দ্বারা তাঁহার শোকাবেগনিবারণ করিয়া, সঙ্গে লইয়া, উভয়ে স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, প্রজাগণ অতিশয় আনন্দিত হইল। রাজা প্রতাপমুকুট, বধূ সহিত পুত্র পাইয়া, আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া, নগরে মহোৎসবের আদেশ করিলেন।

এইরূপে আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! রাজা ও মন্ত্রিপুত্র, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি, নিরপরাধে রাজনন্দিনীর নির্বাসন-জন্য দুরদৃষ্টভাগী হইবেন। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, আমার মতে, রাজা। বেতাল কহিল, কি নিমিত্তে। রাজা কহিলেন, শাস্ত্রকারেরা আততায়ীর বধে ও বিদ্রোহাচরণে দোষাভাব লিখিয়াছেন। অতএব, বিষপ্রদায়িনী রাজতনয়ার প্রতি এরূপ প্রতিকূল আচরণের নিমিত্ত, মন্ত্রিপুত্রকে দোষী বলিতে পারা যায় না। কিন্তু, রাজা যে, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ ও বিচারবহির্মুখ হইয়া, অপত্যস্নেহবিস্মরণপূর্বক, অকৃত অপরাধে, কন্যাকে নির্বাসিত করিলেন, ইহাতে তাঁহার, রাজধর্মের বিরুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানজন্য, পাপস্পর্শ হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া, বেতাল পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে, শ্মশানে গিয়া, পূর্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; রাজাও, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, তাহাকে, বৃক্ষ হইতে অবতারণপূর্বক, স্কন্ধে করিয়া, সন্ন্যাসীর আশ্রম অভিমুখে চলিলেন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! দ্বিতীয় উপাখ্যানের আরম্ভ করি, অবধান কর।

যমুনাতীরে, জয়স্থল নামে এক নগর আছে। তথায়, কেশব নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের, মধুমালতী নামে, এক পরম সুন্দরী দুহিতা ছিল। কালক্রমে, মধুমালতী বিবাহযোগ্যা হইলে, তাহার পিতা ও ভ্রাতা, উভয়ে উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণে তৎপর হইলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, ব্রাহ্মণ, যজমানপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে, গ্রামান্তরে গেলেন; ব্রাহ্মণের পুত্রও, অধ্যয়নের নিমিত্ত, গুরুগৃহে প্রস্থান করিলেন। উভয়ের অনুপস্থিতি-সময়ে, এক সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন। কেশবের ব্রাহ্মণী, তাহাকে রূপে রতিপতি ও বিদ্যায় বৃহস্পতি দেখিয়া, মনে মনে বাসনা করিলেন, যদি সৎকুলোদ্ভব হয় ও অঙ্গীকার করে, তবে ইহাকেই জামাতা করিব; অনন্তর,

যথোচিত অতিথিসৎকার করিয়া, তাহার কুলের পরিচয় লইলেন, এবং সৎকুলজাত জানিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন, বৎস! যদি তুমি স্বীকার কর, তোমার সহিত আমার মধুমালতীর বিবাহ দি। বিপ্রতনয়, মধুমালতীর লোকাতীত লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, কেশবপত্নীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষায়, তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র উভয়ে, মধুমালতীপ্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, এক এক পাত্র লইয়া, প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিন পাত্র একত্র হইল; একের নাম ত্রিবিক্রম, দ্বিতীয়ের নাম বামন, তৃতীয়ের নাম মধুসূদন। তিন জনই রূপ, গুণ, বিদ্যা, বয়ঃক্রমে তুল্য, কোনও ক্রমে ইতরবিশেষ করিতে পারা যায় না। তখন ব্রাহ্মণ, বিলক্ষণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক কন্যা, তিন পাত্র উপস্থিত; কি উপায় করি; তিন জনেই তিন জনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি; এক্ষণকার কর্তব্য কি।

ব্রাহ্মণ এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিলেন, তুমি এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ, সর্পাঘাতে মধুমালতীর প্রাণত্যাগ হয়। তখন কেশব-শর্মা, সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, চারি পাঁচ জন বিষবৈদ্য আনাইয়া, অশেষ প্রকারে চিকিৎসা করাইলেন; কিন্তু কোনও প্রকারেই প্রতীকার দর্শিল না। বিষবৈদ্যেরা কহিল, মহাশয়! আপনকার কন্যাকে কালে দংশন করিয়াছে, এবং বার, তিথি, নক্ষত্র সমুদয়ের দোষ পাইয়াছে; স্বয়ং ধন্বন্তরি উপস্থিত হইলেও, ইহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। এক্ষণকার যাহা কর্তব্য থাকে, করুন; আমরা চলিলাম। এই বলিয়া, প্রণাম করিয়া, বিষবৈদ্যেরা প্রস্থান করিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, মধুমালতীর প্রাণবিয়োগ হইল। তখন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পুত্র, এবং তিন বর, পাঁচজন একত্র হইয়া তদীয় মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া, যথাবিধি দাহক্রিয়া করিলেন। ব্রাহ্মণ, পুত্র সহিত গৃহে আসিয়া, সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বরেরা তিন জনেই, এতাদৃশ অলৌকিকরূপনিধান কন্যানিধান লাভে হতাশ হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। তন্মধ্যে, ত্রিবিক্রম চিতা হইতে অস্থি-সঞ্চয়ন করিলেন, এবং বস্ত্রখণ্ডে বন্ধনপূর্বক, কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; বামন সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন; মধুসূদন, সেই শ্মশানের প্রান্তভাগে পর্ণশালানির্মাণ করিয়া, তাহার এক কোণে মধুমালতীর রাশীকৃত দেহভস্ম রাখিয়া, যোগসাধন করিতে লাগিলেন।

একদিন, বামন, ভ্রমণ করিতে করিতে, মধ্যাহ্নকালে, এক ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ, ভোজনকালে সন্ন্যাসী উপস্থিত দেখিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি, কৃপা করিয়া, দীনের ভবনে পাদার্পণ করিয়াছেন, তবে অনুগ্রহপূর্বক ভিক্ষাস্বীকার করুন; তাহা হইলে, আমি চরিতার্থ হই; পাকের অধিক বিলম্ব নাই।

সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন এবং পাকান্তে ভোজনে বসিলেন। ব্রাহ্মণী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র, নিতান্ত অশান্তভাবে উৎপাত আরম্ভ করিয়া, পরিবেশনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন ; বালক কোনওক্রমে প্রবোধ মানিলেক না। তখন তিনি, ক্রোধভরে, পুত্রকে প্রজ্বলিতহুতাশনপূর্ণ চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, নির্বিঘ্নে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণীর এইরূপ বিরূপ আচরণ দেখিয়া, নারায়ণ নারায়ণ বলিয়া, তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহাশয়! অকস্মাৎ ভোজনে বিরত হইলেন কেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, যে স্থানে এরূপ রাক্ষসের ব্যবহার, তথায় কি প্রকারে ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয়, বল। ব্রাহ্মণ, ঈষৎ হাস্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সঞ্জীবনীবিদ্যার পুস্তক বহির্গত করিয়া, তন্মধ্য হইতে এক মন্ত্র লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। পুত্র, অবিলম্বে প্রাণদান পাইয়া, পূর্ববৎ উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। সন্ন্যাসী, চমৎকৃত হইয়া, ভোজন-সমাপন করিলেন, এবং মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, এই পুস্তকে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র আছে ; ঐ মন্ত্র জানিতে পারিলে, প্রিয়াকে পুনর্জীবিত করিতে পারি। অতএব, যেরূপে হয়, পুস্তকখানি হস্তগত করিতে হইবেক।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া, সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে কহিলেন, অদ্য অপরাহ্ণ হইল ; অতএব, আর স্থানান্তরে না গিয়া, তোমার আলয়েই রাত্রিকাল অতিবাহিত করিব। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, পরমসমাদরপূর্বক, স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। সমুদয় গৃহস্থ, ভোজনাবসানে, স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিল। সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে, বামন, নিঃশব্দপদসঞ্চারে, গৃহে প্রবেশপূর্বক, সঞ্জীবনী বিদ্যার পুস্তক হস্তগত করিয়া, প্রস্থান করিলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই, জয়স্থলের শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মধুসূদন, স্বহস্তনির্মিত পর্ণকুটীরে অবস্থিত হইয়া, যোগসাধন করিতেছেন। এই সময়ে, দৈবযোগে, ত্রিবিক্রমও তথায় উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে তিন বর একত্র হইলে পর, বামন কহিলেন, আমি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়াছি ; তোমরা অস্থি ও ভস্ম একত্র কর, আমি প্রিয়াকে প্রাণদান দিব। তাঁহারা, মহাব্যস্ত হইয়া, অস্থি ও ভস্ম একত্র করিলেন। বামন, পুস্তক হইতে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র বহিষ্কৃত করিয়া, জপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রের প্রভাবে, অনতিবিলম্বে, কন্যার কলেবরে মাংস শোণিত প্রভৃতির আবির্ভাব ও প্রাণসঞ্চার হইল। তখন তিন জনে, মধুমালতীর রূপ ও লাবণ্যের মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, এই কামিনী আমার আমার বলিয়া, পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিনের মধ্যে, কোন ব্যক্তি মধুমালতীর পাণিগ্রহণে যথার্থ অধিকারী হইতে পারে। রাজা কহিলেন,

যে ব্যক্তি কুটীর নির্মাণ করিয়া, এতাবৎকাল পর্যন্ত, শ্মশানবাসী হইয়াছিল, আমার বিবেচনায়, সেই এই কামিনীর পাণিগ্রহণে অধিকারী। বেতাল কহিল, যদি ত্রিবিক্রম অস্থিসঞ্চয়ন করিয়া না রাখিত, এবং বামন, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া, সঞ্জীবনী বিদ্যার সংগ্রহ করিতে না পারিত, তবে কি প্রকারে মধুমালতী প্রাণদান পাইত। রাজা কহিলেন, যাহা কহিতেছ, উহা সর্বাংশে সত্য বটে; কিন্তু ত্রিবিক্রম, অস্থিসঞ্চয়ন দ্বারা, মধুমালতীর পুত্রস্থানীয়, আর বামন, জীবনদান দ্বারা, পিতৃস্থানীয় হইয়াছে; সুতরাং, তাহারা উহার প্রণয়ভাজন হইতে পারে না। কিন্তু মধুসূদন, ভস্মরাশিসংগ্রহ ও উটজনির্মাণ পূর্বক শ্মশানবাসী হইয়া, যথার্থ প্রণয়ীর কার্য করিয়াছে। অতএব, সেই, ন্যায়মার্গ অনুসারে, এই প্রমদার প্রণয়ভাজন হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

তৃতীয় উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

বর্ধমান নগরে, রূপসেন নামে, অতি বিজ্ঞ, গুণগ্রাহী, দয়াশীল, পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। এক দিন, দক্ষিণদেশনিবাসী বীরবর নামে রজঃপূত, কর্মপ্রাপ্তির বাসনায়, রাজদ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারবান, তাহার প্রমুখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, রাজসমীপে বিজ্ঞাপন করিল, মহারাজ! বীরবর নামে এক অস্ত্রধারী পুরুষ, কর্মের প্রার্থনায় আসিয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে; সাক্ষাৎকারে আসিয়া স্বীয় অভিপ্রায় আপনকার গোচর করিতে চায়; কি আজ্ঞা হয়। রাজা আজ্ঞা করিলেন, অবিলম্বে উহারে লইয়া আইস।

অনন্তর, দ্বারী বীরবরকে নরপতিগোচরে উপস্থিত করিলে, রাজা, তদীয় আকার প্রকার দর্শনে, তাহাকে বিলক্ষণ কার্যদক্ষ স্থির করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বীরবর! কত বেতন পাইলে, তোমার সচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারে। বীরবর নিবেদন করিল, মহারাজ! প্রত্যহ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার আদেশ হইলে, আমার চলিতে পারে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তোমার পরিবার কত। সে কহিল, মহারাজ! এক স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, আর স্বয়ং, এই চারি; এতদ্ব্যতিরিক্ত আর আমার পরিবার নাই। রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইহার পরিবার এত অল্প, তথাপি কি নিমিত্ত এত অধিক প্রার্থনা করে। যাহা হউক, এক ভৃত্যের নিমিত্ত, নিত্য নিত্য, এবংবিধ ব্যয় যুক্তিসঙ্গত নহে। অথবা, এ অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবেক না; অবশ্যই ইহার অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা থাকিবেক। অতএব, কিছুদিনের নিমিত্তে রাখিয়া, ইহার গুণের ও ক্ষমতার পরীক্ষা করা উচিত। অনন্তর, কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া, রাজা

আজ্ঞা দিলেন, তুমি প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, বীরবরকে সহস্র সুবর্ণ দিবে; কোনও মতে অন্যথা না হয়।

বীরবর, রাজকীয় আজ্ঞা শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে, সে দিবসের প্রাপ্য নির্ধারিত সুবর্ণগ্রহণপূর্বক, নৃপনির্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া, সে, প্রথমতঃ, সেই সুবর্ণকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া, একভাগ বিপ্রসাৎ করিল; অবশিষ্ট ভাগ পুনর্বার দ্বিভাগ করিয়া, একভাগ বৈষ্ণব, বৈরাগী, সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে দিল; অপর ভাগ দ্বারা নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া, শত শত দীন, দুঃখী, অনাথ প্রভৃতিকে পর্যাপ্ত ভোজন করাইল; অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ স্বয়ং, পুত্র, কলত্র, ও দুহিতার সহিত, আহার করিল।

প্রতিদিন, এইরূপে দিনপাত করিয়া, সায়ংকালে বর্ম, খড়্গ ও চর্ম ধারণপূর্বক, বীরবর সমস্ত রজনী, রাজদ্বারে উপস্থিত থাকে। রাজা, তাহার শক্তির ও প্রভুভক্তির পরীক্ষার্থে, কি দ্বিতীয় প্রহর, কি তৃতীয় প্রহর, যখন যে আদেশ করেন, অতি দুঃসাধ্য হইলেও, সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিয়া আইসে।

এক দিন, নিশীথ সময়ে, অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া, রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্তী হইয়া কহিল, মহারাজ। কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনা যাইতেছে; ত্বরায়, ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া, আমায় সংবাদ দাও। বীরবর যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। রাজা বীরবরকে, এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না দেখিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন; এক্ষণে তাহার সাহস ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, স্বয়ং গুপ্ত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বীরবর, সেই ক্রন্দনশব্দ লক্ষ্য করিয়া, অতি প্রসিদ্ধ এক ভয়ঙ্কর শ্মশানে উপস্থিত হইল; দেখিল, এক সর্বালঙ্কারভূষিতা সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী শিরে করাঘাত ও হাহাকার করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। বীরবর দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল, এবং তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কে, কি দুঃখে, এই ঘোর রজনীতে, একাকিনী শ্মশানবাসিনী হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছ। সে কোনও উত্তর দিল না; বরং পূর্ব অপেক্ষায়, অধিকতর রোদন করিতে, লাগিল। অনন্তর, বীরবর, সবিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক, বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে, সে কহিল, আমি রাজলক্ষ্মী; রাজা রূপসেনের গৃহে নানা অন্যায়াচরণ হইতেছে; তৎপ্রযুক্ত, তদীয় আবাসে, অচিরাৎ অলক্ষ্মীর প্রবেশ হইবেক; সুতরাং, আমি রাজার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আমি প্রস্থান করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই, রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক; সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া, রোদন করিতেছি।

প্রভুর এবম্ভূত অসম্ভাবিত ভাবি অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া, বীরবর

কহিল, দেবি! আপনি যে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে, কোনও মতে, সন্দেহ করিতে পারি না। কিন্তু, যদি এই হৃদয়বিদারণ অমঙ্গলঘটনার নিবারণের কোনও উপায় থাকে, বলুন; আমি, রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত, প্রাণান্ত পর্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, পূর্বদিকে, অর্ধযোজনান্তে, এক দেবী আছেন। যদি কেহ ঐ দেবীর নিকটে, আপন পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দেয়, তবে তিনি, প্রসন্ন হইয়া, রাজার সমস্ত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন।

রাজলক্ষ্মীর এই বাক্য শুনিয়া, বীরবর, অতি সত্বর, ভবনাভিমুখে ধাবমান হইল। রাজাও, কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বীরবর, গৃহে উপস্থিত হইয়া, আপন পত্নীকে জাগরিত করিয়া, সবিশেষ সমস্ত জ্ঞাত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিল, বৎস! তোমার মস্তক দিলে, রাজার দীর্ঘ আয়ুঃ ও অচল রাজ্য হয়। তখন পুত্র কহিল, মাতঃ! প্রথমতঃ, আপনকার আজ্ঞা; দ্বিতীয়তঃ, স্বামিকার্য; তৃতীয়তঃ, ক্ষণবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবসেবায় নিয়োজিত হইবেক; ইহা অপেক্ষা, আমার পক্ষে প্রাণত্যাগের উত্তম সময় আর ঘটিবেক না। অতএব, শুভ কর্মে বিলম্ব করা কর্তব্য নহে। আপনারা, সত্বর হইয়া, কার্যসম্পাদন করুন।

বীরবর, পুত্রের এতাদৃশ পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সহধর্মিণীকে কহিল, যদি তুমি সচ্ছন্দ মনে পুত্রপ্রদান কর, তবেই আমি দেবীর নিকটে বলিদান দিয়া, রাজকার্য নিষ্পন্ন করি। স্বামিবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, বীরবরের পত্নী নিবেদন করিল, নাথ! ধর্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, স্বামী মূক, বধির, পঙ্গু, অন্ধ, কুব্জ, কুষ্ঠী, যেরূপ হউন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, যেরূপ চরিতার্থতা লাভ হয়, শাস্ত্রবিহিত দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা দ্বারা তদ্রূপ হয় না; আর যদি স্বামীর প্রতি অযত্ন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, পারলৌকিক সুখসম্ভোগের লোভে, নিরন্তর শাস্ত্রবিহিত ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে, সে সকল সর্বতোভাবে বিফল ও অন্তে অবধারিত অধোগতির কারণ হয়। অতএব, আমার পুত্র-পৌত্রে প্রয়োজন কি; তোমার চিত্তরঞ্জন ও চরণশুশ্রূষা করিলেই, উভয় লোকে নিস্তার পাইব। তাহার পুত্র কহিল, পিতঃ! যে ব্যক্তি স্বামিকার্যসম্পাদনে সমর্থ, তাহারই জন্ম সার্থক, এবং সেই স্বর্গলোকে অনন্ত কাল সুখসম্ভোগ করে। অতএব, আর কি জন্যে, সংশয়ে কালহরণ করিতেছেন, কার্যসাধনে তৎপর হউন। বিলম্বে কার্যহানির সম্ভাবনা।

ইত্যাকার নানাপ্রকার কথোপকথনের পর, বীরবর সপরিবারে, দেবীর মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজা, এইরূপে, বীরবরের সপরিবারের প্রভুভক্তির প্রবলতা ও অচলতা দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনে মনে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক, গুপ্ত ভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বীরবর দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল, এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য আদি নানা উপচারে, যথাবিধি পূজা করিয়া, সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্বক, দেবীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, জগদীশ্বরি! তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত, আমি প্রাণাধিকপ্রিয়

পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দিতেছি। কৃপা কর, যেন প্রভুর দীর্ঘ আয়ুঃ ও অচল রাজ্য হয়।

এই বলিয়া, খড়্গ লইয়া, বীরবর, অকাতরে, পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। বীরবরের কন্যা, এইরূপে জীবিতাধিক সহোদরের প্রাণবিনাশ দেখিয়া, খড়্গপ্রহার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পত্নীও, শোকে একান্ত বিকলচিত্তা হইয়া, তৎক্ষণাৎ তনয়-তনয়ার অনুগামিনী হইল। তখন বীরবর বিবেচনা করিল, প্রভুকার্য সম্পন্ন করিলাম; এক্ষণে আর কি নিমিত্তে, দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকি; আর কি সুখেই বা জীবনধারণ করি; এই বলিয়া, সেই বিষম খড়্গ দ্বারা স্বীয় শিরচ্ছেদন করিল।

এইরূপে, অল্পক্ষণ মধ্যে, চারিজনের অদ্ভুত মরণ প্রত্যক্ষ করিয়া, রাজার অন্তঃকরণে নিরতিশয় নির্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, যে রাজ্যের নিমিত্ত এতাদৃশ প্রভুভক্ত সেবকের সর্বনাশ হইল, আর আমি সেই বিষম রাজ্যের ভোগে প্রবৃত্ত হইব না। আমি, অতিশয় স্বার্থপর ও নিরতিশয় নির্বিবেক; নতুবা, কি নিমিত্তে, বীরবরকে পুত্রহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলাম না; কি নিমিত্তেই বা, তাহাকে আত্মঘাতী হইতে দিলাম; উপক্রমেই, এই ঘোরতর অধ্যবসায় হইতে, বীরবরকে বিরত করা, সর্বতোভাবে, আমার উচিত ছিল। সর্বথা আমি অতি অসৎ কর্ম করিয়াছি। এক্ষণে, আত্মহত্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত, চিত্তসন্তোষ জন্মিবেক না।

এই বলিয়া, খড়্গ লইয়া, রাজা আত্মশিরচ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র, ভগবতী কাত্যায়নী, তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া, হস্তধারণপূর্বক, রাজাকে মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন; কহিলেন, বৎস! তোমার সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে, যার পর নাই, প্রীত হইয়াছি; অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন, মাতঃ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই চারি জনের জীবনদান কর; এক্ষণে, ইহা অপেক্ষা আমার আর গুরুতর প্রার্থয়িতব্য নাই। দেবী, তথাস্তু বলিয়া, অবিলম্বে পাতাল হইতে অমৃত আনয়নপূর্বক, তাহাদের গাত্রে সেচন করিবামাত্র, চারিজনেই তৎক্ষণাৎ, সুপ্তোত্থিতের ন্যায়, গাত্রোত্থান করিল। রাজা, যথার্থ প্রভুভক্ত বীরবরকে, অপত্য কলত্র সহিত, পুনর্জীবিত দেখিয়া, অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং, নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে, দেবীর চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া, গদ্গদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। রাজার ভক্তিদর্শনে ও স্তবশ্রবণে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, দেবী, প্রার্থনাধিক বরপ্রদান দ্বারা, রাজাকে চরিতার্থ করিয়া, অন্তর্হিতা হইলেন।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, রাজা রূপসেন, সভাভবনে সিংহাসনে আসীন হইয়া, রাত্রিবৃত্তান্তকীর্তনপূর্বক, সর্ব সভাজন সমক্ষে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া, অদ্ভুত প্রভুপরায়ণ বীরবরকে অর্ধরাজ্যেশ্বর করিলেন।

এইরূপে কথা সমাপ্ত করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! পূর্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কাহার ঔদার্য অধিক হইল। বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, আমার বোধে রাজার ঔদার্য অধিক। বেতাল কহিল, কেন। রাজা বলিলেন, স্বামীর নিমিত্ত সর্বনাশস্বীকার ও প্রাণদান করা সেবকের কর্তব্য কর্ম। বীরবর, রাজকার্যার্থে, ঈদৃশ ঔদার্য প্রকাশ করিয়া, আত্মধর্মপ্রতিপালন করিয়াছে। কিন্তু, রাজা যে, সেবকের নিমিত্ত, রাজ্যাধিকার তৃণতুল্য বোধ করিয়া, অনায়াসে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন, এতাদৃশ ঔদার্যের কার্য, কস্মিন্ কালেও, কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্থ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ভোগবতী নগরীতে, অনঙ্গসেন নামে, অতি প্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। চূড়ামণি নামে সর্বগুণাকর শুকপক্ষী, সর্ব কাল, তাঁহার সন্নিহিত থাকিত। এক দিন, রাজা কথা-প্রসঙ্গে চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসিলেন, শুক! তুমি কি কি জান। সে কহিল, মহারাজ! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, কালত্রয়ের বৃত্তান্ত জানি। তখন রাজা কহিলেন, যদি তুমি ত্রিকালজ্ঞ হও, বল, কোন স্থানে আমার উপযুক্ত রমণী আছে। চূড়ামণি নিবেদন করিল, মহারাজ! মগধদেশের অধিপতি রাজা বীরসেনের চন্দ্রাবতী নামে এক কন্যা আছে; সে পরম সুন্দরী ও সাতিশয় গুণশালিনী; তাহার সহিত মহারাজের বিবাহ হইবেক।

রাজা অনঙ্গসেন, শুকের সর্বজ্ঞতাপরীক্ষার্থে, চন্দ্রকান্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়! আপনি গণনা দ্বারা নির্ধারিত করিয়া বলুন, কোন কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হইবেক। তিনি জ্যোতির্বিদ্যাপ্রভাবে অবগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! চন্দ্রাবতী নামে এক অতি রূপবতী রমণী আছে; গণনা দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, তাহার সহিত আপনকার পরিণয় হইবেক। রাজা শুনিয়া শুকের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; পরে এক সদ্বক্তা, চতুর, বুদ্ধিমান্, কার্যদক্ষ ব্রাহ্মণকে আনাইয়া, নানা উপদেশ দিয়া, সম্বন্ধস্থিরীকরণার্থে, মগধেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন।

চন্দ্রাবতীর নিকটেও মদনমঞ্জরী নামে এক শারিকা থাকিত। তাহারও সর্বজ্ঞতাখ্যাতি ছিল। তিনি, এক দিবস, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, শারিকে! যদি তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমুদায় বলিতে পার, আমার যোগ্য পতি কোথায় আছেন, বল। শারিকা কহিল, রাজনন্দিনী! আমি দেখিতেছি, ভোগবতী নগরীর অধিপতি রাজা অনঙ্গসেন তোমার পতি হইবেন। ফলতঃ, অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী, উভয়েরই, এইরূপে শ্রবণদ্বারা

অন্তরে অনুরাগসঞ্চার হইল, এবং, সমাগমের অভাব নিবন্ধন, উভয়েরই, ক্রমে ক্রমে, পূর্বরাগ সংক্রান্ত স্মরদশার আবির্ভাব হইতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, অনঙ্গসেনের প্রেরিত ব্রাহ্মণ, মগধেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীয় রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং, বাগ্দানের দ্রব্য-সামগ্রী সমভিব্যাহারে দিয়া, এক ব্রাহ্মণকে ঐ ব্রাহ্মণের সহিত পাঠাইলেন ; কহিয়া দিলেন, তুমি তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিলে, আমি কোনও উদ্‌যোগ করিতে পারিব না। বাগ্দানের দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ব্রাহ্মণেরা, অনঙ্গসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ দ্বারা, বিবাহের দিন নির্ধারিত করিয়া, মগধেশ্বরের প্রেরিত ব্রাহ্মণ দ্বারা, তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর, নির্ধারিত দিবসে, যথাসময়ে মগধেশ্বরের আলয়ে উপস্থিত হইয়া, অনঙ্গসেন, চন্দ্রাবতীর পাণিগ্রহণপূর্বক, নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া, পরম সুখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাবতী, শ্বশুরালয়ে আগমনকালে, মদনমঞ্জরী শারিকারে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে সর্বদা আপন সমীপে রাখিতেন। রাজাও, ক্ষণ কালের নিমিত্ত, চূড়ামণিকে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিতেন না। এক দিবস, রাজা ও রাজমহিষী অন্তঃপুরে একাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং পিঞ্জরস্থ শুক-শারিকাও তাঁহাদের সম্মুখে আছে ; সেই সময়ে রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ, একাকী থাকিলে অতি কষ্টে কালযাপন হয় ; অতএব আমার অভিলাষ, শুকের সহিত তোমার শারিকার বিবাহ দিয়া, উভয়কে এক পিঞ্জরে রাখি ; তাহা হইলে, উহারা আনন্দে কালহরণ করিতে পারিবেক। রাজ্ঞী, ঈষৎ হাসিয়া, অনুমোদনপ্রদর্শন করিলে, রাজা, শুকের সহিত শারিকার বিবাহ দিয়া, উভয়কে এক পিঞ্জরে রাখিয়া দিলেন।

এক দিন, রাজা নির্জনে, রাজমহিষীর সহিত, রসপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, সেই সময়ে শুক শারিকাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিল, দেখ, এই অসার সংসারে ভোগ অতি সার পদার্থ। যে ব্যক্তি, এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভোগসুখে পরাঙ্মুখ থাকে, তাহার বৃথা জন্ম। অতএব, কি নিমিত্ত, তুমি ভোগবিষয়ে নিরুৎসাহিনী হইতেছ। শারিকা কহিল, পুরুষজাতি অতিশয় শঠ, অধর্মী, স্বার্থপর ও স্ত্রীহত্যাকারী ; এজন্য, পুরুষসহবাসে আমার রুচি হয় না। শুক কহিল, নারীও অতিশয় চপলা, কুটিলা, মিথ্যাবাদিনী, ও পুরুষঘাতিনী। উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শুক ! হে শারিকে ! কেন তোমরা অকারণে কলহ করিতেছ। তখন শারিকা কহিল, মহারাজ ! পুরুষ বড় অধর্মী, এই নিমিত্তে পুরুষজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নাই। আমি পুরুষের ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে এক উপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ১

ইলাপুরে, মহাধন নামে, অতি ঐশ্বর্যশালী এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বহুকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার পুত্র হইল না; এজন্য, তিনি সর্বদাই মনোদুঃখে কালহরণ করেন। কিয়ৎ দিন পরে, জগদীশ্বরের কৃপায়, তাঁহার সহধর্মিণী এক কুমার প্রসব করিলেন। শ্রেষ্ঠী, অধিক বয়সে পুত্রমুখনিরীক্ষণ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন, এবং পুত্রের নাম নয়নানন্দ রাখিয়া, পরম যত্নে তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। বালক পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, তিনি তাহাকে, বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত, উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে, স্বভাবদোষবশতঃ, কেবল দুঃশীল, দুশ্চরিত্র বালকগণের সহিত কুৎসিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া, সতত কালযাপন করে, ক্ষণমাত্রও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে না। ক্রমে ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তদীয় কুপ্রবৃত্তি সকল, উত্তরোত্তর, ততই উত্তেজিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎ কাল পরে, শ্রেষ্ঠী পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। নয়নানন্দ, সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া, দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত হইল, এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যে, দুষ্ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, অত্যন্ত দুর্দশায় পড়িল। পরে সে, ইলাপুর পরিত্যাগপূর্বক, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে, চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের নিকট উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয়প্রদান করিল। হেমগুপ্ত তাহার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন; উহাকে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং যথোচিত সমাদর ও সাতিশয় প্রীতিপ্রদর্শন-পূর্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি, কি সংযোগে, অকস্মাৎ এস্থলে উপস্থিত হইলে।

নয়নানন্দ কহিল, আমি, কতিপয় অর্ণবপোত লইয়া, সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম। দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত, অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে, সমস্ত অর্ণবপোত জলমগ্ন হইল। আমি, ভাগ্যবলে, এক ফলকমাত্র অবলম্বন করিয়া, বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছি। এ পর্যন্ত আসিয়া, আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এমন আশা ছিল না। আমার সমভিব্যাহারের লোক সকল কে কোন দিকে গেল, বাঁচিয়াছে, কি মরিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র জলমগ্ন হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশে প্রবেশ করিতে অতিশয় লজ্জা হইতেছে। কি করি, কোথায় যাই, কোনও উপায় ভাবিয়া পাইতেছি না। অবশেষে, আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, হেমগুপ্ত মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি অনেক দিন অবধি, রত্নাবতীর নিমিত্ত, নানা স্থানে, পাত্রের অন্বেষণ করিতেছি; কোথাও মনোনীত হইতেছে না; বুঝি, ভগবান কৃপা করিয়া গৃহে উপস্থিত করিয়া দিলেন। এ অতি সদ্বংশজাত, পৈতৃক অতুল অর্থসম্পত্তির ন্যায়, পৈতৃক অতুল গুণসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব, ত্বরায় দিন স্থির করিয়া, ইহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দি। মনে মনে এইপ্রকার কল্পনা করিয়া, তিনি শ্রেষ্ঠিনীর নিকটে গিয়া কহিলেন, দেখ, এক শ্রেষ্ঠীর পুত্র উপস্থিত

হইয়াছে ; সে সংকুলোদ্ভব। তাহার পিতার সহিত আমার অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। যদি তোমার মত হয়, তাহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দি।

শ্রেষ্ঠিনী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভগবানের ইচ্ছা না হইলে, এরূপ ঘটে না। বিনা চেষ্টায় মনস্কাম সিদ্ধ হওয়া ভাগ্যের কথা। অতএব, বিলম্বের প্রয়োজন নাই ; দিন স্থির করিয়া, ত্বরায় শুভ কর্ম সম্পন্ন কর। শ্রেষ্ঠী, স্বীয় সহধর্মিণীর অভিপ্রায় বুঝিয়া, মহাধননন্দনের নিকটে গিয়া, আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। তখন তিনি, শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্ধারিত করিয়া, মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন। বর ও কন্যা, পরম কৌতুকে, কালযাপন করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, নয়নানন্দ, মনোমধ্যে কোনও অসৎ অভিসন্ধি করিয়া, আপন পত্নীকে বলিল, দেখ, অনেক দিন হইল, আমি স্বদেশে যাই নাই, এবং বন্ধুবর্গেরও কোনও সংবাদ পাই নাই ; তাহাতে অন্তঃকরণে কি পর্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে, বলিতে পারি না। অতএব, তোমার পিতা-মাতার মত করিয়া, আমায় বিদায় দাও ; আর, যদি ইচ্ছা হয়, তুমিও সমভিব্যাহারে চল। পতিব্রতা রত্নাবতী, জননীর নিকটে গিয়া, স্বামীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

শ্রেষ্ঠিনী স্বামীর সন্নিধানে গিয়া কহিলেন, তোমার জামাতা গৃহে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠী শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সে জন্যে ভাবনা কি ; বিদায় করিয়া দিতেছি। তুমি কি জান না, জন, জামাই, ভাগিনেয়, এ তিন, কোনও কালে, আপন হয় না, ও তাহাদের উপর বলপ্রকাশ চলে না। জামাতা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাই সর্বাংশে কর্তব্য। তাঁহাকে বল, ভাল দিন দেখিয়া, বিদায় করিয়া দিতেছি। অনন্তর, শ্রেষ্ঠী আপন তনয়াকে হাস্যমুখে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! তোমার অভিপ্রায় কি, শ্বশুরালয়ে যাইবে, না পিত্রালয়ে থাকিবে।

রত্নাবতী, কিয়ৎ ক্ষণ, লজ্জায় নম্রমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল ; অনন্তর, কার্যান্তর-ব্যপদেশে, তথা হইতে অপসৃত হইয়া, স্বামীর নিকটে গিয়া কহিল, দেখ, পিতা মাতা সম্মত হইয়াছেন ; কহিলেন, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হও, তাহাই করিবেন। অতএব, তোমায় এই অনুরোধ করিতেছি, কোনও কারণে, আমায় ছাড়িয়া যাইও না ; আমি, তোমার অদর্শনে, প্রাণধারণ করিতে পারিব না।

পরিশেষে, শ্রেষ্ঠী জামাতাকে, অনেকবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও প্রচুর অর্থ দিয়া, মহাসমাদর-পূর্বক, বিদায় করিলেন, এবং কন্যাকেও, মহামূল্য অলঙ্কারসমূহে ভূষিতা করিয়া, তাহার সমভিব্যাহারিণী করিয়া দিলেন। নয়নানন্দ, নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণবন্দনাপূর্বক, পত্নীর সহিত প্রস্থান করিল।

নয়নানন্দ, এক নিবিড় জঙ্গলে উপস্থিত হইয়া, শ্রেষ্ঠীকন্যাকে কহিল, দেখ, এই অরণ্যে অতিশয় দস্যুভয় আছে ; শিবিকায় আরোহণ ও অঙ্গে অলঙ্কারধারণ করিয়া যাওয়া উচিত নহে ; অলঙ্কারগুলি খুলিয়া আমার হস্তে দাও, আমি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখি ;

নগর নিকটবর্তী হইলে, পুনরায় পরিবে। আর, বাহকেরাও, শিবিকা লইয়া, এই স্থান হইতে ফিরিয়া যাউক, কেবল আমরা দুইজনে দরিদ্রবেশে গমন করি; তাহা হইলে, নিরুপদ্রবে যাইতে পারিব।

রত্নাবতী, তৎক্ষণাৎ, অঙ্গ হইতে উন্মোচিত করিয়া, সমস্ত আভরণ স্বামিহস্তে ন্যস্ত করিল, এবং দাস দাসী ও বাহকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, একাকিনী সেই শঠের সমভিব্যাহারিণী হইয়া চলিল। নয়নানন্দ, এইরূপে মহামূল্য অলঙ্কারসমূহ হস্তগত করিয়া, ক্রমে ক্রমে, অরণ্যের অতি নিবিড় প্রদেশে প্রবেশ করিল, এবং তাদৃশ পতিপরায়ণা হিতৈষিণী প্রণয়িনীকে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, পলায়নপূর্বক, স্বদেশে উপস্থিত হইল। রত্নাবতী, কূপে পতিত হইয়া, হা তাত! হা মাতঃ! বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। দৈবযোগে, এক পথিক, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অসম্ভাবিত রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং শব্দ অনুসারে গমন করিয়া, কূপের সমীপবর্তী হইয়া, তন্মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্বক, অবলোকন করিল, এক পরম সুন্দরী নারী, উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও পরিদেবন করিতেছে। পথিক দর্শনমাত্র, অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, পরম যত্নে সেই স্ত্রীরত্নকে কূপ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে, একাকিনী এই ভয়ঙ্কর কাননে আসিয়াছিলে; কি প্রকারেই বা তোমার এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিল, বল।

রত্নাবতী, পতিনিন্দা অতি গর্হিত বুঝিয়া, প্রকৃত ব্যাপার গোপনে রাখিয়া কহিল, আমি চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের কন্যা; আমার নাম রত্নাবতী; আপন পতির সহিত শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলাম; এই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, সহসা কতিপয় দুর্দান্ত দস্যু আসিয়া, প্রথমতঃ, অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া, আমায় এই কূপে ফেলিয়া দিল, এবং আমার পতিকে নিতান্ত নির্দয়রূপে প্রহার করিতে করিতে, লইয়া গেল। তাঁহার কি দশা ঘটিয়াছে, কিছুই জানি না। পান্থ শুনিয়া অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং অশেষবিধ আশ্বাসদান ও অভয়প্রদান পূর্বক, অতি যত্নে রত্নাবতীকে সঙ্গে লইয়া, তাহার পিত্রালয়ে পঁহুছাইয়া দিল।

রত্নাবতী পিতা-মাতার নিরতিশয় স্নেহপাত্র ছিল। তাঁহারা, তাহার তাদৃশ অসম্ভাবিত দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন ও একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, আকুল বচনে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! কিরূপে তোমার এরূপ দুর্দশা ঘটিল, বল। সে কহিল, এক অরণ্যে, অকস্মাৎ চারিদিক হইতে, অস্ত্রধারী পুরুষেরা আসিয়া, বলপূর্বক আমার অঙ্গ হইতে সমুদায় অলঙ্কার খুলিয়া লইল, এবং তাঁহাকে যত সম্পত্তি দিয়া বিদায় করিয়াছিলে, সে সমুদায়ও কাড়িয়া লইল; অনন্তর, আমাকে এক অন্ধকূপে ফেলিয়া দিয়া, তাঁহার পৃষ্ঠে, নিতান্ত নিষ্ঠুর রূপে, যষ্টিপ্রহার করিতে করিতে, কহিতে লাগিল, আর কোথায় কি লুকাইয়া রাখিয়াছিস, বাহির করিয়া দে। তখন তিনি, নিতান্ত কাতর স্বরে অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, আমাদের নিকট যাহা

ছিল, সমস্ত তোমাদের হস্তগত হইয়াছে ; আর কিছুমাত্র নাই। তোমাদের প্রহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে ; চরণে ধরিতেছি ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমায় ছাড়িয়া দাও। তিনি বারংবার এইপ্রকার কাতরোক্তিপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন ; নির্দয় দস্যুরা তথাপি তাঁহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল ; তৎপরে ছাড়িয়া দিল, কি মারিয়া ফেলিল, কিছুই জানিতে পারি নাই। তখন তাহার পিতা কহিলেন, বৎসে! তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। আমার অন্তঃকরণে লইতেছে, তোমার পতি জীবিত আছেন। চোরেরা অর্থপিশাচ, অর্থ হস্তগত হইলে, আর অকারণে প্রাণ নষ্ট করে না। এইরূপে অশেষবিধ আশ্বাস ও প্রবোধ দিয়া, তাহার পিতা, অবিলম্বে, আর এক প্রস্থ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এদিকে, নয়নানন্দ, আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়া, অলঙ্কারবিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া, দিবারাত্র দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃতি দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং কিয়ৎ দিনের মধ্যেই, পুনরায় নিঃস্বভাবাপন্ন ও অন্নবস্ত্রবিহীন হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি যে কুব্যবহার করিয়াছি, তাহা শ্বশুরালয়ে, কোনও প্রকারেই, প্রকাশ পায় নাই। অতএব, একটা ছল করিয়া, তথায় উপস্থিত হই ; পরে, দুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া, সুযোগক্রমে কিছু হস্তগত করিয়া, পলাইয়া আসিব। মনে মনে এই দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া, সে শ্বশুরালয়ে গমন করিল, এবং বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র, সর্বাগ্রে স্বীয় পত্নী রত্নাবতীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

পতিপ্রাণা রত্নাবতী, পতিকে সমাগত দেখিয়া, অন্তঃকরণে চিন্তা করিল, পতি, অতি দুরাচার হইলেও, নারীর পরম গুরু। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই, নারী ইহলোকে ও পরলোকে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। আর, যে নারী, কুমতিপরতন্ত্র হইয়া, পরম গুরু স্বামীর কাদাচিৎক কুব্যবহারকে অপরাধ গণ্য করিয়া, তাঁহার প্রতি কোনও প্রকারে অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করে, সে আপন ঐহিক ও পারলৌকিক সকল সুখে জলাঞ্জলি দেয়। আর, উনি, কেবল ভ্রান্তিক্রমেই, সেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। অতএব, আমি, সেই সামান্য দোষ ধরিয়া, উঁহার চরণে অপরাধিনী হইব না। যাহা হউক, উনি সবিশেষ না জানিয়াই এখানে আসিয়াছেন ; আমায় দেখিতে পাইলেই, নিঃসন্দেহ, পলায়ন করিবেন। অতএব, অগ্রে উঁহার ভয়ভঞ্জন করিয়া দেওয়া উচিত।

রত্নাবতী, অন্তঃকরণে, এই সকল আলোচনা করিয়া, ত্বরায় তাহার সম্মুখবর্তিনী হইয়া কহিল, নাথ! তুমি অন্তঃকরণে কোনও আশঙ্কা করিও না। আমি পিতা মাতার নিকট কহিয়াছি, চোরেরা, অলঙ্কারগ্রহণপূর্বক, আমায় কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, তোমায় বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব, সে সকল কথা মনে করিয়া, ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। আমার পিতা মাতা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছেন ; তোমায় দেখিলে, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইবেন। আর তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই ; এই স্থানেই অবস্থিতি কর ; আমি যাবজ্জীবন তোমার

চরণসেবা করিব। এইরূপে তাহার ভয়ভঞ্জন করিয়া, পরিশেষে রত্নাবতী কহিল, আমি পিতা-মাতার নিকট যেরূপ বলিয়াছি, তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে, তুমিও সেইরূপ বলিবে।

এইরূপ উপদেশ দিয়া, রত্নাবতী প্রস্থান করিলে পর, সেই ধূর্ত তৎক্ষণাৎ শ্বশুরের নিকটে গিয়া প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী, আলিঙ্গনপূর্বক আশীর্বাদ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদ বচনে, জামাতাকে সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। নয়নানন্দ, স্বীয় সহধর্মিণীর উপদেশানুরূপ সমস্ত বর্ণন করিয়া, পরিশেষে কহিল, মহাশয়! যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে প্রাণরক্ষার কোনও সম্ভাবনা ছিল না; কেবল জগদীশ্বরের কৃপায়, ও আপনাদের চরণারবিন্দের অকৃত্রিমস্নেহ-সম্বলিত আশীর্বাদের প্রভাবে, এ যাত্রা কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইয়াছি। যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। অধিক আর কি বলিব, শত্রুও যেন কখনও এরূপ বিপদে না পড়ে। ইহা কহিয়া, যেন যথার্থই পূর্ব অবস্থার স্মরণ হইল, এরূপ ভান করিয়া, সে রোদন করিতে লাগিল। সবিশেষ সমস্ত শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া, হেমগুপ্তের অন্তঃকরণে অতিশয় অনুকম্পা জন্মিল।

রজনী উপস্থিত হইল। পতিপ্রাণা রত্নাবতী, স্বামিসমাগমসৌভাগ্যমদে মত্তা হইয়া, তদীয় পূর্বতন নৃশংস আচরণ বিস্মরণপূর্বক, তৎসহবাসসুখসম্ভোগের অভিলাষে, মনের উল্লাসে, সর্বাঙ্গে সর্বপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া, শয়নাগারে প্রবেশ করিল। নয়নানন্দ, কিয়ৎ ক্ষণ কৃত্রিম কৌতুকের পর, নিদ্রাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন রত্নাবতী কহিল, আজ তুমি পথশ্রান্ত আছ, আর অধিক ক্ষণ জাগরণক্লেশ সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। শয়ন কর, আমি চরণসেবা করি। সে কহিল, তুমিও শয়ন কর, চরণসেবা করিতে হইবেক না।

অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলে, ধূর্তশিরোমণি নয়নানন্দ, অবিলম্বে, কপট নিদ্রার আশ্রয়গ্রহণপূর্বক, নাসিকাধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। রত্নাবতীও, পতিকে নিদ্রাগত দেখিয়া, অনতিবিলম্বে নিদ্রায় অচেতন হইল। তখন, সেই অদ্ভুত দুরাত্মা, অবসর বুঝিয়া, গাত্রোত্থানপূর্বক, আপন কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরি বহিষ্কৃত করিল, এবং, নিরুপম স্ত্রীরত্ন রত্নাবতীর কণ্ঠনালীচ্ছেদনপূর্বক, সমস্ত আভরণ লইয়া পলায়ন করিল।

ইহা কহিয়া, শারিকা বলিল, মহারাজ! যাহা বর্ণিত হইল, সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তদবধি, আমার পুরুষজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না, এবং সাধ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গপরিত্যাগে যত্নবতী থাকিব। পুরুষেরা অতি ধূর্ত, অতি নৃশংস, অতি স্বার্থপর। মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, পুরুষসহবাস সসর্প গৃহে বাস অপেক্ষাও ভয়ানক। এই সমস্ত কারণে, আর আমার পুরুষের মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা নাই।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, শুককে কহিলেন, অহে চূড়ামণি! তুমি, স্ত্রীজাতির উপর কি নিমিত্তে এত বিরক্ত, তাহার সবিশেষ বর্ণন কর।

তখন শুক কহিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন,

কাঞ্চনপুর নগরে সাগরদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার শ্রীদত্ত নামে সুরূপ, সুশীল, শান্তস্বভাব এক পুত্র ছিল। অনঙ্গপুরনিবাসী সোমদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা জয়শ্রীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিয়ৎ দিন পরে, শ্রীদত্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে প্রস্থান করিল; জয়শ্রী আপন পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিল। দীর্ঘ কাল অতীত হইল, তথাপি শ্রীদত্ত প্রত্যাগমন করিল না।

একদিন, জয়শ্রী আপন প্রিয়বয়স্যার নিকট কহিল, দেখ সখি! আমার যৌবন বৃথা হইল। আজ পর্যন্ত সংসারের সুখ কিছুমাত্র জানিতে পারিলাম না। বলিতে কি, এরূপে একাকিনী কালহরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তুমি কোনও উপায় স্থির কর। তখন সখী কহিল, প্রিয়সখি! ধৈর্য ধর, ভগবানের ইচ্ছা হয় ত, অবিলম্বে তোমার প্রিয়সমাগম হইবেক। জয়শ্রী, ইচ্ছানুরূপ উত্তর না পাইয়া, অসন্তোষ প্রকাশ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃতা হইয়া, গবাক্ষদ্বার দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে, ঐ সময়ে, এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ, অতিমনোহর বেশে, ঐ পথে গমন করিতেছিল। ঘটনাক্রমে, তাহার ও জয়শ্রীর চারিচক্ষুঃ একত্রে হইবাতে, উভয়েই উভয়ের মন হরণ করিল। জয়শ্রী তৎক্ষণাৎ, আপন সখীকে কহিল, দেখ, যে রূপে পার, ঐ হৃদয়চোর ব্যক্তির সহিত সংঘটন করিয়া দাও। জয়শ্রীর সখী, তাহার নিকটে গিয়া, কথাচ্ছলে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিল, সোমদত্তের কন্যা জয়শ্রী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান; সন্ধ্যার পর, তুমি আমার আলয়ে আসিবে। এই বলিয়া, সে তাহাকে আপন আলয় দেখাইয়া দিল। তখন সে কহিল, তোমার সখীকে বলিবে, আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম; সায়ংকালে, তোমার আবাসে আসিয়া নিঃসন্দেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

তদনন্তর সখী, জয়শ্রীর নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমুদায় তাহার গোচর করিলে, সে অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইল, এবং তাহাকে পারিতোষিক দিয়া, অশেষ প্রকার প্রশংসা করিয়া কহিল, যদি তুমি তাহার সহিত মিলন করিয়া দিতে পার, আমায় চিরকালের মত কিনিয়া রাখিবে; আমি, কোনও কালে, তোমার এ ধার শুধিতে পারিব না। এক্ষণে তুমি আপন আলয়ে গিয়া অবস্থিতি কর; সে আসিবামাত্র আমায় সংবাদ দিবে। এই বলিয়া, সখীকে বিদায় করিয়া, জয়শ্রী, উল্লাসিত মনে, ইচ্ছানুরূপ বেশভূষা করিতে বসিল।

শুভ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, সেই যুবা, রতিপতির আদেশানুরূপ বেশপরিগ্রহ করিয়া, সখীর আলয়ে উপস্থিত হইল। সে, পরম সমাদরে বসিতে আসন দিয়া,

জয়শ্রীর নিকটে গিয়া, প্রিয়তমের উপস্থিতিসংবাদ দিল। জয়শ্রী শুনিয়া, আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া, কহিল, সখি! কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর; গৃহজন নিদ্রিত হইলেই, তোমার সঙ্গে গিয়া, প্রাণনাথের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, জন্ম সার্থক করিব। অনন্তর, পরিবারস্থ সমস্ত লোক নিদ্রাগত হইলে, জয়শ্রী, সখীর সহিত তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া, অননুভূতপূর্ব, চিরাকাঙ্ক্ষিত মদনরসের আস্বাদন দ্বারা, যৌবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া, নিশাবসান সময়ে, স্বীয় আবাসে প্রতিগমন করিল। সে, এইরূপে, প্রত্যহ, প্রিয়সমাগমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, তাহার স্বামী, বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। জয়শ্রী, শ্রীদত্তের সমাগমনে, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, এ আপদ আবার, এত দিনের পর, কোথা হইতে উপস্থিত হইল। এখন কি করি, প্রাণনাথের নিকটে যাইবার ব্যাঘাত জন্মিল। কতদিন থাকিবেক, কত জ্বালাইবেক, তাহাও জানি না। এই চিন্তায় মগ্ন, ও স্নান, ভোজন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিমুখ হইয়া, বিষণ্ন মনে, সখীর সহিত, নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

রজনী উপস্থিত হইল। জয়শ্রীর মাতা, জামাতাকে, পরম সমাদর ও যত্নপূর্বক ভোজন করাইয়া, দাসী দ্বারা, শয়নাগারে গিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন এবং আপন কন্যাকেও পতিশুশ্রূষার্থে গমন করিতে আদেশ দিলেন। জয়শ্রী প্রথমতঃ অসম্মত হওয়াতে, তাহার মাতা, নানাবিধ প্রবোধবাক্য ও ভর্ৎসনা দ্বারা তাহাকে নিরুত্তরা করিয়া, বলপূর্বক গৃহপ্রবেশ করাইলেন। তখন সে বিবশা হইয়া, শয়নাগারে প্রবেশ-পূর্বক, পল্যঙ্কে আরোহণ করিয়া, বিবৃত্ত মুখে শয়ন করিয়া রহিল। শ্রীদত্ত, স্নিগ্ধ সম্ভাষণ করিয়া, প্রণয়িনীর প্রতি নানাপ্রকার প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে, তাহাতে সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, মৌন অবলম্বন করিয়া রহিল। শ্রীদত্ত, তাহার সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত, নিজানীত নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও পট্টশাটী প্রভৃতি কামিনীজনকমনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে, জয়শ্রী, সাতিশয় কোপপ্রদর্শনপূর্বক, তদ্দত্ত সমস্ত বস্তু দূরে নিক্ষিপ্ত করিল। তখন শ্রীদত্ত, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, ক্ষান্ত রহিল, এবং একান্ত পথশ্রান্ত ছিল, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইল।

জয়শ্রী, পতিকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া, মনে মনে আহ্লাদিতা হইল, এবং পতিদত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া, ঘোরতর অন্ধকারাবৃত রজনীতে, একাকিনী নির্ভয়ে প্রিয়তমের উদ্দেশে চলিল। সেই সময়ে, এক তস্কর ঐ পথে দণ্ডায়মান ছিল। সে সর্বা-লঙ্কারভূষিতা কামিনীকে, অর্ধরাত্র সময়ে, একাকিনী গমন করিতে দেখিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিল, এই যুবতী, অসহায়িনী হইয়া, নিশীথ সময়ে, নির্ভয়ে কোথায় যাইতেছে। যাহা হউক, সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইল। এই বলিয়া, সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

এদিকে, জয়শ্রীর প্রিয় সখা, সখীর আলয়ে একাকী শয়ন করিয়া, তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছিল। অকস্মাৎ এক কালসর্প আসিয়া, দংশিয়া তাহার

প্রাণসংহার করিয়া গেল। সে মৃত পতিত রহিল। জয়শ্রী, তথায় উপস্থিত হইয়া, মৃত প্রিয়তমকে কপটনিদ্রিত বোধ করিয়া, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিল; কিন্তু উত্তর না পাইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিল, আমার আসিতে বিলম্ব হওয়াতে, ইনি অভিমানে উত্তর দিতেছেন না; অনন্তর, তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া, বিনয় ও প্রিয় সম্ভাষণপূর্বক, বিলম্বের হেতুনির্দেশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। চোর কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া, সহাস্য আস্যে, এই রহস্য দেখিতে লাগিল।

নিকটস্থবটবৃক্ষবাসী এক পিশাচও এই কৌতুক দেখিতেছিল। সে, সাতিশয় কুপিত হইয়া, স্থির করিল, ঈদৃশী দুশ্চারিণীকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া আবশ্যক; অনন্তর সে, তদীয় প্রিয়তমের মৃত কলেবরে আবির্ভূত হইয়া, দন্ত দ্বারা জয়শ্রীর নাসিকাচ্ছেদন-পূর্বক, আপন আবাসবৃক্ষে প্রতিগমন করিল। চোর, এই সমস্ত নয়নগোচর করিয়া, নিরতিশয় চমৎকৃত হইল।

জয়শ্রীর জ্ঞানোদয় হইল। তখন, সে, প্রিয়তমকে মৃত স্থির করিয়া, সখীর নিকটে গিয়া, পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপার তাহার গোচর করিয়া কহিল, সখি! আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি; কি উপায় করি, বল। গৃহে গিয়া, কেমন করিয়া, পিতামাতার নিকট মুখ দেখাইব। তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে, কি উত্তর দিব। বিশেষতঃ, আজ আবার সেই সর্বনাশিয়া আসিয়াছে; সেই বা, দেখিয়া শুনিয়া, কি মনে করিবেক। সখি! তুমি আমায় বিষ আনিয়া দাও, খাইয়া প্রাণত্যাগ করি; তাহা হইলেই সকল আপদ ঘুচিয়া যায়। এই বলিয়া, জয়শ্রী শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। সখী শুনিয়া হতবুদ্ধি ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, জয়শ্রী, উৎপন্নমতিত্ববলে, এক উপায় স্থির করিয়া কহিল, সখি! আর চিন্তা নাই, উত্তম উপায় স্থির করিয়াছি; শুন দেখি, সঙ্গত হয় কিনা। আমি, এই অবস্থায় গৃহে গিয়া, শয়নমন্দিরে প্রবেশপূর্বক, চীৎকার করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করি। গৃহজন, রোদনশব্দে জাগরিত হইয়া, কারণ জিজ্ঞাসার্থে উপস্থিত হইলে, বলিব, আমার স্বামী, অকারণে, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, নিতান্ত নির্দয়রূপে বারংবার প্রহার করিয়া, পরিশেষে নাসিকাচ্ছেদন করিয়া দিলেন। সখী কহিল, উত্তম যুক্তি হইয়াছে; ইহাতে সকল দিক রক্ষা হইবেক। অতএব, অবিলম্বে গৃহে গিয়া, এইরূপ কর।

জয়শ্রী, সত্বর গৃহে গিয়া, শয়নাগারে প্রবেশপূর্বক, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। গৃহজন, ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া, জয়শ্রীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার নাসিকা নাই; সমস্ত গাত্র ও বস্ত্র শোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছে; এবং, সে নিজে, ভূতলে পতিত হইয়া, রোদন করিতেছে। অনন্তর, তাহারা, ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পুরঃসর, বারংবার হেতু জিজ্ঞাসা করাতে, জয়শ্রী আপন স্বামীর দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিল, ঐ দুর্বৃত্ত দস্যু আমার এই দুর্দশা করিয়াছে। তখন সমস্ত পরিবার, একবাক্য হইয়া, শ্রীদত্তের অশেষপ্রকার তিরস্কার আরম্ভ করিল।

সুশীল শ্রীদত্ত, পূর্বাপর কিছুই জানে না; অকস্মাৎ এতাদৃশ ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শনে ও নানাপ্রকার তিরস্কারবাক্য শ্রবণে, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি, সবিশেষ না জানিয়া, শ্বশুরালয়ে আসিয়া, যার পর নাই অবিবেচনার কর্ম করিয়াছি। ইহাকে অতি দুশ্চরিত্রা দেখিতেছি। প্রথমতঃ, শত শত চাটুবচনেও, যে ব্যক্তি আলাপ করে নাই; সেই এক্ষণে অনায়াসে, মুক্তকণ্ঠে, মিথ্যাপবাদ দিতেছে। এই নিমিত্তই নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারেন না। জানি না, পরিশেষে কি বিপদ ঘটিবেক। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, মৌন অবলম্বনপূর্বক, সে অধোবদন হইয়া রহিল।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, জয়শ্রীর পিতা, রাজদ্বারে সংবাদ দিয়া, জামাতাকে বিচারালয়ে নীত করিল। প্রাড়্বিবাক, বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে পরস্পর সম্মুখবর্তী করিয়া প্রথমতঃ জয়শ্রীকে জিজ্ঞাসিলেন, কে তোমার এ দুর্দশা করিয়াছে, বল; আমি সেই দুরাচারের যথোচিত দণ্ডবিধান করিতেছি। জয়শ্রী পতি প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, ধর্মাবতার! ইনি আমার স্বামী; ইঁহা হইতে আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। অনন্তর, প্রাড়্বিবাক শ্রীদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এমন দুষ্কর্ম করিলে। সে কহিল, ধর্মাবতার! আমি এ বিষয়ের ভালমন্দ কিছুই জানি না; ইহাতে, আপনকার বিচারে, যেরূপ ব্যবস্থা হয়, করুন; এই বলিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মান রহিল।

প্রাড়্বিবাক, বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যশ্রবণান্তে, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া, ঘাতকদিগকে ডাকাইয়া, শ্রীদত্তকে শূলে দিতে আদেশ করিলেন। চোর, কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া, পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপার, সবিশেষ সতর্কতাপূর্বক, দেখিতেছিল। সে, অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবিনাশের উপক্রম দেখিয়া, প্রাড়্বিবাকের সম্মুখবর্তী হইয়া নিবেদন করিল, মহাশয়! সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, বিনা অপরাধে, আপনি এ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতেছেন। আপনি ধর্মাবতার, যথার্থ বিচার করুন; ব্যভিচারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।

প্রাড়্বিবাক চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চোরের বাক্য শুনিয়া, বারংবার জিজ্ঞাসা ও তথ্যানুসন্ধানপূর্বক, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, জয়শ্রীর মৃত পতিত উপপতির বক্তৃমধ্য হইতে, তদীয় ছিন্ন নাসিকা আনীত হইল। তখন তিনি; নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, চোরকে যথার্থবাদী ও শ্রীদত্তকে নিরপরাধ স্থির করিয়া, যথোচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্বক, উভয়কে বিদায় দিলেন; এবং জয়শ্রীর মস্তকমুণ্ডন ও তাহাতে তক্রসেচন, তৎপরে তাহাকে গর্দভে আরোহণ ও নগরে পরিভ্রমণ করাইয়া, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।

এইরূপে আখ্যায়িকার সমাপন করিয়া, চূড়ামণি কহিল, মহারাজ! নারী ঈদৃশ প্রশংসনীয় গুণে পরিপূর্ণা হয়।

উপক্রান্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! জয়শ্রী ও নয়নানন্দ, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক দুরাচার। রাজা কহিলেন, আমার মতে, দুই সমান।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ধারা নগরে, মহাবল নামে, মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার দূতের নাম হরিদাস। ঐ দূতের, মহাদেবী নামে, এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। কালক্রমে, কন্যা যৌবনসীমায় উপনীত হইলে, হরিদাস মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল; অতঃপর, বর অন্বেষণ করিয়া, উহার বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করা উচিত। অনন্তর, পরিবারের মধ্যে, মহাদেবীর বিবাহের কথার আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইলে, সে, এক দিন, আপন পিতার নিকট নিবেদন করিল, পিতঃ! যে ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিবেন, তিনি যেন সর্বগুণে অলঙ্কৃত হন। হরিদাস, কন্যার এই প্রশংসনীয় প্রার্থনা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এক দিন, রাজা মহাবল হরিদাসকে কহিলেন, হরিদাস! দক্ষিণদেশে হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। বহু দিন অবধি, তাঁহার শারীরিক ও বৈষয়িক কোনও সংবাদ না পাইয়া, বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। অতএব, তুমি তথায় গিয়া, আমার কুশলসংবাদ দিয়া, ত্বরায় তাঁহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসংবাদ লইয়া আইস। হরিদাস, রাজকীয় আদেশ অনুসারে, কতিপয় দিবসের মধ্যে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট নিজ প্রভুর সন্দেশ জানাইল। হরিশ্চন্দ্র, দূতমুখে মিত্রের মঙ্গলবার্তা প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং সমুচিত পুরস্কার প্রদানপূর্বক, হরিদাসকে, কতিপয় দিবস, তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন।

এক দিবস, রাজা হরিশ্চন্দ্র সভামধ্যে হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস! তুমি কি বোধ কর, কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে কিনা। তখন সে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, হাঁ মহারাজ! কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অধিকারপ্রভাবেই, সংসারে মিথ্যাপ্রপঞ্চ প্রবল হইয়া উঠিতেছে; সত্যের হ্রাস হইতেছে; পৃথিবী অল্প ফল দিতেছেন; লোক মুখে মিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে, কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণ কপটতা; রাজারা, প্রজার সুখসমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল কোষ পরিপূরণে যত্নবান হইয়াছেন; ব্রাহ্মণেরা সৎকর্মের অনুষ্ঠানে বিসর্জন দিয়াছেন, এবং যৎপরোনাস্তি লোভী হইয়াছেন; স্ত্রীলোক লজ্জায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছে, এবং সর্ব বিষয়ে

সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে; পুত্র পরম গুরু পিতামাতার শুশ্রূষায় ও আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি সর্বতোভাবে স্নেহশূন্য দৃষ্ট হইতেছে; মিত্রতানিবন্ধন অকৃত্রিমপ্রণয়সম্বলিত সরল ব্যবহার আর দৃষ্টিগোচর হয় না; নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্মে কাহারও আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না; পামরেরা, বুদ্ধি ও বিদ্যার অহঙ্কারে, প্রতিকূল তর্ক দ্বারা, ধর্মমূল সনাতন বেদশাস্ত্রের বিপ্লাবনে উদ্যত হইয়াছে। মহারাজ! ইত্যাদি নানা প্রকারে কেবল ধর্মের তিরোভাব ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব সর্বত্র নেত্রগোচর হইতেছে। রাজা শুনিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, হরিদাসের সবিশেষ প্রশংসা করিলেন।

সভাভঙ্গান্তে, রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। হরিদাস, আপন অবস্থিতিস্থানে উপস্থিত হইয়া, এক অপরিচিত ব্রাহ্মণতনয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে আসিয়াছ। সে কহিল, আমি তোমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। হরিদাস কহিল, কি প্রার্থনা, বল; আমার সামর্থ্য হয়, সম্পন্ন করিব। সে কহিল, তোমার এক পরম সুন্দরী গুণবতী কন্যা আছে; আমার সহিত তাহার বিবাহ দাও। হরিদাস কহিল, আমি, কন্যার প্রার্থনা অনুসারে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ও অসাধারণগুণসম্পন্ন হইবেক, তাহাকে কন্যাদান করিব। সে কহিল, আমি, বাল্যকাল অবধি, পরম যত্নে, নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছি; আর, আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে, এক অদ্ভুত রথ নির্মাণ করিয়াছি; তাহাতে আরোহণ করিলে, এক দণ্ডে, বর্ষগম্য দেশে উপস্থিত হওয়া যায়।

হরিদাস শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল; এবং, কন্যাদানে সম্মত হইয়া কহিল, কল্য প্রাতঃকালে, তুমি রথ লইয়া আমার নিকটে আসিবে। এই বলিয়া, ব্রাহ্মণতনয়কে বিদায় দিয়া, হরিদাস স্নান, আহ্নিক, ও ভোজন করিল; এবং, অপরাহ্নে, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বিদায় লইয়া, স্বদেশ প্রতিগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিল।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, ব্রাহ্মণতনয় হরিদাসের নিকটে উপস্থিত হইলে, উভয়ে, রথে আরোহণ করিয়া, স্বল্প সময় মধ্যে, ধারানগরে উপস্থিত হইল। হরিদাসের প্রত্যাগমনের পূর্বে, তদীয় পত্নী ও পুত্র, পৃথক্ পৃথক্, এক এক ব্রাহ্মণতনয়ের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল, মহাদেবীর সহিত বিবাহ দিব; তাঁহাতে কেবল হরিদাসের গৃহপ্রত্যাগমনপ্রতীক্ষা প্রতিবন্ধক ছিল। এক্ষণে, সেই পূর্বাশ্বাসিত বরেরা, হরিদাসকে গৃহাগত শুনিয়া, বিবাহের নিমিত্ত, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইল।

এইরূপে তিন বর একত্র হইলে, হরিদাস, অতিশয়, ব্যাকুল হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, তিন জনে তিন জনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি; তিন জনেই বিদ্যাবান্ ও অসাধারণগুণসম্পন্ন, কাহাকেই নিরাশ করি। অনন্তর, সে তাহাদিগকে কহিল, অদ্য তোমরা আমার আলয়ে অবস্থিতি কর; আমি, পুত্র ও গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া, কর্তব্য স্থির করিব। তাহারা, সম্মত হইয়া, সে দিন, হরিদাসের

আবাসে অবস্থিতি করিল। দৈববিড়ম্বনায়, সেই রজনীতে, বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস আসিয়া, হরিদাসের কন্যাকে হস্তগত করিয়া, প্রস্থান করিল।

গৃহজন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল, মহাদেবী গৃহে নাই। তখন সকলে, একত্র হইয়া, নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। বিবাহার্থী ব্রাহ্মণকুমারেরাও, ভাবিনী ভার্যার অদর্শনবার্তা শ্রবণগোচর করিয়া, ম্লান বদনে তথায় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি, সমাধিবলে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সমুদয় প্রত্যক্ষবৎ দেখিত। সে হরিদাসকে কহিল, মহাশয়! উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমি দেখিতেছি, এক রাক্ষস, আপনকার কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে লইয়া গিয়া, বিন্ধ্য পর্বতে রাখিয়াছে; যদি তথা হইতে প্রত্যাহরণ করিবার কোনও উপায় থাকে, চেষ্টা দেখুন। দ্বিতীয় কহিল, আমি শব্দবেধী শর দ্বারা, বিপক্ষের প্রাণসংহার করিতে পারি; অতএব, কোনও উপায়ে তথায় উপস্থিত হইতে পারিলে, রাক্ষসের প্রাণ-বিনাশ ও কন্যার উদ্ধারসাধন করিতে পারিব। তখন তৃতীয় কহিল, আমার এই রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান কর, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে।

অনন্তর, সে, ঐ রথে আরোহণপূর্বক, বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হইল; এবং, শব্দবেধী শর দ্বারা ক্রব্যাদের প্রাণসংহার করিয়া, মহাদেবী সমভিব্যাহারে, অবিলম্বে ধারানগরে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর, তিন বর, পরস্পর বিবাদ করিয়া, কহিতে লাগিল, আমিই ইহার পাণিগ্রহণে অধিকারী; আমি না হইলে, ইহার উদ্ধার হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। হরিদাস, তদীয় বাদানুবাদ শ্রবণে কর্তব্যাবধারণে বিমূঢ় ও যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইল।

এইরূপে উপাখ্যানের সমাপন করিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি মহাদেবীর পাণিগ্রহণে অধিকারী হইতে পারে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, যে ব্যক্তি রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া, মহাদেবীর প্রত্যানয়ন করিয়াছে। বেতাল কহিল, তিন জনেই সমান বিদ্বান্; এবং, তিন জনই, প্রত্যানয়ন-বিষয়ে, সমান সাহায্য করিয়াছে; তবে কি জন্য, অন্য কাহারও না হইয়া, এই কন্যা প্রত্যাহর্তারই প্রণয়িনী হইবেক। রাজা কহিলেন, তিন জনই অসাধারণ গুণপ্রকাশ করিয়াছে, যথার্থ বটে; কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে, প্রত্যাহর্তার গুণেই, প্রকৃত কার্য নিষ্পন্ন হইয়াছে; অতএব, তাহারই প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ষষ্ঠ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ধর্মপুর নামে অতি প্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় ধর্মশীল নামে অতি সুশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রীর নাম অন্ধক। মন্ত্রী, এক দিন, রাজাকে পরামর্শ দিলেন,

মহারাজ। মন্দিরনির্মাণপূর্বক, কাত্যায়নীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রতিদিন, যথাবিধানে, পূজা করিতে আরম্ভ করুন ; শাস্ত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ ফলশ্রুতি আছে। রাজা, মন্ত্রীর পরামর্শে, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং, নূতন মন্দির নির্মিত করাইয়া, ভগবতী কাত্যায়নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্তি সংস্থাপনপূর্বক, প্রত্যহ, মহা-সমারোহে যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে, দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন।

রাজা, এইরূপে, দেবতার আরাধনে নিয়ত যত্নবান্ ও গো-ব্রাহ্মণে সাতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন ; তথাপি সংসারাশ্রমের সারভূত তনয়ের মুখচন্দ্রনিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন না। সর্বদাই তিনি মনে মনে চিন্তা করেন, শাস্ত্রে ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ আছে, অপুত্র ব্যক্তির সংসারাশ্রম, ধনে জনে পরিপূর্ণ হইলেও, শূন্যপ্রায় ; এবং, পরকালেও, তাহার সদ্গতিলাভ হয় না। অতএব কি কর্তব্য।

এক দিন, রাজা, মন্ত্রিপ্রবর অন্ধকের পরামর্শ অনুসারে, কাত্যায়নীর মন্দিরে প্রবেশ-পূর্বক, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন, দেবি। তুমি ত্রিলোকজননী ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ নিয়ত তোমার আরাধনা করেন ; তুমি, কালে কালে, ত্রিভুবনের মহানর্থহেতু উৎপাতধূমকেতুপ্রায় মহিষাসুর, রক্তবীজ প্রভৃতি দুর্বৃত্ত দৈত্য-দানবগণের প্রাণসংহার করিয়া, ভূমির ভার হরিয়াছ ; আর, যখন যে স্থানে তোমার ভক্তেরা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, তুমি তৎক্ষণাৎ, তথায় আবির্ভূত হইয়া, তাহাদের পরিত্রাণ করিয়াছ ; তুমি শরণাগত ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক ; এই নিমিত্ত, আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি ; আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ কর। স্তবাবসানে রাজা, পুনর্বার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর আকাশবাণী হইল, রাজন্! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ; অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজা শুনিয়া, কৃতার্থম্মন্য হইয়া, আনন্দগদ্গদ স্বরে কহিলেন, জননি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, কৃপা করিয়া এই বর দাও, যেন আমি অবিলম্বে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করি। দেবী কহিলেন, বৎস। অবিলম্বে তোমার পুত্র জন্মিবেক, এবং ঐ পুত্র সুশীল, শান্তস্বভাব, সর্বগুণসম্পন্ন, ও সর্ব বিষয়ে পারদর্শী হইবেক।

কিয়ৎ দিন অতীত হইলে, রাজার এক পুত্র জন্মিল। রাজা, মহাসমারোহে, সপরিবারে, দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তে পূজাকার্য সম্পন্ন করিলেন, এবং, সমাগত দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাধিক ধন দিয়া, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

এক দিন, দীনদাস নামে তন্তুবায়, কোনও কার্য উপলক্ষে, নিজ বন্ধুর সহিত, রাজ-ধানীতে গমন করিতেছিল। দৈবযোগে, তাহার সজাতীয়া, রাজধানীবাসিনী, এক পরম সুন্দরী কন্যা নয়নগোচর হওয়াতে, দীনদাস তদীয় অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে

মোহিত হইল। অনন্তর, সে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, তন্তুবায় মনে মনে চিন্তা করিল, আমাদের মহারাজ, পুত্রবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াও, ভগবতী কাত্যায়নীর প্রসাদে, বৃদ্ধ বয়সে, পুত্রের মুখনিরীক্ষণ করিয়াছেন। দেবীর কৃপাদৃষ্টি হইলে, আমারও এই স্ত্রীরত্নলাভ সম্পন্ন হইতে পারে।

এই চিন্তা করিয়া, দেবীর মন্দিরে প্রবেশপূর্বক, দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, তন্তুবায় কৃতাঞ্জলিপুটে মানসিক করিল, ভগবতি! যদি এই কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হয়, স্বহস্তে মস্তকচ্ছেদন করিয়া, তোমায় পূজা দিব। এইরূপ মানসিক করিয়া, প্রণামপূর্বক, সে, আপন বন্ধুর সহিত, নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল; পরে, নিজালয়ে প্রতিগমন করিয়া, সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর দুঃসহ বিরহানলে দগ্ধহৃদয় হইয়া, আহার, বিহার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য হইল; এবং, অষ্ট প্রহর, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, কেবল সেই কামিনীর বিভ্রম বিলাস আদি ধ্যান করিতে লাগিল।

তাহার সহচর, স্বীয় প্রিয় বয়স্যের এবংবিধ অপ্রতিবিধেয় স্মরদশার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, নিরতিশয় বিষণ্নমনা হইল, এবং অশেষবিধ চিন্তা করিয়াও, উপায়নিরূপণে অসমর্থ হইয়া, পরিশেষে তাহার পিতার নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। তাহার পিতা, সমস্ত শ্রবণ ও স্বচক্ষে সমস্ত অবলোকন করিয়া, বিবেচনা করিল, ইহার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে, বোধ হয়, সেই কন্যার সহিত বিবাহ না হইলে, প্রাণত্যাগ করিতে পারে। অতএব, এ বিষয়ে উপেক্ষা করা বিধেয় নহে; যাহাতে ত্বরায় ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্তব্য।

এই স্থির করিয়া, দীনদাসের পিতা, পুত্রের মিত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল; এবং, যথোচিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের পর, গৃহস্বামীকে কহিল, আমি তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি; যদি তুমি, দয়া করিয়া, প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হও, ব্যক্ত করি। সে কহিল, যদি সাধ্যাতীত না হয়, অবশ্য করিব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপে গৃহস্বামীকে বচনবদ্ধ করিয়া, দীনদাসের পিতা, তাহার নিকট, আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিলে, সে, তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া, শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্ধারিত করিয়া, কন্যাদান করিল। তন্তুবায়তনয়, অভিলষিত দারসমাগম দ্বারা, কৃতার্থম্মন্য হইয়া, পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, দীনদাস, শ্বশুরালয়ে কর্মবিশেষ উপস্থিত হওয়াতে, নিমন্ত্রিত হইয়া, পূর্ব বন্ধুকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পত্নীর সহিত তথায় প্রস্থান করিল। রাজধানীর নিকটবর্তী হইলে, ভগবতী কাত্যায়নীর মন্দির দীনদাসের দৃষ্টিগোচর হইল। তখন, পূর্বকৃত মানসিক স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, সে মনোমধ্যে এই আলোচনা করিতে লাগিল, আমি অতিশয় অসত্যবাদী পামর; দেবীর নিকট মানসিক করিয়া, বিস্মৃত

হইয়া রহিয়াছি ; জন্মজন্মান্তরেও, আমি এই গুরুতর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যাহা হউক, এক্ষণে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, দেবীর ধার পরিশোধ করা উচিত।

এইরূপ স্থির করিয়া, দীনদাস স্বীয় সহচরকে কহিল, মিত্র! তুমি ক্ষণ কাল অপেক্ষা কর ; আমি, দেবীদর্শন করিয়া, ত্বরায় প্রত্যাগমন করিতেছি। এই বলিয়া, তথায় উপস্থিত ও সন্নিহিত সরোবরে স্নাত হইয়া, সে প্রথমতঃ যথাবিধি পূজা করিল ; অনন্তর, ভগবতি কাত্যায়নী! বহু কাল হইল, আমি তোমার নিকট মানসিক করিয়াছিলাম ; অদ্য তাহার পরিশোধ করিতেছি। এই বলিয়া, মন্দিরস্থিত খড়্গ লইয়া, স্কন্ধদেশে আঘাত করিবামাত্র, তাহার মস্তক, দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

দীনদাসের আসিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া, তাহার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে কহিল, তুমি এই খানে থাক, আমি বন্ধুকে ডাকিয়া আনি। এই বলিয়া, তথায় গমন করিয়া, মন্দিরমধ্যে প্রবেশপূর্বক, সে দেখিল, দীনদাসের মস্তক ও কলেবর পৃথক্ পৃথক্ পতিত আছে। তখন সে, হতবুদ্ধি হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, সংসার অতি বিরুদ্ধ স্থান ; কোনও ব্যক্তিই বোধ করিবেক না, এ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছে ; সকলেই বলিবেক, আমি ইহার স্ত্রীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া, নির্বিঘ্নে আপন অসৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ইহার প্রাণবধ করিয়াছি। অকারণে, এরূপ বিরূপ লোকাপবাদে দূষিত হওয়া অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাই বিধেয়। এই ভাবিয়া, সে ব্যক্তিও, তৎক্ষণাৎ, সেই খড়্গ দ্বারা, আপনার মস্তকচ্ছেদন করিল।

তন্তুবায়তনয়া, বহুক্ষণ একাকিনী দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহাদের অন্বেষণার্থে, দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল ; এবং উভয়কেই মৃত পতিত দেখিয়া, বিবেচনা করিল, দৈবদুর্বিপাকে আমার যে দুরবস্থা ঘটিল, তাহাতে বোধ করি, পূর্বজন্মে অনেক মহাপাতক করিয়াছিলাম। যাহা হউক, যাবজ্জীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অসার দেহভার বহন করা বিড়ম্বনামাত্র। আর, লোকেও বিশেষ না জানিয়া বলিবেক, এই স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, আপন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত, স্বামীর ও স্বামীর বন্ধুর প্রাণবধ করিয়াছে। অতএব, সর্ব প্রকারেই, আমার প্রাণত্যাগ করা উপযুক্ত।

এই বলিয়া, সেই শোণিতলিপ্ত খড়্গ লইয়া, তন্তুবায়তনয়া আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র, দেবী, তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া, তাহার হস্ত ধরিলেন এবং কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। সে কহিল, জননি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, ইহাদের দুইজনের প্রাণদান কর। দেবী, তথাস্তু বলিয়া, উভয়ের কলেবরের সহিত মস্তকের যোগ করিতে আদেশ দিয়া, অন্তর্হিতা হইলেন। তন্তুবায়তনয়া, কাত্যায়নীর বচন শ্রবণে আহ্লাদে অন্ধপ্রায়া হইয়া, একের মস্তক অন্যের শরীরে যোজিত করিয়া দিল। উভয়েই, তৎক্ষণাৎ প্রাণদান পাইয়া, গাত্রোত্থান করিল।

এইরূপে উপাখ্যান শেষ করিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এক্ষণে কোন ব্যক্তি ঐ কন্যার স্বামী হইবেক বল। রাজা কহিলেন, শুন বেতাল! যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা উত্তম, পর্বতের মধ্যে সুমেরু উত্তম, বৃক্ষের মধ্যে কল্পতরু উত্তম; সেইরূপ, সমুদয় অঙ্গের মধ্যে মস্তক উত্তম; এই নিমিত্তে, শাস্ত্রকারেরা মস্তকের নাম উত্তমাঙ্গ রাখিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তির কলেবরে পূর্বস্বামীর উত্তমাঙ্গ যোজিত হইয়াছে, সেই তাহার স্বামী হইবেক।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

সপ্তম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! শ্রবণ কর,

চম্পা নগরে চন্দ্রাপীড় নামে নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুলোচনা নামে ভার্যা ও ত্রিভুবনসুন্দরী নামে পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা কালক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে, রাজা উপযুক্ত পাত্রের নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হইলেন। নানাদেশীয় রাজারা ক্রমে ক্রমে অবগত হইলেন, রাজা চন্দ্রাপীড়ের এক পরম সুন্দরী কন্যা আছে; তদীয় রূপ-লাবণ্যের মাধুরী দর্শনে, মুনিজনেরও মন মোহিত হয়। তাঁহারা সকলেই, বিবাহ-প্রার্থনায়, নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা স্ব স্ব প্রতিমূর্তি চিত্রিত করাইয়া, চন্দ্রাপীড়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। রাজা, মনোনীত করিবার নিমিত্ত, সেই সকল চিত্র কন্যার নিকটে উপনীত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কাহারও ছবি তাহার মনোনীত হইল না। তখন রাজা কন্যার স্বয়ংবরের আদেশ দিলেন। সে তাহাতে অসম্মতা হইয়া কহিল, তাত! স্বয়ংবর বৃথা আড়ম্বর মাত্র; তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি, বিক্রম, এই তিনে অসাধারণ হইবেক, আমি তাহাকেই পতিত্বে পরিগৃহীত করিব।

কিয়ৎ দিন পরে, দেশান্তর হইতে, চারি বর উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদিগকে স্ব স্ব গুণের পরিচয় দিতে বলিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, মহারাজ! আমি বাল্যকাল অবধি, বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে, নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছি; আর, আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে, প্রতিদিন, একখানি মনোহর বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, পাঁচ রত্ন মূল্যে বিক্রয় করি। তাহার মধ্যে, সর্বাগ্রে এক রত্ন ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করি; দ্বিতীয় দেবসাৎ করিয়া, তৃতীয় আপন অঙ্গে ধারণ করি; চতুর্থ ভাবী ভার্যার নিমিত্ত রাখিয়া, পঞ্চম দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়ের নির্বাহ করিয়া থাকি। এই গুণ আমাভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তির নাই। আর আমার রূপের পরিচয় দিবার আবশ্যকতা কি; মহারাজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দ্বিতীয় কহিল, আমি, জলচর, স্থলচর, সমস্ত পশুপক্ষীর ভাষা জানি; আমার সমান বলবান্ ত্রিভুবনে আর কোনও ব্যক্তি নাই; আর, আমার আকার আপনকার সমক্ষেই উপস্থিত রহিয়াছে। তৃতীয় কহিল, আমি

শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ; আমার সৌন্দর্য সাক্ষাৎ দেখিতেছেন, আপন মুখে বর্ণন করিয়া, নির্লজ্জ হইবার প্রয়োজন কি। চতুর্থ কহিল, আমি শস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয়, শব্দবেধী শর নিক্ষিপ্ত করিতে পারি ; আর, আমার রূপলাবণ্যের বিষয় সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, এবং আপনিও স্বচক্ষে দেখিতেছেন।

এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, চারি জনের রূপ, গুণ, ও বিদ্যার পরিচয় লইয়া, রাজা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, চারি জনকেই রূপে, গুণে, ও বিদ্যায় অসাধারণ দেখিতেছি, কাহাকে কন্যা দান করি। অনন্তর, ত্রিভুবনসুন্দরীর নিকটে গিয়া, চারি-জনের গুণের পরিচয় দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে ! এই চারি বর উপস্থিত, তুমি কাহাকে মনোনীত কর। শুনিয়া, ত্রিভুবনসুন্দরী লজ্জায় অধোমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! কোন ব্যক্তি, যুক্তিমার্গ অনুসারে, ত্রিভুবনসুন্দরীর পতি হইতে পারে। রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি বস্ত্র নির্মাণ করিয়া বিক্রয় করে, সে জাতিতে শূদ্র ; যে ব্যক্তি পশুপক্ষীর ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, সে জাতিতে বৈশ্য ; যে সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছে, সে জাতিতে ব্রাহ্মণ ; কিন্তু শস্ত্রবেধী ব্যক্তি কন্যার সজাতীয় ; সেই, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, এই কন্যার পরিণেতা হইতে পারে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

অষ্টম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

মিথিলানগরে গুণাধিপ নামে রাজা ছিলেন। দক্ষিণদেশীয়, চিরঞ্জীব নামে, রজঃপুত, তাঁহার বদান্যতা ও গুণগ্রাহকতা কীর্তি শ্রবণ করিয়া, কর্মের প্রার্থনায়, তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু, তাহার দুরদৃষ্টক্রমে, রাজা তৎকালে, সর্বক্ষণ অন্তঃপুরবাসী হইয়া, মহিলাগণের সহবাসে কালযাপন করিতেন, বহু কালেও একবার রাজসভায় উপস্থিত হইতেন না। সংবৎসর অতীত হইল, তথাপি চিরঞ্জীব রাজার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিল না ; এ দিকে, ব্যয়নির্বাহের জন্য, যৎকিঞ্চিৎ যাহা সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া, চিরঞ্জীব মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, প্রায় সংবৎসর অতীত হইল, আশারাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, শ্ববৃত্তি সেবার প্রত্যাশায়, দূর দেশ হইতে আসিয়া, রাজ্যতন্ত্রপরাঙ্মুখ স্ত্রীপরতন্ত্র রাজার আশ্রয় লইয়াছি। অভীষ্টসিদ্ধির কথা দূরে থাকুক, এ পর্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতেও পারিলাম না। দেবতা, কত দিনে, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, রাজাকে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার মতি ও প্রবৃত্তি দিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।

আর, এ ব্যক্তিকে অমাত্যায়ত্ত দেখিতেছি, স্বয়ং রাজকার্যে মনোযোগ করেন না। কিন্তু, রাজা স্বায়ত্ত না হইলেও, তাঁহার নিকট মাদৃশ জনের অনায়াসে প্রার্থনাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আর, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেই, যে আমি, এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়া, কৃতকার্য হইতে পারিব, তাহারই বা নিশ্চয় কি। বিশেষতঃ, এক্ষণে আমি নিঃসম্বল হইলাম; ভিক্ষা দ্বারা উদরান্নসংগ্রহ ব্যতিরেকে, এ স্থলে অবস্থিতি করিবারও উপায় নাই। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী। অতএব, এক অনিশ্চিত শ্ববৃত্তিলাভের প্রত্যাশায়, অন্য এক শ্ববৃত্তি অবলম্বন করা, নিতান্ত নির্ঘৃণ ও কাপুরুষের কর্ম। ফলতঃ, আশার দাসত্বস্বীকার করিলেই, নিঃসন্দেহ, দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি, আশাকে দাসী করিয়া, সকল ক্লেশের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই জীবন সার্থক; যদি সংসারে কেহ সুখী থাকে, তবে সে ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। অতএব, অদ্যই আমি, সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া, অরণ্যে গিয়া, জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব। এই নিশ্চয় করিয়া, মিথিলাপরিত্যাগপূর্বক, চিরঞ্জীব অরণ্যে প্রবেশ করিল।

কিয়ৎ দিন পরে, রাজা গুণাধিপ, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, পুনর্বার রাজকার্যে নিবিষ্টমনা হইলেন; এবং, কতিপয় দিবসের পর, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া, মহাসমারোহে, মৃগয়ায় গমন করিলেন। নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে. তিনি, এক মৃগের অনুসরণক্রমে, অশ্বারোহণে, একাকী, অরণ্যের নিবিড়তর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান কমলিনীনায়ক অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল; এবং সে মৃগও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল।

রাজা, যৎপরোনাস্তি ভীত ও ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া, সাতিশয় বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হইলেন। কিন্তু, ভয়ক্ষোভ অপেক্ষা, বুভুক্ষা ও পিপাসার যন্ত্রণা, ক্রমে ক্রমে, অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি, নিতান্ত অধৈর্য হইয়া, ইতস্ততঃ জলের অন্বেষণ করিতে করিতে, অরণ্যের মধ্যে অসম্ভাবিত কুটীর দর্শনে সাতিশয় হৃষ্টমনা হইলেন। রজঃপূত চিরঞ্জীব, বিষয়বিরক্ত হইয়া, ঐ কুটীরে তপস্যা করিতেছিল। তথায় উপস্থিত ও কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, কাতরতাপ্রদর্শনপূর্বক, রাজা জলদান দ্বারা প্রাণদানপ্রার্থনা করিলেন। চিরঞ্জীব, আতিথেয়তাপ্রদর্শনপূর্বক, তৎক্ষণাৎ, তপোবনসুলভ সুস্বাদ ফল ও সুশীতল জল প্রদান করিল।

রাজা, ফল ও জল পাইয়া, ক্ষুধানিবৃত্তি ও পিপাসাশান্তি করিলেন, এবং নিরতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া, আপনাকে পুনর্জীবিত বোধ করিতে লাগিলেন; পরে, মহোপকারক চিরঞ্জীবের ভাবদর্শনে, প্রকৃত ঋষি বলিয়া বোধ না হওয়াতে, বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, মহাশয়! আপনি আমার যে মহোপকার করিলেন, তাহাতে আমি আপনকার নিকট চিরক্রীত রহিলাম। এক্ষণে, এক অনুচিত প্রার্থনা দ্বারা, ধৃষ্টতা-প্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছি, অনুগ্রহপূর্বক অপরাধমার্জনা করিবেন। আমি ক্রিয়া দ্বারা

আপনাকে বিশুদ্ধ তপস্বী দেখিতেছি ; কিন্তু, আকার ইঙ্গিত দর্শনে, কোনও ক্রমে, প্রকৃত তপস্বী বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ বিষয়ে আমার গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি, প্রাণসংশয়সময়ে, জলদান দ্বারা, আমায় প্রাণদান করিয়াছেন ; এক্ষণে, কৃপাপ্রদর্শনপূর্বক, সংশয়াপনোদন দ্বারা, আমায় চরিতার্থ করুন।

চিরঞ্জীব, রাজার অনুরোধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, আত্মপরিচয়প্রদানপূর্বক কহিল, আমি, লোকমুখে মিথিলাধিপতি রাজা গুণাধিপের আশ্রিতপ্রতিপালনকীর্তি শ্রবণ করিয়া, কর্মপ্রার্থনায়, তাঁহার রাজধানীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু, আমার ভাগ্যদোষে, রাজা, বিষয়সম্ভোগে আসক্ত হইয়া, সংবৎসরমধ্যেও, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন না। তৎপরে, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু, জাতিস্বভাবসিদ্ধ রজোগুণের আতিশয্যবশতঃ, আমার অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক কার্যে অনুরক্ত হইতেছে না ; এখনও রাজসপ্রকৃতিসুলভ বিষয়ানুরাগে বিচলিত হইতেছে। অতএব, আপনকার এ সংশয় নিতান্ত অমূলক নহে ; আপনি উত্তম অনুভব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া, মনে মনে, নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন ; কিন্তু, তখন কিছু মাত্র ব্যক্ত না করিয়া, চিরঞ্জীবের অনুমতিগ্রহণপূর্বক, তদীয় কুটীরেই রজনীযাপন করিলেন।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, রাজা গুণাধিপ, আত্মপরিচয়প্রদানপূর্বক, চিরঞ্জীবকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন ; এবং, সাতিশয় অনুগ্রহভাজন ও প্রিয়পাত্র করিয়া, আপন নিকটে রাখিলেন। তদবধি, তিনি, তাহার প্রতি, সতত, সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তিও, তদীয় নিদেশ সম্পাদনে, প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিল।

একদা রাজা, অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রয়োজনবিশেষবশতঃ, চিরঞ্জীবকে দেশান্তরে প্রেরণ করিলেন। সে, রাজকার্যসম্পাদন করিয়া, প্রত্যাগমনকালে অর্ণবকূলে এক অপূর্ব দেবালয় দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক, দেবদর্শন করিয়া, চিরঞ্জীব বহির্গত হইবামাত্র, এক পরম সুন্দরী কামিনী সহসা তাহার সম্মুখবর্তিনী হইল। তদীয় কোমল কলেবরে লোকাতিগ লাবণ্য অবলোকনে মোহিত হইয়া, চিরঞ্জীব একতান মনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই রমণী, তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, অহে পুরুষবর! তুমি, কি নিমিত্তে, এ স্থানে আসিয়াছ ; এবং, কি নিমিত্তেই বা, চিত্রার্পিতের ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিয়াছ। চিরঞ্জীব কহিল, কার্যবশতঃ দেশান্তরে গিয়াছিলাম ; কার্য শেষ করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছি ; কিন্তু, অকস্মাৎ, তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে, মোহিত ও হতবুদ্ধি হইয়া, দণ্ডায়মান আছি। তখন সেই সীমন্তিনী কহিল, তুমি এই সরোবরে অবগাহন কর, তাহা হইলে, আমি তোমার আজ্ঞানুবর্তিনী হইব।

চিরঞ্জীব, শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, সরোবরে অবগাহন করিল ; কিন্তু, জলের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলিত করিয়া দেখিল, আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়াছে। তখন

সে, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিল। এবং, অবিলম্বে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া, পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া, রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং কহিলেন, তুমি ত্বরায় আমায় ঐ স্থানে লইয়া চল। অনন্তর, উভয়ে, সমুচিত যানে আরোহণপূর্বক, অর্ণবতীরে উপস্থিত হইয়া, সেই দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন; এবং, যথোচিত ভক্তি-যোগ সহকারে পূজা ও প্রণাম করিয়া, বহির্গত হইলেন।

এই সময়ে, সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী, রাজার সম্মুখে আসিয়া, দণ্ডায়মান হইল, এবং, তদীয় সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হইয়া কহিল, মহারাজ! আমার প্রতি যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই শিরোধার্য করিব। রাজা কহিলেন, যদি তুমি, আমার বাক্য অনুসারে, কার্য করিতে চাও, আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবের সহধর্মিণী হও। সে কহিল, আমি তোমার রূপের ও গুণের বশীভূত হইয়াছি; এমন স্থলে, কেমন করিয়া, উহার সহধর্মিণী হইব। রাজা কহিলেন, তুমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিয়াছ, আমার আদেশ অনুসারে কর্ম করিবে। সজ্জনেরা, প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া, প্রতিজ্ঞাপালন করেন। অতএব, আপন বাক্যরক্ষা কর, চিরঞ্জীবের সহধর্মিণী হও। পরিশেষে, সেই কামিনী সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, রাজা, গান্ধর্ব বিধান দ্বারা, উভয়কে পরস্পর সহচর করিয়া দিয়া, আপন সমভিব্যাহারে, রাজধানীতে লইয়া গেলেন, এবং তাহাদের সচ্ছন্দরূপ জীবিকানির্বাহের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! রাজা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে, কোন ব্যক্তির অধিক সৌজন্য ও ঔদার্য প্রকাশ হইল। রাজা কহিলেন, চিরঞ্জীবের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, রাজা পরিশেষে চিরঞ্জীবের নানা মহোপকার করিলেন, যথার্থ বটে; কিন্তু চিরঞ্জীব, মৃগয়াদিবসে, ফল, জল, ও আশ্রয়দান দ্বারা, রাজার যে উপকার করিয়াছিল, তাহার সহিত ও সকলের তুলনা হইতে পারে না।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

নবম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

মগধপুর নামে এক নগর আছে। তথায় বীরবর নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার অধিকারে, হিরণ্যদত্ত নামে, এক ঐশ্বর্যশালী বণিক বাস করিত। ঐ বণিকের, মদনসেনা নামে, এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। ঋতুরাজ বসন্ত সমাগত হইলে, মদনসেনা, স্বীয় সহচরীবর্গ সমভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিল। দৈবযোগে, ধর্মদত্ত বণিকের পুত্র সোমদত্তও, পরিভ্রমণবাসনায়, সেই সময়ে, ঐ উপবনে উপস্থিত হইল। সে, কিয়ৎ ক্ষণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, দূর হইতে দর্শন করিল, এক পরম সুন্দরী, পূর্ণযৌবনা কামিনী, সখীগণ সহিত, ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী

হইয়া, সোমদত্ত, মদনসেনার অসামান্যরূপলাবণ্য নয়নগোচর করিয়া, মোহিত হইল ; এবং, নিতান্ত অধৈর্য হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া কহিল, সুন্দরি ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ; আমি, তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে, নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব, যদি আমার প্রতি অনুকূল না হও, তোমার সমক্ষে আত্মঘাতী হইব।

মদনসেনা শুনিয়া, সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, সোমদত্তকে, অশেষ প্রকারে, সদুপদেশ প্রদান করিল ; কিন্তু কোনও প্রকারে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। সোমদত্ত, অধিকতর অধৈর্য ও ব্যাকুল হইয়া, অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, অশ্রুমুখে, সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন মদনসেনা, উদারস্বভাবতাবশতঃ, পরের প্রাণরক্ষা করা প্রধান ধর্ম বোধ করিয়া, কহিল, আগামী পঞ্চম দিবসে, আমার বিবাহ হইবেক ; তৎপরে শ্বশুরালয়ে যাইব। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অগ্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তুমি এক্ষণে ক্ষান্ত হও, গৃহে গমন কর। সোমদত্ত, মদনসেনার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া, বিশ্বসিত মনে, গৃহে গমন করিল।

তৎপরে, পঞ্চম দিবসে পরিণীতা হইয়া, মদনসেনা শ্বশুরালয়ে গেল। রজনী উপস্থিত হইলে, গৃহজনেরা তাহারে শয়নাগারে প্রবেশিত করিল। সে, সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া, মৌন অবলম্বনপূর্বক, শয্যার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিল। তাহার স্বামী, পরম সমাদরে করগ্রহণপূর্বক, প্রিয় সম্ভাষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মদনসেনা, তৎকালোচিত নবোঢ়াচেষ্টিতসমুদয়ের বৈপরীত্যে, সোমদত্তের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল, যদি তুমি আমায় তাহার নিকটে যাইতে অনুমতি না দাও, আমি আত্মঘাতিনী হইব। তাহার স্বামী প্রথমতঃ বিস্তর নিষেধ করিল ; পরে তাহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া কহিল, যদি তুমি নিতান্তই তাহার নিকটে যাইতে চাও, যাও, আমি নিষেধ করিতে পারি না ; প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন অবশ্যকর্তব্য বটে।

মদনসেনা, এইরূপে স্বামীর সম্মতিলাভ করিয়া, অর্ধরাত্র সময়ে, একাকিনী সোমদত্তের আলয়ে চলিল। রাজপথে উপস্থিত হইলে, এক তস্কর তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, সুন্দরি ! তুমি কে ; এবং, সর্বাঙ্গে সর্বপ্রকার অলঙ্কার পরিয়া, এ ঘোর রজনীতে, কি অভিপ্রায়ে, কোথায় যাইতেছ। তোমায় একাকিনী দেখিতেছি ; অথচ, তোমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার লক্ষিত হইতেছে না। মদনসেনা কহিল, আমি হিরণ্যদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা। আমার নাম মদনসেনা ; প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনের জন্য, সোমদত্তের নিকটে যাইতেছি।

চোর শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কার গ্রহণের উদ্যম করিলে, মদনসেনা ব্যাকুল হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তের নির্দেশ করিয়া কহিল, ভ্রাতঃ ! আমি, অনেক যত্নে, স্বামীকে সম্মত করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইবার উপায় করিয়াছি ; তুমি, আমার বেশভঙ্গ করিয়া, প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। এই স্থানে অবস্থিতি কর ; প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রত্যা-

গমনকালে সমস্ত অলঙ্কার তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব। চোর, মদনসেনার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিল; এবং, সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, অলঙ্কারের প্রত্যাশায় তদীয় প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মদনসেনা, সোমদত্তের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে সুপ্ত দেখিয়া জাগরিত করিল। সোমদত্ত, মদনসেনার অসম্ভাবিত সমাগমে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, তুমি, এই ঘোর রজনীতে, একাকিনী কি প্রকারে কোথা হইতে উপস্থিত হইলে। মদনসেনা কহিল, বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়াছি; তথা হইতে আসিতেছি। কয়েক দিবস হইল, উপবনবিহারকালে, তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞার প্রতিপালনার্থে উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার ইচ্ছা বলবতী। সোমদত্ত জিজ্ঞাসিল, তোমার পতির নিকটে এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছ কি না। সে উত্তর দিল, তাঁহার নিকটে সকল বিষয়ের অবিকল বর্ণন করিলাম; তিনি, শুনিয়া ও বিবেচনা করিয়া, কিঞ্চিৎ কাল পরে, অনুমতি প্রদান করিলেন; তৎপরে তোমার নিকট আসিয়াছি।

সোমদত্ত কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, আমি পরকীয় মহিলার অঙ্গস্পর্শ করিব না। শাস্ত্রে সে বিষয়ে সবিশেষ দোষনির্দেশ আছে। যাহা হউক, তোমার বাক্যনিষ্ঠায় ও তোমার পতির ভদ্রতায়, অতিশয় প্রীত হইলাম। অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, তুমি প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইলে; এক্ষণে যাও, প্রকৃত প্রস্তাবে পতিশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হও।

তদনন্তর, মদনসেনা, প্রত্যাবর্তনকালে, মলিম্লুচের নিকটে উপস্থিত হইল। সে, তাহাকে ত্বরায় প্রত্যাগত দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিলে, মদনসেনা সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল। চোর শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, অকপট হৃদয়ে কহিল, আমার অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই। তুমি অতি সুশীলা ও সত্যবাদিনী। ধর্ম্মে ধর্ম্মে, তোমার যে সতীত্বরক্ষা হইল, তাহাই আমার পরম লাভ। তুমি নির্বিঘ্নে শ্বশুরালয়ে গমন কর। এই বলিয়া চোর চলিয়া গেল। অনন্তর, মদনসেনা স্বামীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, সে, আর তাহার সহিত পূর্ববৎ সম্ভাষণ না করিয়া, অপ্রসন্ন মনে শয়ান রহিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! এই চারি জনের মধ্যে কাহার ভদ্রতা অধিক। রাজা উত্তর দিলেন, চোরের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে। রাজা কহিলেন, মদনসেনার স্বামী, তাহাকে অন্যসংক্রান্তহৃদয়া দেখিয়া, পরিত্যাগ করিয়াছিল; প্রশস্ত মনে সোমদত্তের নিকট গমনে অনুমতি দেয় নাই; তাহা হইলে উহার মন এখন অপ্রসন্ন হইত না। আর, সোমদত্ত, উপবনে তাদৃশ অধৈর্যপ্রদর্শন করিয়া, এক্ষণে, কেবল রাজদণ্ডভয়ে, মদনসেনার সতীত্বভঙ্গে পরাঙ্মুখ হইল, আন্তরিক ধর্ম্মভীরুতা প্রযুক্ত নহে। আর, মদনসেনা, সোমদত্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এবং প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন করা উচিত কর্ম বটে; কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে, সতীত্ব-প্রতিপালন করাই সর্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম। সুতরাং, প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে, সতীত্বভঙ্গে

প্রবৃত্ত হওয়া, অসতীর কর্ম বলিতে হইবেক ; অতএব, তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদ-যোগ্য নহে। কিন্তু, চোর স্বভাবতঃ অর্থগৃধ্নু ; সে যে মহামূল্য অলঙ্কার সমস্ত হস্তে পাইয়া, মদনসেনার সতীত্বরক্ষাশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, লোভসংবরণপূর্বক, তাহাকে অক্ষত বেশে গমন করিতে দিল, ইহা অকৃত্রিম ঔদার্যের কার্য, তাহার সন্দেহ নাই।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দশম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

গৌড়দেশে বর্ধমান নামে এক নগর আছে। তথায়, গুণশেখর নামে, অশেষগুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রধান অমাত্য অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। নরপতিও, তদীয় উপদেশের বশবর্তী হইয়া, বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিলেন ; এবং, স্বয়ং শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, গোদান, ভূমিদান, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অবশ্যকর্তব্য ক্রিয়াকলাপে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া, মন্ত্রিপ্রধান অভয়চন্দ্রের প্রতি আদেশ দিলেন, আমার রাজ্যমধ্যে, যেন এই সমস্ত অবৈধ ব্যাপার আর প্রচলিত না থাকে।

সর্বাধিকারী, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণাপ্রদান করিলেন, যদি, অতঃপর, কোনও ব্যক্তি এই সকল রাজনিষিদ্ধ অবৈধ কর্মের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার সর্বস্বহরণ ও নির্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। প্রজারা, কুলক্রমাগত আচার ও অনুষ্ঠানের পরিত্যাগে নিতান্ত অনিচ্ছু ও রাজার প্রতি মনে মনে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াও, দণ্ডভয়ে, প্রকাশ্য রূপে তদনুষ্ঠানে বিরত হইল।

এক দিবস, অভয়চন্দ্র রাজার নিকট নিবেদন করিলেন, মহারাজ! সংক্ষেপে ধর্মশাস্ত্রের মর্মপ্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এ জন্মে, কোনও ব্যক্তি কাহারও প্রাণহিংসা করিলে, হতপ্রাণ ব্যক্তি, জন্মান্তরে, ঐ প্রাণঘাতকের প্রাণহন্তা হয়। এই উৎকট হিংসাপাপের প্রবলতাপ্রযুক্তই, মানবজাতি, সংসারে আসিয়া, জন্মমৃত্যু-পরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে। এই নিমিত্তই, শাস্ত্রকারেরা নিরূপণ করিয়াছেন, অহিংসা, মনুষ্যের পক্ষে, সর্বপ্রধান ধর্ম। মহারাজ! দেখুন, হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতি প্রধান দেবতারাও, কেবল কর্মদোষে, সংসারে আসিয়া, বারংবার অবতার হইতেছেন। অতএব, অতি প্রবল জন্তু হস্তী অবধি, অতি ক্ষুদ্র জন্তু কীট পর্যন্ত, প্রত্যেক জীবের প্রাণরক্ষা করা সর্বপ্রধান কর্ম ও পরম পবিত্র ধর্ম। আর, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যেরা যে পরমাংস দ্বারা আপন মাংসবৃদ্ধি করে, ইহা অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম ও যার পর নাই অসৎ কর্ম আর নাই। এবংবিধ ব্যক্তিরা, দেহান্তে নরকগামী হইয়া, অশেষ প্রকারে যাতনাভোগ করে। বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি, স্বদৃষ্টান্ত অনুসারে, অন্যের দুঃখ বিবেচনা না করিয়া, প্রাণহিংসাপূর্বক, মাংসভক্ষণ দ্বারা, স্বীয় রসনা পরিতৃপ্ত করে, সে রাক্ষস ; তাহার আয়ু, বিদ্যা, বল, বিত্ত, যশ প্রভৃতি হ্রাস প্রাপ্ত হয় ; এবং সে কাণ, খঞ্জ, কুব্জ, মূক, অন্ধ, পঙ্গু, বধিররূপে পুনঃ

পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। আর, সুরাপান অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। অতএব, জীবহিংসা ও সুরাপান, সর্ব প্রযত্নে, পরিত্যাগ করা উচিত।

ঈদৃশ অশেষবিধ উপদেশ দ্বারা, অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্মে রাজার এরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মাইল যে, যে ব্যক্তি, তাঁহার সমক্ষে, ঐ ধর্মের প্রশংসা করিত, সে অশেষ প্রকারে রাজপ্রসাদভাজন হইত। ফলতঃ, রাজা, সবিশেষ অনুরাগ ও ভক্তিযোগ সহকারে, স্বীয় অধিকারে, অবলম্বিত অভিনব ধর্মের বহুল প্রচার করিলেন।

কালক্রমে রাজার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার পুত্র ধর্মধ্বজ পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি, সনাতন বেদশাস্ত্রের অনুবর্তী হইয়া, বৌদ্ধদিগের যথোচিত তিরস্কার ও নানাপ্রকার দণ্ড করিতে লাগিলেন; পিতার প্রিয়পাত্র প্রধান মন্ত্রীকে, শিরোমুণ্ডনপূর্বক, গর্দভে আরোহণ ও নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া, দেশবহিষ্কৃত করিলেন; এবং, বৌদ্ধধর্মের সমূলে উন্মূলন করিয়া, বেদবিহিত সনাতন ধর্মের পুনঃস্থাপনে অশেষপ্রকার যত্ন ও প্রয়াস করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে, রাজা ধর্মধ্বজ, মহিষীত্রয় সমভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিলেন। সেই উপবনে এক সুশোভন সরোবর ছিল। রাজা, তাহাতে কমল সকল প্রফুল্ল দেখিয়া, স্বয়ং জলে অবতরণপূর্বক, কতিপয় পুষ্প লইয়া, তীরে আসিয়া, এক মহিষীর হস্তে দিলেন। দৈবযোগে, একটি পদ্ম, মহিষীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া, তদীয় বাম পদে পতিত হওয়াতে, উহার আঘাতে তাহার সেই পদ ভগ্ন হইল। তখন রাজা, হা হতোঽস্মি বলিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। সুধাকরের উদয় হইবামাত্র, তদীয় অমৃতময় শীতল কিরণমালার স্পর্শে, দ্বিতীয়া মহিষীর গাত্র স্থানে স্থানে দগ্ধ হইয়া গেল। আর, তৎকালে অকস্মাৎ এক গৃহস্থের ভবনে উদূখলের শব্দ হইল; সেই শব্দ শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তৃতীয়া মহিষীর শিরোবেদনা ও মূর্ছা হইল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! উহাদের মধ্যে কোন-কামিনী অধিক সুকুমারী। রাজা কহিলেন, সুধাকরকরস্পর্শে যে রাজমহিষীর দেহ দগ্ধ হইল, আমার মতে, সেই সর্বাপেক্ষা সুকুমারী।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

একাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

পুণ্যপুর নগরে, বল্লভ নামে, নিরতিশয় প্রজাবল্লভ নরপতি ছিলেন। তাঁহার অমাত্যের নাম সত্যপ্রকাশ। এক দিবস, রাজা সত্যপ্রকাশের নিকট কহিলেন, দেখ, যে ব্যক্তি, রাজ্যেশ্বর হইয়া, অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগ না করে, তাহার রাজ্য ক্লেশপ্রপঞ্চ মাত্র।

অতএব, অদ্যাবধি, আমি ইচ্ছানুরূপ বৈষয়িক সুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইব ; তুমি, কিয়ৎ কালের নিমিত্তে, সমস্ত রাজকার্যের ভার গ্রহণ করিয়া, আমায় এক বারে অবসর দাও। ইহা কহিয়া, অমাত্যহস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিয়া, রাজা, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, কেবল ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রকাশ, অগত্যা, রাজকীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; কিন্তু, স্বতন্ত্র রাজতন্ত্রনির্বাহ ও অহর্নিশ দুরবগাহ নীতিশাস্ত্রের অবিশ্রান্ত পর্যালোচনা দ্বারা, একান্ত ক্লান্ত হইতে লাগিলেন।

এক দিবস, অমাত্য আপন ভবনে, উৎকণ্ঠিত মনে, নির্জনে বসিয়া আছেন ; এমন সময়ে, তাঁহার গৃহলক্ষ্মী লক্ষ্মীনাম্নী পত্নী তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং, স্বামীকে সাতিশয় অবসন্ন ও নিরতিশয় দুর্ভাবনাগ্রস্ত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন, কি নিমিত্তে, তোমায় সতত উৎকণ্ঠিত দেখিতে পাই, এবং, কি নিমিত্তেই বা, তুমি দিন দিন দুর্বল হইতেছ। তিনি কহিলেন, রাজা, আমার উপর সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, ভোগসুখে কালযাপন করিতেছেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, ইদানীং, আমায় রাজশাসন ও প্রজাপালন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করিতে হইতেছে। রাজ্যের নানাবিষয়ক বিষম চিন্তা দ্বারা, আমি এরূপ দুর্বল হইতেছি। তখন তাঁহার পত্নী কহিলেন, তুমি, অনেক দিন, একাকী সমস্ত রাজকার্য নিষ্পন্ন করিলে ; এক্ষণে, কিছু দিনের অবকাশ লইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, তীর্থপর্যটন কর।

সত্যপ্রকাশ, সহধর্মিণীর উপদেশ অনুসারে, নৃপতিসমীপে বিদায় লইয়া, তীর্থপর্যটনে প্রস্থান করিলেন। তিনি, ক্রমে ক্রমে, নানা স্থানের তীর্থদর্শন করিয়া, পরিশেষে, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি, রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্বক, দর্শনাদি করিয়া, নির্গত হইলেন ; এবং, সমুদ্রে দৃষ্টিপাতমাত্র, দেখিতে পাইলেন, প্রবাহমধ্য হইতে এক অদ্ভুত স্বর্ণময় মহীরুহ বহির্গত হইল। ঐ মহীরুহের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া, এক পরম সুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী, হস্তে বীণা লইয়া, মধুর, কোমল, তানলয়বিশুদ্ধ স্বরে, সঙ্গীত করিতেছে। সত্যপ্রকাশ, বিস্ময়াবিষ্ট ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া, নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, ঐ অদ্ভুত মহীরুহ প্রবাহগর্ভে বিলীন হইল।

ঈদৃশ অঘটনঘটনা নিরীক্ষণে চমৎকৃত হইয়া, সত্যপ্রকাশ, ত্বরায় স্বদেশে প্রতিগমনপূর্বক, নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমি এক অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য দর্শন করিয়াছি ; কিন্তু, বর্ণন করিলে, তাহাতে, কোনও প্রকারে, আপনকার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিব না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যাহা কাহারও বুদ্ধিগম্য ও বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাদৃশ বিষয়ের কদাপি নির্দেশ করিবেক না ; করিলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু, মহারাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি ; এই নিমিত্ত নিবেদন

করিতেছি, যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান রামচন্দ্র, দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংসবিধান-বাসনায়, মহাকায় মহাবল কপিবল সাহায্যে, শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর, লোকাতীত কীর্তিহেতু সেতুসঙ্ঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল ; তদুপরি এক পরম সুন্দরী রমণী, বীণাবাদনপূর্বক, মধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সেই বৃক্ষ কন্যা সহিত জলে মগ্ন হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া, তীর্থপর্যটন পরিত্যাগপূর্বক, আমি আপনকার নিকট ঐ বিষয়ের সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

রাজা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, পুনর্বার সত্যপ্রকাশের হস্তে রাজ্যের ভারপ্রদানপূর্বক, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। নিরূপিত সময়ে, মহাদেবের পূজা করিয়া, মন্দির হইতে বহির্গত হইবামাত্র, সত্যপ্রকাশের বর্ণনানুরূপ ভূরুহ মহীপতির নয়নগোচর হইল। তাঁহার উল্লিখিত সর্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীর সৌন্দর্য-সন্দর্শনে ও সঙ্গীতশ্রবণে, বিমূঢ় ও পূর্বাপরপর্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া, রাজা অর্ণবপ্রবাহে লম্ফপ্রদানপূর্বক, অল্পক্ষণমধ্যে, ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। বৃক্ষও, মহীপতি সহিত, তৎক্ষণাৎ পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর, সেই রমণী রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, অহে বীরপুরুষ ! তুমি কে, কি অভিপ্রায়ে এ স্থানে আগমন করিলে, বল। তিনি কহিলেন, আমি পুণ্যপুরের রাজা ; আমার নাম বল্লভ ; তোমার সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া, সেই রমণী কহিল, আমি তোমার সাহসে সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি তুমি, কেবল কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে, আমার সহিত সর্ব প্রকারে সম্পর্কশূন্য হইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমার সহধর্মিণী হই। রাজা শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎপরে সে রাজাকে, এই নিয়মের রক্ষার্থে, পুনরায় প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া, গান্ধর্ব বিধানে আপন প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন করিল। রাজা, নব মহিষীর সহিত, পরম কৌতুকে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ চতুর্দশী উপস্থিত হইল। রাজমহিষী, সাতিশয় আগ্রহ ও নিরতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক, নিকটে থাকিতে নিষেধ করিলে, রাজা, পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু, কি কারণে পূর্বে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল, এবং এক্ষণে, এতাদৃশ আগ্রহ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক, পুনর্বার নিষেধ করিল, যাবৎ ইহা সবিশেষ অবগত না হইব, তাবৎ আমার অন্তঃকরণে এক বিষম সংশয় থাকিবেক। অতএব, ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক। এই বলিয়া, কৌতূহলাকুলিত চিত্তে, অন্তরালে থাকিয়া, রাজা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অর্ধরাত্র সময়ে, এক রাক্ষস আসিয়া কন্যার অঙ্গে করার্পণ করিল। রাজা দেখিয়া, একান্ত অসহমান হইয়া, করতলে করাল করবাল ধারণপূর্বক, তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত

হইলেন, এবং অশেষপ্রকার তিরস্কার করিয়া কহিলেন, অরে দুরাচার রাক্ষস! তুই, আমার সমক্ষে, প্রিয়তমার অঙ্গে হস্তার্পণ করিস না। যাবৎ তোরে না দেখিয়াছিলাম, তাবৎ অন্তঃকরণে ভয় ছিল ; এক্ষণে দেখিয়া নির্ভয় হইয়াছি, এবং তোর প্রাণদণ্ড করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, তিনি খড়্গপ্রহার দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন রাজমহিষী, অকৃত্রিম পরিতোষপ্রদর্শনপূর্বক, কহিলেন, তুমি, দুর্দান্ত রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া, আমায় জীবনদান করিলে। আমি, এত কাল, কি যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি, বলিতে পারি না।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, সুন্দরি! কি কারণে তুমি, এতাবৎ কাল পর্যন্ত, এই দারুণ দৈবদুর্বিপাকে পতিত ছিলে, বল।

তিনি কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ কর। আমি বিদ্যাধর নামক গন্ধর্বরাজের কন্যা ; আমার নাম রত্নমঞ্জরী। ভোজনকালে আমি নিকটে উপবিষ্ট না থাকিলে, পিতার তৃপ্তি হইত না ; এজন্য, নিত্যই, ভোজনসময়ে তাঁহার সন্নিহিত থাকিতাম। এক দিন, বাল্যখেলায় আসক্ত হইয়া, ভোজনবেলায় গৃহে উপস্থিত ছিলাম না। পিতা, আমার অপেক্ষায়, বুভুক্ষায় অভিভূত হইয়া, ক্রোধভরে এই শাপ দিলেন, অদ্যাবধি তুমি রসাতলবাসিনী হইবে ; এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এক রাক্ষস আসিয়া তোমায় অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা দিবে। আমি শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলাম, এবং, পিতার চরণে ধরিয়া, বহুবিধ স্তুতি ও বিনীতি করিয়া, নিবেদন করিলাম, পিতঃ! আমার দুরদৃষ্টবশতঃ, সামান্য অপরাধে, উৎকট দণ্ডবিধান করিলেন। এক্ষণে, কৃপা করিয়া, শাপমোচনের কোনও উপায় করিয়া দেন ; নতুবা, কত কাল যন্ত্রণাভোগ করিব। ইহা কহিয়া, আমি, বিষণ্ণ বদনে, রোদন করিতে লাগিলাম। তখন তিনি, পূর্বার্জিত স্নেহরসের সহায়তা দ্বারা, আমার বিনয়ের বশীভূত হইয়া কহিলেন, এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ আসিয়া, সেই রাক্ষসের প্রাণদণ্ড করিয়া, তোমার শাপমোচন করিবেন। আমি, সেই শাপে, এই পাপে আশ্লিষ্ট ছিলাম। বহু দিনের পর, তুমি আমায় মুক্ত করিলে। এক্ষণে, অনুমতি কর, পিতৃদর্শনে যাই।

রাজা কহিলেন, যদি তুমি উপকার স্বীকার কর, অগ্রে একবার আমার রাজধানীতে চল ; পরে পিতৃদর্শনে যাইবে। রত্নমঞ্জরী, মহোপকারকের নিকট অবশ্য কর্তব্য কৃতজ্ঞতাস্বীকারের অন্যথাভাবে অধর্ম জানিয়া, রাজার প্রার্থনায় সম্মত হইলে, তিনি, তাহারে সমভিব্যাহারে লইয়া, রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ; এবং, কিছু দিন, তদীয় সহবাসে বিষয়রসে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, তাহাকে পিতৃদর্শনে যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন রত্নমঞ্জরী কহিলেন, মহারাজ! বহু কাল মনুষ্যসহবাস দ্বারা, আমার গন্ধর্বত্ব গিয়াছে ; এখন, সর্বতোভাবে, মনুষ্যভাবাপন্ন হইয়াছি। পিতা আমার সর্বগন্ধর্বপতি ; এক্ষণে, তাঁহার নিকটে গিয়া, সমুচিত সমাদর পাইব না। অতএব, আর আমার তথায় যাইতে অভিলাষ নাই ; তোমার নিকটেই যাবজ্জীবন অবস্থিতি করিব। রাজা শুনিয়া অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং,

রাজকার্যে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া, দিন যামিনী, সেই কামিনীর সহিত, বিষয়-বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া, প্রধান অমাত্য সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! কি কারণে, অমাত্য প্রাণত্যাগ করিলেন, বল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন, রাজা বিষয়রসে আসক্ত হইয়া, রাজ্যচিন্তায় জলাঞ্জলি দিলেন; প্রজা অনাথ হইল। অতঃপর, আর কোনও ব্যক্তি আমার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেক না। অহোরাত্র এই বিষম চিন্তাবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে, সত্যপ্রকাশের প্রাণবিয়োগ হইল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দ্বাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

চূড়াপুরে, দেবস্বামী নামে, এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি রূপে রতিপতি, বিদ্যায় বৃহস্পতি, সম্পদে ধনপতি ছিলেন। কিয়ৎ দিন পরে, দেবস্বামী, লাবণ্যবতী নামে, এক গুণবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ কন্যা রূপলাবণ্যে ভুবনবিখ্যাত ছিল। উভয়ে প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা বিপ্রদম্পতী, গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত, অট্টালিকার উপরিভাগে শয়ন করিয়া, নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেই সময়ে, এক গন্ধর্ব, বিমানে আরোহণপূর্বক, আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছিল। দৈবযোগে, বিপ্রকামিনীর উপর দৃষ্টিপাত হওয়াতে, সে তদীয় অলৌকিক রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হইল; এবং, বিমান কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ করিয়া, নিদ্রান্বিতা লাবণ্যবতীকে লইয়া পলায়ন করিল।

কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দেবস্বামী, স্বীয় প্রেয়সীকে পার্শ্বশায়িনী না দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও সন্ধান না পাইয়া, সাতিশয় বিষণ্ণ ভাবে, নিশাযাপন করিলেন। পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, তিনি, অতিমাত্র ব্যগ্র ও চিন্তাকুল চিত্তে, পুনরায়, বিশেষ করিয়া, অশেষপ্রকার অনুসন্ধান করিলেন; পরিশেষে, নিতান্ত নিরাশ্বাস ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সংসারাশ্রমে বিসর্জন দিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এক দিন, দেবস্বামী, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়া, এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অতিথি হইলেন; কহিলেন, আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি; কিছু ভোজনীয় দ্রব্য দিয়া, আমার প্রাণরক্ষা কর। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, তৎক্ষণাৎ এক পাত্র দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া, অতিথি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ, ইতঃপূর্বে, এক কৃষ্ণসর্প ঐ দুগ্ধে মুখার্পণ করাতে, তাহা অতিশয় বিষাক্ত হইয়াছিল। পান করিবামাত্র, সেই বিষ, সর্বাঙ্গব্যাপী হইয়া, অতিথি ব্রাহ্মণকে ক্রমে ক্রমে অবসন্ন ও

অচেতন করিতে লাগিল। তখন তিনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে, তুমি বিষভক্ষণ করাইয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে, এই বলিয়া ভূতলে পড়িলেন ও প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণ, অকস্মাৎ ব্রহ্মহত্যা দেখিয়া, যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন ; এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশিয়া, আপন পত্নীকে, তুই দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলি, তাহাতেই ব্রহ্মহত্যা হইল ; তুই অতি দুর্বৃত্তা, আর তোর মুখাবলোকন করিব না ; ইত্যাদি নানাপ্রকার তিরস্কার ও বহু প্রহার করিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এ স্থলে কোন ব্যক্তি দোষভাগী হইবেক। রাজা কহিলেন, সর্পের মুখে স্বভাবতঃ বিষ থাকে ; সুতরাং, সে দোষী হইতে পারে না ; গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী, সেই দুগ্ধকে বিষাক্ত বলিয়া জানিতেন না ; সুতরাং, তাঁহারাও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবেন না ; আর, অতিথি ব্রাহ্মণ, সবিশেষ না জানিয়া, পান করিয়াছেন ; এজন্য, তিনিও আত্মঘাতী নহেন। কিন্তু, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, নিরপরাধা সহধর্মিণীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, তাহাতে তিনি, অকারণে পত্নীপরিত্যাগজন্য, দুরদৃষ্টভাগী হইবেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

চন্দ্রহৃদয় নগরে, রণধীর নামে, প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। রাজা রণধীরের প্রভাবে, প্রজারা চিরকাল নিরুপদ্রবে বাস করিত। কিয়ৎ দিন পরে, নগরে গুরুতর চৌর্যক্রিয়ার আরম্ভ হইল। পৌরেরা, চৌরের উপদ্রবে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, সকলে মিলিয়া, নৃপতিসমীপে স্ব স্ব দুঃখের পরিচয় প্রদান করিল। রাজা সবিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, যাহা হইয়াছে, তাহার আর উপায় নাই ; অতঃপর যাহাতে না হইতে পায়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ থাকিলাম। এইরূপ আশ্বাস দিয়া, রাজা নগরবাসীদিগকে বিদায় করিলেন ; এবং, নূতন নূতন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে সাতিশয় সতর্কতাপূর্বক নগররক্ষার আদেশ দিয়া, স্থানে স্থানে পাঠাইলেন ; বলিয়া দিলেন, চোর পাইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে। প্রহরীরা, সাতিশয় সাবধান হইয়া, নগররক্ষা করিতে লাগিল ; তথাপি চৌর্যের কিঞ্চিন্মাত্র নিবৃত্তি হইল না, বরং দিনে দিনে বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

পুরবাসীরা, পুনরায় একত্র হইয়া, রাজার নিকটে গিয়া, আপন আপন দুঃখ জানাইলে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এক্ষণে তোমরা বিদায় হও ; অদ্য রজনীতে, আমি স্বয়ং নগররক্ষার্থে নির্গত হইব। প্রজারা, রাজাজ্ঞা অনুসারে, স্বীয় স্বীয় আলয়ে গমন করিল। রাজাও, সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, অসি, চর্ম, ও বর্ম ধারণপূর্বক,

একাকী নগররক্ষার্থে নির্গত হইলেন ; এবং, কিয়ৎ দূরে গিয়া, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কোথায় যাইতেছ, তোমার বাস কোথায়। সে কহিল, আমি চোর ; তুমি কে, কি নিমিত্তে আমার পরিচয় লইতেছ, বল। রাজা ছল করিয়া বলিলেন, আমিও চোর। তখন সে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিল, আইস, উভয়ে একত্র হইয়া চুরি করিতে যাই। রাজা সম্মত হইলেন।

চোর, রাজাকে সহচর করিয়া, এক ধনাঢ্য গৃহস্থের ভবনে প্রবেশপূর্বক, বহু অর্থ হস্তগত করিল ; এবং নগর হইতে নির্গত হইয়া, কিয়ৎ দূরে গিয়া, এক প্রচ্ছন্ন সুরঙ্গ দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট হইল। আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়া, রাজাকে দ্বারদেশে বসিতে আসন দিয়া, সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবকাশে, এক দাসী আসিয়া, কথায় কথায়, রাজার পরিচয় লইল, এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কহিল, মহারাজ ! তুমি কি নিমিত্ত, এই দুর্বৃত্ত দস্যুর আবাসে আসিয়াছ ; সে না আসিতে আসিতে, যত দূর পার, পলায়ন কর ; নতুবা, সে আসিয়াই তোমার প্রাণ-সংহার করিবেক। রাজা শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, এবং বলিলেন, আমি পথ জানি না, কিরূপে পলাইব ; যদি তুমি কৃপা করিয়া পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে এবার আমার প্রাণরক্ষা হয়। তখন সেই দাসী পথপ্রদর্শন করিলে, রাজা পলাইয়া আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, রাজা রণধীর, বহু সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, পূর্বনির্দিষ্ট সুরঙ্গ দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া, চোরের ভবনরোধ করিলেন। এক রাক্ষস সেই পাতালস্থ নগবীর, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায়, রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চোর, রাজকীয় অবরোধ হইতে আত্মরক্ষার নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া নগররক্ষক রাক্ষসের শরণাপন্ন হইল, এবং নিবেদন করিল, এক রাজা সসৈন্য আসিয়া আমার উপর আক্রমণ করিয়াছে। যদি তুমি এ সময়ে আমার সহায়তা না কর, অদ্যই তোমার নগর হইতে প্রস্থান করিব। এই বলিয়া, প্রলোভনস্বরূপ তাহার আহারোপযোগী দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া, চোর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মান রহিল। আহারসামগ্রী উপহার পাইয়া, রাক্ষস সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল ; এবং, তুমি নির্ভয় হও, কিয়ৎক্ষণমধ্যেই, আমি রাজার সমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন করিতেছি ; এই বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, সৈন্যের অন্তর্গত নর, করী, তুরঙ্গ প্রভৃতি এক এক গ্রাসে উদরস্থ করিতে আরম্ভ করিল। রাজা, রাক্ষসের ভয়ানক আকার ও ক্রিয়া দর্শনে অতিশয় কাতর হইয়া, পলায়ন করিলেন। ফলতঃ, যে পলাইতে পারিল, তাহারই প্রাণ বাঁচিল ; অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য, সেই দুর্দান্ত রাক্ষসের গ্রাসে পতিত হইয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

রাজা একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। চোর, রাক্ষসের সহায়তায়, সাহসী ও স্পর্ধাবান্ হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল ; এবং, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, অরে কুলাঙ্গার ! ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, এরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতেছিস ; তোরে ধিক্। রাজা হইয়া, ভঙ্গ দিয়া,

রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে, ইহলোকে অকীর্তি ও পরলোকে নরকপাত হয়। রাজা, তৎকালে নিতান্ত ব্যাকুল ও সর্বথা উপায়বিহীন হইয়াও, কেবল কুলাভিমান ও খড়্গ, চর্ম সহায় করিয়া, চোরের সম্মুখীন হইলেন।

ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে, রাজা রণধীর চোরকে পরাজিত করিয়া, বন্ধনপূর্বক রাজধানীতে লইয়া গেলেন, এবং, পর দিন প্রাতঃকালে, শূলদানের ব্যবস্থা করিয়া, বধ্যবেশপ্রদানপূর্বক, তাহাকে গর্দভে আরোহণ করাইয়া, নগরের সমস্ত প্রদেশে পরিভ্রমণ করাইতে আদেশ দিলেন। চোর প্রায় সকলেরই সর্বনাশ করিয়াছিল; সুতরাং সকলেই তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, তাহার অশেষপ্রকার তিরস্কার ও রাজার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিন্তু, ধর্মধ্বজ নামক বণিকের গৃহের নিকটবর্তী হইলে, তাহার কন্যা শোভনা, গবাক্ষ-দ্বার দিয়া চোরকে নয়নগোচর করিয়া, একবারে মোহিত হইল; এবং, তৎক্ষণাৎ স্বীয় পিতার সমীপবর্তিনী হইয়া কহিল, তুমি রাজার নিকটে গিয়া, যেরূপে পার, ঐ চোরকে ছাড়াইয়া আন। বণিক কহিল, যে চোর সমস্ত নগর নির্ধন করিয়াছে; যাহার নিমিত্তে, রাজার সমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে; এবং রাজারও নিজের প্রাণ-সংশয় পর্যন্ত ঘটিয়াছিল; তাহাকে, আমার কথায়, কখনই ছাড়িয়া দিবেন না। শোভনা কহিল, যদি তোমার সর্বস্ব দিলেও, রাজা উহাকে ছাড়িয়া দেন, তাহাও তোমায় করিতে হইবেক। যদি তুমি উহারে না আন, তোমার সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব।

কন্যা ধর্মধ্বজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল; সুতরাং সে, তদীয় নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, রাজার নিকটে গিয়া আবেদন করিল, মহারাজ! আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্ত দিতেছি; আপনি, দয়া করিয়া, এই চোরকে ছাড়িয়া দেন। রাজা কহিলেন, এই চোর আমার ও পৌরবর্গের যৎপরোনাস্তি অপকার করিয়াছে; আমি, কোনও প্রকারে, উহারে ছাড়িয়া দিব না। তখন ধর্মধ্বজ, আপন কন্যার নিকটে গিয়া কহিল, আমি, সর্বস্বদান পর্যন্ত স্বীকারপূর্বক, প্রার্থনা করিলাম; রাজা, কোনও ক্রমে, চোরকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। তখন শোভনা, অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, বিষাদসগারে মগ্ন হইল।

এই সময় মধ্যে, রাজপুরুষেরা চোরকে সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করাইয়া, পরিশেষে বধ্যভূমিতে আনয়নপূর্বক, শূলস্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান করিল। শোভনার অপরূপ বৃত্তান্ত, তৎক্ষণাৎ নগরমধ্যে প্রচারিত হওয়াতে, অনতিবিলম্বে চোরেরও কর্ণগোচর হইল। তখন সে প্রথমতঃ হাসিতে লাগিল; অনন্তর, হাস্য হইতে বিরত হইয়া, রোদন আরম্ভ করিবামাত্র, রাজপুরুষেরা তাহাকে শূলে আরোহণ করাইল।

বণিককন্যা, চোরের মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র, সহগমনের উদ্যোগ করিয়া, বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল; এবং, যথানিয়মে চিতা প্রস্তুত হইলে, চোরকে, শূল হইতে অবতীর্ণ করিয়া, গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক, তাহারে লইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল।

দাহকেরা অগ্নিপ্রদানে উদ্যত হইল। নিকটে ভগবতী কাত্যায়নী দেবীর মন্দির ছিল। দেবী, তথা হইতে নির্গমনপূর্বক, শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, বৎসে! বরপ্রার্থনা কর; তোমার সাহস ও সতীত্ব দর্শনে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। শোভনা কহিল, জননি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই চোরের জীবনদান কর। দেবী, তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আনয়নপূর্বক, চোরের প্রাণদান করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! চোর, কি নিমিত্তে, প্রথমে হাস্য ও পরে রোদন করিয়াছিল, বল। রাজা কহিলেন, চোর, কন্যার কামনা শুনিয়া, আমার মৃত্যুসময়ে ইহার অনুরাগ সঞ্চার হইল; ভগবানের কি ইচ্ছা, কিছুই বুঝা যায় না; এই আলোচনা করিয়া, প্রথমে হাস্য করিয়াছিল; অনন্তর, এই কন্যা, আমার নিমিত্তে, রাজাকে সর্বস্ব দিতে উদ্যত হইয়াছিল; আমি ইহার এমন কি উপকারে আসিতাম; এই অনুশোচনা করিয়া, দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্দশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

কুসুমবতী নগরীতে সুবিচার নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার, চন্দ্রপ্রভা নামে, অবিবাহিতা দুহিতা ছিল। রমণীয় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, রাজকুমারী, উপবনবিহারে অভিলাষিণী হইয়া, পিতার অনুমতিপ্রার্থনা করিলেন। রাজা সম্মত হইলেন; এবং রাজধানীর অনতিদূরে, যে যোজনবিস্তৃত অতি রমণীয় উপবন ছিল, উহাকে স্ত্রীলোকের বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত, বহুসংখ্যক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্বে, বিংশতিবর্ষবয়স্ক, অতি রূপবান, মনস্বী নামে, বিদেশীয় ব্রাহ্মণকুমার, পরিশ্রান্ত ও আতপক্লান্ত হইয়া, উপবনমধ্যবর্তী নিকুঞ্জমধ্যে প্রবেশপূর্বক, স্নিগ্ধ ছায়াতে নিদ্রাগত ছিল। রাজপরিচারকেরা, তথায় উপস্থিত হইয়া, আবশ্যক কার্য সকল সম্পন্ন করিয়া, প্রস্থান করিল। দৈবযোগে, ঐ ব্রাহ্মণকুমার তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না।

রাজকুমারী, স্বীয় সহচরীবর্গ ও পরিচারিকাগণের সহিত, উপবনে উপস্থিত হইয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, ব্রাহ্মণকুমারের সমীপবর্তিনী হইলেন। ভ্রমণকারিণীদিগের পদশব্দে, মনস্বীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণকুমারের ও রাজকুমারীর চারি চক্ষুঃ একত্র হইলে, ব্রাহ্মণকুমার মোহিত ও মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল; রাজকুমারীও, আবির্ভূত সাত্ত্বিক ভাবের প্রভাবে, কম্পমানকলেবরা ও বিকলিতচিত্তা হইলেন। সখীগণ, অকস্মাৎ ঈদৃশ অতিবিষম বিষমস্মরদশা উপস্থিত দেখিয়া, মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণ করাইয়া, তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে গৃহে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণকুমার, সেই স্থানেই, স্পন্দহীন পতিত রহিল।

শশী ও ভূদেব নামে দুই ব্রাহ্মণ, কামরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছিলেন। তাঁহারাও, আতপে তাপিত হইয়া, বিশ্রামার্থে, উপবনস্থ নিকুঞ্জমধ্যে উপস্থিত হইলেন। প্রবেশমাত্র, সেই ব্রাহ্মণকুমারকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া, ভূদেব স্বীয় সহচরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বল দেখি, শশী! এ এরূপ অচেতন হইয়া পতিত আছে কেন। শশী কহিলেন, বোধ করি, কোনও নায়িকা জ্রচাপ দ্বারা কটাক্ষবাণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহাতেই এরূপে পতিত আছে। ভূদেব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন, ইহাকে জাগরিত করিয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

অনন্তর, ভূদেব, শশীর নিষেধ না মানিয়া, নানাবিধ উপায় দ্বারা, ব্রাহ্মণকুমারের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, অহে ব্রাহ্মণতনয়! কি কারণে তোমার ঈদৃশী দশা ঘটিয়াছে, বল। ব্রাহ্মণকুমার কহিল, যে ব্যক্তি দুঃখ দূর করিতে ইচ্ছু ও সমর্থ, তাহার নিকটেই দুঃখের কথা ব্যক্ত করা উচিত; নতুবা, যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইলে, মূঢ়তামাত্র প্রকাশ পায়। ভূদেব কহিলেন, ভাল, তুমি আমার নিকটে ব্যক্ত কর; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে রূপে পারি, তোমার দুঃখ দূর করিব। মনস্বী কহিল, কিয়ৎ ক্ষণ পূর্বে, এক রাজকন্যা এই উপবনে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল; তাহাকে দেখিয়া, আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে, প্রাণত্যাগ করিব।

তখন ভূদেব কহিলেন, তুমি আমার সমভিব্যাহারে চল; যাহাতে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে অশেষবিধ যত্ন করিব। আর, যদি তোমার প্রার্থিত সম্পাদনে নিতান্তই কৃতকার্য হইতে না পারি, অন্ততঃ, বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া বিদায় করিব। মনস্বী কহিল, যদি আমার অভিপ্রেত স্ত্রীরত্নলাভের সদুপায় করিতে পার, তবেই তোমাদের সঙ্গে যাই; নতুবা, ধনের নিমিত্তে, আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। ভূদেব, মনস্বীর এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন; এবং, অবশ্যই তোমার মনোরথ সম্পন্ন করিব, তুমি আমাদের সমভিব্যাহারে চল; এই বলিয়া, আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি তাহাকে এক একাক্ষর মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন; বলিলেন, এই মন্ত্রের উচ্চারণ করিলে, তুমি ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার আকৃতি ধারণ করিবে, এবং, ইচ্ছা করিলেই, পুনর্বার আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।

মনস্বী মন্ত্রবলে ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা হইল। ভূদেব অশীতিবর্ষদেশীয়ের আকারধারণ করিলেন, এবং, মনস্বীকে বধূবেশধারণ করাইয়া, রাজা সুবিচারের নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দর্শনমাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া, প্রণামপূর্বক, বসিতে আসন প্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ, আসনপরিগ্রহ করিয়া, আশীর্বাদ করিলেন, যিনি, এই জগন্মণ্ডল প্রলয়-জলধিজলে নিলীন হইলে, মীনরূপধারণ করিয়া, ধর্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন; যিনি, বরাহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা, প্রলয়-জলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন; যিনি, কূর্মরূপ অবলম্বন করিয়া, পৃষ্ঠে

এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন ; যিনি, নৃসিংহের আকারস্বীকার করিয়া, নখকুলিশপ্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন ; যিনি, দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত, বামন অবতার হইয়া, দেবরাজকে পুনর্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন ; যিনি, জমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া, তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা, মহাবীর্য কার্তবীর্য অর্জুনের ভুজবনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং, একবিংশতি বার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া, অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন ; যিনি, দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে, দশরথগৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া, বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে, সমুদ্রে সেতুবন্ধন-পূর্বক, দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংস করিয়াছেন ; যিনি, দ্বাপরযুগের অন্তে, ধর্মসংস্থাপনার্থে, যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া, দৈত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া, অশেষপ্রকার লীলা করিয়াছেন ; যিনি, বেদমার্গবিপ্লাবনের নিমিত্ত, বুদ্ধাবতার হইয়া, দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন ; যিনি, সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশানামক ধর্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া, ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং, অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া, করতলে করাল করবাল ধারণপূর্বক, বেদবিদ্বেষী, ধর্মমার্গপরিভ্রষ্ট, নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন ; সেই ত্রিলোকীনাথ, বৈকুণ্ঠস্বামী, ভূতভাবন ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়! কোথা হইতে আসিতেছেন। বৃদ্ধবেশী ভূদেব কহিলেন, মহারাজ! আমি গঙ্গার পূর্বপার হইতে আসিতেছি। ইনি আমার পুত্রবধূ। ইঁহাকে ইঁহার পিত্রালয় হইতে আনিতে গিয়াছিলাম ; প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, মারীভয়ে গ্রামস্থ সমস্ত লোক, স্থানত্যাগ করিয়া, দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। গৃহে ব্রাহ্মণী ও বিংশতিবর্ষীয় পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলাম ; তাহারাও, সেই উপদ্রবের সময়, দেশত্যাগ করিয়াছে ; কোথায় গিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। জানি না, কত স্থানে ভ্রমণ করিলে, কত কালে, তাহাদিগকে দেখিতে পাইব। তাহাদের অদর্শনে, দুঃসহ শোকভারে আক্রান্ত হইয়া, এক বারে, আমি আহার ও নিদ্রায় বিসর্জন দিয়াছি। এক্ষণে মানস করিয়াছি, পুত্রবধূকে বিশ্বস্তহস্তে ন্যস্ত করিয়া, তাহাদের অন্বেষণে নির্গত হইব। আপনি দেশাধিপতি ; আপনকার ন্যায় প্রকৃত বিশ্বাসভাজন কোথায় পাইব। আপনি, অনুগ্রহ করিয়া, আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত, পুত্রবধূটিকে আপনকার আশ্রয়ে রাখুন।

রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পরকীয় মহিলা গৃহে রাখা অতি কঠিন কর্ম ; কিন্তু, অস্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন ; অতএব, চন্দ্রপ্রভার নিকটে দিয়া, তাহার উপর ইহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দি। এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া, তিনি ব্রাহ্মণকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম। ভূদেব, হৃষ্টচিত্তে আশীর্বাদপ্রয়োগপূর্বক, রাজার হস্তে পুত্রবধূ ন্যস্ত করিয়া,

প্রস্থান করিলেন। রাজাও, অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, কন্যার হস্তে কন্যাবেশধারী মনস্বীর ভারসমর্পণ করিলেন।

রাজকন্যা, ব্রাহ্মণবধূকে সমবয়স্কা দেখিয়া, আদরপূর্বক, তাহার ভার লইলেন, এবং, স্বীয় সহোদরার ন্যায়, যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। সর্বদা একত্র উপবেশন, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন আদি দ্বারা, পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হইতে লাগিল। মনস্বী, ক্রমে ক্রমে, রাজকন্যার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিল। এক দিবস, সে, রাজকন্যার মনের ভাবপরীক্ষার্থে, কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, প্রিয়সখি! তুমি দিবানিশি কি চিন্তা কর, এবং, কি নিমিত্তে, দিন দিন দুর্বল হইতেছ, বল।

রাজপুত্রী কহিলেন, সখি! বসন্তকালে, এক দিন, সখীগণ সঙ্গে লইয়া, বনবিহারে গিয়াছিলাম। তথায়, দৈবযোগে, এক পরম সুন্দর যুবা ব্রাহ্মণকুমার আমার নয়নপথের পথিক হইলেন। তদবধি তদাসক্তচিত্তা হইয়া, তদ্বিরহে দিন দিন এরূপ দুর্বল হইতেছি। দুঃসহ বিরহানল, ক্রমে প্রবল হইয়া, নিরন্তর অন্তরদাহ করিতেছে। আমার আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়েই সুখ নাই। দিবানিশি কেবল সেই মোহিনী মূর্তির চিন্তা করিয়া, প্রাণধারণ করিতেছি, এবং চতুর্দিক তন্ময় দেখিতেছি। তাঁহার নাম ধাম কিছুই জানি না। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কোনও উপায় স্থির করিতে পারি নাই। নিতান্ত নির্লজ্জা হইয়া, কাহারও নিকট মনের বেদনা ব্যক্ত করিতে পারি না। তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ; তোমার কাছে কোনও কথাই গোপনীয় নাই। তুমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতেই প্রকাশ করিলাম। ফলতঃ, তোমার নিকটে মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়াও, অনেক অংশে, স্বাস্থ্যলাভ হইল। তুমি এ বিষয় অতি গোপনে রাখিবে।

এইরূপে রাজকন্যার অভিপ্রায় বুঝিয়া, মনস্বী আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইল, এবং কহিল, প্রিয়সখি! আমি যদি তোমার প্রিয়সমাগম সম্পন্ন করিতে পারি, আমায় কি পারিতোষিক দাও। রাজকন্যা কহিলেন, সখি! অধিক আর কি বলিব, যদি তুমি তাঁহাকে মিলাইয়া দিতে পার, তোমার দাসী হইয়া, চিরকাল চরণসেবা করিব। মনস্বী, তৎক্ষণাৎ আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, প্রিয়সম্ভাষণপূর্বক, রাজকুমারীর করগ্রহণ করিল। রাজকন্যা অসম্ভাবিত প্রিয়সমাগম দ্বারা, মনোরথনদীর পার প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমতঃ, বাক্‌পথাতীত হর্ষ, বিস্ময়, লজ্জার উদ্রেক সহকারে, পরম রমণীয় অনির্বচনীয় দশান্তর প্রাপ্ত হইলেন; অনন্তর, লজ্জাভঙ্গ হইলে, মনস্বীর রূপান্তরপ্রতিপত্তিরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য, একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে, আপন বিচেতনদশা অবধি, ভূদেবের তিরস্করণী বিদ্যাপ্রদান পর্যন্ত, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকন্যার গোচর করিয়া, গান্ধর্ব বিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিল।

কিছু দিনের পর, রাজকুমারী অন্তর্বত্নী হইলেন। এই সময়ে, এক দিন, রাজা সুবিচার সপরিবার অমাত্যভবনে নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজকন্যা, এক নিমিষের নিমিত্তেও,

ব্রাহ্মণবধূকে নয়নের বহির্বর্তিনী করিতেন না ; সুতরাং, তিনি, অমাত্যভবনপ্রস্থান-কালে, তাহারে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন। অমাত্যপুত্র, ব্রাহ্মণবধূর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে, মোহিত হইল ; এবং, নিতান্ত অধৈর্য হইয়া, আপন মিত্রের নিকটে কহিল, যদি এই স্ত্রীরত্ন হস্তগত না হয়, প্রাণত্যাগ করিব। ফলতঃ, ক্রমে ক্রমে, মন্ত্রিপুত্রের বিরহবেদনা এরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যে কেবল দশমী দশা মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

তখন তাহার মিত্র, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, অমাত্যের নিকটে গিয়া, তদীয় অবস্থা ও প্রার্থনা জানাইল। অমাত্য, অপত্যস্নেহের আতিশয্যবশতঃ, উচিতানুচিত-বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, রাজসমীপে সবিশেষ সমস্ত নির্দেশপূর্বক, ব্রাহ্মণবধূপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন, অরে মূর্খ! স্থাপিত ধন, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে, অন্যকে দেওয়া সর্বতোভাবে অতি গর্হিত কর্ম। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণ, কোনও কালে, কোনও ক্রমে, ব্যতিক্রমের আশঙ্কা নাই জানিয়া, বিশ্বাস করিয়া, আমার হস্তে পুত্রবধূসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসভঙ্গ, শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে, যার পর নাই, গর্হিত ব্যবহার। আমি, তোমার অনুরোধে, এইরূপ দুষ্ক্রিয়ায়, প্রাণান্তেও, প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। মন্ত্রী শুনিয়া, নিরাশ হইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিলেন ; কিন্তু পুত্রের তাদৃশী দশা দর্শনে, নিতান্ত কাতর হইয়া, আহার নিদ্রা পরিহারপূর্বক, বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন।

সর্বাধিকারী, ক্রমে ক্রমে, পুত্রের তুল্য দশা প্রাপ্ত হইলে, রাজকার্যব্যাঘাতের উপক্রম দেখিয়া, অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষেরা রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! মন্ত্রিপুত্রের যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার জীবনরক্ষা হওয়া কঠিন। যেরূপ দেখিতেছি, তাহার কোনও অমঙ্গল ঘটিলে, মন্ত্রীও অবধারিত প্রাণত্যাগ করিবেন। এরূপ সর্বাংশে কর্মদক্ষ কার্যসহায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই ; সুতরাং, রাজকার্যনির্বাহবিষয়ে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবেক। অতএব, আমরা বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্রবধূকে অমাত্যপুত্রের নিকট প্রেরিত করুন। বহুদিন হইল, ব্রাহ্মণের উদ্দেশ নাই ; আর তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা, কোনও ক্রমে, বোধগম্য হইতেছে না ; যদিও কালান্তরে প্রত্যাগমন করেন ; ব্রাহ্মণজাতি সাতিশয় অর্থলোভী ; বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া, তুষ্ট করিয়া, অনায়াসে বিদায় করিতে পারিবেন ; অথবা, কন্যান্তরসঙ্ঘটন করিয়া, তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়াও তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারা যাইবেক।

রাজা, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, অবশেষে, ব্রাহ্মণবধূর নিকটে গিয়া, মন্ত্রিপুত্রের প্রার্থনা জানাইলেন। কপটচারী বধূবেশধারী মনস্বী নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনি দেশাধিপতি ; আপনকার ইচ্ছা, সর্ব কাল, সর্ব বিষয়ে, সর্বাংশে বলবতী ; বিশেষতঃ, এক্ষণে আমি আপনকার আশ্রয়ে আছি ; আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন, আমার পক্ষে, সর্বতোভাবে, সম্পূর্ণ উচিত কর্ম। কিন্তু মহারাজ! বিবেচনা করুন, আমি বিবাহিতা নারী ; বিবাহিতা নারীর পুরুষান্তরসেবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকাচার-

বিরুদ্ধ। আপান দণ্ডধারী হইয়া, কি রূপে, ঈদৃশ বিসদৃশ আজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। মহারাজ! আমি, প্রাণান্তেও পরপুরুষের মুখ দেখিব না। রাজা শুনিয়া, নিরতিশয় বিষণ্ণ, হতবুদ্ধি, ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

মনস্বী, আর এখানে থাকায় ভদ্রস্থতা নাই, অতঃপর পলায়ন করাই সর্বাংশে শ্রেয়ঃ, এই স্থির করিয়া, বধূবেশপরিত্যাগপূর্বক, কৌশলক্রমে, রাজবাটী হইতে পলায়ন করিল। রাজা, ব্রাহ্মণবধূর অদর্শনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এক বারে বিষাদপারাবারে মগ্ন হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার এক বিষম সর্বনাশ উপস্থিত হইল; ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কি উত্তর দিব; ব্রাহ্মণবধূর নিকট ওরূপ অনুচিত প্রস্তাব করাই অতি অসঙ্গত কর্ম হইয়াছে। যদর্থে প্রার্থনা করিলাম, তাহাও সিদ্ধ হইল না; অথচ ঘোরতর বিপদে পড়িলাম।

এদিকে, মনস্বী, ভূদেবের নিকটে গিয়া, পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তিনি অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন; এবং, স্বীয় সহচর শশীকে বিংশতিবর্ষীয় পুত্র সাজাইয়া, স্বয়ং, পূর্ববৎ বৃদ্ধবেশধারণপূর্বক, রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা, প্রণাম ও স্বাগতপ্রশ্নপূর্বক বসিতে আসন দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়ের এত বিলম্ব হইল কেন। ভূদেব কহিলেন, মহারাজ! বিলম্বের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন। অনেক কষ্টে, অনেক অন্বেষণ করিয়া, পুত্র পাইয়াছি। এক্ষণে, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া, গৃহে যাইব। রাজা, ব্রহ্মশাপভয়ে কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, ব্রাহ্মণের নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলেন।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া কোপে কম্পমানকলেবর হইলেন, এবং শাপপ্রদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন, তোমার এ কি ব্যবহার; আমি তোমাকে রাজা জানিয়া, বিশ্বাস করিয়া, তোমার হস্তে পুত্রবধূসমর্পণ করিয়াছিলাম। তুমি, আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, যথেচ্ছ বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার সর্বনাশ করিয়াছ। বলিতে কি, কোনও কালে, আমার এ মনোবেদনা দূর হইবেক না। রাজা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, এবং অশেষপ্রকার স্তুতি ও বিনীতি করিয়া কহিলেন, মহাশয়! কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করিতে হইবেক; আপনকার যে অপকার করিয়াছি, তাহার প্রতিক্রিয়ার্থে, যে আজ্ঞা করিবেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাহাতেই সম্মত হইব। ভূদেব কহিলেন, যদি তুমি আমার পুত্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দাও, তাহা হইলে, আমি কথঞ্চিৎ ক্ষমা করিতে পারি।

রাজা, ব্রহ্মকোপানলে কুলক্ষয়ভয়ে, তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; এবং, জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ দ্বারা, শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্ধারিত করিয়া, ব্রাহ্মণতনয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। ভূদেব রাজকন্যা লইয়া আলয়ে উপস্থিত হইলে, শশী ও মনস্বী, উভয়ে, এই ভার্যা আমার আমার বলিয়া, পরস্পর বিষম বিবাদ আরব্ধ করিল। মনস্বী কহিল, আমি পূর্বে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, এবং, আমার

সহযোগে, ইহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। শশী কহিলেন, রাজা সর্বসমক্ষে আমাকে কন্যাদান করিয়াছেন।

ইহ কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এক্ষণে, এই কন্যা, শাস্ত্র ও যুক্তি অনু-সারে, কাহার সহধর্মিণী হইতে পারে। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, আমার মতে মনস্বীর। বেতাল কহিল, শাস্ত্রে লিখিত আছে, কন্যার দান, বিক্রয়, পরিত্যাগে পিতামাতার সম্পূর্ণ অধিকার। রাজা সর্ব সমক্ষে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া, শশীকে কন্যা দান করিয়াছেন। অতএব, পিতৃদত্তা কন্যা শশীরই সহধর্মিণী হইতে পারে; তাহা না হইয়া, মনস্বীর কেন হইবেক, বল। রাজা কহিলেন, তুমি যাহা কহিতেছ, তাহার যথার্থতা বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু, মনস্বী পূর্বে বিবাহ করিয়াছে, এবং, তাহার সহযোগে, রাজকন্যার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। এমন স্থলে, সে মনস্বীর সহচারিণী হইলে, তাহারও সতীত্বরক্ষা হয়, ধর্মেরও মান থাকে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায়, হিমালয় নামে, অতি প্রসিদ্ধ পর্বত আছে। তাহার প্রস্থদেশে, পুষ্পপুর নামে, পরম রমণীয় নগর ছিল। গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু ঐ নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি, পুত্রকামনা করিয়া, বহু কাল, কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষ প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদান করিলে, রাজা জীমূতকেতুর এক পুত্র জন্মিল। তিনি পুত্রের নাম জীমূতবাহন রাখিলেন। জীমূতবাহন, স্বভাবতঃ, সাতিশয় ধর্মশীল, দয়াবান্, ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; এবং, স্বল্প পরিশ্রমে, স্বল্পকাল মধ্যে, সর্ব শাস্ত্রে পারদর্শী ও শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে, রাজা জীমূতকেতু, পুনরায় কল্পবৃক্ষকে প্রসন্ন করিয়া, এই বরপ্রার্থনা করিলেন, আমার প্রজারা সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হউক। কল্পবৃক্ষের বরদান দ্বারা, তদীয় প্রজাবর্গ সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইল, এবং, ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া, রাজাকেও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল। ফলতঃ, অল্পকালমধ্যে, রাজা ও প্রজা বলিয়া, কোনও অংশে, কোনও বিশেষ রহিল না। তখন, জীমূতকেতুর জ্ঞাতিবর্গ গোপনে পরামর্শ করিল, ইহারা পিতাপুত্রে, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, দিবানিশি, কেবল ধর্মচিন্তায় কালযাপন করিতেছে; রাজ্যের দিকে ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করে না। প্রজা সকল উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল। অতএব, ইহাদের উভয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া, যাহাতে উপযুক্তরূপ রাজ্যশাসন হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। অনন্তর, বহুতর সৈন্যসংগ্রহপূর্বক, তাহারা রাজপুরীর চতুর্দিক নিরুদ্ধ করিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া, যুবরাজ জীমূতবাহন পিতার নিকট নিবেদন করিলেন, মহারাজ!

জ্ঞাতিবর্গ, একবাক্য হইয়া, আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিসন্ধিতে, এই উদ্যোগ করিয়াছে। আপনকার আজ্ঞা পাইলে, রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, বিপক্ষপক্ষের সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ডবিধান করি।

জীমূতকেতু কহিলেন, এই ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি অকিঞ্চিৎকর; বিনশ্বর রাজপদের নিমিত্ত, বহুসংখ্যক জীবের প্রাণহিংসা করিয়া, মহাপাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, আত্মীয়গণের কুমন্ত্রণায়, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, পশ্চাৎ অনেক অনুতাপ করিয়াছিলেন। অতএব, রাজপদপরিত্যাগ করিয়া, কোনও নিভৃত স্থানে গিয়া, প্রশান্ত মনে, দেবতার আরাধনা করা ভাল। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, পিতাপুত্রে নগর হইতে বহির্গত হইলেন; এবং, মলয় পর্বতে গিয়া, তদীয় অধিত্যকায় কুটীরনির্মাণপূর্বক, তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এক ঋষিকুমারের সহিত, রাজকুমারের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিল। এক দিন, দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া ভ্রমণার্থে নির্গত হইলেন। অনতিদূরে কাত্যায়নীর মন্দির ছিল; শ্রবণমনোহর বীণাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, তাঁহারা, কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে, সত্বর গমনে, তথায় উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন, এক পরম সুন্দরী কন্যা, বীণানুগত স্তুতিগর্ভ গীত দ্বারা, ভগবতী কাত্যায়নীর উপাসনা করিতেছে। উভয়ে, একতানমনা হইয়া, শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সেই কন্যা, জীমূতবাহনকে নয়নগোচর করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ, এবং স্বীয় সহচরী দ্বারা তাঁহার নাম, ধাম, ব্যবসায় প্রভৃতির পরিচয়গ্রহণপূর্বক, প্রস্থান করিল।

অনন্তর, তাহার সহচরী, তদীয় নিদেশক্রমে, তাহার মাতার নিকট পূর্বাপর সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি স্বীয় পতি রাজা মলয়কেতুর নিকটে কন্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মলয়কেতু আপন পুত্র মিত্রাবসুকে কহিলেন, তোমার ভগিনী বিবাহ-যোগ্যা হইয়াছে; আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে; উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করা আবশ্যক। শুনিলাম, গন্ধর্বাধিপতি রাজা জীমূতকেতু, রাজ্যাধিকারপরিহারপূর্বক, নিজ পুত্র জীমূতবাহন মাত্র সমভিব্যাহারে, মলয়াচলে অবস্থিতি করিতেছেন। আমার অভিপ্রায়, জীমূতবাহনকে কন্যাদান করি। তুমি, রাজা জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া, আমার এই অভিপ্রায় তাঁহার গোচর কর।

মিত্রাবসু, পিতার আদেশ অনুসারে, জীমূতকেতুর সমীপে উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন; এবং, জীমূতবাহনকে, মিত্রাবসুর সমভিব্যাহারে, মলয়কেতুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মলয়কেতু, শুভ লগ্নে, স্বীয় কন্যা মলয়বতীর বিবাহকার্য সম্পন্ন করিলেন। বর ও কন্যা, পরম সুখে, কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এক দিন, জীমূতবাহন ও মিত্রাবসু, উভয়ে, মলয় মহীধরের পরিসরে, পরিভ্রমণবাসনায়, বাসস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। ভূধরের উত্তর ভাগে উপস্থিত হইয়া, দূর হইতে এক

শ্বেতবর্ণ বস্তুরাশি নয়নগোচর করিয়া, জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! গণ্ডশৈলের ন্যায়, ধবলবর্ণ, রাশীকৃত কি বস্তু দৃষ্ট হইতেছে। মিত্রাবসু কহিলেন, মিত্র! পূর্ব কালে, গরুড়ের সহিত, নাগগণের নিরন্তর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিয়ৎ কাল পরে, নাগেরা, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, সন্ধিপ্রার্থনা করিলে, গরুড় কহিলেন, যদি তোমরা, আমার দৈনন্দিন আহারের নিমিত্ত, এক এক নাগ উপহার দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হই ; নতুবা, অবিলম্বে নাগকুল নিঃশেষ করিব। নিরুপায় নাগেরা, তাহাতেই সম্মত হইল। তদবধি, প্রতিদিন, এক এক নাগ, পাতাল হইতে আসিয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত থাকে ; গরুড়, মধ্যাহ্নকালে আসিয়া, ভক্ষণ করেন। এইরূপে, ভক্ষিত নাগগণের অস্থি দ্বারা, ঐ পর্বতাকার ধবলরাশি প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রবণমাত্র, জীমূতবাহনের অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, মধ্যাহ্নকাল আগতপ্রায় ; অবশ্যই এক নাগ, গরুড়ের আহারার্থে, পর্যায়ক্রমে, উপস্থিত হইবেক ; আমি, আপন প্রাণ দিয়া, তাহার প্রাণরক্ষা করিব। অনন্তর, কৌশলক্রমে শ্যালককে বিদায় করিয়া, ক্রমে ক্রমে অস্থিরাশির নিকটবর্তী হইয়া, জীমূতবাহন রোদনশব্দশ্রবণ করিলেন ; এবং, সত্বর গমনে, রোদন-স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা নাগী, শিরে করাঘাতপূর্বক, হাহাকার ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। দেখিয়া, একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া, তিনি কাতর বচনে নাগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! তুমি কি নিমিত্তে রোদন করিতেছ। সে গরুড়-বৃত্তান্তের বর্ণন করিয়া কহিল, অদ্য আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের বার ; ক্ষণকাল পরেই, গরুড় আসিয়া, আহারার্থে তাহার প্রাণসংহার করিবেক। আমার দ্বিতীয় পুত্র নাই। আমি, সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া, রোদন করিতেছি। জীমূতবাহন কহিলেন, মা! আর রোদন করিও না ; আমি, আপন প্রাণ দিয়া, তোমার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিব। নাগী কহিল, বৎস! তুমি, কি কারণে, পরের জন্যে প্রাণত্যাগ করিবে। আর, পরের পুত্রের প্রাণ দিয়া, আপন পুত্রের প্রাণরক্ষা করিলে, আমারও ঘোরতর অধর্ম ও যার পর নাই অপযশ হইবেক।

এইরূপে উভয়ের কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে শঙ্খচূড়ও তথায় উপস্থিত হইল ; এবং, জীমূতবাহনের অভিসন্ধি শুনিয়া, তাঁহার পরিচয়গ্রহণপূর্বক, বিশেষজ্ঞ হইয়া কহিল, মহারাজ! আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার মত কত শত ব্যক্তি সংসারে জন্মিতেছে ও মরিতেছে ; কিন্তু, আপনকার ন্যায় ধর্মাত্মা দয়ালু সংসারে সর্বদা জন্মগ্রহণ করেন না। অতএব, আমার পরিবর্তে, আপনকার প্রাণত্যাগ করা, কোনও ক্রমে, উচিত নহে। আপনি জীবিত থাকিলে, লক্ষ লক্ষ লোকের মহোপকার হইবেক। আমি জীবিত থাকিয়া, কোনও কালে, কাহারও কোনও উপকার করিতে পারিব না। মাদৃশ ব্যক্তির জীবন মরণ দুই তুল্য।

জীমূতবাহন কহিলেন, শুন শঙ্খচূড়! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপন প্রাণ দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিব। আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; ক্ষত্রিয়েরা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ অতি লঘু ও সহজ জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ, প্রাণস্নেহে প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে, নরকগামী হইতে হয়। অতএব, যখন স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছি, তখন অবশ্যই প্রাণ দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিব; তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর। এইরূপ বলিয়া, তিনি শঙ্খচূড়কে বিদায় করিলেন; এবং, তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া, গরুড়ের আগমনপ্রতীক্ষায়, নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। শঙ্খচূড়, জীমূতবাহনের নির্বন্ধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, বিষণ্ণ মনে, বিরস বদনে, মলয়াচলবাসিনী কাত্যায়নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল; এবং, একাগ্রচিত্ত হইয়া, জীবনদাতা জীমূতবাহনের জীবনরক্ষণের উপায়প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, গরুড় আসিয়া, চঞ্চুপুট দ্বারা জীমূতবাহনগ্রহণপূর্বক, নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া, মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, জীমূতবাহনের দক্ষিণবাহুস্থিত নামাঙ্কিত মণিময় কেয়ূর, শোণিতলিপ্ত হইয়া, মলয়বতীর সম্মুখে পতিত হইল। মলয়বতী, নামাক্ষরপরিচয় দ্বারা, প্রিয়তমের প্রাণাত্যয় স্থির করিয়া, শিরে করাঘাতপূর্বক, ভূতলে পতিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কেয়ূর দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিলেন। রাজা মলয়কেতু, চতুর্দিকে বহুসংখ্যক লোক প্রেরিত করিয়া, পরিশেষে স্বয়ং, পুত্র সহিত, জীমূতবাহনের অন্বেষণে নির্গত হইলেন।

শঙ্খচূড়, কাত্যায়নীর আলয় হইতে, রাজপরিবারের কোলাহলশ্রবণ করিয়া, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, জীমূতবাহনের অমঙ্গলবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে পূর্বস্থানে উপস্থিত হইল; এবং, গরুড়কে সম্বোধন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, অহে বিহঙ্গরাজ! তুমি, শঙ্খচূড়ভ্রমে, রাজা জীমূতবাহনকে লইয়া গিয়াছ; উনি তোমার ভক্ষ্য নহেন। আমার নাম শঙ্খচূড়; অদ্য আমার বার। তুমি, তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়া, আমায় ভক্ষণ কর; নতুবা, তোমায় সাতিশয় অধর্মগ্রস্ত হইতে হইবেক।

গরুড় শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন; এবং মৃতকল্প জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে মহাপুরুষ! তুমি কে, কি নিমিত্তে প্রাণদানে উদ্যত হইয়াছ। জীমূতবাহন আত্মপরিচয়প্রদানপূর্বক, কহিলেন, অদ্য বা অশব্দতান্তে, অবশ্যই মৃত্যু ঘটিবেক। যে ব্যক্তি, ক্ষণবিধ্বংসী তুচ্ছ শরীরের বিনিয়োগ দ্বারা, পরোপকার করিয়া, দিগন্তব্যাপিনী ও অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তি উপার্জন করে, তাহারই এই সংসারে জন্মগ্রহণ সার্থক; নতুবা, স্বোদরপরায়ণ কাক, কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি হইতে বিশেষ কি। এই বিবেচনায়, আমি, আত্মপ্রাণব্যয় দ্বারা, শঙ্খচূড়ের প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়াছি। গরুড় শুনিয়া, যার পর নাই, সন্তুষ্ট হইলেন, এবং জীমূতবাহনকে শত শত সাধুবাদপ্রদান করিয়া কহিলেন, জগতে জীবমাত্রেই স্ব স্ব প্রাণরক্ষায় যত্নবান। কিন্তু, আপন প্রাণ দিয়া, পরের প্রাণরক্ষা করে, এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল।

যাহা হউক, আমি তোমার দয়া ও সাহস দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; বরপ্রার্থনা কর।

জীমূতবাহন কহিলেন, খগেশ্বর ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই বর দাও, তুমি অতঃপর আর নাগহিংসা করিবে না ; এবং, দীর্ঘ কাল ভক্ষণ করিয়া, যে অসংখ্য নাগের প্রাণ-সংহার করিয়াছ, তাহাদেরও জীবনদান কর। গরুড়, তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আহরণপূর্বক, অস্থিস্তূপের উপর সেচন করিয়া, মৃত নাগগণের জীবনদান করিলেন, এবং জীমূতবাহনকে কহিলেন, রাজকুমার ! আমার প্রসাদে, তোমাদের অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবেক। এইরূপ বরপ্রদান করিয়া, গরুড় অন্তর্হিত হইলে, শঙ্খচূড়ও জীমূতবাহনের বহুবিধ স্তুতি করিয়া, বিদায় লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

জীমূতবাহন, এইরূপ বরলাভে চরিতার্থ হইয়া, পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন ; এবং, লোক দ্বারা, শ্বশুরালয়ে স্বীয় মঙ্গলসংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের রাজ্যাপহারক জ্ঞাতিবর্গ, বরপ্রদানবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, রাজা জীমূতকেতুর শরণাগত হইল ; এবং, স্তুতি ও বিনতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে পুনঃস্থাপিত করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড়, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তির অধিক ভদ্রতাপ্রকাশ হইল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, শঙ্খচূড়ের। বেতাল কহিল, কি প্রকারে। রাজা কহিলেন, শঙ্খচূড়, জীমূতবাহনের প্রাণদানবিষয়ে, প্রথমতঃ কোনও মতে সম্মত হয় নাই ; পরিশেষে, সম্মত হইয়াও, কাত্যায়নীর নিকটে গিয়া, উপকারকের মঙ্গলপ্রার্থনা করিতে লাগিল ; এবং পুনরায় আসিয়া, প্রাণদানে উদ্যত হইয়া, জীমূতবাহনের প্রাণরক্ষা করিল। বেতাল কহিল, যে ব্যক্তি পরার্থে প্রাণদান করিল, তাহার ভদ্রতা অধিক বলিয়া গণ্য হইল না কেন। রাজা কহিলেন, জীমূতবাহন ক্ষত্রিয়জাতি ; ক্ষত্রিয়েরা প্রাণত্যাগ অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে। অতএব, এই জীবনদান, জীমূতবাহনের পক্ষে, তাদৃশ দুষ্কর নহে।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ষোড়শ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে বণিক বাস করিত। তাহার উন্মাদিনী নামে পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। সে বিবাহযোগ্যা হইলে, তাহার পিতা, তত্রত্য নরপতির নিকটে গিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ ! আমার এক সুরূপা কন্যা আছে ; যদি আপনকার অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন ; নতুবা, অন্য ব্যক্তিকে দিব।

রাজা, দুই তিন বয়োবৃদ্ধ প্রধান রাজপুরুষদিগকে, উন্মাদিনীর লক্ষণপরীক্ষার্থে, প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা, রাজকীয় আদেশ অনুসারে, রত্নদত্তের আলয়ে উপস্থিত হইলেন ;

এবং, উন্মাদিনীকে ইন্দ্রের অপ্সরা অপেক্ষাও অধিকতর রূপবতী ও সর্বপ্রকারে সুলক্ষণা দেখিয়া, পরামর্শ করিলেন, এই কন্যা মহিষী হইলে, রাজা, ইহার নিতান্ত বশতাপন্ন হইয়া, এক বারেই রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিবেন। অতএব উত্তম কল্প এই, রাজার নিকটে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাউক। অনন্তর, তাঁহারা রাজসমীপে পরামর্শানুরূপ সংবাদ দিলে, তিনি, তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, অস্বীকার করিলেন। তখন রত্নদত্ত, সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্রবর্মার সহিত, আপন কন্যার বিবাহ দিল।

এক দিন, রাজা, নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া, সেনাপতির বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে, উন্মাদিনী, মনোহর বেশভূষা করিয়া, অট্টালিকার উপরিদেশে দণ্ডায়মান ছিল। রাজা, উন্মাদিনীকে নয়নগোচর করিয়া, মোহিত ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাকে সহসা প্রত্যাগত ও বিচেতনপ্রায় দেখিয়া, এক প্রিয় পার্শ্বচর জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! কি নিমিত্তে আজ আপনাকে নিতান্ত চলচিত্ত দেখিতেছি। রাজা কহিলেন, অদ্য বলভদ্রের ভবনে একটি স্ত্রীলোক দেখিলাম ; তদীয় লোকাতীত রূপলাবণ্য দর্শনে, আমার মন মোহিত হইয়াছে, ও আমি এইরূপ বিকলচিত্ত হইয়াছি।

পার্শ্বচর কহিল, মহারাজ! যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সে রত্নদত্তের কন্যা ; তাহার নাম উন্মাদিনী। আপনি অস্বীকার করাতে, সেনাপতি বলভদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। রাজা কহিলেন, আমি যাহাদিগকে ঐ কন্যার রূপ ও লক্ষণ দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম, বুঝিলাম, তাহারা প্রতারণা করিয়াছে। অনন্তর, রাজার আহ্বান অনুসারে, রাজপুরুষেরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, দেখ, আজ আমি, নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া, রত্নদত্তের কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জন্মাবচ্ছিন্নে, তাহার ন্যায় সুরূপা সুলক্ষণা নারী আমার নয়নগোচর হয় নাই। তবে তোমরা, কি নিমিত্তে, তৎকালে তাহাকে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া, আমায় তাদৃশ স্ত্রীরত্নলাভে বঞ্চিত করিলে।

রাজপুরুষেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ! যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। কিন্তু তৎকালে আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, এরূপ সুরূপা কন্যা মহিষী হইলে, মহারাজ, রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া, অহোরাত্র অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিবেন। তাহাতে রাজ্যভঙ্গের সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায়, আমরা ঐ কন্যাকে, মহারাজের নিকট, কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদের যে অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। রাজা, তোমরা যাহা কহিলে, তাহা সর্বতোভাবে ন্যায়ানুগত বটে ; ইহা কহিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু আপনি, নিতান্ত বিচেতন হইয়া, দিন যামিনী, কেবল উন্মাদিনীচিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। রাজার এই অবস্থা কর্ণপরম্পরায় নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, সেনাপতি বলভদ্রবর্মা, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! বলভদ্র আপনকার দাস,

উন্মাদিনী দাসী। দাসীর নিমিত্তে ঈদৃশ ক্লেশস্বীকারের আবশ্যকতা কি। মহারাজের আজ্ঞা হইলেই, সে উপস্থিত হইতে পারে।

রাজা শুনিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং কহিলেন, আমার কি ধর্মজ্ঞান নাই যে, পরস্ত্রীস্পর্শ দ্বারা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব। শাস্ত্রকারেরা পরস্ত্রীতে মাতৃদৃষ্টি করিতে কহিয়াছেন। বলভদ্র কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা ইহাও নির্দিষ্ট করিয়াছেন, পত্নীর উপর পরিণেতার সর্বতোমুখী প্রভুতা আছে। তদনুসারে, আমি আপনাকে উন্মাদিনী দান করিতেছি; তাহা হইলে আর মহারাজের পরস্ত্রীস্পর্শদোষের আশঙ্কা থাকিতেছে না। রাজা কহিলেন, যাহাতে সমস্ত সংসারে অপযশ হইবেক, প্রাণান্তেও আমি এরূপ কর্ম করিব না। যশোধনেরা, পঞ্চীকৃতভূতপঞ্চময় ক্ষণবিনশ্বর শরীরের অনুরোধে, অবিনশ্বর যশঃশরীরের অপক্ষয় করেন না।

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ! আমি তাহাকে, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, অন্য স্থানে রাখিব; তাহা হইলে সে সাধারণ স্ত্রী হইবেক; তখন আর অপযশের আশঙ্কা কি। রাজা, শুনিয়া, পূর্ব অপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, কহিলেন, যদি তুমি পতিব্রতা কামিনীকে কুলটা কর, আমি তোমার গুরুতর দণ্ডবিধান করিব, এবং জন্মাবচ্ছিন্নে আর মুখাবলোকন করিব না। তখন বলভদ্র, ভীত ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু উন্মাদিনীচিন্তা, কালস্বরূপিণী হইয়া, দশম দিবসে রাজার প্রাণসংহার করিল।

প্রভুভক্ত বলভদ্র, এবংবিধ ধর্মশীল স্বামীর প্রাণবিনাশসংবাদ শ্রবণে, সাতিশয় শোক ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এতাদৃশ প্রভুর লোকান্তর গমনের পর, আর জীবনধারণের প্রয়োজন কি। বিবেচনা করিলে, আমার নিমিত্তেই স্বামীর এই অকালমৃত্যু হইল। জানি না, জন্মান্তরে, এই পাপে, আমায় কত যাতনা-ভোগ করিতে হইবেক। এক্ষণে, প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আত্মাকে বিশুদ্ধ করি। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া, তিনি প্রেতভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং, চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া, সূর্যদেবের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ভগবন্ ভাস্কর! আমি, কৃতাঞ্জলি হইয়া, একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মে জন্মে এইরূপ ধর্মপরায়ণ প্রভু পাই।

এই বলিয়া, বলভদ্র প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিলে, তাহার পত্নী উন্মাদিনী মনে মনে বিবেচনা করিল, আমার আর জীবনধারণের প্রয়োজন কি; বরং সহগমনপথ অবলম্বন করিলে, পরকালে সদ্গতি পাইব। ধর্মশাস্ত্রপ্রবর্তকেরা কহিয়াছেন, সহগমন স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম। নারী, চিরকাল দুশ্চারিণী হইলেও, সহগমনবলে, স্বামীর সহিত স্বর্গলোকে, অনন্ত কাল, সুখসম্ভোগ করে; এবং, পতি অতি দুরাচার ও পাপাত্মা হইলেও, সহগমনপ্রভাবে, নারী তাঁহারও উদ্ধারকারিণী হয়। এই ভাবিয়া, সহগামিনী হইয়া, উন্মাদিনী প্রাণত্যাগ করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিন জনের মধ্যে, কোন ব্যক্তির ভদ্রতা অধিক। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, রাজার। বেতাল কহিল, কি নিমিত্তে। তিনি কহিলেন, রাজা উন্মাদিনীর নিমিত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, তথাপি, অধর্ম ও অপযশের ভয়ে, পরস্ত্রীস্পর্শে প্রবৃত্ত হইলেন না। আর, স্বামীর নিমিত্ত সেবকের প্রাণত্যাগ করা উচিত কর্ম। স্ত্রীলোকেরও স্বামীর সহগামিনী হওয়া প্রধান ধর্ম। অতএব, রাজার ভদ্রতাই, আমার বিবেচনায়, সর্বাপেক্ষা অধিক।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

সপ্তদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

হেমকূট নগরে, বিষ্ণুশর্মা নামে, পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গুণাকর নামে পুত্র ছিল। ঐ পুত্র, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, দ্যূতক্রীড়ায় সাতিশয় আসক্ত হইল; এবং, ক্রমে ক্রমে, পিতার সর্বস্ব দুরোদরমুখে আহুতি দিয়া, পরিশেষে, অর্থের নিমিত্ত, তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিল। তখন বিষ্ণুশর্মা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

গুণাকর, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে, এক নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল, এবং দেখিল, এক সন্ন্যাসী, শ্মশানে উপবেশন করিয়া, যোগাভ্যাস করিতেছেন। পরে সে, যোগীর নিকটে গিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্বক, সমীপদেশে উপবিষ্ট হইল। যোগী, গুণাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা, তাহাকে ক্ষুধার্ত বোধ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিছু ভোজন করিবে। সে কহিল, মহাশয়! আপনি কৃপা করিয়া প্রসাদ দিলে, অবশ্য ভোজন করিব। তখন তিনি, অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ এক নরকপাল তাহার সম্মুখে রাখিয়া, ভোজন করিতে বলিলেন। সে কহিল, মহাশয়! এ অন্ন, এ ব্যঞ্জন ভোজন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।

তখন যোগী, যোগাসনে আসীন হইয়া, নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিবামাত্র, এক যক্ষকন্যা, অঞ্জলিবদ্ধপূর্বক, তাঁহার সম্মুখবর্তিনী হইয়া, নিবেদন করিল, মহাশয়! দাসী উপস্থিত; কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ, ক্ষুধার্ত হইয়া, আমার আশ্রমে আসিয়াছেন; ইঁহার যথোচিত অতিথিসৎকার কর। যোগী আজ্ঞা করিবামাত্র, যক্ষকন্যার মায়াবলে, নিমিষমধ্যে, পরম রমণীয় সুসজ্জিত হর্ম্য আবির্ভূত হইল। সে ব্রাহ্মণকে, তথায় লইয়া গিয়া, সুরস অন্ন, ব্যঞ্জন, মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইয়া, মণিময় পল্যঙ্কে শয়ন করাইল; পরে, রজনী উপস্থিত হইলে, স্বয়ং মনোহর বেশভূষার সমাধান করিয়া, পল্যঙ্কের এক দেশে উপবেশনপূর্বক, তাহার চরণসেবা করিতে লাগিল। গুণাকরের পরম সুখে রজনীযাপন হইল।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, যক্ষকন্যা ও তৎকৃত যাবতীয় অদ্ভুত ব্যাপারের চিহ্নমাত্র দেখিতে না পাইয়া, গুণাকর, নিরতিশয় দুঃখিত মনে, সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া, নিবেদন করিল, মহাশয়ের প্রসাদে, কল্য রাজভোগে রজনীযাপন করিয়াছি। কিন্তু, নিশাবসানে, সেই কামিনী প্রস্থান করিয়াছে, এবং তৎকৃত সেই সমস্ত হর্ম্যাদিও লয় পাইয়াছে। যোগী কহিলেন, যক্ষকন্যা যোগবিদ্যার প্রভাবে আসিয়াছিল। যে ব্যক্তি যোগবিদ্যায় সিদ্ধ হয়, তাহার নিকটে চিরকাল অবস্থিতি করে। গুণাকর কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, মহাশয়! যদি কৃপা করিয়া উপদেশ দেন, আমিও সেই বিদ্যার সাধনা করি। যোগী, তদীয় বিনয়ের বশীভূত হইয়া, এক মন্ত্রের উপদেশ দিয়া কহিলেন, তুমি চত্বারিংশৎ দিবস, অর্ধরাত্র সময়ে, জলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া, একাগ্র চিত্তে, এই মন্ত্রের জপ কর।

গুণাকর, সন্ন্যাসীর আদেশানুরূপ জপ করিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, মহাশয়! আপনকার আদেশ অনুসারে, যথানিয়মে, চল্লিশ দিন জপ করিয়াছি; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়। যোগী কহিলেন, আর চল্লিশ দিন, জ্বলন্ত অনলে প্রবেশপূর্বক, জপ কর, তাহা হইলেই তুমি কৃতকার্য হইবে। তখন সে কহিল, মহাশয়! বহু দিবস হইল, গৃহপরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। পিতা মাতা প্রভৃতিকে দেখিবার নির্মিত্ত, চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। অতএব, অগ্রে একবার পিতামাতার চরণদর্শন করিয়া আসি; পশ্চাৎ, আপনকার আদেশানুরূপ মন্ত্রসাধন করিব। এই বলিয়া, সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় লইয়া, গুণাকর আপন আলয়ে প্রস্থান করিল।

গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহার পিতা মাতা, বহুকালের পর পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া, অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে; আমরা তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায় হইয়া আছি। গুণাকর কহিল, হে তাত! হে মাতঃ! আমি, যদৃচ্ছাক্রমে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে, সৌভাগ্যক্রমে, এক পরম দয়ালু সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছি, এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে, তদীয় উপদেশ অনুসারে, মন্ত্রসাধন করিতেছি। তোমাদিগকে বহু কাল না দেখিয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও চলচিত্ত হইয়াছিলাম; তাহাতেই এক বার, কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, দর্শন করিতে আসিয়াছি। সম্প্রতি, জন্মের মত বিদায় লইয়া, যোগসাধনার্থে প্রস্থান করিব।

গুণাকর এই বলিয়া প্রস্থানের উদ্যম করিলে, তাহার জননী, বাষ্পাকুল লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এ তোমার যোগাভ্যাসের সময় নয়। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, গৃহস্থধর্ম প্রতিপালন কর; তাহা হইলেই, তুমি যোগাভ্যাসের সম্পূর্ণ ফল পাইবে। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের মূল, এবং সকল আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ, পরম গুরু পিতামাতার শুশ্রূষা করাই পুত্রের প্রধান ধর্ম। অতএব, যাবৎ আমরা জীবিত আছি, তাবৎ তোমার তীর্থযাত্রা বা যোগাভ্যাসের প্রয়োজন নাই। আমাদের শুশ্রূষা কর, তাহাতেই তোমার পরম ধর্মলাভ হইবেক।

আর বিবেচনা কর, তুমি আমার একমাত্র পুত্র ; মা বলিয়া সম্ভাষণ করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। অন্ধের যষ্টির ন্যায়, তুমি আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন আছ। আমরা, তোমায় বিদায় দিয়া, কোনও ক্রমে, প্রাণধারণ করিতে পারিব না। যদি নিতান্তই যোগাভ্যাসের বাসনা হইয়া থাকে, অন্ততঃ, আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা কর ; পরে ইচ্ছানুরূপ ধর্মোপার্জন করিবে।

গুণাকর শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল ; এবং কহিল, এই মায়াময় সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে লিপ্ত থাকিলে, কেবল জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হয়। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থমাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই নহে। কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা, কে কাহার পুত্র। সকলই ভ্রান্তিমূলক। অতএব, আর আমি বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইব না ; এবং, শ্রেয়ঃসাধন বোধ করিয়া, যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহা ছাড়িতে পারিব না। এই বলিয়া, পিতামাতার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিল ; এবং, সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, অগ্নিপ্রবেশপূর্বক, মন্ত্রসাধনে যত্ন করিতে লাগিল ; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল না।

ইহা কহিয়া, বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ ! কি কারণে, ব্রাহ্মণ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিল না, বল। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, একাগ্রচিত্ত না হইলে, মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণের মনে একান্ত নিষ্ঠা ছিল না ; সেই বৈগুণ্যবশতঃ, তাহার সাধনা বিফল হইল। ইহা শুনিয়া বেতাল কহিল, যে সাধক, মন্ত্র সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে, এতাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিলেক, সে একাগ্রচিত্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, সে, একাগ্রচিত্ত হইলে, পিতামাতার নিমিত্ত চলচিত্ত হইত না ; এবং, মধ্যে যোগে ভঙ্গ দিয়া, তাঁহাদের দর্শনে যাইত না। ফলতঃ, সকলই অদৃষ্টমূলক ; নতুবা, যোগাভ্যাস দ্বারা, সর্বাংশে নির্মম ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও, কি নিমিত্তে সিদ্ধপ্রায় সাধনফলে বঞ্চিত হইল, বল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

অষ্টাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ !

কুবলয়পুরে, ধনপতি নামে, এক সঙ্গতিপন্ন বণিক ছিলেন। তিনি, ধনবতীনাম্নী নিজ কন্যার, গৌরীকালে, গৌরীদত্ত নামক ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ দিলেন। কিয়ৎ কাল পরে, ধনবতীর এক কন্যা জন্মিল। গৌরীদত্ত কন্যার নাম মোহিনী রাখিলেন। কালক্রমে, তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তদীয় জ্ঞাতিবর্গ, ধনবতীকে অসহায়িনী দেখিয়া, তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিল। সে, নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া, কন্যা লইয়া, এক তমিস্রা রজনীতে, পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া, পথ ভুলিয়া, উহারা এক শ্মশানে উপস্থিত হইল। তথায় এক চোর, রাজদণ্ড অনুসারে, তিন দিন, শূলে আরোহিত ছিল; বিধিবিপাকে, সে পর্যন্ত, তাহার প্রাণপ্রয়াণ হয় নাই। দৈবযোগে, ধনবতীর দক্ষিণ কর চোরের চরণে লগ্ন হইলে, সে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কহিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে, এমন দুঃখের সময়ে, আমায় মর্মান্তিক যাতনা দিলে। ধনবতী কহিল, জ্ঞানপূর্বক তোমাকে যাতনা দি নাই। যাহা হউক, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। অনন্তর, আত্মপরিচয় দিয়া, সে চোরকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, কি নিমিত্তে শ্মশানে আছ, ও কিরূপ দুঃখভোগ করিতেছ, বল।

চোর কহিল, আমি বণিগ্‌জাতি, চৌর্যাপরাধে শূলে আরোহিত হইয়াছি; অদ্য তৃতীয় দিবস, তথাপি প্রাণ নির্গত হইতেছে না; তাহাতেই যার পর নাই যাতনাভোগ করিতেছি। জন্মকালে, জ্যোতির্বিদেরা, গণনা দ্বারা, স্থির করিয়াছিলেন, অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হইবেক না। যাবৎ বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ আমায়, এই অবস্থায়, দুঃসহ যাতনাভোগ করিতে হইবেক। যদি তুমি কৃপা করিয়া কন্যাদান কর, তবেই আমি এ অসহ্য যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাই। আমার চিরসঞ্চিত সুবর্ণরাশি আছে; যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, সমস্ত তোমায় দি।

ধনবতী, অর্থলোভে বিমূঢ় হইয়া, মনে মনে, মলিম্লুচের প্রার্থনায় সম্মতপ্রায় হইল; এবং কহিল, তুমি যে প্রস্তাব করিলে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু, আমার দৌহিত্রমুখদর্শনের ঐকান্তিক অভিলাষ আছে; তোমায় কন্যাদান করিলে, আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় না। এ কথা শুনিয়া, চোর কহিল, তুমি এখন, কন্যাদান করিয়া, আমায় যাতনা হইতে মুক্ত কর। আমি অনুমতি দিতেছি, তোমার কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে, কোনও ব্রাহ্মণতনয়কে ধনদান দ্বারা সম্মত করিয়া, তাহা দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করিয়া লইবে; তাহা হইলে, তোমারও বাসনা পূর্ণ হইল; আমিও দুঃসহ যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।

ধনবতী কন্যাসম্প্রদান করিল। তখন চোর কহিল, ঐ পুরোবর্তী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আমার গৃহ। গৃহের পূর্ব ভাগে, কূপের নিকট, এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে; তাহার মূলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিহিত আছে; যাইয়া গ্রহণ কর। ইহা কহিবামাত্র, চোরের প্রাণবিয়োগ হইল; ধনবতীও, চৌরনির্দিষ্ট ন্যগ্রোধবৃক্ষের মূলখননপূর্বক, সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করিয়া, পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। পরে সে, পিতাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া, তাঁহার হস্তে সম্পত্তিসমর্পণপূর্বক, তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কালক্রমে, মোহিনী যৌবনবতী হইল। সে, এক দিন, স্বীয় সহচরীর সহিত, গবাক্ষ দিয়া রথ্যানিরীক্ষণ করিতেছে; এমন সময়ে, দৈবযোগে, এক পরমসুন্দর বিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণতনয় তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে নয়নগোচর করিয়া, মোহিনীর মন

মোহিত হইল। তখন, সে আপন সহচরীকে কহিল, তুমি এই ব্রাহ্মণকুমারকে আমার মার নিকটে লইয়া যাও। সখী ব্রাহ্মণতনয়কে তাহার জননীর নিকট উপস্থিত করিলে, সে চৌরবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, তাহাকে প্রার্থনারূপ অর্থ দিয়া, মোহিনীর পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্ত করিল।

মোহিনী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইল। সুতিকাষষ্ঠীর রজনীতে, সে স্বপ্নে দেখিল, দুই হস্ত, পঞ্চ মস্তক, প্রতি মস্তকে তিন তিন চক্ষুঃ ও এক এক অর্ধচন্দ্র, অতি দীর্ঘ জটাভার পৃষ্ঠদেশে লম্বমান, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে নরকপাল, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান, ভুজঙ্গের মেখলা, উজ্জ্বল রজতগিরির ন্যায় কলেবর, অতিশুভ্র নাগযজ্ঞোপবীত, সর্বাঙ্গ ভস্মভূষিত; এবংবিধ আকার ও বেশ বিশিষ্ট বৃষভারূঢ় এক পুরুষ, তাহার সম্মুখে আসিয়া, কহিতেছেন, বৎসে মোহিনী! তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এজন্য আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এই বালক ক্ষণজন্মা। তুমি, আমার আজ্ঞা অনুসারে, ঐ শিশুকে, সহস্র সুবর্ণ সহিত, পেটকের মধ্যগত করিয়া, কল্য অর্ধরাত্র সময়ে, রাজদ্বারে রাখিয়া আসিবে। রাজা তাহার, পুত্রনির্বিশেষে, প্রতিপালন করিবেন। রাজার স্বর্গারোহণের পর, তোমার পুত্র, তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, ক্রমে ক্রমে, নিজ প্রতাপে ও নীতিবিদ্যাপ্রভাবে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক।

মোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত স্বীয় জননীর গোচর করিল। ধনবতী শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইল; এবং, পর দিন নিশীথসময়ে, ঐ শিশুকে, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সহিত, পেটকের মধ্যে স্থাপিত করিয়া, রাজদ্বারে রাখিয়া আসিল। সেই সময়ে, রাজাও স্বপ্নে দেখিতেছেন, পূর্বোক্তপ্রকার পুরুষ, তাঁহার সম্মুখবর্তী হইয়া, কহিতেছেন, মহারাজ! গাত্রোত্থান কর; এক পেটকমধ্যশায়ী চক্রবর্তিলক্ষণাক্রান্ত সন্তান তোমার দ্বারদেশে উপনীত। অবিলম্বে উহারে আনিয়া, পুত্রনির্বিশেষে, প্রতিপালন কর। উত্তর কালে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবেক।

রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি, রাজমহিষীকে জাগরিত করিয়া, স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনাইলেন। অনন্তর, উভয়ে, দ্বারদেশে গিয়া পেটক পতিত দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পেটকের মুখ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন, বালকের রূপে পেটক আলোকপূর্ণ হইয়া আছে। রাজ্ঞী, সেই শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, অগ্রগামিনী হইলেন; রাজা, স্বর্ণমুদ্রাগ্রহণপূর্বক, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রভাত হইবামাত্র, রাজা, সামুদ্রিকবেত্তা পণ্ডিতগণকে আনাইয়া, দেবপ্রসাদলব্ধ বালকের লক্ষণপরীক্ষার্থে, আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। তাঁহারা সেই শিশুকে দৃষ্টিগোচর করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপাততঃ তিন স্পষ্ট সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; দীর্ঘ আকার, উন্নত ললাট, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল। অনন্তর, তাঁহারা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন; সামুদ্রিক শাস্ত্রে পুরুষের দ্বাত্রিংশৎ শুভ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে; মহারাজ!

সেই সমুদয় এই একাধারে লক্ষিত হইতেছে। এই বালক সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হইবেন, সন্দেহ নাই।

রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং, পারিতোষিকপ্রদানপূর্বক, ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিয়া, দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করিলেন। ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন দিয়া, তিনি বালকের নাম হরদত্ত রাখিলেন। বালক, অল্পকালমধ্যে, চতুর্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন; এবং, রাজার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে, সমস্ত ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন।

কিয়ৎ কাল পরে, হরদত্ত, তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া, প্রথমতঃ, পিতৃকৃত্যসম্পাদনার্থে, গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। ফল্গুতীরে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া, রাজা পিতৃপিণ্ড-প্রদানে উদ্যত হইলে, নদীর মধ্য হইতে, পিণ্ডগ্রহণার্থে, তিন জনের তিন দক্ষিণ হস্ত যুগপৎ নির্গত হইল; প্রথম ক্ষেত্রিক চোরের, দ্বিতীয় বীজী ব্রাহ্মণের, তৃতীয় প্রতি-পালক রাজার।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি, শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, হরদত্ত-দত্ত পিণ্ডের অধিকারী হইতে পারে। রাজা বলিলেন, চোর। বেতাল কহিল, অন্যেরা কি অপরাধ করিয়াছে। রাজা বলিলেন, ব্রাহ্মণ, অর্থ লইয়া বীজবিক্রয় করিয়াছেন; রাজাও, সহস্র সুবর্ণ লইয়া, প্রতিপালন করিয়াছেন; এজন্য তাঁহারা পিণ্ডগ্রহণে অধিকারী হইতে পারেন না।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ঊনবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে রাজা ছিলেন। তিনি, এক দিন, একাকী, অশ্বে আরোহণ করিয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। মৃগের অন্বেষণে, বনে বনে অনেক ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে, তিনি এক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল। তিনি তাহার তীরে গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে; মধুকরেরা, মধুপানে মত্ত হইয়া, গুনগুন রবে গান করিতেছে; হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গগণ তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে; চারিদিকে, কিসলয়ে ও কুসুমে সুশোভিত নানাবিধ পাদপসমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্যবিস্তার করিতেছে; সর্বতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে। রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন; বৃক্ষমূলে অশ্ববন্ধন করিয়া, তথায় উপবেশনপূর্বক, শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, এক ঋষিকন্যা আসিয়া স্নানার্থে সরোবরে অবগাহন করিল। রাজা, দর্শনমাত্র, অতিমাত্র মোহিত ও জ্ঞানরহিত হইলেন। স্নানক্রিয়ার সমাপন করিয়া, ঋষিতনয়া আশ্রমাভিমুখী হইলে, রাজা তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া কহিলেন, ঋষিকন্যে! তোমার এ কেমন ধর্ম। আমি, আতপে তাপিত হইয়া, বিশ্রামার্থে তোমার আশ্রমে অতিথি হইলাম, তুমি এমনই আতিথেয়ী, যে সম্ভাষণ দ্বারাও, আমার সংবর্ধনা করিলে না। ঋষিতনয়া শুনিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

এই অবসরে, ঋষিও, বনান্তর হইতে ফল, পুষ্প, কুশ, সমিধ প্রভৃতির আহরণ করিয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজা, দর্শনমাত্র, আত্মপরিচয়প্রদানপূর্বক, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে, ঋষি অভীষ্টসিদ্ধির্ভবতু বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রাজা, আশীর্বাদশ্রবণে, মনে মনে হৃষ্ট অভিসন্ধি করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিবেদন করিলেন, মহাশয়! আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি, ঋষিবাক্য কস্মিন্ কালেও ব্যর্থ হয় না। আপনি আশীর্বাদ করিলেন আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক, কিন্তু, আমি তাহার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। ঋষি কহিলেন, আমি বলিতেছি, অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবেক। তখন রাজা অম্লান বদনে বলিলেন, আমি এই কন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ করিয়াছি।

ঋষি, রাজার দুরভিপ্রায়শ্রবণে, মনে মনে নিরতিশয় কুপিত হইয়াও, স্বীয় আশীর্বাদ-বাক্যের বৈয়র্থ্যপরিহারের নিমিত্ত, রাজাকে কন্যাসম্প্রদান করিলেন। রাজা, নব প্রণয়িনীকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া, রাজধানী অভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে রজনী উপস্থিত হইল। রাজা ও রাজপ্রেয়সী, যথাসম্ভব ফলমূল আদি দ্বারা, কথঞ্চিৎ ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া, তরুতলে শয়ন করিলেন।

অর্ধরাত্র সময়ে, এক দুর্দান্ত রাক্ষস আসিয়া, রাজাকে জাগরিত করিয়া, কহিল, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া আসিয়াছি, তোমার ভার্যাকে ভক্ষণ করিব। রাজা কহিলেন, তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রেয়সীর প্রাণহিংসায় বিরত হও। অন্য যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। তখন রাক্ষস কহিল, যদি তুমি, প্রশস্ত মনে, স্বহস্তে দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মস্তকচ্ছেদন করিয়া, আমার হস্তে দিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রিয়তমার প্রাণবধে ক্ষান্ত হই। রাজা, প্রিয়তমার প্রাণরক্ষার্থে, ব্রহ্মহত্যাতেও সম্মত হইলেন; এবং কহিলেন, তুমি সপ্তম দিবসে, আমার রাজধানীতে যাইবে; সেইদিন, আমি তোমার অভিলষিত সম্পন্ন করিব।

এইরূপে রাজাকে ব্রহ্মবধপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া, রাক্ষস প্রস্থান করিল। রাজাও, প্রভাত হইবামাত্র, প্রেয়সী সমভিব্যাহারে, রাজধানীতে গিয়া, প্রধানমন্ত্রীর সমক্ষে রাক্ষসবৃত্তান্তের বর্ণন করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! আপনি, ও জন্যে উৎকণ্ঠিত হইবেন না; আমি অনায়াসে উহা সম্পন্ন করিয়া দিব। রাজা, মন্ত্রিবাক্যে নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, নবপ্রণয়িনীর সহিত, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী, এক পুরুষপ্রমাণ কাঞ্চনময়ী প্রতিমা নির্মিত করাইয়া, মহামূল্য অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া, নগরের চতুষ্পথে স্থাপিত করিলেন, এবং প্রচার করিয়া দিলেন, যে ব্রাহ্মণ, বলিদানার্থে, স্বীয় দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র দিবেন, তিনি এই প্রতিমা পাইবেন। এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ছিল। তিনি, ঘোষণার বিষয় অবগত হইয়া, ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, দেখ, নির্ধন ব্যক্তির সংসারাশ্রমে বাস করা বিড়ম্বনামাত্র। ধনই সকল ধর্মের ও সকল সুখের মূল। আমি জন্মদরিদ্র ; এ পর্যন্ত, সাংসারিক কোনও সুখের মুখ দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে, ধনাগমের এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। যদি তুমি মত কর, পুত্র দিয়া স্বর্ণময়ী প্রতিমা লইয়া আসি ; তাহা হইলে, যত দিন বাঁচিব, পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিব।

ব্রাহ্মণী সম্মতা হইলেন। ব্রাহ্মণ, পুত্র দিয়া, প্রতিমা লইয়া, তদ্বিক্রয় দ্বারা ধনসংগ্রহ করিলেন। সপ্তম দিনে, প্রত্যূষ সময়ে, রাক্ষস রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র, মন্ত্রী, দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমার ও তীক্ষ্ণধার খড়্গ আনিয়া, রাজার সম্মুখে রাখিলেন। অনন্তর, রাজা শিরশ্ছেদনার্থে খড়্গ উত্তোলিত করিলে, ব্রাহ্মণকুমার, অবনত বদনে, ঈষৎ হাস্য করিল। রাজা, অম্লান বদনে, তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তদীয় ছিন্ন মস্তক রাক্ষসের হস্তে অর্পিত হইল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! মৃত্যুসময়ে সকলে রোদন করিয়া থাকে ; বালক হাস্য করিল কেন, বল। রাজা কহিলেন, বাল্যকালে পিতামাতা প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন ; তৎপরে, কোনও বিপদ ঘটিলে, রাজা রক্ষা করিয়া থাকেন ; কিন্তু, আমার ভাগ্যদোষে, সকলই বিপরীত হইল। পিতা মাতা অর্থলোভে বিক্রয় করিলেন ; প্রাণভয়ে যে রাজার শরণাগত হইব, তিনিই স্বয়ং মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত। মনে মনে এই আলোচনা করিয়া, সে হাস্য করিয়াছিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

বিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

বিশালপুর নগরে, অর্থদত্ত নামে, ধনাঢ্য বণিক ছিলেন। তিনি, কমলপুরবাসী মদনদাস বণিকের সহিত, আপন কন্যা অনঙ্গমঞ্জরীর বিবাহ দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে, মদনদাস, ভার্যাকে তদীয় পিত্রালয়ে রাখিয়া, বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে প্রস্থান করিল।

এক দিন, অনঙ্গমঞ্জরী, গবাক্ষ দ্বারা, রাজপথনিরীক্ষণ করিতেছে ; এমন সময়ে, কমলাকর নামে, সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার তথায় উপস্থিত হইল। উভয়ের নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হইলে, পরস্পর পরস্পরের রূপলাবণ্যদর্শনে মোহিত হইল। ব্রাহ্মণকুমার,

নিকাম ব্যাকুল হইয়া, গৃহগমনপূর্বক, প্রিয় বয়স্যের নিকট স্বীয় বিরহবেদনার নির্দেশ করিয়া, বিচেতন ও শয্যাগত হইল। তাহার সখা, উশীরানুলেপন, চন্দনবারিসেচন, সরসকমলদলশয্যা, জলার্দ্রতালবৃন্তসঞ্চালন প্রভৃতি দ্বারা, শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এ দিকে, অনঙ্গমঞ্জরীও, অনঙ্গশরপ্রহারে জর্জরিতাঙ্গী হইয়া, ধরাশয্যা অবলম্বন করিলে, তাহার সখী, সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা, সমস্ত অবগত হইয়া, প্রবোধদানচ্ছলে, অনেক ভর্ৎসনা করিল। তখন সে কহিল, সখি! আমি নিতান্ত অবোধ নহি; কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না। নির্দয় কন্দর্পের নিরন্তর শরপ্রহারে আমি জর্জরিত হইয়াছি। আর যাতনা সহ্য হয় না। যদি সেই চিত্তচোরকে ধরিয়া দিতে পার, তবেই প্রাণধারণ করিব; নতুবা, নিঃসন্দেহ, আত্মঘাতিনী হইব।

ইহা কহিয়া, অনঙ্গমঞ্জরী, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, অবিশ্রান্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার সহচরী, কালবিলম্ব অনুচিত বিবেচনা করিয়া, কমলাকরের আলয়ে গমনপূর্বক, তাহাকেও স্বীয় সহচরীর তুল্যাবস্থ দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, দুরাত্মা কন্দর্পের কিছুই অসাধ্য নাই; কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলকেই, সমান রূপে, স্বীয় কুসুমময় শরাসনের বশবর্তী করিয়া রাখিয়াছে। অনন্তর, সে কমলাকরের নিকটে বলিল, অর্থদত্ত শেঠের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরী প্রার্থনা করিতেছে, তুমি তাহারে প্রাণদান কর। কমলাকর, শ্রবণমাত্র অতি মাত্র উল্লাসিত হইয়া, গাত্রোত্থান করিল, এবং কহিল, আপাততঃ তুমি, এই অমৃতবর্ষী মনোহর বাক্য দ্বারা, আমায় প্রাণদান করিলে।

তৎপরে সহচরী, কমলাকরকে সমভিব্যাহারে লইয়া, অনঙ্গমঞ্জরীর বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অমনি কমলাকর, হা প্রেয়সি! বলিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, ভূতলে পতিত ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনঙ্গমঞ্জরীর গৃহজন, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, উভয়কে শ্মশানে লইয়া, একচিতায় অগ্নিদান করিল। দৈবযোগে, অর্থদত্তের জামাতা মদনদাসও, সেই সময়ে, শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল; এবং, নিজ ভার্যা অনঙ্গমঞ্জরীর মৃত্যুবৃত্তান্ত শুনিয়া, হাহাকার করিতে করিতে, ঊর্ধ্বশ্বাসে শ্মশানে গিয়া, জ্বলন্ত চিতায় ঝম্পপ্রদানপূর্বক, প্রাণত্যাগ করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই তিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক ইন্দ্রিয়দাস। রাজা কহিলেন, মদনদাস। বেতাল কহিল, কেন। রাজা কহিলেন, অনঙ্গমঞ্জরী, পরপুরুষে অনুরাগিণী হইয়া, তাহার বিরহে প্রাণত্যাগ করিল; তাহাতে মদনদাসের অন্তঃকরণে অণুমাত্র বিরাগ জন্মিল না; প্রত্যুত, তদীয় মৃত্যুশ্রবণে প্রাণধারণে অসমর্থ হইয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিল।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

একবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

জয়স্থল নগরে, বিষ্ণুস্বামী নামে, ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ দ্যূতাসক্ত; মধ্যম লম্পট; তৃতীয় নির্লজ্জ; চতুর্থ নাস্তিক। ব্রাহ্মণ, পুত্রগণের গর্হিত ব্যবহার ও কদাচার দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, এক দিন, চারি জনকে একত্র করিয়া এইরূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন;—যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয়, কমলা, ভ্রান্তিক্রমেও, তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, নাসাকর্ণ-চ্ছেদনপূর্বক, গর্দভে আরোহণ করাইয়া, দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেক। দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি হিতাহিতবিবেচনারহিত ও ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য হয়। ধর্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির, দ্যূতাসক্ত হইয়া, সাম্রাজ্য ও ভার্যা পর্যন্ত হারাইয়া, পরিশেষে, দুঃসহ বনবাসক্লেশে কালযাপন করিয়াছিলেন। আর, যে ব্যক্তি লম্পট হয়, সে সুখভ্রমে দুঃখার্ণবে প্রবেশ করে। লম্পটেরা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উদ্দেশে সর্বস্বান্ত করিয়া, অবশেষে, চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। লম্পট ব্যক্তির আচার, বিচার, নিয়ম, ধর্ম, সমস্তই নষ্ট হয়। আর, যে ব্যক্তি নির্লজ্জ, তাহাকে ভর্ৎসনা করা বা উপদেশ দেওয়া বৃথা। তাহার লোকনিন্দার ভয় থাকে না, এবং, গর্হিত কর্ম করিয়াও, লজ্জাবোধ হয় না। এবংবিধ ব্যক্তির যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, ততই পৃথিবীর মঙ্গল। আর, যে ব্যক্তি পরকালের ভয় না করে, দেবতা ও গুরুজনে ভক্তিমান্ ও শ্রদ্ধাবান্ না হয়, এবং সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে আস্থাশূন্য হয়, সে অতি পাষণ্ড; তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেও, অধর্মগ্রস্ত হইতে হয়। লোকে, পুত্রের মঙ্গলপ্রার্থনায়, জপ, তপ, দান, ধ্যান, ব্রত, উপবাস আদি করে; কিন্তু আমি, কায়মনোবাক্যে, নিয়ত, তোমাদের মৃত্যু-প্রার্থনা করিয়া থাকি।

পিতার এইপ্রকার তিরস্কারবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, চারি জনেরই অন্তঃকরণে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তখন তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসে ঔদাস্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে; এক্ষণে, বিদেশে গিয়া, প্রাণপণে যত্ন করিয়া, বিদ্যাভ্যাস করা উচিত। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, চারি জনে, নানাদেশে ভ্রমণপূর্বক, অল্পকালমধ্যে, নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইল। গৃহপ্রতিগমন-কালে, তাহারা পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, এক চর্মকার, মৃত ব্যাঘ্রের মাংস ও চর্ম লইয়া, প্রস্থান করিল; কেবল অস্থি সকল স্থানে স্থানে পতিত রহিল।

তাহাদের মধ্যে, একজন অস্থিসঙ্ঘটনী বিদ্যা শিখিয়াছিল; সে, বিদ্যাপ্রভাবে, সমস্ত অস্থি একস্থানস্থ করিয়া, ব্যাঘ্রের কঙ্কালসঙ্কলন করিল। দ্বিতীয়, মাংসসঞ্জননী বিদ্যা দ্বারা, ঐ কঙ্কালে মাংস জন্মাইয়া দিল। তৃতীয় চর্মযোজনী বিদ্যা শিখিয়াছিল; সে, তৎপ্রভাবে, শার্দূলের সর্বশরীর চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। অনন্তর, চতুর্থ,

মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা, প্রাণদান করিলে, ব্যাঘ্র, তৎক্ষণাৎ, তাহাদের চারি সহোদরেরেই প্রাণসংহার করিল।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই চারি জনের মধ্যে, কোন ব্যক্তি অধিক নির্বোধ। রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি প্রাণদান করিল, সেই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্বোধ।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক দিন, তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে, বার্ধক্যবশতঃ, আমার শরীর দুর্বল ও ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে; কিন্তু ভোগাভিলাষ পূর্ব অপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে। আমি পরকলেবর-প্রবেশনী বিদ্যা জানি। অতএব, ভোগাক্ষম, জরাজীর্ণ, শীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, কোন যুবার কলেবরে প্রবিষ্ট হই; তাহা হইলে, আর কিছুকাল, অভিলাষানুরূপ বিষয়সুখসম্ভোগ করিতে পারিব। কিন্তু সহসা, কলেবরত্যাগ করিয়া, অন্য কলেবরে প্রবেশ করিলে, আমার এ অভিপ্রায় প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। অতএব, অগ্রে, যোগাভ্যাসচ্ছলে, পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া, বনপ্রবেশ করি; পরে, সুযোগক্রমে, স্বীয় অভিপ্রায় সম্পন্ন করিব। নারায়ণ, এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া, পত্নী, পুত্র, পৌত্র, দুহিতৃ, দৌহিত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ একত্র করিয়া, তাহাদের সম্মুখে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমি, সংসারাশ্রমে আবদ্ধ থাকিয়া, বিষয়বাসনায় আসক্ত হইয়া, জীবনকাল অতিবাহিত করিলাম; এক দিন, এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, পরকালের হিতচিন্তা করি নাই। এক্ষণে আমার শেষ দশা উপস্থিত। এজন্য, অভিলাষ করিয়াছি, অরণ্যপ্রবেশপূর্বক যোগাভ্যাস দ্বারা তনুত্যাগ করিব; আর আমার, এক ক্ষণের জন্যেও, মায়াময় অকিঞ্চিৎকর সংসারে লিপ্ত থাকিতে বাসনা নাই। এক্ষণে তোমরা, ঐকমত্য অবলম্বনপূর্বক, অনুমতি কর; নির্মম ও নিঃসঙ্গ হইয়া, মোক্ষপথের পথিক হই।

নারায়ণ, এইরূপ কপটবাক্যপ্রয়োগপূর্বক, পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া, বনপ্রস্থান করিলেন; এবং তথায়, জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, এক যুবকলেবরে প্রবেশপূর্বক বিষয়াভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ! ব্রাহ্মণ, পূর্বকলেবর পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব ক্ষণে, রোদন করিয়া, পরকলেবরপ্রবেশকালে, বিকশিত আস্যে হাস্য করিয়াছিলেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি, ইঁহার রোদন ও হাস্যের কারণ কি। বিক্রমাদিত্য কহিলেন, শুন বেতাল! পূর্ব কলেবর পরিত্যাগ করিলেই, বহু কালের, বহু যত্নের পরিবারের সহিত আর কোনও সম্বন্ধ থাকিল না; এই মমতায়

মুগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণ রোদন করিয়াছিলেন ; আর, পরকলেবরে প্রবেশ দ্বারা, অভিলষিত ভোগপথ অকণ্টক হইল, এজন্য, আহ্লাদিত হইয়া, হাস্য করিয়াছিলেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে একজন ভোজন-বিলাসী; অর্থাৎ, অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত, তাহা দুর্জ্ঞেয় হইলেও, ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না ; দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী ; অর্থাৎ, শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ফলতঃ, এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তদীয় ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে, সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন, এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলাসী।

অনন্তর, তাহারা স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর পরীক্ষার্থে, পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাচক, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, সাতিশয় যত্ন সহকারে, চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, ভূপতিসমীপে সংবাদ দিল। রাজা ভোজন-বিলাসীকে আহার করিবার আদেশ করিলে, সে আহারস্থানে উপস্থিত হইল ; এবং, আসনে উপবেশনমাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া, নৃপতিসমীপে প্রতিগমন করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিয়াছ। সে কহিল, না মহারাজ! আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, কেন। সে কহিল, মহারাজ! অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে ; বোধ করি, শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়াছিল। রাজা শুনিয়া, তদীয় বাক্য উন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন ; এবং এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া, ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া, সেই তণ্ডুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ভাণ্ডারী, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতিগোচরে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! অমুক গ্রামের শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যে ঐ তণ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা শুনিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং ভোজনবিলাসীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ ভোজনবিলাসী।

অনন্তর, রাজা, এক সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সে, কিয়ৎ ক্ষণ শয়ন করিয়া, নৃপতিসমীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ! ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে ; তাহা আমার সাতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল ; এজন্য

শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন; এবং, শয়নাগারে প্রবেশপূর্বক, অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, শয্যার সপ্তমতলে যথার্থই এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত রহিয়াছে। তখন, তিনি, যৎপরোনাস্তি সন্তোষপ্রদর্শনপূর্বক, বারংবার তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী। অনন্তর, তাহাদের দুই সহোদরকে, যথোচিত পারিতোষিকপ্রদানপূর্বক, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! উভয়ের মধ্যে, কোন জন অধিক প্রশংসনীয়। রাজা কহিলেন, আমার মতে শয্যাবিলাসী।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

চতুর্বিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ!

কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্মা নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি, অনেক কাল, অনেক দেবতার আরাধনা করিয়া, একমাত্র পুত্র প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুত্র, অল্পকালমধ্যে, সর্ব শাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী হইল; এবং, অনন্যকর্মা ও অনন্যধর্মা হইয়া, নিরন্তর পিতামাতার সেবা করিতে লাগিল। পিতামাতার ভাগ্যদোষে, ঐ পুত্র অষ্টাদশ বয়ঃক্রমকালে, কালগ্রাসে পতিত হইল। তাহার পিতামাতা, প্রথমতঃ, যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন; পরিশেষে, পুত্রের মৃতদেহ, অগ্নিসংস্কারার্থে, গ্রামের উপান্তবর্তী শ্মশানে লইয়া গিয়া, চিতারচনা করিতে লাগিলেন।

এক বৃদ্ধ যোগী, বহুকাল অবধি, ঐ শ্মশানে যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি, অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মৃত কলেবর পতিত দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমার এই প্রাচীন দেহ, জরায় জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া, কার্যাক্ষম হইয়াছে; অতএব, এই যুবদেহে প্রবেশ করি; তাহা হইলে, বহুকাল যোগাভ্যাস করিতে পারিব। এই বলিয়া, জগদীশ্বরের নামস্মরণপূর্বক, যোগী সেই যুবকলেবরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণকুমার তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞশর্মা, পুত্রকে প্রত্যাগতজীবিত দেখিয়া, প্রথমতঃ, প্রফুল্ল বদনে, হাস্য করিলেন; কিন্তু, এক নিমেষ পরেই, বিষণ্ণ বদনে রোদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসিল, মহারাজ! ব্রাহ্মণ, পুত্রকে পুনর্জীবিত দেখিয়া, হৃষ্ট মনে হাস্য করিয়া, কি কারণে, পর ক্ষণে, রোদন করিলেন, বল। রাজা কহিলেন, ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ, পুত্রকে পুনর্জীবিত বোধ করিয়া, আহ্লাদে হাস্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পরকলেবরপ্রবেশনী বিদ্যা জানিতেন; ঐ বিদ্যার প্রভাবে, পর ক্ষণেই জানিতে পারিলেন, পুত্র পুনর্জীবিত হয় নাই; যোগীর প্রবেশ দ্বারা এরূপ ঘটিয়াছে; এজন্য, রোদন করিলেন।

ইহা শুনিয়া বেতাল ইত্যাদি।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ।

দাক্ষিণাত্য দেশে ধর্মপুর নামে নগর আছে। তথায়, মহাবল নামে, মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন। এক প্রবল প্রতিপক্ষ রাজা, চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া, তদীয় রাজধানীর অবরোধ করিলে, রাজা মহাবল, স্বীয় সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে, সমরসাগরে অবগাহন করিয়া, অশেষপ্রকার প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু, দৈবদুর্বিপাকবশতঃ, ক্রমে ক্রমে, স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, প্রাণরক্ষার্থে, মহিষী ও তনয়া সমভিব্যাহারে, অরণ্যপ্রস্থান করিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া, তিন জনেই অতিশয় ক্ষুধার্ত হইলেন। তখন রাজা, মহিষী ও তনয়াকে তরুতলে অবস্থিতি করিতে বলিয়া, আহারোপযোগী দ্রব্যের আহরণার্থে গমন করিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। রাজা প্রত্যাগত হইলেন না। রাজমহিষী ও রাজকুমারী, রাজার অনাগমনে, নানা অনিষ্টের আশঙ্কা কবিযা, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া,অশেষবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ দিনে, কুণ্ডিনের অধিপতি রাজা চন্দ্রসেন, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, ঐ অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা, তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অসম্ভাবনীয় নরচরণচিহ্ন দেখিয়া, বিস্ময়ান্বিত চিত্তে, নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, পুংবিলক্ষণ লক্ষণ দ্বারা, উহা স্ত্রীলোকের পদচিহ্ন বলিয়া স্থিবীকৃত হইল। রাজা কহিলেন, চরণচিহ্ন দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, দুই নারী, অচিরে, এই স্থান দিয়া, গমন করিয়াছে। চল, চারিদিকে অন্বেষণ করি।

পিতা-পুত্রে, অন্বেষণ করিতে কবিতে, সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন, দুই পরম সুন্দরী রমণী, তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, বাষ্পাকুল লোচনে, পরস্পর বদননিরীক্ষণ করত, যূথবিরহিত কুররীযুগলের ন্যায়, প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছে। অবলোকনমাত্র, উভয়েরই অন্তঃকরণে অতিপ্রভূত কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তখন তাঁহারা, স্নেহগর্ভ সম্ভাষণ পুরঃসর, অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা ও অভয়প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে, রাজা রাজকন্যার, রাজকুমার রাজমহিষীর, পাণিগ্রহণ করিলেন।

ইহা কহিয়া, বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! এই দুই নারীর সন্তান জন্মিলে, তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হইবেক, বল। রাজা বিক্রমাদিত্য, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

উপসংহার

বেতাল কহিল, মহারাজ! আমি তোমার সাহস ও অধ্যবসায় দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় কিছু উপদেশ দিতেছি, অবধানপূর্বক শ্রবণ কর।

যে যোগী তোমায় শবানয়নে নিযুক্ত করিয়াছে, সে কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন; তাহার নাম শান্তশীল। আর, যে শব লইতে আসিয়াছ, উহা ভোগবতীর অধিপতি রাজা চন্দ্রভানুর মৃতদেহ। শান্তশীল, যোগসিদ্ধির নিমিত্ত, অনেক কৌশলে, চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়া, প্রায় কৃতকার্য হইয়া আছে; এক্ষণে, তোমার প্রাণসংহার করিতে পারিলেই, উহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এজন্য, আমি তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি; যোগী পূজাসমাপন করিয়া তোমায় বলিবেক, মহারাজ! সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর। তদনুসারে তুমি যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইবে, অমনই সে খড়্গপ্রহার দ্বারা তোমার প্রাণসংহার করিবেক। অতএব, তুমি, কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রণাম না করিয়া বলিবে, আমি কোনও কালে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করি নাই; এবং, কেমন করিয়া সেরূপ প্রণাম করিতে হয়, তাহাও জানি না; আপনি কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিলে, আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে পারি। অনন্তর, তোমায় দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, সে যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবেক, অমনি তুমি, খড়্গপ্রহার দ্বারা, তাহার মস্তকচ্ছেদনপূর্বক, তাহার ও চন্দ্রভানুর মৃতদেহ সন্নিহিত জ্বলন্ত মহানসের উপরিস্থিত তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবে; এবং, তাহা হইলেই, তদীয় সম্পূর্ণ যোগফল প্রাপ্ত হইয়া, অখণ্ড ভূমণ্ডলে অবিচল সাম্রাজ্যস্থাপন করিতে পারিবে। সে ব্যক্তি আততায়ী; আততায়ীর বধে পাতক নাই।

এইরূপে বিক্রমাদিত্যকে সতর্ক করিয়া দিয়া, বেতাল, সেই মৃত শরীর হইতে বহির্নিঃসরণ পুরঃসর, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজা, সেই শব লইয়া, সন্ন্যাসীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, তিনি সাতিশয় সন্তোষপ্রদর্শন ও রাজার অশেষপ্রকার প্রশংসাকীর্তন করিতে লাগিলেন; অনন্তর, চন্দ্রভানুর মৃত দেহে জীবনদানপূর্বক, বলিপ্রদান করিলেন; এবং, পূজার অন্যান্য অঙ্গ যথাবৎ সমাপ্ত করিয়া, রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! সাষ্টাঙ্গ প্রণাম. কর; তোমার প্রতাপবৃদ্ধি ও অভীষ্টসিদ্ধি হইবেক। রাজা, বেতালদত্ত উপদেশ অনুসারে, কৃতাঞ্জলি হইয়া, অতি বিনীতভাবে আবেদন করিলেন, মহাশয়! আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে জানি না; আপনি গুরু; কি প্রকারে ওরূপ প্রণাম করিতে হয়, কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিউন। যোগী, রাজাকে সাষ্টাঙ্গপ্রণাম শিখাইবার নিমিত্ত, যেমন ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, অমনি রাজা, বেতালের উপদেশ অনুসারে, খড়্গাঘাত দ্বারা, তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

দেবতারা, এই ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া, দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবরাজ, দেবলোক হইতে অবতরণপূর্বক, রাজাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার সৌভাগ্যদর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, বরপ্রার্থনা কর। রাজা, অনিমিষ সহস্র নয়নে অলঙ্কৃত কলেবর দর্শনে, দেবরাজ

স্থির করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন ; এবং বলিলেন, আপনকার প্রসাদে, পৃথিবীতে আমার কোনও প্রার্থয়িতব্য নাই। এক্ষণে, এইমাত্র প্রার্থনা করি, যেন আমার এই বৃত্তান্ত সমস্ত সংসারে প্রসিদ্ধ হয়। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! যাবৎ চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, ও আকাশমণ্ডল বিদ্যমান থাকিবেক, তাবৎকাল পর্যন্ত, তোমার এই বৃত্তান্ত ধরাতলে প্রসিদ্ধ থাকিবেক।

এই রূপে রাজাকে বরপ্রদান করিয়া, দেবরাজ দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর রাজা, মন্ত্রপ্রয়োগপূর্বক, দুই মৃতদেহ তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবামাত্র, দুই বিকটাকার বীরপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল ; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন কবিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, আমি যখন যখন স্মরণ করিব, তোমরা আমার নিকটে উপস্থিত হইবে। তাহারা, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, প্রস্থান করিল। রাজা বিক্রমাদিত্যও, সর্বপ্রকারে চরিতার্থ হইয়া, নিরতিশয় হৃষ্ট চিত্তে, রাজধানী প্রতিগমনপূর্বক, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব

বিজ্ঞাপন

এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করাতে, আমি, তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুত ডাক্তর মোয়েট মহোদয়ের অনুমতি লইয়া, দুই শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি।

যে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সেই প্রস্তাব সেই সমাজের স্বত্বাস্পদীভূত হইয়া থাকে, এজন্য আমি উক্ত ডাক্তর মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্বক আমাকে বিনা মূল্যে সেই অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে আমি এই প্রস্তাব পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক কোনও ক্রমেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধগ্রন্থের নামোল্লেখমাত্র হইয়াছে, তদ্গ্রন্থেরও প্রকৃত প্রস্তাবে দোষ গুণ বিচার করা হয় নাই। তদ্ভিন্ন, কত শত গ্রন্থের নামও উল্লিখিত হয় নাই। বীটন সোসাইটিতে এক ঘণ্টামাত্র সময় প্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত নিরূপিত আছে; সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া, এরূপ সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

এক্ষণে, এরূপ অসম্যক্ সঙ্কলিত প্রস্তাব পুনর্মুদ্রিত করিবার তাৎপর্য এই যে, আমার কতিপয় আত্মীয় ভূয়োভূয়ঃ কহিয়াছিলেন যে এই প্রস্তাব পাঠ করিলে সংস্কৃত-কালেজের ছাত্রদিগের উপকার দর্শিতে পারে, অতএব ইহা পুনর্মুদ্রিত করা আবশ্যক; তদ্ব্যতিরিক্ত, অন্যান্য লোকেও এই প্রস্তাব পাঠ করিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; তৎপ্রযুক্ত, আমি মানস করিয়াছিলাম, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে এক প্রস্তাব রচনা করিয়া, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিব। কিন্তু, নিতান্ত অনবকাশপ্রযুক্ত, এ পর্য্যন্ত আমি সে মানস পূর্ণ করিতে পারি নাই; এবং কিছু কালও যে সম্যক্ রূপে তৎসঙ্কলনের উপযুক্ত অবকাশ পাইব, তাহারও সম্ভাবনা নাই; এজন্য আপাততঃ এই প্রস্তাব যথাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

কলিকাতা, সংস্কৃতকালেজ।
১৪ই চৈত্র, সংবৎ ১৯১৩।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

সংস্কৃতভাষা

সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এই অপূর্ব ভাষায় ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি ভূরি ধাতু, ভূরি ভূরি বিভক্তি ও ভূরি ভূরি প্রত্যয় আছে, এবং এক এক শব্দে ও এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তির যোগ করিয়া, ভূরি ভূরি নূতন শব্দ ও ভূরি ভূরি পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না ; এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে সুচারু রূপে সঙ্কলিত হইতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল অবধি, অতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা, নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া, এই ভাষাকে সম্যক্ মার্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃতভাষায় দুই পদ পরস্পর সন্নিহিত হইলে পূর্ব, পর অথবা উভয় বর্ণই প্রায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই রূপান্তরপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়, তাহাকে সন্ধি বলে। সন্ধিপ্রক্রিয়া দ্বারা ভাষার অশ্রাব্যতাপরীহার ও সুশ্রাব্যতাসম্পাদন হইয়া থাকে। আর প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অনেক পদকে, একত্র যোগ করিয়া, একপদ করা যায়। এই অনেক পদের একপদীকরণপ্রণালীকে সমাস বলে। সমাসপ্রক্রিয়া দ্বারা সংক্ষিপ্ততা ও সুশ্রাব্যতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে সমাসঘটিত বাক্য সকল অপেক্ষাকৃত দুরূহ, এবং আবৃত্তিমাত্র তত্তদ্বাক্যের অর্থবোধ নির্বাহ হইয়া উঠে না। সমাসপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ পদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থকর্তারা তাদৃশ সমাসপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু নব্যেরা সচরাচর অতি দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস করিয়া থাকেন। কোনও কোনও উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থেও বিংশতি পদ পর্যন্তও একপদীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমাস, পদসাধন ও প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃতভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। সংস্কৃত রচনাতে এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

সংস্কৃত রচনাতে শব্দঘটিত যে সকল কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে।

নিম্নে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল, উহা কেবল ভ এবং র এই দুই ব্যঞ্জনবর্ণে রচিত।

ভূরিভির্ভারিভির্ভোরৈর্ভূভারৈরভিরেভিরে।
ভেরীরেভিভিরভ্রাভৈরভোরুভিরিভৈরিভাঃ॥

শিশুপালবধ।

নিম্নলিখিত শ্লোক কেবল দ এই একমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণে রচিত।

দাদদো দুদ্দদুদ্দাদী দাদাদো দুদদী দদোঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে দদাদদ দদোদদঃ॥

শিশুপালবধ।

যমক রচনার চাতুর্য প্রদর্শনার্থে নিম্নলিখিত কয়েক শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ
স্ফুট পরাগ পরাগ তপঙ্কজম্।
মৃদু লতান্ত লতান্ত মলোকয়ৎ
স সুরভিং সুরভিং সুমনোভরৈঃ॥

শিশুপালবধ।

নসমা নসমা নসমা নসমা
গমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ
ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥

নলোদয়।

ঘনং বিদার্য্যার্জ্জুনবাণপূগং
সসার বাণোঽযুগলোচনস্য।
ঘনং বিদার্য্যার্জ্জুনবাণপূগং
সসার বাণোঽযুগলোচনস্য॥

কিরাতার্জ্জুনীয়।

বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ।
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ॥

ভট্টিকাব্য।

নিম্নলিখিত দুই শ্লোক আদি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ করিলে যেরূপ হয়, অন্ত হইতে পাঠ করিলেও অবিকল সেইরূপ হয়।

বাহনাজনি মানাসে সারাজাবনমা ততঃ।
মত্তসারগরাজেভে ভারীহাবজ্জনধ্বনি॥
নিধ্বনজ্জবহারীভা ভেজে রাগরসাত্তমঃ।
ততমানবজারাসা সেনা মানিজনাহবা॥

শিশুপালবধ।

নিম্নলিখিত শ্লোক নানা দিকে এক প্রকার পাঠ করা যায়।

দে বা কা নি নি কা বা দে
বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা।
কা কা রে ভ ভ রে কা কা
নি স্ব ভ ব্য ব্য ভ স্ব নি॥

কিরাতার্জ্জুনীয়।

সংস্কৃতভাষায় সরল, মধুর, ললিত প্রভৃতি রচনা কিরূপ হইতে পারে, তাহারও উদাহরণ প্রদর্শনার্থে, গদ্যে ও পদ্যে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

সখে পুণ্ডরীক নৈতদনুরূপং ভবতঃ; ক্ষুদ্রজনক্ষুণ্ণ এষ মার্গঃ; ধৈর্য্যধনা হি সাধবঃ। কিং যঃ কশ্চিৎ প্রাকৃত ইব বিক্লবীভবন্তমাত্মানং ন রুণৎসি। কুতস্তবাপূর্ব্বোঽয়মদ্যে-ন্দ্রিয়োপপ্লবঃ, যেনাস্যেবং কৃতঃ। ক তে তদ্ধৈর্য্যং, কাসাবিন্দ্রিয়জয়ঃ, ক তদ্বশিত্বং চেতসঃ, ক সা প্রশান্তিঃ, ক তৎ কুলক্রমাগতং ব্রহ্মচর্য্যং, ক সা সর্ব্ববিষয়নিরুৎসুকতা, ক তে গুরূপদেশাঃ, ক তানি শ্রুতানি, ক তা বৈরাগ্যবুদ্ধয়ঃ, ক তদুপভোগবিদ্বেষিতং, ক সা সুখপরাঙ্মুখতা, কাসৌ তপস্যভিনিবেশঃ, ক সা সংযমিতা, ক সা ভোগানামুপর্য্যরুচিঃ, ক তৎ যৌবনানুশাসনম্। সর্ব্বথা নিষ্ফলা প্রজ্ঞা, নির্গুণো ধর্ম্মশাস্ত্রাভ্যাসঃ, নিরর্থকঃ সংস্কারঃ, নিরুপকারকো গুরূপদেশবিবেকঃ, নিষ্প্রয়োজনা প্রবুদ্ধতা, নিষ্কারণং জ্ঞানম্; যদত্র ভবাদৃশা অপি রাগাভিষঙ্গৈঃ কলুষীক্রিয়ন্তে প্রমাদৈশ্চাভিভূয়ন্তে। কথং করতলা-দ্গলিতামপহৃতামক্ষমালামপি ন লক্ষয়সি; অহো বিগতচেতনত্বম্; অপহৃতা নামেয়ম্; ইদমপি তাবদপহ্রিয়মাণমনয়ানার্য্যয়া নিবার্য্যতাং হৃদয়মিতি।

কাদম্বরী।

ইতি পরিসমাপিতাহারাং, নির্ব্বর্ত্তিতসন্ধ্যোচিতাচারাং, শিলাতলে বিশ্রব্ধমুপবিষ্টাং নিভৃতমুপসৃত্য, নাতিদূরে সমুপবিশ্য, মুহূর্ত্তমিব স্থিত্বা চন্দ্রাপীড়ঃ সবিনয়মবাদীৎ, ভগবতি ত্বৎপ্রসাদপ্রাপ্তিপ্রোৎসাহিতেন কুতূহলেনাকুলীক্রিয়মাণো মানুষতাসুলভো লঘিমা বলাদনিচ্ছন্তমপি মাং প্রশ্নকর্ম্মণি নিয়োজয়তি। জনয়তি হি প্রভুপ্রসাদলবোঽপি প্রাগল্ভ্যমধীরপ্রকৃতেঃ; স্বল্পাপ্যেকদেশাবস্থানকালকলা পরিচয়মুৎপাদয়তি; অণুরপ্যু-পচারপরিগ্রহঃ প্রণয়মারোপয়তি। তদ্যদি নাতিখেদকরমিব, তর্ত্তঃ কথনেনাত্মান-মনুগ্রাহ্যমিচ্ছামি।

কাদম্বরী।

বনস্পতীনাং সরসাং নদীনাং
তেজস্বিনাং কান্তিভৃতাং দিশাঞ্চ।
নির্যায় তস্যাঃ স পুরঃ সমন্তাৎ
শ্রিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ॥
নিশাতুষারৈর্নয়নাম্বুকল্পৈঃ
পত্রান্তপর্য্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ।

উপারুরোদেব নদৎপতঙ্গঃ
কুমুদ্বতীং তীরতরুর্দিনাদৌ ॥
বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ
পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।
পরস্পরাং বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মী-
মালোকয়াঞ্চক্রুরিবাদরেণ ॥
দত্তাবধানং মধুলেহিগীতৌ
প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।
আকর্ণয়ন্নুৎসুকহংসনাদান্
লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ ॥
অদৃক্ষতাম্ভাংসি নবোৎপলানি
রুতানি চাশ্রোষত ষট্পদানাম্।
আঘ্রায়িবান্ গন্ধবহঃ সুগন্ধ-
স্তেনারবিন্দব্যতিষঙ্গবাংশ্চ ॥
লতানুপাতং কুসুমান্যগৃহ্নাৎ
স নদ্যবস্কন্দমুপাস্পৃশচ্চ।
কুতূহলাচ্চারুশিলোপবেশং
কাকুৎস্থ ঈষৎ স্ময়মান আস্ত ॥
দিগ্ব্যাপিনীর্লোচনলোভনীয়া
মৃজান্বয়াঃ স্নেহমিব স্রবন্তীঃ।
ঋজ্বায়তাঃ শস্যবিশেষপংক্তী-
স্তুতোষ পশ্যন্ বিতৃণান্তরালাঃ ॥
বিয়োগদুঃখানুভবানভিজ্ঞৈঃ
কালে নৃপাংশং বিহিতং দদদ্ভিঃ।
আহার্য্যশোভারহিতৈরমায়ৈ-
রৈক্ষিষ্ট পুম্ভিঃ প্রচিতান্ স গোষ্ঠান্ ॥
স্ত্রীভূষণং চেষ্টিতমপ্রগল্ভং
চারূণ্যবক্রাণ্যপি বীক্ষিতানি।
ঋজূংশ্চ বিশ্বাসকৃতঃ স্বভাবান্
গোপাঙ্গনানাং মুমুদে বিলোক্য ॥
সিতারবিন্দপ্রচয়েষু লীনাঃ
সংসক্তফেনেষু চ সৈকতেষু।
কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ
প্রতীয়িরে শ্রোত্রসুখৈর্নিনাদৈঃ ॥

ভট্টিকাব্য।

অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে
শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেশা-
মদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ॥
সা সাধুসাধারণপার্থিবর্দ্ধেঃ
স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহূতভাসঃ।
জেতুঃ পরেষাং জয়শব্দপূর্ব্বং
তস্যাঞ্জলিং বন্ধুমতো ববন্ধ॥
অথানপোঢ়ার্গলমপ্যগারং
ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্।
সবিস্ময়ো দাশরথেস্তনূজঃ
প্রোবাচ পূর্ব্বার্দ্ধবিসৃষ্টতল্পঃ॥
লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে
যোগপ্রভাবে নচ দৃশ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্॥
কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা
কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে।
আচক্ষ মত্বা বশিনাং রঘূণাং
মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তি॥
তমব্রবীৎ সা গুরুণানবদ্যা
যা নীতপৌরা স্বপদোন্মুখেন।
তস্যাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীতনাথাং
জানীহি রাজন্নধিদেবতাং মাম্॥
বস্বৌকসারামভিভূয় সাহং
সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা।
সমগ্রশক্তৌ ত্বয়ি সূর্য্যবংশ্যে
সতি প্রপন্না করুণামবস্থাম্॥
বিশীর্ণতল্পাদৃশতো নিবেশঃ
পর্য্যস্তশালঃ প্রভুণা বিনা মে।
বিড়ম্বয়ত্যস্তনিমগ্নসূর্য্যং
দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্॥
নিশাসু ভাস্বৎকলনূপুরাণাং
যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্।

নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ
স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ ॥
আস্ফালিতং যৎ প্রমদাকরাগ্রৈ-
র্মৃদঙ্গধীরধ্বনিমন্বগচ্ছৎ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ
শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্ ॥
বৃক্ষেশয়া যষ্টিনিবাসভঙ্গাৎ
মৃদঙ্গশব্দাপগমাদলাস্যাঃ।
প্রাপ্তা দবোল্কাহতশেষবর্হাঃ
ক্রীড়াময়ূরা বনবর্হিণত্বম্ ॥
সোপানমার্গেষু চ যেষু রামা
নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যোহতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং
ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে ॥
চিত্রদ্বিপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ
করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্নকুম্ভাঃ
সংরব্ধসিংহপ্রহৃতং বহন্তি ॥
কালান্তরশ্যামসুধেষু নক্ত-
মিতস্ততোরূঢ়তৃণাঙ্কুরেষু।
ত এব মুক্তাগুণশুদ্ধয়োঽপি
হর্ম্ম্যেষু মূর্চ্ছন্তি ন চন্দ্রপাদাঃ ॥
আবর্জ্য শাখাঃ সদয়ঞ্চ যাসাং
পুষ্পাণ্যুপাত্তানি বিলাসিনীভিঃ।
বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ
ক্লিশ্যন্ত উদ্যানলতা মদীয়াঃ ॥
রাত্রাবনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ
কান্তামুখশ্রীবিযুতা দিবাপি।
তিরস্ক্রিয়ন্তে কৃমিতন্তুজালৈ-
র্বিচ্ছিন্নধূমপ্রসরা গবাক্ষাঃ ॥
বলিক্রিয়াবর্জ্জিতসৈকতানি
স্নানীয়সংসর্গমনাপ্নুবন্তি।
উপান্তবানীরগৃহাণি দৃষ্ট্বা
শূন্যানি দূয়ে সরযূজলানি ॥

তদৰ্হসীমাং বসতিং বিসৃজ্য
মামভ্যুপেতুং কুলরাজধানীম্।
হিত্বা তনুং কারণমানুষীং তাং
যথা গুরুস্তে পরমাত্মমূর্ত্তিম্ ॥
তথেতি তস্যাঃ প্রণয়ং প্রতীতঃ
প্রত্যগ্রহীৎ প্রাগ্রহরো রঘূণাম্।
পূরপ্যভিব্যক্তমুখপ্রসাদা
শরীরবন্ধেন তিরোবভূব ॥

রঘুবংশ।

সুকুমারমহো লঘীয়সাং হৃদয়ং তদ্গতমপ্রিয়ং যতঃ।
সহসৈব সমুদ্গিরন্ত্যমী ক্ষপয়ন্ত্যেব হি তন্মনীষিণঃ ॥
উপকারপরঃ স্বভাবতঃ সততং সর্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতামনিশং তথাপ্যহো গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ ॥
পরিতপ্যত এব নোত্তমঃ পরিতপ্তোঽপ্যপরঃ সুসংবৃতিঃ।
পরবৃদ্ধিভিরাহিতব্যথঃ স্ফুটনির্ভিন্নদুরাশয়োঽধমঃ ॥
অনিরাকৃততাপসম্পদং ফলহীনাং সুমনোভিরুজ্ঝিতাম্।
খলতাং খলতামিবাসতীং প্রতিপদ্যেত কথং বুধো জনঃ ॥
প্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ শপমানায় ন চেদিভূভুজে।
অনুহুংকুরুতে ঘনধ্বনিং নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী ॥
জিতরোষরয়া মহাধিয়ঃ সপদি ক্রোধজিতো লঘুর্জনঃ।
বিজিতেন জিতস্য দুর্মতের্মতিমদ্ভিঃ সহ কা বিরোধিতা ॥
বচনৈরসতাং মহীয়সো ন খলু ব্যেতি গুরুত্বমুদ্ধতৈঃ।
কিমপৈতি রজোভিরৌর্বরৈরবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা ॥
পরিতোষয়িতা ন কশ্চন স্বগতো যস্য গুণোঽস্তি দেহিনঃ।
পরদোষকথাভিরল্পকঃ স্বজনং তোষয়িতুং কিলেচ্ছতি ॥
সহজান্ধদৃশঃ সদুর্নয়ে পরদোষেক্ষণদিব্যচক্ষুষঃ।
স্বগুণোচ্চগিরো মুনিব্রতাঃ পরবর্ণগ্রহণেষ্বসাধবঃ ॥
কিমিবাখিললোককীর্ত্তিতং কথয়ত্যাত্মগুণং মহামনাঃ।
বদিতা ন লঘীয়সোঽপরঃ স্বগুণং তেন বদত্যসৌ স্বয়ম্ ॥

শিশুপালবধ।

সংস্কৃতভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত নহে। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃত দেবভাষা। ভারতবর্ষীয়েরা আদিকালাবধি ঐ দেবভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করিতেন; তদনুসারে, সংস্কৃত ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়। কিন্তু ইয়ুরোপীয়

পণ্ডিতেরা শব্দবিদ্যানুশীলনপ্রভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা নহে ; সংস্কৃতভাষী লোকেরা, পৃথিবীর অন্য কোনও প্রদেশ হইতে আসিয়া, ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। সেই প্রদেশ ইরান। তাঁহাদিগের গবেষণা দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে, অতি পূর্বকালে, ইরানের আদিম নিবাসী লোকেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জর্মনি প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন। ইঁহারা ইরানে অবস্থানকালে একজাতি ও একভাষাভাষী ছিলেন। ঐ একজাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া, হিন্দু, গ্রীক, রোমক, জর্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন ; এবং ঐ এক ভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক, ইটালিতে লাটিন, জর্মানিতে জর্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে উহাদিগের পরস্পর কোনও সম্বন্ধ আছে, ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষমাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ করিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ, বাঙ্গালা ভাষার অদ্যাপি এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে ঐ সমস্ত বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে ও সুচারু রূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে ; এই নিমিত্ত ফলিতার্থমাত্র উল্লিখিত হইল।

সাহিত্যশাস্ত্র

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যশাস্ত্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। তাঁহারা এই উভয় বিভাগের মধ্যেই সমুদায় সাহিত্যশাস্ত্র সমাবেশিত করিয়াছেন। শ্রব্যকাব্য ত্রিবিধ ; পদ্যময়, গদ্যময়, গদ্যপদ্যময়। পদ্যময় কাব্যও ত্রিবিধ ; মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য। গদ্যময় কাব্যকে আলঙ্কারিকেরা কথা ও আখ্যায়িকা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুয়ের বৈলক্ষণ্য এমন সামান্য যে ইহাদিগের ভাগদ্বয়ে বিভাগ অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর। গদ্যপদ্যময় কাব্যকে চম্পূ বলে। চম্পূ কাব্যের বিভাগ নাই।

মহাকাব্য

কোনও দেবতার, অথবা সদ্বংশজাত অশেষসদ্‌গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের, কিংবা এক-বংশোদ্ভব বহু ভূপতিদিগের বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্য নানা সর্গে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্গসংখ্যা অষ্টাধিক না হইলে, তাহাকে মহাকাব্য বলে না। সংস্কৃতভাষায় যত মহাকাব্য আছে তাহাতে দ্বাবিংশতির অধিক সর্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনও মহাকাব্য আদ্যোপান্ত এক ছন্দে রচিত নহে ; এক এক সর্গ এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত। সর্গের অবসানে এক, দুই, অথবা তদধিক অন্য অন্য ছন্দের শ্লোক থাকে। সকল সর্গই যে

এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত এমন নহে। মহাকাব্যে দুই, তিন, চারি, পাঁচ সর্গও এক ছন্দে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও সর্গ নানা ছন্দেও রচিত হইয়া থাকে। সর্গ সকল অতি সংক্ষিপ্ত অথবা অতি বিস্তৃত নহে। সর্গের শেষে পরসর্গের বৃত্তান্তসূচনা থাকে। মহাকাব্য সকল আদিরস অথবা বীররস প্রধান, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে। কবি, কিংবা বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়কের নামানুসারে মহাকাব্যের নাম নির্দেশ হয়।

রঘুবংশ

সংস্কৃতভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ তৎসর্বাপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদে অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদিগের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন, স্বরচিত কাব্যসমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়; তাহাতে অত্যুক্তির সংশ্রবমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ, এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্ত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা অতি মনোহর, বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি উপমাবিষয়ে কালিদাসের সদৃশ নহেন। তিনি এরূপ সংক্ষেপে, ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া, উপমা সঙ্কলন করিয়াছেন যে পাঠকমাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তিমাত্র উপমান ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার পূর্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা তাঁহার উত্তরকালে সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কি কবি, কি অন্যান্য গ্রন্থকার, কাহারই রচনা তাঁহার রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল, মধুর ও ললিত। তিনি একটিও অনাবশ্যক অথবা পরিবর্তসহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সমস্ত তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে, রচনা বা ভাবসঙ্কলনের নিমিত্ত, তাঁহাকে এক মুহূর্তও চিন্তা করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ, এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি এই উভয়ের একত্র সংঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্তই কালিদাসপ্রণীত কাব্যের এত আদর ও এত গৌরব; এই নিমিত্তই ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্তই প্রসন্নরাঘবকর্তা জয়দেব, স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনাতে, কালিদাসকে

কবিকুলগুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং এই নিমিত্তই, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কালিদাসের নাম অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কালিদাস, এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তিসম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমানশূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে মোহাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

যেমন বামন উন্নতপুরুষপ্রাপ্য ফলগ্রহণাভিলাষে বাহুপ্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আমি, কবিকীর্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব।

কালিদাস, অদ্বিতীয় বিদ্বোৎসাহী গুণগ্রাহী বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্তর্বর্তী ছিলেন ; সুতরাং ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কালিদাসের যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হইল, প্রায় তৎপ্রণীত যাবতীয় কাব্যেই সেই সমুদায় সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। রঘুবংশে সূর্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণন আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্যন্ত সাত সর্গে দশরথ ও রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত, রামের উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃতব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃতভাষার সর্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

কুমারসম্ভব

কালিদাসের দ্বিতীয় মহাকাব্য কুমারসম্ভব। কুমারসম্ভব অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য। এই মহাকাব্যের স্থূল বৃত্তান্ত এই ; তারকনামে এক মহাবল পরাক্রান্ত অতিদুর্দান্ত অসুর, ব্রহ্মদত্তবরপ্রভাবে অত্যন্ত গর্বিত ও দুর্জয় হইয়া, দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া, স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে পার্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদিগের সেনাপতি হইয়া, তারকাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া, তোমাদিগকে পুনর্বার স্ব স্ব অধিকার প্রদান করিবেন। তদনুসারে, দেবতারা উদ্যোগী হইয়া হর-গৌরীর পরিণয় সম্পাদন করিলে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনন্তর, তিনি, দেবসৈন্য সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া, দুর্বৃত্ত তারকাসুরের প্রাণসংহারপূর্বক, দেবতাদিগকে আপন আপন অধিকারে পুনঃ স্থাপিত করেন। এই বৃত্তান্ত সুচারু রূপে কুমারসম্ভবে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গেরই সর্বত্র অনুশীলন আছে; অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে—এমন অপ্রচলিত যে ঐ দশ সর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া অনেকেই অবগত নহেন। এই দশ সর্গ, কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যে, এরূপ অপ্রচলিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে তাহার হেতু এই বোধ হয়, অষ্টম সর্গে হর-গৌরীর বিহারবর্ণনা আছে; তাহাও অত্যন্ত অশ্লীল এবং সামান্য নায়ক-নায়িকার বিহারের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হর-গৌরীর কৈলাসগমন এবং দশমে কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দুই সর্গেও হরগৌরীঘটিত অনেক অশ্লীল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকেরা হর-গৌরীকে জগৎপিতা ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন। জগৎপিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে। আলঙ্কারিকেরাও কুমারসম্ভবের হরগৌরীবিহারবর্ণনাকে অত্যন্ত অনুচিত ও অত্যন্ত দূষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্যন্ত সাত সর্গে কার্তিকেয়ের বাল্যলীলা, সৈনাপত্যগ্রহণ, তারকাসুরের সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকাসুরের নিপাত, এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনার লেশমাত্র নাই। কিন্তু অষ্টম, নবম, দশম এই তিন সর্গের দোষে, ইহারাও একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এক কুম্ভকার কালিদাসের পরম মিত্র ছিলেন। কালিদাস, কুমারসম্ভব রচনা করিয়া, ঐ কুম্ভকার মিত্রকে দেখাইতে লইয়া যান। কুম্ভকার পাঠ করিয়া সম্মুখবর্তী একখান কাঁচা সরার উপর রাখিয়া দেন। তাহাতে কালিদাস বোধ করিলেন, এই গ্রন্থ কাঁচা হইয়াছে, এবং সেই নিমিত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ পুস্তক হস্তে লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কুম্ভকার তদ্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন এবং অশেষ প্রয়াসে প্রথম সাত সর্গ মাত্র সঙ্কলন করিতে পারিলেন; অবশিষ্ট দশ সর্গ বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই অমূলক অকিঞ্চিৎকর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গই বিদ্যমান আছে, অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে লোপ পাইয়াছে।

কুমারসম্ভবের যে শেষভাগের কথা উল্লিখিত হইল, ইহার পুস্তক বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশে কুমারসম্ভবের অন্যবিধ এক শেষ ভাগ আছে। এই শেষ ভাগ পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কুমারসম্ভবের শেষ ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে এই স্থির করিয়া, এতদ্দেশীয় কোনও আধুনিক কবি ঐ অংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহা, পাঠ করিলে, কালিদাসের রচিত বলিয়া কোনও ক্রমেই প্রতীতি জন্মিতে পারে না।

কুমারসম্ভবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, শিবপুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থে, ইতিবৃত্তের যেরূপ ঐক্য আছে, দুই এক শ্লোকেরও সেইরূপ ঐক্য

দেখিতে পাওয়া যায়। (১) যদি শিবপুরাণকে বেদব্যাসবিরচিত, ও তদনুসারে কালিদাসের কুমারসম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন, গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, কালিদাস শিবপুরাণের বৃত্তান্ত লইয়া কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে, ঐ গ্রন্থের শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস অলৌকিককবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন হইয়া যে আপন কাব্যে অন্যদীয় শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভাবিত নহে। যে কয়েকটি শ্লোকে ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে, কুমারসম্ভবের অথবা কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের রচনার সহিত সেই সেই শ্লোকের রচনার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে; কিন্তু শিবপুরাণের কোনও অংশের রচনার সহিত কোনও অংশেই উহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, শিবপুরাণ কুমারসম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন কিনা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় আছে। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনাপ্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ন, এবং এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে সঙ্কলিত হইয়াছে যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া কোনও ক্রমেই প্রতীতি হইতে পারে না। যাঁহাদের সংস্কৃত রচনার ইতরবিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি আছে, তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভাগবত-পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে। বাস্তবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয়, এক কালেও রচিত নয়। বোধ হয়, পুরাণনামপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমুদায়ের অধিকাংশই প্রাচীন নহে। সুতরাং, শিবপুরাণ যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের পূর্বের রচিত গ্রন্থ, এবং তাহা দেখিয়া কালিদাস কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিতান্ত ভক্তি না থাকিলে এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন; বরং বিপরীত পক্ষই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগবাশিষ্ঠে ও কুমারসম্ভবেও শ্লোকের ঐক্য আছে। (২) কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ যে আধুনিক গ্রন্থ, প্রাচীন ও ঋষিপ্রণীত নহে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় হইতে পারে না।

---

(১) তদিচ্ছামি বিভো স্রষ্টুং সেনান্যং তস্য শান্তয়ে।
কর্ম্মবন্ধচ্ছিদং ধর্ম্মং ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ॥
যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥
শিবপুরাণ, উত্তরখণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়।
কুমারসম্ভব, দ্বিতীয় সর্গ।

(২) আকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিহ্বলাং
প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ॥
যোগবাশিষ্ঠ, ভূকৈলাসনিবাসী রাজশ্রীসত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের মুদ্রিত পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা।
কুমারসম্ভব, চতুর্থ সর্গ।

কিরাতার্জুনীয়

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের পর, সংস্কৃত মহাকাব্যের উল্লেখ করিতে হইলে, উৎকর্ষ ও প্রাথম্য অনুসারে, সর্বাগ্রে কিরাতার্জুনীয়ের নির্দেশ করিতে হয়। এই মহাকাব্যের রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুরূহ, কালিদাসের রচনার ন্যায় সরল নহে। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, কিরাতার্জুনীয়কর্তা ভারবি কালিদাসের উত্তর কালে, এবং মাঘ, শ্রীহর্ষপ্রভৃতির বহুকাল পূর্বে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কিরাতার্জুনীয়ের স্থূল বৃত্তান্ত এই; যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, রাজ্যাধিকার হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, দ্বৈতবনে বাস করেন। এক দিবস, ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাদিগকে কহেন, দৈব অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমাদিগের নষ্টরাজ্যের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই; অতএব অর্জুন হিমালয়ে গিয়া ইন্দ্রের আরাধনা করুন। তদনুসারে অর্জুন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করেন। দেবরাজ তদীয় আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিবের আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। অর্জুন শিবের আরাধনা আরম্ভ করিলে, মূক নামে এক দুর্বৃত্ত দানব, বরাহের রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে আইসে। সেই সময়ে শিবও কিরাতরাজের আকার পরিগ্রহ করিয়া অর্জুনের আশ্রমে উপস্থিত হন। অর্জুন বরাহরূপী দানবের প্রাণদণ্ডার্থে শরাসনে শরসন্ধান করিয়াছেন, এমন সময়ে কিরাতরাজ এক শর নিক্ষেপ করিয়া বরাহের প্রাণসংহার করিলেন। এই উপলক্ষে কিরাতরাজের সহিত অর্জুনের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে অর্জুনের অসাধারণ বল বীর্য দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, কিরাতরূপী মহাদেব তাঁহাকে ধনুর্বেদ শিক্ষা করাইলেন। সেই শিক্ষার প্রভাবে অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় ও অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়া উঠিলেন।

ভারবি কবিত্বশক্তিবিষয়ে কালিদাস অপেক্ষা ন্যূন বটেন; কিন্তু ভারতবর্ষের এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি এই মহাকাব্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ সর্গ পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত না হন এবং পদে পদে অসাধারণ কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ প্রমাণ না পান। কিরাতার্জুনীয় সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত।

শিশুপালবধ

কাব্যকর্তা মাঘনামা কবি স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন

. . . . . সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াদঃ
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানম্ ॥

মাঘ কবিকীর্তি লাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া এই শিশুপালবধনামক কাব্য রচনা করিলেন।

মাঘ অতি প্রধান কবি ছিলেন এবং তৎপ্রণীত শিশুপালবধ অতি প্রধান মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের স্থূল বৃত্তান্ত এই; কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া,

সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান করেন। যিনি সর্বাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ হন, তিনিই যজ্ঞে অর্ঘ পাইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির, রাজসূয় সমাপ্ত হইলে, ভীষ্মের উপদেশানুসারে, কৃষ্ণকে সর্বাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া অর্ঘ দান করেন। কৃষ্ণের পিতৃষ্বসৃপুত্র শিশুপাল তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন; তিনি, কৃষ্ণের এইরূপ অসামান্য সম্মান দর্শনে অসূয়াপরবশ হইয়া, ভীষ্মের যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বপক্ষীয় নরপতিগণ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন এবং দূত দ্বারা কৃষ্ণের অনেক তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, এবং সেই সংগ্রামেই কৃষ্ণ শিশুপালের প্রাণসংহার করিলেন।

শিশুপালবধ কিরাতার্জুনীয়ের প্রতিরূপস্বরূপ। মাঘ কিরাতার্জুনীয়কে আদর্শস্বরূপ করিয়া শিশুপালবধ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ভারবি যে প্রণালীতে কিরাতার্জুনীয় রচনা করিয়াছেন, মাঘ শিশুপালবধরচনাকালে আদ্যোপান্ত সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। কিরাতার্জুনীয়ে, মহর্ষি ব্যাস আসিয়া পাণ্ডবদিগকে কর্তব্যের উপদেশ দিতেছেন; শিশুপালবধে, দেবর্ষি নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে উদ্‌যুক্ত করিতেছেন। কিরাতার্জুনীয়ে, যুধিষ্ঠির, ভীম, দ্রৌপদী, এই তিন জনের রাজনীতিসংক্রান্ত বাদানুবাদ; শিশুপালবধেও কৃষ্ণ, বলরাম ও উদ্ধবের সেইরূপ রাজনীতিসংক্রান্ত বাদানুবাদ। কিরাতার্জুনীয়ে, তপস্যার্থে অর্জুনের হিমালয় পর্বতে অবস্থান; শিশুপালবধেও, কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থানকালে রৈবতক পর্বতে অবস্থান। কিরাতার্জুনীয়ে, হিমালয় পর্বতের বহুবিস্তৃত বর্ণনা এবং বর্ণনাসংক্রান্ত শ্লোক সকল অধিকাংশ যমকালঙ্কারযুক্ত; শিশুপালবধেও, রৈবতক পর্বতের অবিকল সেইরূপ বর্ণনা ও সেইরূপ যমকালঙ্কৃত শ্লোক। কিরাতার্জুনীয়ে, সুরাঙ্গনাদিগের বনবিহার, নায়কসমাগম, বিরহ, মান প্রভৃতির বর্ণনা আছে; শিশুপালবধেও, অবিকল সেই সমস্ত বর্ণনা আছে। কিরাতার্জুনীয়ে, কিরাতরাজ অর্জুনের উত্তেজনার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন; শিশুপালবধেও, শিশুপাল কৃষ্ণের ভর্ৎসনার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অনন্তর উভয় কাব্যেই উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জা, সৈন্যপ্রয়াণ ও সংগ্রাম বর্ণন আছে। কিরাতার্জুনীয়ের পঞ্চদশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক; শিশুপালবধের ঊনবিংশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও ঐরূপ একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক। কিরাতার্জুনীয়ে, প্রতি সর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক লক্ষ্মীশব্দ প্রয়োগ আছে; শিশুপালবধেও, প্রতি সর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক শ্রীশব্দ প্রয়োগ আছে। কোনও স্থলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, শিশুপালবধে কিরাতার্জুনীয়ের ভাব অবিকল ভিন্ন ছন্দে সঙ্কলিত হইয়াছে। ফলতঃ, অভিনিবেশ-পূর্বক উভয় কাব্য আদ্যন্ত পাঠ করিলে, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, কিরাতার্জুনীয় আদর্শ ও শিশুপালবধ তৎপ্রতিরূপ। উভয় কাব্যের রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষ কোনও ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিরাতার্জুনীয় যে শিশুপালবধ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয় নাই।

মাঘ অতি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অতি অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি পাইয়াছিলেন। যদি তাঁহার, কালিদাস ও ভারবির ন্যায়, সহৃদয়তা থাকিত, তাহা হইলে তদীয় শিশুপালবধ সংস্কৃতভাষায় সর্বপ্রধান মহাকাব্য হইত সন্দেহ নাই। তিনি সকল বিষয়েরই বহুবিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সকল আরম্ভে একান্ত মনোহর, কিন্তু অবসানে নিতান্ত নীরস। মাঘ অধিক বর্ণনা এত অধিক ভালবাসিতেন যে, শেষাংশ নিতান্ত অশক্তিকৃত হইতেছে দেখিয়াও, ক্ষান্ত হইতে পারিতেন না। কখনও কখনও ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্লিষ্ট অথবা সুশ্রাব্য শব্দের অনুরোধে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোকের সেই শব্দটি ভিন্ন অন্য কোনও চমৎকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী ও গাম্ভীর্যব্যঞ্জক, কিন্তু কালিদাসের অথবা ভারবির ন্যায় পরিপক্ব নহে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহুবিস্তৃত বর্ণনা মাঘের অতিপ্রধান দোষ। তিনি বিংশতি-সর্গাত্মক কাব্যের নয় সর্গ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সমর্পিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থানকালে প্রথম দিন রৈবতক পর্বতে অবস্থান করেন। এই উপলক্ষে মাঘ রৈবতক প্রভৃতির অত্যন্ত অধিক বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে কেবল রৈবতক বর্ণন, পঞ্চমে শিবিরসন্নিবেশ, ষষ্ঠে ঋতুবর্ণন, সপ্তমে যাদবদিগের বনবিহার, অষ্টমে জলবিহার, নবমে সন্ধ্যাবর্ণন, দশমে সস্ত্রীক যাদবদিগের সুরাপান ও বিহার, একাদশে প্রভাতবর্ণন, দ্বাদশে সৈন্যপ্রয়াণ ; এইরূপ এক এক সর্গে এক এক বিষয় মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। মাঘ এই সমস্ত বর্ণনাতে স্বীয় অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও বর্ণনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনা যেমন অতিবিস্তৃত, তেমনি অপ্রাসঙ্গিক ; প্রকৃত বিষয় শিশুপালবধে উহাদের কোনও উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নয় সর্গ পরিত্যাগ করিলেও কাব্যের ইতিবৃত্ত কোনও ক্রমেই অসংলগ্ন হইবেক না।

শিশুপালবধ, এইরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও যে, এক অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা যে ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন (৩), ইহা কোনও ক্রমেই অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। সম্যক্ সহৃদয়তা সহকারে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে শিশুপালবধ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জুনীয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

নৈষধচরিত

এরূপ কিংবদন্তী আছে, শ্রীহর্ষ দেবতার আরাধনা করিয়া তৎপ্রসাদে অলৌকিক কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন ; নৈষধচরিত সেই দেবপ্রসাদলব্ধ অলৌকিক কবিত্ব-

---

(৩) উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥
পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ॥

শক্তির ফল। শ্রীহর্ষের যে কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল, তাহার কোনও সংশয় নাই; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী সহৃদয়তা ছিল না। তিনি নৈষধচরিতকে আদ্যোপান্ত অত্যুক্তিতে এমন পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার রচনা এমন মাধুর্যবর্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশূন্য ও অপরিপক্ক যে ইহাকে কোনও ক্রমে অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া নির্দেশ, অথবা পূর্বোল্লিখিত মহাকাব্য চতুষ্টয়ের সহিত তুলনা করিতে পারা যায় না।

শ্রীহর্ষের অত্যুক্তি এমন উৎকট যে, তদ্দ্বারা তদীয় কাব্যের উপাদেয়ত্ব না জন্মিয়া বরং হেয়ত্বই ঘটিয়াছে। তিনি নলরাজার বর্ণনাকালে কহিয়াছেন, "নলরাজার যুদ্ধযাত্রা-কালে সৈন্য দ্বারা যে ধূলি উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই ধূলি ক্ষীরসমুদ্রে পতিত হইয়া পঙ্কভাব প্রাপ্ত হয়; উৎপত্তিকালে চন্দ্রের গাত্রে সেই পঙ্ক লাগিয়া কলঙ্ক হইয়াছে।"(৪) নলরাজা যখন অশ্বারোহণ করিয়া, বয়স্যবর্গসমভিব্যাহারে উপবনবিহারে গমন করিতেছেন, শ্রীহর্ষ তদীয় অশ্বের এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "আমাদিগের চলিবার নিমিত্ত এই পৃথিবী কয় পদ হইবেক; অতএব সমুদ্রও স্থল হউক; এই মনে করিয়াই যেন অশ্বগণ, সমুদ্রের জল শুষ্ক করিয়া স্থল করিবার নিমিত্ত, পদ দ্বারা ধূলি উত্থাপিত করিতেছে।" (৫) নৈষধচরিত এইরূপ উৎকট বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এরূপ উৎকট বর্ণনা পাঠ করিয়া কোন্ ব্যক্তি প্রীত বা চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীহর্ষ অত্যন্ত অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। সংস্কৃতভাষায় অনুপ্রাস সাতিশয় মধুর হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত অধিক হইলে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠে। সুতরাং, অনুপ্রাসবাহুল্য দ্বারা নৈষধচরিতের মাধুর্য সম্পাদন না হইয়া সাতিশয় কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িকমহাশয়েরা, এমন অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নৈষধচরিত সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রধান মহাকাব্য। (৬) যাহা হউক, নৈষধচরিতে মধ্যে মধ্যে অনেক অত্যুৎকৃষ্ট অংশ আছে। অন্য অন্য অংশ পাঠ করিয়া যেরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে হয়, ঐ সকল অত্যুৎকৃষ্ট অংশ পাঠ করিয়া সেইরূপ প্রীত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, এবং সকল মহাকাব্য অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে নলরাজার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

নৈষধচরিতের বিষয়ে এক অতিকৌতুকাবহ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত রচনা করিয়া স্বীয় মাতুল প্রধান আলঙ্কারিক মম্মটভট্টকে দেখাইতে

(৪) যদস্য যাত্রাসু বলোদ্ধতং রজঃ স্ফুরৎপ্রতাপানলধূমমঞ্জিম।
তদেব গত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ॥

প্রথমসর্গ। ৮ শ্লোক

(৫) প্রয়াতুমস্মাকমিয়ং কিয়ৎপদং ধরা তদম্ভোধিরপি স্থলায়তাম্।
ইতীব বাহৈর্নিজবেগদর্পিতৈঃ পয়োধিরোধক্ষমমুদ্ধৃতং রজঃ॥

প্রথমসর্গ। ৬১ শ্লোক।

(৬) উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ।

লইয়া যান। মম্মটভট্ট আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, শ্রীহর্ষকে কহিয়াছিলেন, বাপু হে! যদি তুমি কিছু পূর্বে তোমার গ্রন্থখানি আনিতে, তাহা হইলে আমার শ্রমের অনেক লাঘব হইত। বহু পরিশ্রমে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমায় অলঙ্কার গ্রন্থের দোষপরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সেই সময় তোমার নৈষধচরিত পাইলে, আমায় এত পরিশ্রম করিতে হইত না; এক গ্রন্থ হইতেই সমুদায় উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

ভট্টিকাব্য

ভট্টিকাব্যে রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকর্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দেশ করেন নাই। প্রামাণিক প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গল কহেন, এই মহাকাব্য ভট্টনামক কবির রচিত। ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও ইহাই সম্যক্ প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু অধুনাতন টীকাকার ভরতমল্লিক, আপন মতের প্রতিপোষক প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভট্টিকাব্যকে ভর্তৃহরিপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভর্তৃহরি ও এই কাব্যের রচয়িতা, উভয়েই অতি প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন, বোধ হয়, এই সাদৃশ্য দর্শনেই ভরতমল্লিকের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। গ্রন্থকর্তা কাব্যের শেষ শ্লোকে (৭) লিখিয়াছেন, আমি বলভীপতি নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম। যদি ভরতমল্লিক এই শ্লোক দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ভ্রমে পতিত হইতেন না। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে ভর্তৃহরি স্বয়ং রাজা ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন, তিনি, অমুক রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলাম, আপন গ্রন্থে কদাচ এরূপ নির্দেশ করেন না। ভরতমল্লিক শেষ চারি শ্লোকের টীকা করেন নাই; তাহাতেই বোধ হইতেছে, এই চারি শ্লোক তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে হৃদয়গ্রাহিণী শরদ্বর্ণনা আছে, তদ্দ্বারা গ্রন্থকর্তার অসাধারণ কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্তার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করা তাদৃশ উদ্দেশ ছিল না। এই নিমিত্তই, ভট্টিকাব্যের অধিকাংশ অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। যদি তিনি, ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া, কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে ভট্টিকাব্য উৎকৃষ্ট মহাকাব্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই।

---

(৭) কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্ন পশ্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যত প্রজানাম্॥

এই যে ছয় মহাকাব্যের বিষয় উল্লিখিত হইল, ইহারাই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত প্রচলিত। ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই এই ছয়ের সচরাচর অনুশীলন আছে।

রাঘবপাণ্ডবীয়

এই মহাকাব্যের প্রণালী স্বতন্ত্র। ইহা দ্ব্যর্থ কাব্য। এক অর্থে রামের চরিত্র বর্ণন প্রতিপন্ন হয়, অপর অর্থে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্তবর্ণন লক্ষিত হয়। এই রূপ এক শ্লোকে অর্থদ্বয় সমাবেশ দ্বারা রাঘব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্তবর্ণন সমাধান করিয়া, কবি স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাঘবপাণ্ডবীয়ের উপক্রমণিকা অংশে গ্রন্থকর্তার নাম কবিরাজপণ্ডিত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু বোধ হয়, ইহা তাঁহার উপাধি, নাম নহে। উপাধি দ্বারাই বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, এই নিমিত্ত গ্রন্থকর্তা আপন গ্রন্থে উপাধিরই নির্দেশ করিয়াছেন। কবি যেরূপ উপাধি অথবা নাম পাইয়াছিলেন, তদনুরূপ কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হন নাই। ইনি কবিত্ববিষয়ে পূর্বনির্দিষ্ট কবিদিগের অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন। এই কাব্য ত্রয়োদশ সর্গে বিভক্ত। পূর্বোক্ত কাব্য সকল যেমন সর্বত্র প্রচলিত, রাঘবপাণ্ডবীয় সেরূপ নহে, ইহা অত্যন্ত বিরলপ্রচার। এত বিরলপ্রচার যে অনেকে ইহার নামও অবগত নহেন। কবিরাজ স্বগ্রন্থে নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি কামদেব রাজার সভায় ছিলেন এবং তৎকর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া রাঘবপাণ্ডবীয় রচনা করেন। কামদেব জয়ন্তীপুরের রাজা ছিলেন এবং মধ্যদেশ হইতে সোমপায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া অনেকে বোধ করেন, কামদেবেরই অপর নাম আদিসূর। আদিসূরেরও মধ্যদেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কিংবদন্তী আছে।

গীতগোবিন্দ

গীতগোবিন্দ জয়দেবপ্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃতভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, এরূপ ললিতপদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনাবিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনিই তৎসর্বোৎকৃষ্ট।

গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে। সঙ্গীতসমূহে রাগতানের বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। অনেকানেক কলাবতেরা, ভাষাসঙ্গীতের ন্যায়, গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দে রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোকেরা অদ্যাপি বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, গীতগোবিন্দের "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশটি কৃষ্ণ জয়দেবের আবাসে আসিয়া স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন। রাধার মানভঞ্জনার্থে যখন কৃষ্ণ অনুনয় করিতেছেন, সেই স্থলে, "মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারম্," এই বাক্য লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই, (কৃষ্ণ রাধিকাকে কহিতেছেন) তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে ভূষণস্বরূপ অর্পণ কর। জয়দেব "মণ্ডনং" পর্যন্ত লিখিয়া, এই ভাবিয়া, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশ সাহস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না যে, প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথা কিরূপে লিখিব। পরিশেষে, ঐ অংশ লিখিতে কোনও ক্রমেই সাহস না হওয়াতে, সে দিবস লেখা রহিত করিয়া তিনি স্নানে গমন করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অত্যন্ত রসিক, সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলে, অপরাধ গ্রহণ করেন এরূপ নহেন; বরং তাঁহার প্রণয়িনীর পদপল্লব তদীয় মস্তকে অর্পিত বর্ণন করিলে, প্রসন্নই হয়েন। অতএব তিনি, প্রস্তুত বিষয়ে স্বীয় পরিতোষ দর্শাইবার এবং পরমভাগবত জয়দেবকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, জয়দেবের স্নানোত্তর প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পূর্বে, তদীয় আকার অবলম্বন করিয়া, স্নাতপ্রত্যাগত জয়দেবের ন্যায়, তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। জয়দেবের ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী রীতিমত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জয়দেবরূপী কৃষ্ণ সেই অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিলেন এবং আহারান্তে জয়দেবের পুস্তক বহিষ্কৃত করিয়া, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশ স্বহস্তে লিখিয়া রাখিলেন। অনন্তর পদ্মাবতী, শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া, রীতিমত তদীয় পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইতে বসিলেন। এই অবসরে প্রকৃত জয়দেবও স্নান করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্মাবতী প্রতিদিন পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া থাকেন, প্রাণান্তেও কদাপি তাঁহার আহারের পূর্বে জলগ্রহণ করেন না। সে দিবস তাঁহাকে অগ্রে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিলেন। জয়দেব, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশটি লিখিত রহিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। পরে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যা পাতিত আছে, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন, আপনাকে যৎপরোনাস্তি ভাগ্যবান্ ও প্রভুর অসাধারণ কৃপাপাত্র স্থির করিয়া, জয়দেব প্রভুর প্রসাদ বলিয়া পদ্মাবতীর পাত্রাবশিষ্ট-গ্রহণ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিলেন।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। (৮) বীরভূমের প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে, অজয় নদের উত্তরতীরে, কেন্দুলি নামে যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিল্ব নামে নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ কেন্দুলি গ্রামে অদ্যাপি, জয়দেবের স্মরণার্থে, প্রতিবৎসর পৌষমাসে বৈষ্ণবদিগের মেলা হইয়া থাকে। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট।

খণ্ডকাব্য

কোনও এক বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ যে কাব্য, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের প্রণালীতে রচিত, কিন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত নহে। কোনও কোনও খণ্ডকাব্য, মহাকাব্যের ন্যায়, সর্গবন্ধে বিভক্ত নয়। আর যে সকল খণ্ডকাব্য সর্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতেও সর্গসংখ্যা আটের অধিক নহে।

মেঘদূত

সংস্কৃতভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত সর্বাংশে সর্বোৎকৃষ্ট। এই অষ্টাদশাধিক শতশ্লোকাত্মক খণ্ডকাব্য কালিদাসপ্রণীত। মেঘদূত এইরূপ ক্ষুদ্র কাব্য বটে, কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ, অত্যন্ত স্ত্রৈণতাপ্রযুক্ত, আপন কর্মে অবহেলা করাতে, কুবের তাহাকে এই শাপ দেন যে তোমাকে একাকী এক বৎসর রামগিরিতে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তদনুসারে, সে তথায় আট মাস বাস করিয়া, স্বীয় প্রিয়তমার অদর্শনদুঃখে উন্মত্তপ্রায় হয়। পরিশেষে, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, নভোমণ্ডলে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার নিমিত্ত, মেঘকে সচেতনবোধে সম্বোধন করিয়া, দৌত্যভারগ্রহণপ্রার্থনা জানাইল, এবং রামগিরি হইতে আপন আলয় পর্যন্ত পথ নির্দেশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। এই বিষয় অতি সুন্দর রূপে মেঘদূতে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাস এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, উপবন, গ্রাম, নগর, ক্ষেত্র, দেবালয় ও রাজধানী এবং হিমালয়, অলকা, যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্য-সামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত। মেঘদূতের রচনা কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের রচনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুরূহ।

---

(৮) বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন॥

ঋতুসংহার

কালিদাসপ্রণীত এই খণ্ডকাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। এক এক সর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির, বসন্ত, ছয় ঋতু বর্ণিত হইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলঙ্কার, ঋতুসংহার আদ্যোপান্ত তাহাতে অলঙ্কৃত। কিন্তু রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের তাদৃশ মনোরম বোধ হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ইহাকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলেন না। কেহ কেহ ঋতুসংহারকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশী এই সকল সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। ঋতুসংহার রঘুবংশাদি অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন বটে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে, রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কারবিবর্জিত ও সহৃদয়-পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া অভিনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে, ঋতুসংহারে সেই সমস্ত গুণের সমুদায় লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণন সাতিশয় মনোহর।

নলোদয়

নলোদয়ের প্রত্যেক শ্লোক যমকালঙ্কারযুক্ত। এই কাব্য কালিদাসপ্রণীত। ইহাতে নলরাজার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস, যমকের দিকেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখাতে, স্বপ্রণীত অন্যান্য কাব্যের ন্যায়, নলোদয়কে স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির লক্ষণে লক্ষিত করিবার অবকাশ পান নাই।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, কালিদাস ঘটকর্পরের গর্ব খর্ব করিবার নিমিত্ত নলোদয় রচনা করেন। ঘটকর্পরও, কালিদাসের ন্যায়, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্বর্তী। ইনি যমকালঙ্কারযুক্ত দ্বাবিংশতি শ্লোক রচনা করেন। এই দ্বাবিংশতিশ্লোকাত্মক কাব্য ঘটকর্পর নামে প্রসিদ্ধ। ঘটকর্পরের বিশেষ প্রশংসা করা যায় এমন কোনও গুণ নাই। গ্রন্থকর্তা শেষ শ্লোকে কহিয়াছেন, "যে কবি যমক লিখিয়া আমাকে পরাজয় করিতে পারিবেক, আমি ঘটকর্পর অর্থাৎ কলসীর খাপরা দ্বারা তাহার বারি বহন করিব।"(৯) কবির এই প্রতিজ্ঞাবাক্য দর্শনে একপ্রকার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ঘটকর্পরঘটিত প্রতিজ্ঞা দ্বারাই তাঁহার ও তাঁহার কাব্যের নাম ঘটকর্পর হইয়াছে। এরূপ কিংবদন্তী আছে, ঘটকর্পরের এই গর্বিত প্রতিজ্ঞা দর্শনে রোষপরবশ হইয়া কালিদাস নলোদয় রচনা করেন। ঘটকর্পর অপেক্ষা নলোদয়ে যমকের আড়ম্বর অনেক অধিক। যদি ঐ কিংবদন্তী সমূলক হয়, তাহা হইলে, কালিদাস ঘটকর্পরের যমকরচনাগর্ব বিলক্ষণ খর্ব করিয়াছিলেন।

---

(৯) জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ ॥

সূর্যশতক

সূর্যশতক ময়ূরভট্টপ্রণীত। ময়ূরভট্ট এক শত শ্লোকে সূর্যের ও তদীয় মণ্ডল, কিরণ, অশ্ব ও সারথির বর্ণনা ও স্তব করিয়াছেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, ময়ূরভট্ট এই শতশ্লোকাত্মক সূর্যস্তব রচনা করিয়া কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সূর্যশতকের রচনা অতিপ্রগাঢ় ও অতিসুন্দর; ইহাতে অসাধারণ কবিত্বশক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ময়ূরভট্টের যেরূপ রচনাশক্তি ও যেরূপ কবিত্বশক্তি ছিল, তাহা বিষয়ান্তরে প্রয়োজিত হইলে, তিনি সূর্যশতক অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারিতেন।

কোষকাব্য

পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য বলে।

অমরুশতক

সংস্কৃতভাষায় যত কোষকাব্য আছে, তন্মধ্যে অমরুশতক সর্বোৎকৃষ্ট। এই শতশ্লোকাত্মক কাব্যের রচনা অতি উত্তম। রচনা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা প্রাচীন গ্রন্থ। এই কাব্যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে, অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়, অমরুশতকের পাঠেও তদনুরূপ হইয়া থাকে। অমরু যে এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। অমরু অধিক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, যথার্থ বটে; কিন্তু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রধান কবি বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবার সম্পূর্ণ সংস্থান হইয়াছে।

অমরুশতক আদিরসাশ্রিত কাব্য; কিন্তু এক টীকাকার, প্রথমতঃ আদিরস পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া, পক্ষান্তরে শান্তিরসাশ্রিত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার, অমরুশতকের শান্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়া, কেবল উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে, একটি শ্লোকেরও শান্তি পক্ষে সম্যক্ অর্থসমাবেশ হইয়া উঠে নাই।

শান্তিশতক

এই শান্তরসাশ্রিত শতক কাব্য শিহ্লণপ্রণীত। শিহ্লণ উত্তম কবি ছিলেন; এবং অর্থলাভার্থে পরোপাসনা, লোভ, বিষয়াসঙ্গ ইত্যাদির নিন্দা, এবং বিষয়ের অনিত্যতাপ্রতিপাদন ও যদৃচ্ছালাভসন্তোষ প্রভৃতির, স্বীয় শতকে সৎকবির ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন। শান্তিশতকের রচনা উত্তম। সমুদায় পর্যালোচনা করিলে শান্তিশতক উৎকৃষ্ট কাব্য।

নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক

নীতিশতকে নানা সুনীতির উপদেশ আছে। শৃঙ্গারশতকের সমুদায় শ্লোক আদিরসাশ্রিত। বৈরাগ্যশতক সর্বাংশে শান্তিশতকের তুল্য। তিনের মধ্যে নীতিশতক সর্বোৎকৃষ্ট। এই তিন শতকের রচয়িতার নাম ভর্তৃহরি। ভর্তৃহরির রচনাও উত্তম এবং কবিত্বশক্তিও বিলক্ষণ ছিল। অনেকে কহিয়া থাকেন, এই ভর্তৃহরিই বিক্রমাদিত্যের সহোদর। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে বিক্রমসোদর ভর্তৃহরি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন এবং পরিশেষে স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থার সহিত তিন কাব্যার্থের যেরূপ ঐক্য হইতেছে, তাহাতে এই তিন কাব্য তাঁহার রচিত, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

আর্যাসপ্তশতী

এই সপ্তশতশ্লোকাত্মক কাব্য আর্যা ছন্দে রচিত, এই নিমিত্ত ইহা আর্যাসপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকর্তার নাম গোবর্ধন, এই নিমিত্ত গোবর্ধনসপ্তশতী নামেও নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোবর্ধন সৎকবি ছিলেন। তাঁহার রচনা সরল ও মধুর। জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে গোবর্ধনের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। (১০)

গদ্যকাব্য

কাদম্বরী

সংস্কৃতভাষায় গদ্যসাহিত্যগ্রন্থ অধিক নাই। যে কয়েকখানি গদ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাদম্বরী সর্বশ্রেষ্ঠ। কাদম্বরী গদ্যে রচিত বটে, কিন্তু অতি প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত। এই গ্রন্থ বাণভট্টপ্রণীত। বাণভট্ট মহাকবি ও সংস্কৃত রচনায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। কাব্যশাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের বর্ণন করিতে হয়, বাণভট্ট এই গ্রন্থে তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। যখন যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই অসাধারণ। তাঁহার বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ়। রচনার বিশেষ প্রশংসা এই, বাণভট্ট যে সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন, তাহার একটিও পরিবর্তসহ নহে।

এই গ্রন্থে চন্দ্রাপীড়নামক রাজকুমার ও গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের কন্যা কাদম্বরীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই গদ্যকাব্যের যে স্থলে, মহাশ্বেতানাম্নী এক তপস্বিনী, চন্দ্রাপীড়ের নিকট, পরিদেবিতপরিপূর্ণ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, ঐ অংশ এমন মনোহর যে বোধ হয় কোনও দেশের কোনও কবি তদপেক্ষায় অধিক মনোহর রচনা বা বর্ণনা

(১০) শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্যগোবর্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ।

করিতে পারেন নাই। মহাশ্বেতার উপাখ্যান এই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ।

কাদম্বরী, এইরূপ অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও, দোষস্পর্শশূন্য নহে। বাণভট্ট মধ্যে মধ্যে শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভাসঘটিত রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থলে গ্রন্থকর্তার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও ঐরূপ রচনাকে চিত্তরঞ্জন জ্ঞান করিয়া থাকেন, যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সকল স্থল যে দুরূহ ও নীরস, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘসমাসঘটিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্য আছে। এই দ্বিবিধ দোষস্পর্শ না থাকিলে কাদম্বরীর ন্যায় কাব্যগ্রন্থ অতি অল্প পাওয়া যাইত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, বাণভট্ট আপন গ্রন্থ সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে পর্যন্ত লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কাদম্বরীর পূর্বভাগ নামে প্রসিদ্ধ। তদীয় পুত্র উপাখ্যানের উত্তরভাগ সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু পুত্র পৈতৃক অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি বা অসাধারণ রচনাশক্তির উত্তরাধিকারী হয়েন নাই। উত্তরভাগ কোনও ক্রমেই পূর্বভাগের যোগ্য নহে।

দশকুমারচরিত

দশকুমারচরিত এক অত্যুত্তম গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু কাব্যাংশে তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয়। রচনা অতি উত্তম বটে, কিন্তু কাদম্বরীর রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী নহে। এই গ্রন্থে নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে; কিন্তু বর্ণনা সকল যেরূপ কৌতুকবাহিনী, সেরূপ রসশালিনী নহে। পাঠ করিলে প্রীত ও চমৎকৃত হওয়া যায়, দশকুমারচরিত সেরূপ গ্রন্থ নয়। গ্রন্থকর্তার নাম দণ্ডী।

দশকুমারচরিতশব্দে দশ কুমারের বৃত্তান্তবর্ণনাত্মক গ্রন্থ বুঝায়। কিন্তু যে দশকুমার-চরিত দণ্ডিপ্রণীত বলিয়া প্রচলিত, তাহাতে আট কুমারের চরিত্র মাত্র বর্ণিত আছে। সুতরাং এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণবৎ বোধ হইতেছে। যেরূপে গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে, তাহা কোনও ক্রমেই সংলগ্ন বোধ হয় না। আমরা যে সকল ব্যক্তি ও বৃত্তান্তের বিষয় বিন্দু বিসর্গও অবগত নহি, এককালে সেই সকল বিষয়ের আরম্ভ হইতেছে। সমাপ্তিও আরম্ভের ন্যায় অসংলগ্ন। অষ্টম কুমারের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে বর্ণিত হইল, এরূপ প্রতীতি হয় না। এইরূপে দশকুমারচরিতের উপক্রম ও উপসংহার উভয়ত্রই ন্যূনতা প্রতিভাসমান হইতেছে।

উপক্রমের ন্যূনতাপরিহারার্থে পূর্বপীঠিকা নামে এক উপক্রমণিকা রচিত হইয়াছে। এই উপক্রমণিকাতে, দশ সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, আর দুই কুমারের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। এই অংশও দণ্ডীর নিজের রচিত বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু উপক্রমণিকার ও দশকুমারচরিতের রচনা পরস্পর এরূপ বিসংবাদিনী যে ঐ উভয় এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া কোনও ক্রমেই প্রতীতি হয় না।

দশকুমারচরিতের যেরূপ এক উপক্রমণিকা আছে, সেইরূপ এক পরিশিষ্টও আছে। ইহার নাম শেষ অর্থাৎ কথার অবশিষ্টাংশ। এই অবশিষ্টাংশ চক্রপাণিদীক্ষিতনামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের রচিত। আমরা এ পর্যন্ত এই পুস্তক দেখিতে পাই নাই। সুবিখ্যাত সংস্কৃতবেত্তা শ্রীযুত হোরেস্ হেমেন্ উইলসন্ ঐ পুস্তক দেখিয়াছেন। তিনি কহেন যে চক্রপাণি নিজ রচনার উৎকর্ষ সাধনার্থে যথেষ্ট শ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনা দণ্ডীর রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিশেষতঃ, উপাখ্যানভাগ এমন অসার ও অকিঞ্চিৎকর যে পাঠ করিলে পরিশ্রম পোষায় না।

অনেকে অনুমান করেন, দণ্ডী গ্রন্থকর্তার নাম নহে; ইহা তাঁহার উপাধি মাত্র। যাহারা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দণ্ডী কহে। এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। আর এই গ্রন্থকর্তার বিষয়ে যে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারাও উক্ত অনুমানের বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে। দণ্ডীদিগের নিয়মিত বাসস্থান নাই, তাঁহারা সর্বদা পর্যটন করেন। কেবল বর্ষা চারি মাস, পর্যটনে অশেষ ক্লেশ বলিয়া, কোনও গৃহস্থের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমাদিগের দণ্ডীও গৃহস্থের ভবনে বর্ষা চারি মাস বাস করিতেন, এবং সেই অবকাশে এক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিতেন। যে বার যে গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিতেন, বর্ষান্তে প্রস্থানকালে, স্বরচিত পুস্তকখানি তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেন। দশকুমার-চরিত দণ্ডীর এক বর্ষা চারি মাসের রচনা। আর কাব্যাদর্শ নামে দণ্ডীর যে অলঙ্কার-গ্রন্থ আছে, তাহাও আর এক বর্ষা চারি মাসের পরিশ্রম। যদি এই কিংবদন্তী অমূলক না হয়, তাহা হইলে, দশকুমারচরিতের উপক্রমে ও উপসংহারে যে ন্যূনতা আছে, তাহারও এক প্রকার হেতু উপলব্ধ হইতেছে। যেহেতু, কিংবদন্তী ইহাও নির্দেশ করিয়া থাকেন, দণ্ডী যে বর্ষাতে দশকুমারচরিত রচনা করেন, সেই বর্ষাতেই তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। এই নিমিত্ত তিনি দশকুমারচরিতের কথা সমাপ্ত ও পূর্বাপরসংলগ্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বাসবদত্তা

বাসবদত্তা সুবন্ধুনামক কবির রচিত। সুবন্ধু স্বগ্রন্থের সমাপিকাতে বররুচির ভাগিনেয় বলিয়া, আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (১১) বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্বর্তী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সুবন্ধু বাসবদত্তা রচনা করেন; এবং গুণগ্রাহী বিক্রমাদিত্য বিদ্যমান নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। (১২)

বাণভট্টের কাদম্বরী ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা এই উভয় গ্রন্থ এক প্রণালীতে রচিত। বোধ হয়, এরূপ রচনাপ্রণালী সুবন্ধুই প্রথম উদ্ভাবিত করেন। বাণভট্ট যে

(১১) ইতি শ্রীবররুচিভাগিনেয়সুবন্ধুবিরচিতা বাসবদত্তাখ্যায়িকা সমাপ্তা।

(১২) সারসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে। বাসবদত্তা।

বিক্রমাদিত্যের সময়ের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। এই গ্রন্থে কন্দর্পকেতুনামক এক রাজকুমার ও বাসবদত্তানাম্নী এক রাজকুমারীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

সুবন্ধু বাসবদত্তারচনাতে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল না। কি রচনা, কি বর্ণনা, কি কথাযোজনা, সুবন্ধুর বাসবদত্তা সর্বাংশেই মধ্যবিধ। পাঠ করিলে এই গ্রন্থ প্রধান কবির রচিত বলিয়া প্রতীতি হয় না। কিন্তু গ্রন্থের আরম্ভে যে কয়েকটি শ্লোক আছে এবং গ্রন্থের মধ্যে কবি যে দুই শ্লোকে কুপিত সিংহের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মনোহর।

চম্পূকাব্য

আমরা যে কয়েকখানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য একখানিও নাই। কালিদাস ও বাণভট্ট, ভারবি ও ভবভূতি, মাঘ ও শ্রীহর্ষদেব প্রভৃতি প্রধান কবিরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর, যদিই কোনও প্রধান কবি চম্পূকাব্য রচনা করিয়া থাকেন, হয় তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান নাই, অথবা এপর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই।

আমরা যে সাতখানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে দেবরাজবিরচিত অনিরুদ্ধচরিত সর্বোৎকৃষ্ট। দেবরাজের রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না। যে ভোজদেবকে বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহিতা বিষয়ে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বলিয়া গণনা করিতে হয়, তাঁহার রচিত চম্পূরামায়ণ ও চিরঞ্জীববিরচিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী নিতান্ত অগ্রাহ্য চম্পূ নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, অনন্তভট্টপ্রণীত চম্পূভারত, ভানুদত্তবিরচিত কুমারভার্গবীয়, রামনাথকৃত চন্দ্রশেখরচেতোবিলাসচম্পূ, এবং রূপগোস্বামিলিখিত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, এই কয়েক চম্পূকে কাব্যনামে নির্দেশ করিতে পারা যায় এমন কোনও বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

দৃশ্যকাব্য

মহাকাব্য প্রভৃতি কেবল শ্রবণ করা যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে শ্রব্যকাব্য বলে। নাটকের, শ্রব্যবাক্যের ন্যায়, শ্রবণ হয় ; অধিকন্তু, রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়কালে, দর্শনও হইয়া থাকে। এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য দ্বিবিধ ; রূপক ও উপরূপক। রূপক নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি দশবিধ। উপরূপক নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ। আলঙ্কারিকেরা দৃশ্যকাব্যের এই যে অষ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষভেদগ্রাহক তাদৃশ কোনও লক্ষণ নাই। সর্বপ্রধান ভেদ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, দৃশ্যকাব্যের অন্যান্য ভেদও সেই সমুদায় লক্ষণে আক্রান্ত। আলঙ্কারিকেরা অন্যান্য ভেদের, অঙ্কসংখ্যার ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি, যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ

করিয়াছেন, তাহা এমন সামান্য যে সেই অনুরোধে, দৃশ্যকাব্যের অষ্টাবিংশতি বিভাগ কল্পনা না করিয়া, যাবতীয় দৃশ্যকাব্যকে কেবল নাটক নামে নির্দেশ করিলেই ন্যায়ানুগত হইত।

প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার, অর্থাৎ প্রধান নট, স্বীয় পত্নী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া, কবির ও নাটকের নাম নির্দেশ করে এবং প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। এই অংশকে প্রস্তাবনা কহে। যে স্থলে ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই সেই স্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক। নাটকে এক অবধি দশ পর্যন্ত অঙ্কসংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত এক ভাষায় রচিত নহে, ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য ভাষাবিশেষে সঙ্কলিত হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত, নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সংস্কৃতভাষী; স্ত্রী, বালক ও অপ্রধান পুরুষদিগের ভাষা প্রাকৃত। প্রাকৃত সংস্কৃতের অপভ্রংশ। আলঙ্কারিকেরা এই অপভ্রংশের, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যনিবন্ধন, সপ্তদশ ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে পণ্ডিতা তপস্বিনীরা সংস্কৃতভাষিণী। অশুভ ঘটনা দ্বারা সংস্কৃত নাটকের উপসংহার করিতে নাই। সংস্কৃতভাষায় আদিরস, বীররস ও করুণরস প্রধান নাটক অনেক।

মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্যের ন্যায়, সংস্কৃত ভাষায় নাটকও অনেক আছে। কালিদাস প্রভৃতি প্রধান কবিগণ এই ভাষায় নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে এই ভারতবর্ষে রঙ্গভূমিতে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত।

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা ভরতমুনিকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও কহেন, এই ভরতমুনি অপ্সরাদিগের নাট্যব্যাপারের উপদেষ্টা। অপ্সরারা, ইঁহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়, নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে। এরূপ নাট্যাচার্য যে কোন কালেই বিদ্যমান ছিলেন না, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা স্ব স্ব গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে ভরতসূত্র বলিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, নাটকরচনা বিষয়ে সংস্কৃতভাষায় এক অতি প্রাচীন গ্রন্থ ছিল; ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা, অবিসংবাদিত প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থে, ঐ গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

কেবল এই বিষয়েই নহে, অন্যান্য বিদ্যা বিষয়েও, এই প্রথা লক্ষিত হইতেছে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাকরণ পাণিনিমুনিপ্রণীত বলিয়া প্রচলিত। ঐ ব্যাকরণের বার্তিক কাত্যায়ন মুনির রচিত, ভাষ্য পতঞ্জলিমুনিপ্রণীত। যে সর্পরাজ অনন্তদেব, পুরাণ-মতানুসারে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ফণমণ্ডলোপরি ধারণ করিয়া আছেন, পতঞ্জলি তাঁহার অবতার। সর্পের অবতার মুনির রচিত বলিয়া, ঐ ভাষ্য ফণিভাষ্য নামে

প্রসিদ্ধ। যাবতীয় পুরাণ মহর্ষিব্যাসরচিত বলিয়া প্রচলিত। ধর্মশাস্ত্র সকল মনু, অত্রি, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি এক এক মুনির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা এই ছয় দর্শন কপিল ও পতঞ্জলি, গোতম ও কণাদ, ব্যাস ও জৈমিনি এই ছয় মুনির নামে প্রচলিত। তন্ত্র সকল যে ইদানীন্তন কালের রচিত গ্রন্থ, তাহার কোনও সংশয় নাই—এত ইদানীন্তন যে, কোনও কোনও তন্ত্রে ইয়ুরোপীয় লোক ও লণ্ডননগরেরও নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। (১৩) এই সকল তন্ত্র শিবপ্রোক্ত বলিয়া প্রচলিত। বেদ সকল সৃষ্টিকর্তার নিজের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই রূপে, নব্য কাব্য ও সংগ্রহগ্রন্থ ভিন্ন, প্রায় সমুদায় সংস্কৃত শাস্ত্রই এক এক মুনির অথবা দেবতার প্রণীত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র

সংস্কৃতভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। এই অপূর্ব নাটকের, আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত, সর্বাংশই সর্বাঙ্গসুন্দর। যদি শত বার পাঠ কর, শত বারই অপূর্ব বোধ হইবে। এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার, তৃতীয় অঙ্কে উভয়ের মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুষ্মন্তসমীপগমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ, সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন ; এই সকল স্থলে কালিদাস স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তি ঐ সকল স্থল পাঠ করিলে, অবশ্যই তাঁহার অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবেক যে মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল অপূর্ব পদার্থ।

ভারতবর্ষীয়েরাই যে, স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া, শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন, এমন নহে ; দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক, প্রশংসা করিয়াছেন। নানাবিদ্যাবিশারদ, অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম্ জোন্স শকুন্তলা পাঠ করিয়া এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি শেক্সপিয়রের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং জর্মনদেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি, গেটি, শকুন্তলার সর্ উইলিয়ম্ জোন্সকৃত ইঙ্গরেজী অনুবাদের ফর্ষ্ট'রকৃত জর্মন অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ

(১৩) পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরঙ্গভাষয়া তন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ভুবি।
অধিপা মণ্ডলামাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥
মেরুতন্ত্র। ২৩ প্রকাশ।

স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে ; তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞানশকুন্তল ! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি ; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।" যদি বিদেশীয় লোক, অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া, এত প্রীত ও চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা যে, সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া, কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

বিক্রমোর্বশী পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে পুরূরবাঃ ও উর্বশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমোর্বশীর আদ্যোপান্ত শকুন্তলার ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু, চতুর্থ অঙ্কে, উর্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন হইয়া, পুরূরবাঃ তদীয় অন্বেষণার্থে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এই বিষয়ের যে বর্ণন আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর —এমন মনোহর যে, কোনও দেশীয় কোনও কবি তদপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেক না।

কালিদাসের তৃতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র। মালবিকাগ্নিমিত্র উত্তম নাটক বটে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল ও বিক্রমোর্বশী অপেক্ষা অনেক ন্যূন। এই নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে মালবিকা ও অগ্নিমিত্র রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয়, কালিদাস সর্বপ্রথম এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব

এই তিন নাটক ভবভূতির প্রণীত। ভবভূতি একজন অতিপ্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নাম নির্দেশ হওয়া উচিত। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতিচমৎকারিণী। সংস্কৃতভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতিপ্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ইনি, অন্য অন্য কবিগণের ন্যায় মধুর ও কোমল রচনাতে বিলক্ষণ প্রবীণ ছিলেন ; অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্যান্য কবিরা অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। অনাবশ্যক স্থলে কোনও ক্রমেই স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন বিশেষ গুণ আছে, তেমনই কয়েকটি বিশেষ দোষও আছে। রচনার দোষে স্থানের স্থানের অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট ; এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথনস্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য।

বীরচরিতে রামের বিবাহ অবধি রাবণবধানন্তর অযোধ্যা প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বীররসাশ্রিত নাটক। বীরচরিতে ভবভূতির কবিত্বশক্তি

বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকিলে নাটক প্রশংসনীয় হয়, তৎসমুদায় তাদৃশ অধিক নাই। তথাপি, রামচরিতের এই অংশ লইয়া অন্যান্য কবিরা যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, বীরচরিত সেই সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উত্তম, তাহার সন্দেহ নাই।

উত্তরচরিতে বীরচরিতবর্ণিতাবশিষ্ট রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরচরিত ভবভূতির সর্বপ্রধান নাটক। এই নাটক করুণরসাশ্রিত। বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, ললিত ও প্রগাঢ়। ফলতঃ, শকুন্তলা আদিরসবিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরসবিষয়ে সেইরূপ। এই নাটক পাঠ করিলে মোহিত হইতে ও মুহুর্মুহুঃ অশ্রুপাত করিতে হয়।

মালতীমাধব আদিরসাশ্রিত নাটক। ভবভূতি এই নাটকে আপন অসাধারণ রচনাশক্তি ও অসাধারণ কবিত্বশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং প্রস্তাবনাতে গর্বিত বাক্যে কহিয়াছেন, "যাহারা আমার এই নাটকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে, তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়; আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোনও ব্যক্তি এই অসীম ভূমণ্ডলের কোনও স্থানে থাকিতে পারেন, অথবা কোনও কালে উৎপন্ন হইতে পারেন।" (১৪) কিন্তু ভবভূতি অসাধারণ উৎকর্ষ সম্পাদনার্থে যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং প্রস্তাবনাতে যেরূপ অসদৃশ অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়াছেন, মালতীমাধব তত উত্তম নাটক হয় নাই। ইহাতে রচনার চাতুর্য ও মাধুর্য আছে এবং অর্থেরও অসাধারণ গাম্ভীর্য আছে, যথার্থ বটে; কিন্তু কালিদাস এবং শ্রীহর্ষদেব দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার, বৎসরাজ ও রত্নাবলীর উপাখ্যান যেরূপ মনোহর করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, মালতী ও মাধবের বৃত্তান্ত ভবভূতি সেরূপ মনোহর করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, অর্থবোধের কষ্ট ও অতিদীর্ঘ সমাস প্রভৃতি ভবভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, তৎসমুদায় মালতীমাধবেই ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয়। আমরা, মালতীমাধব পাঠ করিয়া, ভবভূতির অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অসাধারণ রচনাশক্তির প্রশংসা করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু মালতীমাধবকে অত্যুৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কোনও ক্রমেই সম্মত নহি। ভবভূতি যত অহঙ্কার করুন না কেন, তাঁহার মালতীমাধব কালিদাসের শকুন্তলা, শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী এবং তাঁহার নিজের উত্তরচরিত অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন। ভবভূতি স্বপ্রণীত নাটকত্রয়ের মধ্যে, বোধ হয়, মালতীমাধবকেই সর্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠকবর্গের বিবেচনা যেরূপ পক্ষপাতশূন্য হয়, গ্রন্থকর্তাদের নিজের বিবেচনা সর্বদা সেরূপ হইয়া উঠে না।

---

(১৪) যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

বোধ হয়, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই উত্তরচরিতকে ভবভূতির সর্বোৎকৃষ্ট নাটক জ্ঞান করিয়া থাকেন।

রত্নাবলী ও নাগানন্দ

রত্নাবলী এক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক—এমন উৎকৃষ্ট যে অনেকে রত্নাবলীকে যাবতীয় নাটক অপেক্ষা সমধিক মনোহর জ্ঞান করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, উৎকর্ষ অনুসারে পৌর্বাপর্যক্রমে গণনা করিতে হইলে, শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের পরে রত্নাবলীর নাম নির্দেশ হওয়া উচিত। রত্নাবলী চারি অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে বৎসরাজ ও সাগরিকার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। রাজদর্শনানন্তর সাগরিকার বিরহ, সাগরিকার সহিত অকস্মাৎ রাজার সাক্ষাৎকার, ও রাজমহিষী বাসবদত্তার বেশে সাগরিকার রাজসমাগম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে এই সকল বিষয় বর্ণনকালে, কবি যেরূপ কৌশল ও যেরূপ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, বোধ হয় শকুন্তলা ও উত্তরচরিত ভিন্ন প্রায় আর কোনও নাটকেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাগানন্দও উত্তম নাটক বটে, কিন্তু রত্নাবলী অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

রত্নাবলী ও নাগানন্দ শ্রীহর্ষদেবপ্রণীত। শ্রীহর্ষদেব কশ্মীরের রাজা ছিলেন। কহ্লণরাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে শ্রীহর্ষদেবের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। রাজতরঙ্গিণীতে রত্নাবলী ও নাগানন্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু এরূপ লিখিত আছে, শ্রীহর্ষদেব অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সর্ব ভাষায় সৎকবি ও সমস্ত বিদ্যার আধার ছিলেন। (১৫) রত্নাবলী ও নাগানন্দের প্রস্তাবনাতে রাজশ্রীহর্ষদেবপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ আছে, এবং রাজতরঙ্গিণীতেও রাজা শ্রীহর্ষদেব সৎকবি বলিয়া লিখিত আছে; সুতরাং, রাজতরঙ্গিণীর শ্রীহর্ষদেব যে রত্নাবলী ও নাগানন্দের রচয়িতা, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ, আর কোনও গ্রন্থে আর কোনও রাজা শ্রীহর্ষদেবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীহর্ষদেব, কিঞ্চিদধিক আট শত বৎসর পূর্বে, কশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, রত্নাবলী ও নাগানন্দ আট শত বৎসরের পুস্তক।

এরূপ প্রবাদ আছে, ধাবক নামে এক কবি রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করেন; শ্রীহর্ষদেব, অর্থ প্রদান দ্বারা ধাবককে সম্মত ও সন্তুষ্ট করিয়া, ঐ দুই নাটক আপন নামে প্রচলিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রধান আলঙ্কারিক মম্মটভট্টের লিখনদ্বারাও এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। (১৬) কিন্তু ধাবক ও শ্রীহর্ষদেবে সহস্র বৎসরেরও অধিক অন্তর। উভয়ে এক সময়ের লোক নহেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের

(১৫) সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষ্বপি ॥ ৬১১।

(১৬) শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্। কাব্যপ্রকাশ।

প্রস্তাবনাতে, প্রাচীন নাটকলেখক বলিয়া, ধাবকের নামোল্লেখ আছে। (১৭) তদনুসারে ধাবক বিক্রমাদিত্যের সময়েরও পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং, ঐ লোকপ্রবাদ ও তন্মূলক মম্মটের সিদ্ধান্ত অমূলক বোধ হইতেছে। আর, যখন শ্রীহর্ষদেবের সৎকবিত্ব ও অশেষবিদ্যাশালিত্ব প্রামাণিক পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন, অমূলক লোকপ্রবাদ ও তন্মূলক মম্মটের লিখন রক্ষার্থে, ধাবকান্তর কল্পনা করিয়া, শ্রীহর্ষদেবের কবিকীর্তি লোপ করা কোনও ক্রমেই ন্যায়ানুগত বোধ হইতেছে না।

মৃচ্ছকটিক

মৃচ্ছকটিকের রচনা ও বর্ণনা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বোধ হয়, সংস্কৃতভাষায় এক্ষণে যত নাটক আছে, মৃচ্ছকটিক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। গ্রন্থকর্তার নাম শূদ্রক। শূদ্রক বিক্রমাদিত্যের পূর্বে ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (১৮) মৃচ্ছকটিকলেখক সৎকবি ও সংস্কৃত রচনায় অতি প্রবীণ ছিলেন। এই নাটকের স্থানে স্থানে অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে ; শ্লোক সকল অতিসুন্দর ; আদ্যোপান্তের রচনা অতি প্রাঞ্জল। সমুদায় পর্যালোচনা করিলে, মৃচ্ছকটিক অতি উত্তম কাব্য বটে ; কিন্তু সর্বাংশে প্রশংনীয় নাটক বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, মৃচ্ছকটিক নাটকাংশে শকুন্তলা, উত্তরচরিত ও রত্নাবলী অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

প্রস্তাবনাতে মৃচ্ছকটিক শূদ্রকপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ আছে। কিন্তু, প্রস্তাবনার সমুদায় অংশ বিবেচনা করিলে, শূদ্রকরাজার গ্রন্থকর্তৃত্ববিষয়ে নানা সংশয় উপস্থিত হয়। প্রস্তাবনাতে লিখিত আছে, "গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সুঘটিতকলেবর,

---

(১৭) প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং
প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য
কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।

(১৮) ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব।
ত্রিশতে চ দশন্যূনে হ্যস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি॥
শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ।
নৃপান্ সর্ব্বান্ পাপরূপান্ বর্দ্ধিতান্ যো হনিষ্যতি॥
চর্ব্বিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যতে ভূভরাপহঃ।
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে॥
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি।
শুক্লতীর্থে সর্ব্বপাপনির্মুক্তিং যোঽভিলপ্স্যতে॥
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে॥

কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধ্যায়

অগাধবুদ্ধিশালী শূদ্রকনামে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।" (১৯) "শূদ্রক স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত দেখিয়া, মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন।" (২০) শূদ্রক রাজা, কবি ও অগাধবুদ্ধিশালী হইয়া, গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সুঘটিতকলেবর ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা আপন গ্রন্থে আপনার বর্ণন করিবেন, সম্ভব বোধ হয় না। বিশেষতঃ, এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা স্বীয় প্রাণত্যাগের বিষয় স্বগ্রন্থে নির্দেশ করা কোনও ক্রমেই সংলগ্ন হইতে পারে না। ইহাতে, অনায়াসে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, মৃচ্ছকটিক শূদ্রকরাজার প্রণীত নহে, অথবা, প্রস্তাবনাংশ শূদ্রকের মৃত্যুর পর অন্য দ্বারা রচিত ও মৃচ্ছকটিকে যোজিত হইয়াছে। কিন্তু, প্রস্তাবনার ও নাটকের রচনার এরূপ সৌসাদৃশ্য যে এই দুই বিষয় বিভিন্ন লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত, এরূপ প্রতীতি হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ, প্রস্তাবনা গ্রন্থকর্তা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হয়, এরূপ ব্যবহার অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা নাটকের অবয়বস্বরূপ, তাহা অন্য ব্যক্তি দ্বারা সঙ্কলিত হওয়া কোনও ক্রমে সঙ্গত বোধ হয় না।

মুদ্রারাক্ষস

মুদ্রারাক্ষস বিশাখদেবপ্রণীত। প্রস্তাবনায় নির্দিষ্ট আছে, বিশাখদেব রাজার পুত্র। বিশাখ সৎকবি ও সংস্কৃতরচনাবিষয়ে অতি প্রবীণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনা সম্যক্ প্রাঞ্জল ও ললিত নহে। যাহা হউক, মুদ্রারাক্ষস এক অত্যুত্তম নাটক। চাণক্য, নন্দবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে নিবিষ্ট করেন। কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট নন্দবংশের অমাত্য রাক্ষস অত্যন্ত প্রভুপরায়ণ ও নীতিবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের প্রতিপক্ষ থাকিলে, তদীয় সিংহাসন বদ্ধমূল হয় না ; এই নিমিত্ত চাণক্য, স্বীয় অসাধারণ কৌশলে ও নীতিপ্রভাবে, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের প্রধানামাত্যপদ স্বীকার করান। এই বিষয় মুদ্রারাক্ষসে অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বেণীসংহার

বেণীসংহার ভট্টনারায়ণপ্রণীত। এরূপ কিংবদন্তী আছে, আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ হইতে গৌড়দেশে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে এক

---

(১৯) এতৎ কবিঃ কিল
দ্বিরদেন্দ্রগতিশ্চকোরনেত্রঃ পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ।
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবির্বভূব প্রথিতঃ শূদ্রক ইত্যগাধসত্ত্বঃ

(২০) রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্টা।
লব্ধা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥

জন। এই নাটক নাটকের প্রায় সমুদায়লক্ষণাক্রান্ত। সাহিত্যদর্পণের পরিচ্ছেদে, নাটকসংক্রান্ত বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শনার্থে, বেণীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য কোনও নাটক হইতে তত নহে। কিন্তু, ভট্টনারায়ণের রচনা প্রাচীন কবিদিগের রচনার ন্যায় মনোহারিণী নহে। রচনার ন্যূনতাপ্রযুক্তই বেণীসংহার, নাটকের সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, কাব্যাংশে শকুন্তলা, উত্তরচরিত, রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ন্যূন। বেণীসংহার বীররসাশ্রিত নাটক। ইহাতে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বীর ও করুণ রস সংক্রান্ত উত্তম উত্তম রচনা ও উত্তম উত্তম বর্ণনা আছে।

যে সকল নাটকের বিষয় উল্লিখিত হইল, সংস্কৃতভাষায় তদ্ব্যতিরিক্ত অনেক নাটক আছে; বাহুল্যভয়ে এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না। সমুদয়ে বিরাশি-খানি নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে তেত্রিশখানি মাত্র বিদ্যমান বলিয়া বিজ্ঞাত; অবশিষ্ট সকলের দশরূপকে ও সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে, এবং উদাহরণপ্রদর্শনার্থে অনেকেরই কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কুন্দমালা, উদাত্তরাঘব, বালরামায়ণ প্রভৃতি কতিপয় নাটকের উদ্ধৃত অংশ দর্শনে বোধ হয়, ঐ সকল নাটক অত্যুৎকৃষ্ট।

উপাখ্যান

বালকদিগের শিক্ষার্থে মনুষ্য, পশু, পক্ষীর কল্পিতবৃত্তান্তঘটিত যে সকল গ্রন্থ আছে, অথবা গ্রন্থকর্তারা স্বেচ্ছানুসারে নানা লৌকিক ও অলৌকিক বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা উহাদিগকেও কাব্য নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু, কি কথাযোজনা, কি রচনা, কি বর্ণনা, কোনও অংশেই উহারা কাব্যনামের অধিকারী নহে। সংস্কৃত উপাখ্যানগ্রন্থ কেবল গদ্য, কেবল পদ্য, ও গদ্য পদ্য উভয়াত্মক আছে। কিন্তু তাহারা প্রকৃত রূপে কাব্যশ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত তত্তৎ কাব্যস্থলে তাহাদের উল্লেখ করা যায় নাই। উপাখ্যানের মধ্যে যে কয়েকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ

পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, উহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া উহার রচনা অত্যন্ত সহজ। এরূপ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনত্ব ও তন্নিবন্ধন সরলত্ব ব্যতীত আর কিছুই বিশেষ প্রশংসনীয় নাই। রচনার মাধুর্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য নাই; অধিকন্তু, মধ্যে মধ্যে বহুতর অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে। বোধ হয়, কোনও বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই, পঞ্চতন্ত্র একান্ত উপেক্ষিত হইয়া আছে; অন্য অন্য গ্রন্থের ন্যায়, সচরাচর সর্বত্র প্রচলিত নহে।

লিপিকরপ্রমাদবশতঃ, পঞ্চতন্ত্রের স্থানের স্থানের পাঠ এমন অপভ্রংশিত হইয়া গিয়াছে যে অর্থবোধ ও তাৎপর্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। পঞ্চতন্ত্রে, বিষ্ণুশর্মা বক্তা, রাজপুত্রগণ শ্রোতা এই প্রণালীতে, মনুষ্য, পশু, পক্ষীর উপাখ্যানচ্ছলে, নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় সংস্কৃতবেত্তারা পঞ্চতন্ত্রকে পারস্য, আরব, ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশীয় উপাখ্যানের মূল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

হিতোপদেশকর্তা গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পঞ্চতন্ত্রের ও অন্যান্য গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া, লিখিতে আরম্ভ করিলাম। (২১) বাস্তবিক, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের প্রতিরূপস্বরূপ। পঞ্চতন্ত্রের দোষ গুণ অধিকাংশই হিতোপদেশে লক্ষিত হয়। বিশেষ এই, পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা হিতোপদেশের রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ়, এবং, প্রস্তুত বিষয়ের বৈশদ্য অথবা দৃঢ়ীকরণ বাসনায়, নানা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, উদাহরণস্বরূপ উত্তম উত্তম শ্লোক অধিক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকর্তার সম্যক্ সহৃদয়তার অসদ্ভাব প্রযুক্ত, অনেক স্থলেই উদ্ধৃত শ্লোক সকল অসংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে; তত্তৎস্থলে প্রকৃত বিষয়ের সহিত ঐ সকল শ্লোকের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন, উপাখ্যানচ্ছলে বালকদিগকে নীতি উপদেশ দিতেছি। (২২) কিন্তু, মধ্যে মধ্যে আদিরসঘটিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া কি বুঝিয়া, গ্রন্থকর্তা ঐ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিলেন, বলিতে পারা যায় না।

কোন্ ব্যক্তি পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। অনেকে বিষ্ণুশর্মাকে এই উভয় গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ নাই। পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে বিষ্ণুশর্মা বক্তা, রাজপুত্রগণ শ্রোতা; বোধ হয়, তদ্দর্শনেই বিষ্ণুশর্মা গ্রন্থকর্তা বলিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকিবেক। এই দুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রন্থান্তরের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। লল্লূলাল হিতোপদেশকে নারায়ণপণ্ডিতপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (২৩) কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কথাসরিৎসাগর

কথাসরিৎসাগর সোমদেবভট্টপ্রণীত। উহা অতি বৃহৎ পুস্তক। সোমদেব স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন, কশ্মীরের অধিপতি অনন্তদেবের মহিষী সূর্যবতীর চিত্তবিনোদ সম্পাদনার্থে, আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম। কহ্লণরাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে

---

(২১) পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে।

(২২) যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে॥

(২৩) কাহূ সমৈ শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত নে নীতিশাস্ত্রনি তেং কথানিকৌ সংগ্রহ করি সংস্কৃতমেং এক গ্রন্থ বনায় বাকৌ নাম হিতোপদেশ ধর্য্যো। রাজনীতি।

অনন্তদেব ও সূর্যবতীর বৃত্তান্ত আছে। রাজতরঙ্গিণীর গণনা অনুসারে, অনন্তদেব কিঞ্চিদধিক আট শত বৎসর পূর্বে, কশ্মীরমণ্ডলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তদনুসারে, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর আট শত বৎসরের পুস্তক। এই অনন্তদেব রত্নাবলীকর্তা শ্রীহর্ষদেবের পিতামহ। কথাসরিৎসাগরে যে সমস্ত উপাখ্যান আছে, তাহা তাদৃশ মনোহর নহে। ঐ সমুদয় কেবল অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ। অলৌকিক ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত ঘটিত উপাখ্যান সকল এক সময়ে সাতিশয় মনোহর ছিল; কিন্তু এক্ষণে আর তাহাদের তাদৃশ চমৎকারজনকত্ব নাই। সোমদেবের লিখন অনুসারে বোধ হইতেছে, বৃহৎকথা নামে এক বহুবিস্তৃত উপাখ্যানগ্রন্থ ছিল, তিনি তাহার সারসংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পদ্যে রচিত।

বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্রন্থ আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। সংস্কৃত কবিরা আদিরস, করুণরস ও শান্তরস সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, তাঁহাদের হাস্য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রস সংক্রান্ত বর্ণনা তাদৃশ মনোহর নহে। ফলতঃ, তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ; উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন। নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শন, পূর্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী; যুদ্ধ, ভয়, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।

উপসংহার

সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। অনেকে সংস্কৃতভাষার অনুশীলন একান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত, সংস্কৃতভাষার ফলোপধায়কতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব সমাপন করিব।

সংস্কৃতভাষানুশীলনের নানা ফল। ইয়ুরোপে শব্দবিদ্যার যে ইয়তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃতভাষার অনুশীলন তাহার মূল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃতভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্য অন্য ভাষার মূলনির্ণয়, স্বরূপপরিজ্ঞান ও মর্মোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন; এবং এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাহাদিগের কে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, কে কোন্ দেশের আদিম নিবাসী লোক, কে কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন্ প্রদেশে বাস করিয়াছে ইত্যাদি নির্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু, ইয়ুরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃতভাষার সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; এই নিমিত্তই, ডাক্তার মোক্ষমূলর সংস্কৃতভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃতভাষানুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে

প্রচলিত আছে, সে সমুদায় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার বিধিনির্বন্ধ-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু, সংস্কৃতভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে, তৎসম্পাদন কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোকে বিদ্যানু-শীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, ইয়ুরোপীয় কোনও ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি তত্তৎপ্রচলিত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু, সংস্কৃত না জানিলে, কেবল ইঙ্গরেজী শিখিয়া আমরা যে ঐ মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

তৃতীয়তঃ, পূর্বকালীন লোকদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয় সকল মনুষ্যমাত্রের অবশ্যজ্ঞেয়, ইহা, বোধ হয়, সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অন্যান্যদেশসংক্রান্ত এই সমস্ত বিষয় তত্তদ্দেশীয় পুরাবৃত্তগ্রন্থ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায়, রাজতরঙ্গিণী ব্যতিরিক্ত, প্রকৃত পুরাবৃত্তগ্রন্থ একখানিও নাই। রাজতরঙ্গিণীতেও এই বহুবিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ কশ্মীরের পুরাবৃত্ত মাত্র সঙ্কলিত আছে। সেই সঙ্কলিত পুরাবৃত্তও সর্বসাধারণলোকসংক্রান্ত নহে। কে কোন্ সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কে কত দিন রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, কে কোন্ সময়ে সিংহাসনভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কে কাহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে রাজ্যাস্পদ অধিকার করিয়াছিলেন; এইরূপ, কেবল রাজাদিগের বৃত্তান্তমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং, প্রকৃত পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসদ্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে, পূর্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচারব্যবহারাদি পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই।

চতুর্থতঃ, যাবতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলনে যে আমোদ, যে উপকার ও যে উপদেশ লাভ হইয়া থাকে, সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র সেই আমোদ, সেই উপকার ও সেই উপদেশ প্রদানে অসমর্থ নহে।

এই সমস্ত সংস্কৃতভাষার অনুশীলনসাপেক্ষ।

এক্ষণে, এতদ্দেশে যাঁহারা লেখা-পড়ার চর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এইরূপ মহোপকারিণী সংস্কৃতভাষার অনুশীলনে একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।

শকুন্তলা

বিজ্ঞাপন

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যানভাগ সঙ্কলিত হইল। এই উপাখ্যানে মূলগ্রন্থের অলৌকিকচমৎকারিত্বসন্দর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাঁহারা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন; এবং, সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট, কালিদাসের ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলের এই রূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া, মনে মনে, কত শত বার, আমায় তিরস্কার করিবেন। বস্তুতঃ, বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি। পাঠকবর্গ! বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন, এই শকুন্তলা দেখিয়া, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের উৎকর্ষপরীক্ষা না করেন।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
২৫এ অগ্রহায়ণ। সংবৎ ১৯২১।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অতি পূর্ব কালে, ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে সম্রাট্ ছিলেন। তিনি, একদা, বহুতর সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে, মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। এক দিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে, দ্রুত বেগে, পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, মৃগের পশ্চাৎ রথচালন কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎ ক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শরনিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, দূর হইতে, দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। সারথি, শুনিয়া, অবলোকন করিয়া কহিল, মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। রাজা, তপস্বীর উল্লেখশ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, ত্বরায় রশ্মি সংযত করিয়া রথের বেগসংবরণ কর। সারথি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল।

এই অবকাশে, তপস্বীরা, রথের সন্নিহিত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে। শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনকার শস্ত্র আর্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধের প্রহারের নিমিত্ত নহে।

রাজা, লজ্জিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ, সংহিত শরের প্রতিসংহরণপূর্বক, প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা, দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া, হস্ত তুলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনকার এই বিনয় ও সৌজন্য তদুপযুক্তই বটে। প্রার্থনা করি, আপনকার পুত্রলাভ হউক, এবং সেই পুত্র এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হউন। রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ শিরোধার্য করিলাম।

অনন্তর, তাপসেরা কহিলেন, মহারাজ! ঐ মালিনী নদীর তীরে, আমাদের গুরু মহর্ষি কণ্বের আশ্রম দেখা যাইতেছে; যদি কার্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথি-সৎকার স্বীকার করুন। আর, তপস্বীরা কেমন নির্বিঘ্নে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, বুঝিতে পারিবেন, আপনকার ভুজবলে ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত হইতেছে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, মহর্ষি আশ্রমে আছেন? তপস্বীরা কহিলেন, না মহারাজ! তিনি আশ্রমে নাই; এইমাত্র, স্বীয় তনয়া

শকুন্তলার হস্তে অতিথিসৎকারের ভারার্পণ করিয়া, তদীয় দুর্দৈবশান্তির নিমিত্ত, সোমতীর্থ প্রস্থান করিলেন। রাজা কহিলেন, মহর্ষি আশ্রমে নাই, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আমি, অবিলম্বে, তদীয় তপোবন দর্শন করিয়া, আত্মাকে পবিত্র করিতেছি। তখন তাপসেরা, এক্ষণে আমরা চলিলাম, এই বলিয়া, প্রস্থান করিলেন।

রাজা সারথিকে কহিলেন, সূত! রথচালন কর, তপোবনদর্শন দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিব। সারথি, ভূপতির আদেশ পাইয়া, পুনর্বার রথচালন করিল। রাজা কিয়ৎ দূর গমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, সূত! কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ! কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে; তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুলীফল ভাঙ্গিয়াছেন, সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে; ঐ দেখ, কুশভূমিতে হরিণশিশু সকল, নিঃশঙ্ক চিত্তে, চরিয়া বেড়াইতেছে; এবং, যজ্ঞীয় ধূমের সমাগমে, নব পল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। সারথি কহিল, মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন।

রাজা, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, সারথিকে কহিলেন, সূত! আশ্রমের উৎপীড়ন হওয়া উচিত নহে; অতএব, এইখানেই রথ রাখ, আমি অবতীর্ণ হইতেছি। সারথি রশ্মি সংযত করিল। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর, তিনি স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সূত! তপোবনে বিনীত বেশে প্রবেশ করাই কর্তব্য; অতএব, শরাসন সমুদয় আভরণ রাখ। এই বলিয়া, রাজা সেই সমস্ত সূতহস্তে ন্যস্ত করিলেন, এবং কহিলেন, অশ্বগণের আজ অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে, অতএব, আশ্রমবাসীদিগের দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবার পূর্বেই, উহাদিগকে ভাল করিয়া বিশ্রাম করাও। সারথিকে এই আদেশ দিয়া, রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র, তদীয় দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা, তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই আশ্রমপদ, শান্তরসাস্পদ, অথচ আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে; ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের এতদনুযায়ী ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়। অথবা, ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই হইতে পারে। মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, প্রিয়সখি! এ দিকে, এ দিকে; এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণাংশে, যেন স্ত্রীলোকের আলাপ শুনা যাইতেছে; কি বৃত্তান্ত, অনুসন্ধান করিতে হইল।

এই বলিয়া, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, রাজা দেখিতে পাইলেন, তিনটি অল্পবয়স্কা তপস্বি-কন্যা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আসিতেছেন। রাজা, তাঁহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, ইহারা আশ্রমবাসিনী; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল। এই

বলিয়া, তরুতলে দণ্ডায়মান হইয়া, রাজা, অনিমিষ নয়নে, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সহচরীর সহিত, বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া, পরিহাস করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি শকুন্তলে! বোধ করি, তাত কণ্ব আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকাকুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই, জলসেচন করিতে আসিয়াছি, এমন নয়; আমারও ইহাদের উপর সহোদরস্নেহ আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালে যে সকল বৃক্ষের কুসুম হয়, তাহাদের সেচন সমাপ্ত হইল; এক্ষণে, যাহাদের কুসুমের সময় অতীত হইয়াছে, আইস, তাহাদিগের সেচন করি। অনন্তর, সকলে মিলিয়া, সেই সমস্ত বৃক্ষে জলসেচন করিতে লাগিলেন।

রাজা, দেখিয়া শুনিয়া, প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক; এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন। অথবা, যেমন প্রফুল্ল কমল শৈবলযোগেও বিলক্ষণ শোভা পায়; যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্কসম্পর্কেও সাতিশয় শোভমান হয়; সেইরূপ, এই সর্বাঙ্গসুন্দরী, বল্কল পরিধান করিয়াও, যার পর নাই, মনোহারিণী হইয়াছেন। যাহাদের আকার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যে সুশোভিত, তাহাদের কি না অলঙ্কারের কার্য করে।

শকুন্তলা, জলসেচন করিতে করিতে, সম্মুখে দৃষ্টিপাতপূর্বক, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! দেখ দেখ, সমীরণভরে, সহকারতরুর নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন সহকার, অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা, আমায় আহ্বান করিতেছে; অতএব, আমি উহার নিকটে চলিলাম। এই বলিয়া, তিনি, সহকারতরুতলে গিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন। তখন, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি! ঐখানে খানিক থাক। শকুন্তলা জিজ্ঞাসিলেন, কেন সখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন, তুমি সমীপবর্তিনী হওয়াতে, যেন সহকারতরু অতিমুক্তলতার সহিত সমাগত হইল। শকুন্তলা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! এই জন্যেই তোমায় সকলে প্রিয়ংবদা বলে।

রাজা, প্রিয়ংবদার পরিহাসশ্রবণে, সাতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে; কেন না, শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার সম্পূর্ণ আবির্ভাব; বাহুযুগল কোমল বিটপের বিচিত্র শোভায় বিভূষিত; আর, নব যৌবন, বিকসিত কুসুমরাশির ন্যায়, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

অনসূয়া কহিলেন, শকুন্তলে! দেখ দেখ, তুমি যে নবমালিকার বনতোষিণী নাম রাখিয়াছ, সে, স্বয়ংবরা হইয়া, সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া,

বনতোষিণীর নিকটে গিয়া, সহর্ষ মনে কহিতে লাগিলেন, সখি অনসূয়ে! দেখ, ইহাদের উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় উপস্থিত; নবমালিকা, বিকসিত নব কুসুমে সুশোভিতা হইয়াছে; আর, সহকারও ফলভরে অবনত রহিয়াছে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে, প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন, অনসূয়ে! কি জন্যে শকুন্তলা সর্বদাই বনতোষিণীকে উৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করে, জান? অনসূয়া কহিলেন, না সখি! জানি না; কি বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই মনে করিয়া, যে, বনতোষিণী যেমন সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন সেইরূপ আপন অনুরূপ বর পাই। শকুন্তলা কহিলেন, এটি তোমার আপনার মনের কথা।

শকুন্তলা, এই বলিয়া, অনতিদূরবর্তিনী মাধবীলতার সমীপবর্তিনী হইয়া, হৃষ্ট মনে প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! তোমায় এক প্রিয় সংবাদ দি, মাধবীলতার, মূল অবধি অগ্র পর্যন্ত, মুকুল নির্গত হইয়াছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! আমিও তোমায় এক প্রিয় সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শিত করিয়া, কহিলেন, এ তোমার মনগড়া কথা, আমি শুনিতে চাই না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, না সখি! আমি পরিহাস করিতেছি না। পিতার মুখে শুনিয়াছি, তাই বলিতেছি, মাধবীলতার এই যে মুকুলনির্গম, এ তোমারই শুভ-সূচক। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া, অনসূয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, প্রিয়ংবদে! এই জন্যেই শকুন্তলা মাধবীলতায়, এতাদৃশ যত্ন সহকারে, জলসেচন ও উহার প্রতি এতাদৃশ স্নেহপ্রদর্শন করে। শকুন্তলা কহিলেন, সে জন্যে ত নয়; মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত উহাকে সতত সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করি।

এই বলিয়া শকুন্তলা মাধবীলতায় জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন। এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল; জলসেক করিবামাত্র, মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া, বিকসিত কুসুম ভ্রমে, শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা করপল্লবসঞ্চালন দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইল না, গুন্ গুন্ করিয়া অধরসমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা একান্ত অধীরা হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখি! পরিত্রাণ কর, দুর্বৃত্ত মধুকর আমায় নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে। তখন উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি; দুষ্মন্তকে স্মরণ কর; রাজারাই তপোবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। উত্তরোত্তর ভ্রমর অধিকতর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, শকুন্তলা কহিলেন, দেখ, এই দুর্বৃত্ত কোনও মতে নিবৃত্ত হইতেছে না; আমি এখান হইতে যাই। এই বলিয়া দুই চারি পা গমন করিয়া কহিলেন, কি আপদ্! এখানেও আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। সখি! পরিত্রাণ কর। তখন তাঁহারা পুনর্বার কহিলেন, প্রিয়সখি!

আমাদের পরিত্রাণের ক্ষমতা কি ; দুষ্মন্তকে স্মরণ কর, তিনি তোমার পরিত্রাণ করিবেন।

রাজা, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কি করি। অথবা, অতিথিভাবে উপস্থিত হইয়া অভয় প্রদান করি। এই স্থির করিয়া, রাজা, সত্বর গমনে তাঁহাদের সম্মুখবর্তী হইয়া, কহিতে লাগিলেন, পুরুবংশোদ্ভব দুষ্মন্ত দুর্বৃত্তদিগের শাসনকর্তা বিদ্যমান থাকিতে, কার সাধ্য মুগ্ধস্বভাবা তপস্বিকন্যাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করে।

তপস্বিকন্যারা, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, অতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে, অনসূয়া কহিলেন, না মহাশয়! এমন কিছু অনিষ্টঘটনা হয় নাই। তবে কি জানেন, এক মধুকর আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়াছিল, তাহাতেই ইনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। রাজা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন, নির্বিঘ্নে তপস্যাকার্য সম্পন্ন হইতেছে? শকুন্তলা লজ্জায় জড়ীভূতা ও নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। অনসূয়া, শকুন্তলাকে উত্তরদানে পরাঙ্মুখী দেখিয়া, রাজাকে কহিলেন, হাঁ মহাশয়! নির্বিঘ্নে তপস্যাকার্য সম্পন্ন হইতেছে ; এক্ষণে, অতিথিবিশেষের সমাগমলাভ দ্বারা, সবিশেষ সম্পন্ন হইল। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! যাও, যাও. শীঘ্র কুটীর হইতে অর্ঘপাত্র লইয়া আইস ; জল আনিবার প্রয়োজন নাই, এই কলসে যে জল আছে, তাহাতেই প্রক্ষালনক্রিয়া সম্পন্ন হইবেক। রাজা কহিলেন, না, না, এত ব্যস্ত হইতে হইবেক না ; মধুর সম্ভাষণ দ্বারাই আতিথ্যক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তখন অনসূয়া কহিলেন, মহাশয়! তবে, এই শীতল সপ্তপর্ণবেদীতে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। রাজা কহিলেন, তোমরাও জলসেচন দ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম কর। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি শকুন্তলে! অতিথির অনুরোধরক্ষা করা উচিত ; এস, আমরাও বসি। অনন্তর, সকলে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে, শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই অপরিচিত ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিয়া, আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে? এই বলিয়া তিনি, তাঁহার নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসায়াদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, নিতান্ত উৎসুকা হইলেন। রাজা তাপসকন্যাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাদের সমান রূপ, সমান বয়স, সমান ব্যবসায় ; সেই নিমিত্ত, তোমাদের সৌহৃদ্য সাতিশয় রমণীয় হইয়াছে। প্রিয়ংবদা, রাজার অগোচরে, অনসূয়াকে কহিলেন, সখি! এ ব্যক্তি কে? দেখ, কেমন সৌম্যমূর্তি, কেমন গম্ভীরাকৃতি, কেমন প্রভাবশালী! একান্ত অপরিচিত হইয়াও, মধুর আলাপ দ্বারা, চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায়, প্রতীতি জন্মাইতেছেন। অনসূয়া কহিলেন, সখি!

আমারও এ বিষয়ে কৌতূহল জন্মিয়াছে ; ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনকার মধুর আলাপ শ্রবণে সাহসিনী হইয়া জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কোন্ দেশকেই বা সম্প্রতি আপনকার বিরহে কাতর করিতেছেন? কি নিমিত্তেই বা, এরূপ সুকুমার হইয়াও, তপোবনদর্শনপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন? শকুন্তলা, শুনিয়া, মনকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, হৃদয়! এত উতলা হও কেন? তুমি যে জন্যে ব্যাকুল হইতেছ, অনসূয়া সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছে।

রাজা, শুনিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি রূপে আত্মপরিচয় দি ; যথার্থ পরিচয় দিলে, সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে। এইরূপ তিনি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন, ঋষিতনয়ে! আমি এই রাজ্যের ধর্মাধিকারে নিযুক্ত ; পুণ্যাশ্রমদর্শন প্রসঙ্গে এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি। অনসূয়া কহিলেন, অদ্য তপস্বীদিগের বড় সৌভাগ্য ; মহাশয়ের সমাগমে তাঁহারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। কিন্তু, পরস্পর সন্দর্শনে, রাজা ও শকুন্তলা, উভয়েরই চিত্ত চঞ্চল হইল ; এবং উভয়েরই আকারে ও ইঙ্গিতে চিত্তচাঞ্চল্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, উভয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া, রাজার অগোচরে, শকুন্তলাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! যদি আজ পিতা আশ্রমে থাকিতেন, জীবনসর্বস্ব দিয়াও এই অতিথিকে তুষ্ট করিতেন। শকুন্তলা, শুনিয়া, কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা কিছু মনে করিয়া এই কথা বলিতেছ ; আমি তোমাদের কথা শুনিতে চাই না।

রাজা, শকুন্তলার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আমি তোমাদের সখীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাঞ্ছা করি। তাঁহারা কহিলেন, মহাশয়! আপনকার এ অভ্যর্থনা অনুগ্রহবিশেষ ; যাহা ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন, শুনিয়াছি, মহর্ষি কণ্ব কৌমারব্রহ্মচারী, ধর্মচিন্তায় ও ব্রহ্মোপসনায় একান্ত রত ; জন্মাবচ্ছিন্নে দারপরিগ্রহ করেন নাই ; অথচ, তোমাদের সহচরী তাঁহার তনয়া ; ইহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে, বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজার এই জিজ্ঞাসা শুনিয়া, অনসূয়া কহিলেন, মহাশয়! আমরা প্রিয়সখীর জন্ম-বৃত্তান্ত যেরূপ শুনিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ করুন। শুনিয়া থাকিবেন, বিশ্বামিত্র নামে এক অতি প্রভাবশালী রাজর্ষি আছেন। তিনি, একদা, গোমতী নদীর তীরে, অতি-কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। দেবতারা, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রাজর্ষির সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত, মেনকানাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। মেনকা, তদীয় তপস্যাস্থানে উপস্থিত হইয়া, মায়াজাল বিস্তৃত করিলে, মহর্ষির সমাধিভঙ্গ হইল। বিশ্বামিত্র ও মেনকা আমাদের সখীর জনক ও জননী। নির্দয়া মেনকা, সদ্যঃপ্রসূতা তনয়াকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমাদের সখী সেই

বিজন বনে অনাথা পড়িয়া রহিলেন। এক শকুন্ত, কোন অনির্বচনীয় কারণে, স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক, আমাদের সখীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে, তাত কণ্ব, পর্যটনক্রমে, সেই সময়ে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের আবির্ভাব হইল। তিনি, তৎক্ষণাৎ আশ্রমে আনিয়া, স্বীয় তনয়ার ন্যায়, লালন পালন করিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং, প্রথমে শকুন্ত লালন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত, নাম শকুন্তলা রাখিলেন।

রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিলেন, হাঁ সম্ভব বটে ; নতুবা, মানবীতে কি এরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্ভবিতে পারে ? ভূতল হইতে কখনও জ্যোতির্ময় বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, মহাশয়ের আকার ইঙ্গিত দর্শনে, বোধ হইতেছে, যেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন। শকুন্তলা, রাজার অগোচরে, প্রিয়ংবদাকে লক্ষ্য করিয়া, ভ্রূভঙ্গী ও অঙ্গুলিসঞ্চালন দ্বারা তর্জন করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন, বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছ ; তোমাদের সখীর বিষয়ে, আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, আপনি সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন ? যাহা ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন, আমার জিজ্ঞাস্য এই, তোমাদের সখী, যাবৎ বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ পর্যন্ত মাত্র তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া চলিবেন, অথবা, যাবজ্জীবন, হরিণীগণ সহবাসে, কাল-হরণ করিবেন। প্রিয়ংবদা কহিলেন, তাত কণ্ব সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন, অনুরূপ পাত্র না পাইলে শকুন্তলার বিবাহ দিবেন না। রাজা শুনিয়া, নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তবে আমার শকুন্তলালাভ নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। হৃদয় ! আশ্বাসিত হও, এক্ষণে সংশয়ের নিরাকরণ হইয়াছে ; এ সুখস্পর্শ শীতল রত্ন ; ইহাকে প্রদীপ্ত অগ্নি ভাবিয়া আর শঙ্কিত হইবার আবশ্যকতা নাই।

শকুন্তলা কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে ! আমি চলিলাম ; আর আমি এখানে থাকিব না। অনসূয়া কহিলেন, সখি ! কি নিমিত্তে ? শকুন্তলা বলিলেন, দেখ, প্রিয়ংবদা, যা মুখে আসিতেছে, তাই বলিতেছে; আমি আর্য্যা গোতমীর নিকটে গিয়া এই সকল কথা বলিব। অনসূয়া কহিলেন, সখি ! অভ্যাগত মহাশয়ের এ পর্যন্ত পরিচর্যা করা হয় নাই। বিশেষতঃ, আজ তোমার উপর অতিথি-পরিচর্যার ভার আছে। অতএব, ইঁহারে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। শকুন্তলা, কিছু না বলিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে আটকাইয়া কহিলেন, সখি ! তুমি যাইতে পাইবে না ; আমার এক কলসী জল ধার ; আগে শোধ দাও, তবে যাইতে দিব। শকুন্তলা, কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া, ঋণপরিশোধের নিমিত্ত, কলসী লইয়া, জল আনিতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজা প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, তাপসকন্যে ! তোমার সখী বৃক্ষসেচন দ্বারা অতিশয়

ক্লান্ত হইয়াছেন ; আর উঁহাকে, পল্বল হইতে জল আনাইয়া, অধিকতর ক্লান্ত করা উচিত হয় না। আমি তোমার সখীকে ঋণমুক্ত করিতেছি। এই বলিয়া, রাজা, স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচিত করিয়া, জলকলসের মূল্যস্বরূপ, প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, অঙ্গুরীয় রাজকীয় নামাক্ষরে অঙ্কিত দেখিয়া, চকিত হইয়া, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গুরীয়ে দুষ্মন্তনাম মুদ্রিত আছে, অর্পণ-সময়ে রাজার তাহা মনে ছিল না। এক্ষণে, তিনি, আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা দর্শনে, সাবধান হইয়া কহিলেন, রাজকীয় নামাক্ষর দেখিয়া তোমরা অন্যথা ভাবিও না। আমি রাজপুরুষ ; রাজা আমায়, প্রসাদচিহ্নস্বরূপ, এই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পুরস্কার দিয়াছেন। প্রিয়ংবদা, রাজার ছল বুঝিতে পারিয়া, সহাস্য বদনে কহিলেন, মহাশয় ! তবে এই অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিবিযুক্ত করা কর্তব্য নহে ; আপনকার কথাতেই ইনি ঋণে মুক্ত হইলেন ; পরে, ঈষৎ হাসিয়া, শকুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, সখি শকুন্তলে ! এই মহাশয়, অথবা মহারাজ, তোমায় ঋণে মুক্ত করিলেন ; এক্ষণে, ইচ্ছা হয়, যাও। শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আর আমার সাধ্য নহে ; অনন্তর, প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আমি যাই, না যাই, তোমার কি ?

রাজা, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি ইহার প্রতি যেরূপ, এ আমার প্রতি সেরূপ কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, আর সন্দেহের বিষয় কি ? আমার সহিত কথা কহিতেছে না ; অথচ, আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিত্ত হইয়া, স্থির কর্ণে শ্রবণ করিতেছে ; নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লইতেছে ; অথচ, অন্য দিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়া থাকিতেছে না। অন্তঃকরণে অনুরাগসঞ্চার না হইলে, কামিনীদিগের কদাচ এরূপ ভাব হয় না।

রাজা ও তাপসকন্যাদিগের এইরূপ আলাপ চলিতেছে ; এমন সময়ে, সহসা, অনতি-দূরে, অতি মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল, এবং কেহ কহিতে লাগিল, হে তপস্বিগণ ! মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে, তপোবনসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, তোমরা, আশ্রমস্থ প্রাণিসমূহের রক্ষণার্থে, সত্বর ও যত্নবান্ হও ; বিশেষতঃ, এক আরণ্য হস্তী, রাজার রথদর্শনে নিরতিশয় চকিত হইয়া, তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্ন-স্বরূপ, ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিতেছে।

তাপসকন্যারা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কাকুল হইলেন। রাজা, বিরক্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আপদ্! অনুযায়ী লোকেরা, আমার অন্বেষণে আসিয়া, তপোবনের পীড়া জন্মাইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে, সত্বর নিবারণ করা আবশ্যক। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন, মহারাজ ! আরণ্য গজের উল্লেখ শুনিয়া আমরা

অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি; অনুমতি করুন, কুটীরে যাই। রাজা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, তোমরা কুটীরে যাও; আমিও তপোবনের পীড়াপরীহারের নিমিত্ত চলিলাম। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রস্থানকালে কহিলেন, মহারাজ! যেন পুনরায় আপনকার দর্শন পাই। সমুচিত অতিথিসংকার করা হয় নাই; এজন্য আমরা অতিশয় লজ্জিত হইতেছি। রাজা কহিলেন, না না; তোমাদের দর্শনেই, আমার যথেষ্ট সংকারলাভ হইয়াছে।

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা, দুই চারি পা চলিয়া ছল করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! কুশাগ্র দ্বারা পদতল ক্ষত হইয়াছে; এজন্য, আমি শীঘ্র চলিতে পারিতেছি না। আর আমার বল্কল কুরবকশাখায় লাগিয়া গিয়াছে; কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, ছাড়াইয়া লই। এই বলিয়া, বল্কলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলা, সতৃষ্ণ নয়নে, রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজাও মনে মনে কহিতে লাগিলেন, শকুন্তলাকে দেখিয়া, আর আমার নগরগমনে তাদৃশ অনুরাগ নাই। অতএব, তপোবনের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশিত করি। কি আশ্চর্য! আমি, কোনও মতেই, আমার চঞ্চল চিত্তকে শকুন্তলা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা, মৃগয়ায় আগমনকালে, স্বীয় প্রিয়বয়স্য মাধব্যনামক ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। রাজসহচরেরা, নিয়ত রাজভোগে কালযাপন করিয়া, স্বভাবতঃ সাতিশয় বিলাসী ও সুখাভিলাষী হইয়া উঠে। অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ হইলে, তাহাদের একান্ত অসহ্য হয়। মাধব্য রাজধানীতে অশেষবিধ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতেন। অরণ্যে সে সকল সুখভোগের সম্পর্ক ছিল না; প্রত্যুত, সকল বিষয়ে সবিশেষ ক্লেশ ঘটিয়া উঠিয়াছিল।

এক দিবস, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, মাধব্য মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া প্রাণ গেল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয়, এবং এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই শার্দূল, এই করিয়া, মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পল্বল ও বননদী সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া আইসে; যে অল্পপ্রমাণ জল থাকে, তাহাও, বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে, অতিশয় কটু ও কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস বারি পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রায় প্রতিদিন অনিয়ত সময়েই আহার করিতে হয়। আহারসামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাংসই অধিকাংশ; তাহাও প্রত্যহ প্রকৃতরূপ পাক করা হয় না। আর, প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া, সর্ব শরীর বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে যে, রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রিশেষে নিদ্রার আবেশ হয়; কিন্তু,

ব্যাধগণের বনগমনকোলাহলে, অতি প্রত্যূষেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক, তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস, আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, রাজা, একাকী, এক মৃগের অনুসরণক্রমে, তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, শকুন্তলানাম্নী এক তাপসকন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি, নগরগমনের কথা আর মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই, রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, এক বারও চক্ষু মুদি নাই।

মাধব্য এই সমস্ত চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, রাজা, মৃগয়ার বেশধারণপূর্বক, তৎকালোচিত সহচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই দিকে আসিতেছেন। তখন তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন, বিকলাঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকি; তাহা হইলেও, যদি আজ বিশ্রাম করিতে পাই। এই বলিয়া, মাধব্য, ভগ্নকলেবরের ন্যায়, একান্ত বিকল হইয়া রহিলেন; পরে, রাজা সন্নিহিত হইবামাত্র, সাতিশয় কাতরতাপ্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, বয়স্য! আমার সর্ব শরীর অবশ হইয়া আছে; হস্ত প্রসারিত করি, এমন ক্ষমতা নাই; অতএব, কেবল বাক্য দ্বারাই আশীর্বাদ করিতেছি।

রাজা মাধব্যকে, তদবস্থ অবস্থিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! তোমার শরীর এরূপ বিকল হইল কেন? মাধব্য কহিলেন, কেন হইল কি আবার; স্বয়ং অস্থি ভাঙ্গিয়া দিয়া, অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? রাজা কহিলেন, বয়স্য! বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল। মাধব্য কহিলেন, নদীতীরবর্তী বেতস যে কুব্জভাব অবলম্বন করে, সে কি স্বেচ্ছাবশতঃ সেইরূপ করে, অথবা নদীর বেগপ্রভাবে? রাজা কহিলেন, নদীর বেগ তাহার কারণ। মাধব্য কহিলেন, তুমিও আমার অঙ্গবৈকল্যের। রাজা কহিলেন, সে কেমন? মাধব্য কহিলেন, আমি কি বলিব, ইহা কি উচিত হয় যে, রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া, বনচরের ব্যবসায় অবলম্বনপূর্বক, নিয়ত বনে বনে ভ্রমণ করিবে। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান; সর্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে, মৃগের অন্বেষণে কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া, সন্ধিবন্ধ সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে, এবং সর্ব শরীর অবশ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, অন্ততঃ, এক দিনের মত, আমায় বিশ্রাম করিতে দাও।

রাজা, মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ত এইরূপ কহিতেছে; আমারও, শকুন্তলাদর্শন অবধি, মৃগয়াবিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে। শরাসনে শরসন্ধান করি, কিন্তু মৃগের উপর নিক্ষিপ্ত করিতে পারি না; তাহাদের মঞ্জুল নয়ন নয়নগোচর হইলে, শকুন্তলার অলৌকিকবিভ্রমবিলাসশালী নয়নযুগল মনে পড়ে। মাধব্য, রাজার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, কহিলেন, ইনি আর কিছু ভাবিতে লাগিলেন, আমি অরণ্যে রোদন করিলাম। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, না হে না, আমি অন্য কিছু ভাবিতেছি না; সুহৃদ্বাক্য লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায়, আজ মৃগয়ায় ক্ষান্ত হইলাম। মাধব্য, শ্রবণমাত্র, যার পর নাই

আনন্দিত হইয়া, চিরজীবী হও বলিয়া, চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রাজা কহিলেন, বয়স্য! যাইও না, আমার কিছু কথা আছে। মাধব্য, কি কথা বল বলিয়া, শ্রবণোন্মুখ হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা কহিলেন, বয়স্য! কোনও অনায়াসসাধ্য কর্মে আমার সহায়তা করিতে হইবেক। মাধব্য কহিলেন, বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবেক না, মিষ্টান্নভক্ষণে ; সে বিষয়ে আমি বিলক্ষণ নিপুণ বটে, অনায়াসেই সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে পারিব। রাজা কহিলেন, না হে না, আমি যা বলিব। এই বলিয়া, দৌবারিককে আহ্বান করিয়া, রাজা সেনাপতিকে আনিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন।

দৌবারিকমুখে রাজার আহ্বানবার্তা শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি অনতিবিলম্বে নরপতি-গোচরে উপস্থিত হইলেন, এবং, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে ; আর অনর্থ কালহরণ করিতেছেন কেন, মৃগয়ায় চলুন। রাজা কহিলেন, আজ মাধব্য মৃগয়ার দোষকীর্তন করিয়া আমায় নিরুৎসাহ করিয়াছে। সেনাপতি, রাজার অগোচরে, অনুচ্চ স্বরে মাধব্যকে কহিলেন, সখে! তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাক ; আমি কিয়ৎ ক্ষণ প্রভুর চিত্তবৃত্তির অনুবর্তন করি ; অনন্তর, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ও পাগলের কথা শুনেন কেন? ও কখন কি না বলে? মৃগয়া অপকারী কি উপকারী, মহারাজই বিবেচনা করুন না কেন। দেখুন, প্রথমতঃ, স্থূলতা ও জড়তা অপগত হইয়া, শরীর বিলক্ষণ পটু ও কর্মণ্য হয়, ভয় জন্মিলে, অথবা ক্রোধের উদয় হইলে, জন্তুগণের মনের গতি কিরূপ হয়, তাহা বারংবার প্রত্যক্ষ হইতে থাকে ; আর, চল লক্ষ্যে শরক্ষেপ করা অভ্যাস হইয়া আইসে ; মহারাজ! যদি চল লক্ষ্যে শরক্ষেপ অব্যর্থ হয়, ধনুর্ধরের পক্ষে অধিক শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে? যাহারা মৃগয়াকে ব্যসনমধ্যে গণ্য করে, তাহারা নিতান্ত অর্বাচীন ; বিবেচনা করুন, এরূপ আমোদ, এরূপ উপকার, আর কিসে আছে? মাধব্য শুনিয়া, কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, অরে নরাধম! ক্ষান্ত হ, আর তোর প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক না ; আজ উনি আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুই, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, এক দিন, নরনাসিকালোলুপ ভল্লুকের মুখে পড়িবি।

উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া, রাজা সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, আমরা আশ্রমসমীপে আছি ; এজন্য, তোমার মতে সম্মত হইতে পারিলাম না। অদ্য মহিষেরা নিপানে অবগাহন করিয়া, নিরুদ্বেগে জলক্রীড়া করুক ; হরিণগণ তরুচ্ছায়ায় দলবদ্ধ হইয়া রোমন্থ অভ্যাস করুক ; বরাহেরা অশঙ্কিত চিত্তে পল্বলে মুস্তাভক্ষণ করুক ; আর, আমার শরাসনও বিশ্রাম লাভ করুক। সেনাপতি কহিলেন, মহারাজের যেমন অভিরুচি। রাজা কহিলেন, তবে যে সমস্ত মৃগয়াসহচর অগ্রেই বনপ্রস্থান করিয়াছে, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন ; আর, সেনাসংক্রান্ত লোকদিগকে সবিশেষ সতর্ক করিয়া দাও, যেন তাহারা কোনও ক্রমে তপোবনের উৎপীড়ন না জন্মায়।

সেনাপতি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাজা সন্নিহিত মৃগয়াসহচরদিগকে মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে, তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলে, রাজা ও মাধব্য, সন্নিহিত লতামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া, শীতল শিলাতলে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে উভয়ে নির্জনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা মাধব্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি চক্ষুর ফল পাও নাই; কারণ, দর্শনীয় বস্তুই দেখ নাই। মাধব্য কহিলেন, কেন তুমি ত আমার সম্মুখে রহিয়াছ। রাজা কহিলেন, তা নয় হে, আমি আশ্রমললামভূতা কণ্বদুহিতা শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি। মাধব্য, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, কহিলেন, এ কি বয়স্য! তপস্বিকন্যায় অভিলাষ! রাজা কহিলেন, বয়স্য! পুরুবংশীয়েরা এরূপ দুরাচার নহে যে পরিহার্য বস্তুর উপভোগে অভিলাষ করে। তুমি জান না, শকুন্তলা মেনকাগর্ভসম্ভূতা, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের তনয়া; তপস্বীর আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছে এইমাত্র, বস্তুতঃ তপস্বিকন্যা নহে।

মাধব্য, শকুন্তলার প্রতি রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, যেমন, পিণ্ডখর্জুর ভক্ষণ করিয়া, রসনা মিষ্টরসে অভিভূত হইলে, তিন্তিড়ীভক্ষণে স্পৃহা হয়; সেইরূপ, স্ত্রীরত্নভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া, তুমি এই অভিলাষ করিতেছ। রাজা কহিলেন, না বয়স্য! তুমি তাকে দেখ নাই, এই নিমিত্ত এরূপ কহিতেছ। মাধব্য কহিলেন, তার সন্দেহ কি; যাহা তোমারও বিস্ময় জন্মাইয়াছে, সে বস্তু অবশ্যই রমণীয়। রাজা কহিলেন, বয়স্য! অধিক আর কি বলিব, তার শরীর মনে করিলে, মনে এই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা, প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া, পরে জীবনদান করিয়াছেন; অথবা, মনে মনে মনোমত উপকরণসামগ্রী সকল সঙ্কলিত করিয়া, মনে মনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির যথাস্থানে বিন্যাসপূর্বক, মনে মনেই তাহার শরীরনির্মাণ করিয়াছেন; হস্ত দ্বারা নির্মিত হইলে, শরীরের সেরূপ মার্দব ও রূপলাবণ্যের সেরূপ মাধুরী সম্ভবিত না। ফলতঃ. ভাই রে, সে এক অভূতপূর্ব স্ত্রীরত্নসৃষ্টি। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! বুঝিলাম, শকুন্তলা যাবতীয় রূপবতীদিগের পরাভবস্থান। রাজা কহিলেন, তাহার রূপ অনাঘ্রাত প্রফুল্ল কুসুম স্বরূপ, নখাঘাতবর্জিত নব পল্লব স্বরূপ, অপরিহিত নূতন রত্ন স্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধু স্বরূপ, জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির অখণ্ড ফল স্বরূপ; জানি না, কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই নির্মল রূপের ভোগ আছে।

রাজার মুখে শকুন্তলার এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া, চমৎকৃত হইয়া, মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তবে শীঘ্র তাহাকে হস্তগত কর; দেখিও, যেন, তোমার ভাবিতে চিন্তিতে, এরূপ অসুলভরূপনিধান কন্যানিধান কোনও অসভ্য তপস্বীর হস্তে পতিত না হয়। রাজা কহিলেন, শকুন্তলা নিতান্ত পরাধীনা; বিশেষতঃ, কুলপতি কণ্ব এক্ষণে আশ্রমে নাই। মাধব্য কহিলেন, ভাল বয়স্য! তোমায় এক কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তোমার উপর তার অনুরাগ কেমন? রাজা কহিলেন, বয়স্য! তপস্বিকন্যারা স্বভাবতঃ

অপ্রগল্‌ভস্বভাবা ; তথাপি, তাহার আকারে ও ইঙ্গিতে, আমার প্রতি তদীয় অনুরাগের স্পষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে—যত ক্ষণ আমার সম্মুখে ছিল, আমার সহিত কথা কয় নাই ; কিন্তু, আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিন্তা হইয়া স্থির কর্ণে শ্রবণ করিয়াছে ; নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে, মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, কিন্তু অন্য দিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়া থাকে নাই। আবার, প্রস্থানকালে, কতিপয় পদ মাত্র গমন করিয়া, কুশের অঙ্কুরে পদতল ক্ষত হইল, চলিতে পারি না, এই বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; আর, কুরবকশাখায় বল্কল লাগিয়াছে, এই বলিয়া, বল্কলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, সতৃষ্ণ নয়নে, বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এ সকল অনুরাগের লক্ষণ বই আর কি হইতে পারে ? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তবে তোমার মনোরথসিদ্ধির অধিক বিলম্ব নাই। ভাগ্যক্রমে, তপোবন তোমার উপবন হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, বয়স্য! কোনও কোনও তপস্বীরা আমায় চিনিতে পারিয়াছেন। বল দেখি, এখন কি ছলে কিছু দিন তপোবনে থাকি। মাধব্য কহিলেন, কেন, অন্য ছলের প্রয়োজন কি ? তুমি রাজা, তপোবনে গিয়া তপস্বীদিগকে বল, আমি রাজস্ব আদায় করিতে আসিয়াছি ; যাবৎ তোমরা রাজস্ব না দিবে, তাবৎ আমি তপোবনে থাকিব। রাজা কহিলেন, তপস্বীরা, সামান্য প্রজার ন্যায়, রাজস্ব দেন না, তাঁহারা অন্যবিধ রাজস্ব দিয়া থাকেন ; তাঁহারা যে রাজস্ব দেন, তাহা রত্নরাশি অপেক্ষাও প্রার্থনীয়। দেখ, সামান্য প্রজারা রাজাদিগকে যে রাজস্ব দেয়, তাহা বিনশ্বর ; কিন্তু তপস্বীরা তপস্যার ষষ্ঠাংশস্বরূপ অবিনশ্বর রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজা ও মাধব্য, উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে ; এমন সময়ে দ্বারবান্‌ আসিয়া কহিল, মহারাজ! তপোবন হইতে দুই ঋষিকুমার আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, অবিলম্বে লইয়া আইস। তদনুসারে, ঋষিকুমারেরা রাজসমীপে উপনীত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, আশীর্বাদ করিলেন। রাজা আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক প্রণাম করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, তপস্বীরা কি আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন, বলুন। ঋষিকুমারেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি এখানে আছেন জানিতে পারিয়া, তপস্বীরা মহারাজকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, মহর্ষি আশ্রমে নাই, এই নিমিত্ত, নিশাচরেরা যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইতেছে ; অতএব, আপনাকে, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্যন্ত, এই স্থানে থাকিয়া, তপোবনের উপদ্রব নিবারণ করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন, তপস্বীদিগের এই আদেশে অনুগৃহীত হইলাম। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! মন্দ কি, এ তোমার অনুকূল গলহস্ত। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন ; অনন্তর, দৌবারিককে আহ্বান করিয়া, সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া, ঋষিকুমারদিগকে কহিলেন, আপনারা প্রস্থান করুন ; আমি যথাকালে তপোবনে উপস্থিত হইতেছি। ঋষিকুমারেরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! না হইবেক কেন ? আপনি যে বংশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনকার এই ব্যবহার, তাহার উপযুক্তই বটে। বিপদ্‌গ্রস্তকে অভয়দান পুরুবংশীয়দিগের কুলব্রত।

এই বলিয়া, আশীর্বাদ করিয়া, ঋষিকুমারেরা প্রস্থান করিলে পর, রাজা মাধব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! যদি তোমার শকুন্তলাদর্শনে কৌতূহল থাকে, আমার সমভিব্যাহারে চল। মাধব্য কহিলেন, তোমার মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া দেখিতে অতিশয় অভিলাষ হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে, নিশাচরের নাম শুনিয়া, সে অভিলাষ এক বারে গিয়াছে। রাজা শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ভয় কি, আমার নিকটে থাকিবে। মাধব্য কহিলেন, তবে আর নিশাচরে আমার কি করিবেক? এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, দ্বারপাল আসিয়া কহিল, মহারাজ! রথ প্রস্তুত, আরোহণ করিলেই হয়; কিন্তু, বৃদ্ধা মহিষীর বার্তা লইয়া করভক এইমাত্র রাজধানী হইতে উপস্থিত হইল। রাজা কহিলেন, উহারে অবিলম্বে আমার নিকটে লইয়া আইস। অনন্তর, করভক রাজসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! বৃদ্ধা দেবী আজ্ঞা করিয়াছেন, আগামী চতুর্থ দিবসে তাঁহার এক ব্রত আছে; সেই দিবস, মহারাজকে তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবেক।

এ দিকে তপস্বীদিগের কার্য, ও দিকে গুরুজনের আজ্ঞা, উভয়ই অনুল্লঙ্ঘনীয়; এই নিমিত্ত, কর্তব্যনিরূপণে অসমর্থ হইয়া, রাজা নিতান্ত আকুলচিত্ত হইলেন; এবং মাধব্যকে কহিলেন, বয়স্য! বিষম সঙ্কটে পড়িলাম; কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মাধব্য পরিহাস করিয়া কহিলেন, কেন, ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যস্থলে থাক। রাজা কহিলেন, বয়স্য! এ পরিহাসের সময় নয়; সত্য সত্যই, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি; কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। পরে, তিনি কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, সখে! মা তোমায় পুত্রবৎ পরিগৃহীত করিয়াছেন; তুমি রাজধানী ফিরিয়া যাও, এবং জননীর পুত্রকার্য সম্পন্ন কর। তাঁহাকে কহিবে, তপস্বীদিগের কার্যে সাতিশয় ব্যস্ত আছি, এজন্য যাইতে পারিলাম না। মাধব্য, ভাল, আমি চলিলাম; কিন্তু তুমি যেন আমায় নিশাচরভয়ে কাতর মনে করিও না; এই বলিয়া কহিলেন, এখন আমি রাজার অনুজ হইলাম; অতএব, আমি রাজার অনুজের মত যাইতে ইচ্ছা করি। রাজা কহিলেন, আমার সঙ্গে অধিক লোকজন রাখিলে, তপোবনের উৎপীড়ন হইতে পারে; অতএব, সমুদয় অনুচরদির্গকে তোমারই সঙ্গে পাঠাইতেছি। মাধব্য শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, আজ আমি যথার্থ যুবরাজ হইলাম।

এইরূপে মাধব্যের রাজধানীপ্রতিগমন অবধারিত হইলে, রাজার অন্তঃকরণে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল, এ অতি চপলস্বভাব; হয় ত, শকুন্তলাবৃত্তান্ত অন্তঃপুরে প্রকাশ করিবেক; ইহার কি উপায় করি; অথবা এই বলিয়া বিদায় করি; এই স্থির করিয়া, তিনি মাধব্যের হস্তে ধরিয়া কহিলেন, বয়স্য! ঋষিরা, কয়েক দিনের জন্য, তপোবনে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত রহিলাম; নতুবা, যথার্থই আমি শকুন্তলা-লাভে অভিলাষী হইয়াছি, এরূপ ভাবিও না। আমি ইতঃপূর্বে তোমার নিকট শকুন্তলা-

সংক্রান্ত যে সকল গল্প করিয়াছি, সে সমস্তই পরিহাস মাত্র ; তুমি যেন, যথার্থ ভাবিয়া, একে আর করিও না। মাধব্য কহিলেন, তার সন্দেহ কি ; আমি এক বারও, তোমার ঐ সকল কথা যথার্থ মনে করি নাই।

অনন্তর, রাজা, তপস্বীদিগের যজ্ঞবিঘ্ননিবারণার্থে, তপোবনে প্রবিষ্ট হইলেন ; এবং মাধব্যও, যাবতীয় সৈন্য সামন্ত ও সমস্ত আনুযাত্রিক সঙ্গে লইয়া, রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা, মাধব্য সমভিব্যাহারে সমস্ত সৈন্য সামন্ত বিদায় করিয়া দিয়া, তপস্বিকার্যের অনুরোধে তপোবনে অবস্থিতি করিলেন ; কিন্তু, দিন যামিনী, কেবল শকুন্তলাচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, দিনে দিনে কৃশ, মলিন, দুর্বল, ও সর্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়েই, তাঁহার মনের সুখ ছিল না। কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে গেলে, শকুন্তলাকে দেখিতে পাইবেন, নিয়ত এই অনুধ্যান ও এই অনুসন্ধান। কিন্তু, পাছে তপোবনবাসীরা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন, এই আশঙ্কায়, তিনি সতত সাতিশয় সঙ্কুচিত থাকেন।

এক দিন, মধ্যাহ্নকালে, রাজা, নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, শকুন্তলার দর্শন ব্যতিরেকে, আর আমায় প্রাণরক্ষার উপায় নাই। কিন্তু, তপস্বীদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে, যখন তাঁহারা আমায় রাজধানীপ্রতিগমনের অনুমতি করিবেন, তখন আমাব কি দশা হইবেক ; কি রূপে তাপিত প্রাণ শীতল করিব। সে যাহা হউক, এখন কোথায় গেলে শকুন্তলাকে দেখিতে পাই। বোধ করি, প্রিয়া মালিনীতীরবর্তী শীতল লতামণ্ডপে আতপকাল অতিবাহিত করিতেছেন ; সেইখানে যাই, তাঁহারে দেখিতে পাইব। এই বলিয়া তিনি, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নসময়ে, সেই লতামণ্ডপের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে, শকুন্তলাও, রাজদর্শনদিবস অবধি দুঃসহ বিরহবেদনায়, সাতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার ও রাজার অবস্থার, কোনও অংশে কোনও প্রভেদ ছিল না। সে দিবস, শকুন্তলা সাতিশয় অসুস্থ হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁহাকে মালিনীতীরবর্তী নিকুঞ্জবনে লইয়া গেলেন ; তন্মধ্যবর্তী শীতল শিলাতলে, নব পল্লব ও জলার্দ্র নলিনীদল প্রভৃতি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিলেন ; এবং তাহাতে শয়ন করাইয়া, অশেষ প্রকারে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রাজা, ক্রমে ক্রমে, সেই নিকুঞ্জবনের সন্নিহিত হইয়া, চরণচিহ্নপ্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিলেন, শকুন্তলা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, লতার অন্তরাল হইতে, শকুন্তলাকে দৃষ্টিগোচর করিয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, আঃ ! আমার নয়নযুগল শীতল হইল, প্রিয়ারে দেখিলাম।

ইঁহারা তিন সখীতে কি কথোপকথন করিতেছেন, লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ শ্রবণ ও অবলোকন করি। এই বলিয়া, রাজা, উৎসুক মনে শ্রবণ, ও সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন, করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলার শরীরসন্তাপ সাতিশয় প্রবল হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শীতল সলিলার্দ্র নলিনীদল লইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ বায়ুসঞ্চালন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, সখি শকুন্তলে! কেমন, নলিনীদলবায়ু তোমার সুখজনক বোধ হইতেছে? শকুন্তলা কহিলেন, সখি! তোমরা কি বাতাস করিতেছ? উভয়ে, শুনিয়া, সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, তৎকালে শকুন্তলা, দুষ্মন্তচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। রাজা, শুনিয়া, ও শকুন্তলার অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইঁহাকে আজ নিরতিশয় অসুস্থশরীরা দেখিতেছি। কিন্তু, কি কারণে ইনি এরূপ অসুস্থা হইয়াছেন। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাববশতঃ ইঁহার ঈদৃশ অসুখ, কি যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে, ইঁহারও তাহাই। অথবা, এ বিষয়ে আর সংশয় করিবার আবশ্যকতা নাই; গ্রীষ্মদোষে কামিনীগণের এরূপ অবস্থা কোনও মতেই সম্ভাবিত নহে।

প্রিয়ংবদা, শকুন্তলার অগোচরে, অনসূয়াকে কহিলেন, সখি! সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শন অবধিই, শকুন্তলা কেমন একপ্রকার হইয়াছে; ঐ কারণে ত ইহার এ অবস্থা ঘটে নাই? অনসূয়া কহিলেন, সখি! আমারও ঐ আশঙ্কাই হয়; ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! তোমার শরীরের গ্লানি উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে; অতএব, আমরা তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! কি বলিবে, বল। তখন অনসূয়া কহিলেন, তোমার মনের কথা কি, আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না; কিন্তু, ইতিহাসকথায় বিরহী জনের যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, বোধ হয়, তোমারও যেন সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। সে যা হউক, কি কারণে তোমার এত অসুখ হইয়াছে, বল; প্রকৃত রূপে রোগনির্ণয় না হইলে, প্রতীকারচেষ্টা হইতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমার অতিশয় ক্লেশ হইতেছে, এখন বলিতে পারিব না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়া ভালই বলিতেছে; কেন আপনার মনের বেদনা গোপন করিয়া রাখ? দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইতেছ। দেখ, তোমার শরীরে আর কি আছে; কেবল লাবণ্যময়ী ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

রাজা, অন্তরাল হইতে শ্রবণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছেন; শকুন্তলার শরীর নিতান্ত কৃশ ও একান্ত বিবর্ণ হইয়াছে। কিন্তু, কি চমৎকার! এ অবস্থায় দেখিয়াও, আমার মনের ও নয়নের অনির্বচনীয় প্রীতিলাভ হইতেছে।

অবশেষে, শকুন্তলা, মনের ব্যথা আর গোপন করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্বক কহিলেন, সখি! যদি তোমাদের কাছে না বলিব, আর

কার কাছেই বলিব। কিন্তু, মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়া, তোমাদিগকে কেবল দুঃখভাগিনী করিব। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! এই নিমিত্তই ত আমরা এত আগ্রহ করিতেছি। তুমি কি জান না, আত্মীয় জনের নিকট দুঃখের কথা কহিলেও, দুঃখের অনেক লাঘব হয়।

এই সময়ে, রাজা শঙ্কিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যখন সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন অবশ্যই ইনি আপন মনের বেদনা ব্যক্ত করিবেন। প্রথমদর্শনদিবসে, প্রস্থানকালে, সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করাতে, অনুরাগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছিল ; তথাপি, এখন কি বলিবেন, এই ভয়ে অভিভূত ও কাতর হইতেছি।

শকুন্তলা কহিলেন, সখি! যে অবধি আমি সেই রাজর্ষিকে নয়নগোচর করিয়াছি— এইমাত্র কহিয়া, লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে কহিতে লাগিলেন, সখি! বল, বল, আমাদের নিকট লজ্জা কি? শকুন্তলা কহিলেন, সেই অবধি, তাঁহাতে অনুরাগিণী হইয়া, আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া, তিনি, বিষণ্ণ বদনে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখি! সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ ; অথবা, মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবেক?

রাজা, শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, কহিতে লাগিলেন, যা শুনিবার, তা শুনিলাম ; এত দিনের পর আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল।

শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আর আমি যাতনা সহ্য করিতে পারি না ; এখন প্রাণবিয়োগ হইলেই পরিত্রাণ হয়। প্রিয়ংবদা, শুনিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, শকুন্তলার অগোচরে, অনসূয়াকে কহিলেন, সখি! আর ইহাকে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষান্ত রাখিবার সময় নাই ; আমার মতে, আর কালাতিপাত করা কর্তব্য নয় ; ত্বরায় কোনও উপায় করা আবশ্যক। তখন অনসূয়া কহিলেন, সখি! যাহাতে, অবিলম্বে, অথচ গোপনে, শকুন্তলার মনোরথ সম্পন্ন হয়, এমন কি উপায়, বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! গোপনের জন্যই ভাবনা, অবিলম্বে হওয়া কঠিন নয়। অনসূয়া কহিলেন, কি জন্যে, বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন, কেন, তুমি কি দেখ নাই, সেই রাজর্ষিও, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি, দিন দিন দুর্বল ও কৃশ হইতেছেন?

রাজা, শুনিয়া, স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, যথার্থই এরূপ হইয়াছি বটে। নিরন্তর অন্তরতাপে তাপিত হইয়া, আমার শরীর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ; এবং দুর্বল ও কৃশও যৎপরোনাস্তি হইয়াছি।

প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়ে! শকুন্তলার প্রণয়পত্রিকা করা যাউক ; সেই পত্রিকা, আমি পুষ্পের মধ্যগত করিয়া, নির্মাল্যচ্ছলে, রাজর্ষির হস্তে দিয়া আসিব। অনসূয়া

কহিলেন, সখি! এ অতি উত্তম পরামর্শ; দেখ, শকুন্তলাই বা কি বলে। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমায় আর কি জিজ্ঞাসা করিবে? তোমাদের যা ভাল বোধ হয়, তাই কর। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই; মনোমত একখানি প্রণয়পত্রিকা রচনা কর। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! রচনা করিতেছি; কিন্তু, পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন, এই ভয়ে, আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

রাজা, শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, সুন্দরি! তুমি, যাহার অবজ্ঞাভয়ে ভীত হইতেছ, সে এই, তোমার সমাগমের নিমিত্ত, একান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে; তুমি কি জান না, রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না, রত্নেরই অন্বেষণ সকলে করিয়া থাকে।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও, শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া, কহিলেন, অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! কোন্ ব্যক্তি আতপত্র দ্বারা শরৎকালীন জ্যোৎস্নার নিবারণ করিয়া থাকে? শকুন্তলা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, পত্রিকারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, সখি! রচনা করিয়াছি, কিন্তু লিখনসামগ্রী কিছুই নাই, কিসে লিখি, বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই পদ্মপত্রে লিখ।

লিখন সমাপন করিয়া, শকুন্তলা সখীদিগকে কহিলেন, ভাল, শুন দেখি, সঙ্গত হয়েছে কি না। তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন; শকুন্তলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—হে নির্দয়! তোমার মন আমি জানি না, কিন্তু আমি, তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি;—এইমাত্র শুনিয়া, আর অন্তরালে থাকিতে না পারিয়া, রাজা সহসা শকুন্তলার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, সুন্দরি! তুমি সন্তাপিত হইতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু, বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমি এক বারে দগ্ধ হইতেছি। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সহসা রাজাকে সমাগত দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি হর্ষিত হইলেন, এবং, গাত্রোত্থানপূর্বক, পরম সমাদরে, স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, বসিবার সংবর্ধনা করিলেন। শকুন্তলাও, নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া, গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন রাজা শকুন্তলাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! গাত্রোত্থান করিবার প্রয়োজন নাই; তোমার দর্শনেই আমার সম্পূর্ণ সংবর্ধনালাভ হইয়াছে। বিশেষতঃ, তোমার শরীরের যেরূপ গ্লানি, তাহাতে কোনও মতেই শয্যা পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। সখীরা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই শিলাতলে উপবেশন করুন। রাজা উপবিষ্ট হইলেন। শকুন্তলা, লজ্জায় সাতিশয় জড়ীভূতা হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হৃদয়! যাঁহার জন্যে তত উতলা হইয়াছিলে, এখন, তাঁহারে দেখিয়া, এত কাতর হইতেছ কেন? রাজা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আজ আমি তোমাদের সখীকে অতিশয় অসুস্থ দেখিতেছি। উভয়ে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এখন সুস্থ হইবেন। শকুন্তলা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিলেন।

অনসূয়া কহিলেন, মহারাজ! শুনিতে পাই, রাজাদিগের অনেক মহিষী থাকে, কিন্তু সকলেই প্রেয়সী হয় না: অতএব, আমরা যেন, সখীর নিমিত্ত, অবশেষে মনোদুঃখ না পাই। রাজা কহিলেন, যথার্থ বটে, রাজাদিগের অনেক মহিলা থাকে। কিন্তু, আমি অকপট হৃদয়ে কহিতেছি, তোমাদের সখীই আমার জীবনসর্বস্ব হইবেন। তখন অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থ হইলাম। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমরা মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কত কথা কহিয়াছি; ক্ষমা প্রার্থনা কর। সখীরা হাস্যমুখে কহিলেন, যে কহিয়াছে, সেই ক্ষমা প্রার্থনা করিবেক, অন্যের কি দায়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! যদি কিছু বলিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন; পরোক্ষে কে কি না বলে। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে প্রিয়ংবদা, লতামণ্ডপের বহির্ভাগে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া, কহিলেন, অনসূয়ে! মৃগশাবকটি উৎসুক হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে; বোধ করি, আপন জননীর অন্বেষণ করিতেছে; আমি উহাকে উহার মার কাছে দিয়া আসি। তখন অনসূয়া কহিলেন, সখি! ও অতি চঞ্চল, তুমি একাকিনী উহারে ধরিতে পারিবে না; চল, আমিও যাই। এই বলিয়া, উভয়ে প্রস্থানোন্মুখী হইলেন। শকুন্তলা উভয়কেই প্রস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন, সখি! তোমরা দুজনেই আমায় ফেলিয়া চলিলে, আমি এখানে একাকিনী রহিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! একাকিনী কেন, পৃথিবীনাথকে তোমার নিকটে রাখিয়া গেলাম। এই বলিয়া, হাসিতে হাসিতে, উভয়ে লতামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা, সত্য সত্যই সখীরা চলিয়া গেল, এই বলিয়া, উৎকণ্ঠিতার ন্যায় হইলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! সখীদের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন? আমি তোমার সখীস্থানে রহিয়াছি; যখন যে আদেশ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইবেক। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি মাননীয় ব্যক্তি, এ দুঃখিনীকে অকারণে অপরাধিনী করেন কেন? এই বলিয়া, শয্যা হইতে উঠিয়া, শকুন্তলা গমনোন্মুখী হইলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! এ কি কর; একে তোমার অবস্থা এই, তাহাতে আবার মধ্যাহ্নকাল অতি উত্তাপের সময়; এ অবস্থায়, এ সময়ে, লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত হওয়া কোনও মতেই উচিত নয়। এই বলিয়া, হস্তে ধরিয়া, রাজা নিবারণ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! ও কি কর, ছাড়িয়া দাও, সখীদের নিকটে যাই; তুমি জান না, আমি আপনার বশ নই। রাজা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া শকুন্তলার হাত ছাড়িয়া দিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন? আমি আপনাকে কিছু বলিতেছি না, দৈবের তিরস্কার করিতেছি। রাজা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার করিতেছ কেন? দৈবের অপরাধ কি? শকুন্তলা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার শত বার করিব; সে আমায় পরের অধীন করিয়া পরের গুণে মোহিত করে কেন?

এই বলিয়া, শকুন্তলা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রাজা পুনরায় শকুন্তলার হস্তে ধরিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! কি কর, ইতস্ততঃ ঋষিরা ভ্রমণ করিতেছেন। তখন রাজা কহিলেন, সুন্দরি! তুমি গুরুজনের ভয় করিতেছ কেন? ভগবান্ কণ্ব কখনই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। শত শত রাজর্ষিকন্যারা, গুরুজনের অগোচরে, গান্ধর্ব বিধানে, অনুরূপ পাত্রের হস্তগতা হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের গুরুজনেরাও, পরিশেষে সবিশেষ অবগত হইয়া, সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। শকুন্তলা, মহারাজ! এই সম্ভাষণমাত্রপরিচিত ব্যক্তিকে ভুলিবেন না, এই বলিয়া, রাজার হাত ছাড়াইয়া, চলিয়া গেলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! তুমি, আমার হাত ছাড়াইয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে, কিন্তু আমার চিত্ত হইতে যাইতে পারিবে না। শকুন্তলা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহা শুনিয়া আর আমার পা উঠিতেছে না। যাহা হউক, কিয়ৎ ক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া ইঁহার অনুরাগ পরীক্ষা করিব। এই বলিয়া, লতাবিতানে আবৃতশরীরা হইয়া, শকুন্তলা কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিলেন।

রাজা, একাকী লতামণ্ডপে অবস্থিত হইয়া, শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমা বই আর জানি না; কিন্তু তুমি নিতান্ত নির্দয় হইয়া আমায় এক বারেই পরিত্যাগ করিয়া গেলে; তুমি বড় কঠিন। পরে, তিনি কিয়ৎ ক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া কহিলেন, আর প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি ফল? এই বলিয়া, তিনি তথা হইতে চলিয়া যান, এমন সময়ে, শকুন্তলার মৃণালবলয় ভূতলে পতিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইলেন; এবং, পরম সমাদরে বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্বক, কৃতার্থম্মন্য চিত্তে, শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার মৃণালবলয় অচেতন হইয়াও, এই দুঃখিত ব্যক্তিকে আশ্বাসিত করিলেক, কিন্তু তুমি তাহা করিলে না। শকুন্তলা, ইহা শুনিয়া, আর বিলম্ব করিতে পারি না, কিন্তু কি বলিয়াই বা যাই; অথবা, মৃণালবলয়ের ছল করিয়া যাই; এই বলিয়া, পুনর্বার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। রাজা দর্শনমাত্র হর্ষসাগরে মগ্ন হইয়া কহিলেন, এই যে আমার জীবিতেশ্বরী আসিয়াছেন! বুঝিলাম, দেবতারা আমার পরিতাপ শুনিয়া সদয় হইলেন, তাহাতেই পুনরায় প্রিয়ারে দেখিতে পাইলাম। চাতক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলপ্রার্থনা করিল; অমনি নব জলধর হইতে শীতল সলিলধারা তাহার মুখে পতিত হইল।

শকুন্তলা রাজার সম্মুখবর্তিনী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অর্ধ পথে স্মরণ হওয়াতে, আমি মৃণালবলয় লইতে আসিয়াছি, আমার মৃণালবলয় দাও। রাজা কহিলেন, যদি তুমি আমায় যথাস্থানে নিবেশিত করিতে দাও, তবেই তোমার মৃণালবলয় তোমায় দি, নতুবা দিব না। শকুন্তলা অগত্যা সম্মতা হইলেন। রাজা কহিলেন, আইস, এই শিলাতলে বসিয়া পরাইয়া দি। উভয়ে শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা, শকুন্তলার হস্ত লইয়া, মৃণালবলয় পরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা

একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া কহিলেন, আর্যপুত্র! সত্বর হও, সত্বর হও। রাজা, আর্যপুত্রসম্ভাষণ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা স্বামীকেই আর্যপুত্রশব্দে সম্ভাষণ করিয়া থাকে; বুঝি আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। অনন্তর, তিনি শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! মৃণাল-বলয়ের সন্ধি সম্যক্ সংশ্লিষ্ট হইতেছে না, যদি তোমার মত হয়, প্রকারান্তরে সংযোজন করিয়া পরাই। শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তোমার যা অভিরুচি।

রাজা, নানা ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলার হস্তে মৃণালবলয় পরাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, সুন্দরি! দেখ দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা কহিলেন, দেখিব কি, আমার নয়নে কর্ণোৎপলরেণু পতিত হইয়াছে, এ জন্য, দেখিতেছি না। রাজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, যদি তোমার অনুমতি হয়, ফুৎকার দিয়া পরিষ্কার করিয়া দি। শকুন্তলা কহিলেন, তাহা হইলে অতিশয় উপকৃত হই বটে, কিন্তু তোমায় অত দূর বিশ্বাস হয় না। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! অবিশ্বাসের বিষয় কি, নূতন ভৃত্য কি কখনও প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত করিতে পারে? শকুন্তলা কহিলেন, ঐ অতি-ভক্তিই অবিশ্বাসের কারণ। অনন্তর রাজা, শকুন্তলার চিবুকে ও মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া, তাঁহার মুখকমল উত্তোলিত করিলেন। শকুন্তলা, শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া, রাজাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। রাজা, সুন্দরি! শঙ্কা কি, এই বলিয়া, শকুন্তলার নয়নে ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে শকুন্তলা কহিলেন, তোমায় আর পরিশ্রম করিতে হইবে না; আমার নয়ন পূর্ববৎ হইয়াছে; আর কোনও অসুখ নাই। মহারাজ! আমি অতিশয় লজ্জিত হইতেছি; তুমি আমার এত উপকার করিলে; আমি তোমার কোনও প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! আর কি প্রত্যুপকার চাই? আমি যে তোমার সুরভি মুখকমলের আঘ্রাণ পাইয়াছি, তাহাই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট পুরস্কার হইয়াছে; মধুকর কমলের আঘ্রাণমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সন্তুষ্ট না হইয়াই বা কি করে।

এইরূপ কৌতুক ও কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, চক্রবাকবধূ! রজনী উপস্থিত; এই সময়ে চক্রবাককে সম্ভাষণ করিয়া লও; এই শব্দ শকুন্তলার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। শকুন্তলা, সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার পিতৃষ্বসা আর্যা গৌতমী, আমার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া, আমি কেমন আছি জানিতে আসিতেছেন; এই নিমিত্তই, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, চক্রবাক ও চক্রবাকীর ছলে, আমাদিগকে সাবধান করিতেছে; তুমি সত্বর লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত ও অন্তর্হিত হও। রাজা, ভাল আমি চলিলাম, যেন পুনরায় দেখা হয়, এই বলিয়া, লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া, শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি। তখন গৌতমী, কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া, শকুন্তলার সর্ব শরীরে সেচন করিয়া কহিলেন, বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হয়ে থাক। অনন্তর, লতামণ্ডপে, অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা, কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া, কহিলেন, এই অসুখ, তুমি একলা আছ বাছা, কেউ কাছে নাই। শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল; এইমাত্র, মালিনীতে জল আনিতে গেল। তখন গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ণ হয়েছে, এস কুটীরে যাই। শকুন্তলা অগত্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। রাজাও, আর আমি প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি, এই বলিয়া শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

এই ভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল। পরিশেষে, গান্ধর্ব বিধানে শকুন্তলার পাণিগ্রহণসমাধানপূর্বক, ধর্মারণ্যে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া, রাজা নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজা দুষ্মন্ত প্রস্থান করিলে পর, এক দিন, অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে কহিতে লাগিলেন, সখি! শকুন্তলা গান্ধর্ব বিধানে আপন অনুরূপ পতি পাইয়াছে বটে; কিন্তু আমার এই ভাবনা হইতেছে, পাছে রাজা নগরে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সমাগমে শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! সে আশঙ্কা করিও না; তেমন আকৃতি কখনও গুণশূন্য হয় না। কিন্তু আমার আর ভাবনা হইতেছে, না জানি, পিতা আসিয়া, এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, কি বলেন। অনসূয়া কহিলেন, সখি! আমার বোধ হইতেছে, তিনি শুনিয়া রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না; এ তাঁহার অনভিমত কর্ম হয় নাই। কেন না, তিনি প্রথম অবধি এ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন, গুণবান্ পাত্রে কন্যাপ্রদান করিব; যদি দৈবই তাহা সম্পন্ন করিল, তাহা হইলে তিনি বিনা আয়াসে কৃতকার্য হইলেন। সুতরাং, ইহাতে তাঁহার রোষ বা অসন্তোষের বিষয় কি। উভয়ে, এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরের কিঞ্চিৎ দূরে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, শকুন্তলা, অতিথিপরিচর্যার ভার গ্রহণ করিয়া, একাকিনী কুটীরদ্বারে উপবিষ্ট আছেন; দৈবযোগে, দুর্বাসা ঋষি আসিয়া, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমি অতিথি। শকুন্তলা, রাজার চিন্তায় নিতান্ত মগ্ন হইয়া, এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, সুতরাং দুর্বাসার কথা শুনিতে পাইলেন না। দুর্বাসা অবজ্ঞাদর্শনে রোষবশ হইয়া কহিলেন, আঃ পাপীয়সি! তুই অতিথির অবমাননা করিলি। তুই,

যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া, আমায় অবজ্ঞা করিলি—আমি অভিশাপ দিতেছি—স্মরণ করাইয়া দিলেও, সে তোরে স্মরণ করিবেক না।

প্রিয়ংবদা, শুনিতে পাইয়া, ব্যাকুল হইয়া, কহিতে লাগিলেন, হায়! হায়! কি সর্বনাশ ঘটিল। শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা কোনও পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইল। এই বলিয়া, সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রিয়ংবদা কহিতে লাগিলেন, সখি! যে সে নয়, ইনি দুর্বাসা, ইঁহার কথায় কথায় কোপ; ঐ দেখ, শাপ দিয়া রোষভরে সত্বর প্রস্থান করিতেছেন। অনসূয়া কহিলেন, প্রিয়ংবদে! বৃথা আক্ষেপ করিলে আর কি হইবেক বল। শীঘ্র গিয়া পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আন; আমিও, এই অবকাশে, কুটীরে গিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। প্রিয়ংবদা দুর্বাসার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনসূয়া কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনসূয়া কুটীরে পঁহুছিবার পূর্বেই, প্রিয়ংবদা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, সখি! জানই ত, দুর্বাসা স্বভাবতঃ অতিকুটিলহৃদয়; তিনি কি কাহারও অনুনয় শুনেন; তথাপি অনেক বিনয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছি। যখন দেখিলাম, নিতান্তই ফিরিবেন না, তখন চরণে ধরিয়া কহিলাম, ভগবন্! সে তোমার কন্যা, তোমার প্রভাব ও মহিমা কি জানে? কৃপা করিয়া তাহার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক। তখন তিনি কহিলেন, আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা অন্যথা হইবার নহে; তবে যদি কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহার শাপমোচন হইবেক; এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। অনসূয়া কহিলেন, ভাল, এখন আশ্বাসের পথ হইয়াছে। রাজর্ষি, প্রস্থানকালে শকুন্তলার অঙ্গুলিতে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছেন। অতএব, শকুন্তলার হস্তেই শকুন্তলার শাপমোচনের উপায় রহিয়াছে। রাজা যদিই বিস্মৃত হন, ঐ অঙ্গুরীয় দেখাইলেই তাঁহার স্মরণ হইবেক। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণে, তাঁহারা কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শকুন্তলা, করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, স্পন্দহীনা, মুদ্রিতনয়না, চিত্রার্পিতার ন্যায়, উপবিষ্টা আছেন। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়ে! দেখ দেখ, শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছে; ও কি অতিথি অভ্যাগতের তত্ত্বাবধান করিতে পারে। অনসূয়া কহিলেন, সখি! এ বৃত্তান্ত আমাদেরই মনে মনে থাকুক, কোনও মতে কর্ণান্তর করা হইবেক না; শকুন্তলা শুনিলে প্রাণে বাঁচিবেক না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমি কি পাগল হয়েছ? এ কথাও কি শকুন্তলাকে শুনাতে হয়? কোন্ ব্যক্তি উষ্ণ সলিলে নবমালিকার সেচন করে?

কিয়ৎ দিন পরে, মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিন তিনি অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া হোমকার্য সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল—মহর্ষে! রাজা দুষ্মন্ত, মৃগয়া উপলক্ষে তোমার তপোবনে আসিয়া, শকুন্তলার

পাণিগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, এবং শকুন্তলাও তৎসহযোগে গর্ভবতী হইয়াছেন। মহর্ষি, এইরূপে শকুন্তলার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার অগোচরে ও সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না; বরং, যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে, শকুন্তলা এতাদৃশ সৎপাত্রের হস্তগতা হইয়াছে। অনন্তর তিনি প্রফুল্ল বদনে শকুন্তলার নিকটে গিয়া, সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার পরিণয়-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং স্থির করিয়াছি, অবিলম্বে, দুই শিষ্য ও গৌতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমায় পতিসন্নিধানে পাঠাইয়া দিব। অনন্তর, তদীয় আদেশক্রমে শকুন্তলার প্রস্থানের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল।

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী, এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি, সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। অনন্তর, তিনি, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর; আর অনর্থ কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া, তপোবন-তরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি, তোমাদের জলসেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি, ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ, কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আর্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু, তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে, দেখ!—জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ, আহার-বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়ূরী, নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, ঊর্ধ্বমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া, নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে, ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া, তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণী! শাখাবাহু দ্বারা আমায় স্নেহভরে- আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবর্তিনী হইলাম। অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল। এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্বিঘ্নে প্রসব হইলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে; এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃ-বিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে; যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও; আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে, আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া, শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে! শান্ত হও, অশ্রু-বেগের সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল; উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে, বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া, প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে, সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব, কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া, শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি, শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে— আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর, শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও

স্নেহদৃষ্টি রাখিবে ; আমাদের এই পর্যন্ত প্রার্থনা ; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি, শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব ; আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে ; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে ; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে ; সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত হইবে না ; স্বামী কার্কশ্য-প্রদশন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না ; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয় ; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ। ইহা কহিয়া, বলিলেন, দেখ, গৌতমীই বা কি বলেন। গৌতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবেক ? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।

এইরূপে উপদেশদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না ; আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও কি এইখান হইতে ফিরিয়া যাইবেক ? ইহারা সে পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই ; অতএব, সে পর্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না ; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন। শকুন্তলা, পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া, গদ্গদ স্বরে কহিলেন, তাত! তোমায় না দেখিয়া, সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। এই বলিতে বলিতে, তাঁহার দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, বৎসে! এত কাতর হইতেছ কেন ? তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, তাত! আবার কতদিনে এই তপোবনে আসিব ? কণ্ব কহিলেন, বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া, এবং অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত, ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতিসমভিব্যাহারে পুনরায় এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গৌতমী কহিলে, বাছা আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার বেলা বহিয়া যায় ; সখীদিগকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া লও ; আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদের নিকটে গিয়া কহিলেন, সখি! তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা, শুনিয়া, অতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বল।

তোমাদের কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন, না সখি! ভীত হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া, শকুন্তলা, গৌতমী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দুষ্মন্তরাজধানী উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, একদৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছেন; এক্ষণে, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, আমার সহিত আশ্রমে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে, মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন, স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পিত হইলে, লোক নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয়; তদ্রূপ, অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক দিন, রাজা দুষ্মন্ত, রাজকার্যসমাধানান্তে, একান্তে আসীন হইয়া, প্রিয়বয়স্য মাধব্যের সহিত কথোপকথনরসে কালযাপন করিতেছেন; এমন সময়ে, হংসপদিকা নামে এক পরিচারিকা, সঙ্গীতশালায়, অতি মধুর স্বরে, এই ভাবের গান করিতে লাগিল, অহে মধুকর! অভিনব মধুর লোভে সহকারমঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিয়া, এখন, কমলমধু পানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উহারে এক বারে বিস্মৃত হইলে কেন?

হংসপদিকার গীতি শ্রবণগোচর হইবামাত্র, রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ হইলেন; কিন্তু, কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন, তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত এমন আকুল হইতেছে? প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে মনের এরূপ আকুলতা হয় না; কিন্তু, প্রিয়বিরহও উপস্থিত দেখিতেছি না। অথবা, মনুষ্য, সর্বপ্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া, যে অকস্মাৎ আকুলহৃদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুটরূপে জন্মান্তরীণ স্থির সৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

রাজা মনে মনে এই বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! ধর্মারণ্যবাসী তপস্বীরা, মহর্ষি কণ্বের সন্দেশ লইয়া আসিয়াছেন; কি আজ্ঞা হয়। রাজা, তপস্বিশব্দ শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র আদরপ্রদর্শন-পূর্বক কহিলেন, শীঘ্র উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, অভ্যাগত তপস্বীদিগকে, বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিয়া, অবিলম্বে আমার নিকটে লইয়া আইসেন; আমিও ইত্যবকাশে তপস্বিদর্শনযোগ্য প্রদেশে গিয়া রীতিমত অবস্থিতি করিতেছি।

এই আদেশ প্রদানপূর্বক কঞ্চুকীকে বিদায় করিয়া, রাজা অগ্নিগৃহে গিয়া অবস্থিতি করিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, ভগবান্ কণ্ব কি নিমিত্ত আমার নিকট ঋষি প্রেরণ করিলেন ? কি তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়াছে, কি কোনও দুরাত্মা তাঁহাদের উপর কোনও প্রকার অত্যাচার করিয়াছে ? কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, আমার মন অতিশয় আকুল হইতেছে। পার্শ্ববর্তিনী পরিচারিকা কহিল, মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে, ধর্মারণ্যবাসী ঋষিরা মহারাজের অধিকারে নির্বিঘ্নে ও নিরাকুল চিত্তে তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন ; এই হেতু, প্রীত হইয়া, মহারাজকে ধন্যবাদ দিতে ও আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন।

এবম্প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সোমরাত, তপস্বীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, উপস্থিত হইলেন। রাজা, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাঁহাদের উপস্থিতির প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে সোমরাত তপস্বীদিগকে কহিলেন, ঐ দেখুন, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি, আসন পরিত্যাগপূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। শাঙ্গ´রব কহিলেন, নরপতিদিগের এরূপ বিনয় ও সৌজন্য দেখিলে সাতিশয় প্রীত হইতে হয়, এবং সবিশেষ প্রশংসা করিতে ও সাধুবাদ দিতে হয়। অথবা ইহার বিচিত্র কি—তরুগণ ফলিত হইলে ফলভরে অবনত হইয়া থাকে ; বর্ষাকালীন জলধরগণ বারিভরে নম্রভাব অবলম্বন করে ; সৎপুরুষদিগেরও প্রথা এই, সমৃদ্ধিশালী হইলে তাঁহারা অনুদ্ধতস্বভাব হয়েন।

শকুন্তলার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া গৌতমীকে কহিলেন, পিসি! আমার ডানি চোখ নাচিতেছে কেন ? গৌতমী কহিলেন, বৎসে! শঙ্কিতা হইও না ; পতিকুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করিবেন। যাহা হউক, শকুন্তলা তদবধি মনে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ও নিরতিশয় আকুলহৃদয়া হইলেন।

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, এই অবগুণ্ঠনবতী কামিনী কে ? কি নিমিত্তই বা ইনি তপস্বীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন ? পার্শ্ববর্তিনী পরিচারিকা কহিল, মহারাজ! আমিও দেখিয়া অবধি নানা বিতর্ক করিতেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, মহারাজ! এরূপ রূপলাবণ্যের মাধুরী কখনও কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। রাজা কহিলেন, ও কথা ছাড়িয়া দাও ; পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত বা পরস্ত্রীর কথা লইয়া আন্দোলন করা কর্তব্য নহে। এ দিকে, শকুন্তলা আপনার অস্থির হৃদয়কে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, হৃদয়! এত আকুল হইতেছ কেন ? আর্যপুত্রের তৎকালীন ভাব মনে করিয়া আশ্বাসিত হও ও ধৈর্য অবলম্বন কর।

তাপসেরা, ক্রমে ক্রমে, সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া হস্ত তুলিয়া, আশীর্বাদ করিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া ঋষিদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে

কহিলেন। অনন্তর, সকলে উপবেশন করিলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, নির্বিঘ্নে তপস্যা সম্পন্ন হইতেছে? ঋষিরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি শাসনকর্তা থাকিতে, ধর্মক্রিয়ার বিঘ্নসম্ভাবনা কোথায়? সূর্যদেবের উদয় হইলে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে পারে? রাজা শুনিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া কহিলেন, অদ্য আমার রাজশব্দ সার্থক হইল। পরে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ কণ্বের কুশল? ঋষিরা কহিলেন, হাঁ মহারাজ! মহর্ষি সর্বাংশেই কুশলী।

এইরূপে প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচারপরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে, শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আমাদের গুরুদেবের যে সন্দেশ লইয়া আসিয়াছি, নিবেদন করি, শ্রবণ করুন,—মহর্ষি কহিয়াছেন, আপনি আমার অনুপস্থিতিকালে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; আমি সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়াছি; আপনি সর্বাংশে আমার শকুন্তলার যোগ্য পাত্র; এক্ষণে আপনকার সহধর্মিণী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন, গ্রহণ করুন। গৌতমীও কহিলেন, মহারাজ! আমি কিছু বলিতে চাই, কিন্তু বলিবার পথ নাই। শকুন্তলাও গুরুজনের অপেক্ষা রাখে নাই; তুমিও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই; তোমরা পরস্পরের সম্মতিতে যাহা করিয়াছ, তাহাতে অন্যের কথা কহিবার কি আছে?

শকুন্তলা, মনে মনে শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া, এই ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আর্যপুত্র এখন কি বলেন। রাজা দুর্বাসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলাপরিণয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন; সুতরাং, শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, এ আবার কি উপস্থিত! শকুন্তলা এক বারে ম্রিয়মাণা হইলেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! লৌকিক ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত হইয়াও, আপনি এরূপ কহিতেছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, পরিণীতা নারী যদিও সর্বাংশে সাধুশীলা হয়, সে নিয়ত পিতৃকুলবাসিনী হইলে, লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে; এই নিমিত্ত, সে পতির অপ্রিয়া হইলেও, পিতৃপক্ষ তাহাকে পতিকুলবাসিনী করিতে চাহে।

রাজা কহিলেন, কই, আমি ত ইঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই। শকুন্তলা শুনিয়া, বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হৃদয়! যে আশঙ্কা করিতেছিলে, তাহাই ঘটিয়াছে। শার্ঙ্গরব, রাজার অস্বীকারশ্রবণে, তদীয় ধূর্ততার আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! জগদীশ্বর আপনাকে ধর্মসংস্থাপনকার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন; অন্যে অন্যায় করিলে আপনি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, রাজা হইয়া অনুষ্ঠিত কার্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হইলে ধর্মদ্রোহী হইতে হয় কি না? রাজা কহিলেন, আপনি আমায় এত অভদ্র স্থির করিতেছেন কেন? শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আপনকার অপরাধ নাই; যাহারা ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়, তাহাদের এইরূপই স্বভাব ও এইরূপই আচরণ হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন, আপনি অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন; আমি কোনও ক্রমে এরূপ ভর্ৎসনার যোগ্য নহি।

এইরূপে রাজাকে অস্বীকারপরায়ণ ও শকুন্তলাকে লজ্জায় অবনতমুখী দেখিয়া, গৌতমী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! লজ্জিতা হইও না; আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি; তাহা হইলে মহারাজ তোমায় চিনিতে পারিবেন। এই বলিয়া, তিনি শকুন্তলার মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন। রাজা তথাপি চিনিতে পারিলেন না; বরং, পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর সংশয়ারূঢ় হইয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! এরূপ মৌনভাবে রহিলেন কেন? রাজা কহিলেন, মহাশয়! কি করি বলুন; অনেক ভাবিয়া দেখিলাম; কিন্তু, ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া কোনও ক্রমেই স্মরণ হইতেছে না। সুতরাং, কি প্রকারে ইঁহারে ভার্যা বলিয়া পরিগ্রহ করি; বিশেষতঃ, ইনি এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন।

রাজার এই বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া, শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়, কি সর্বনাশ! এক বারে পাণিগ্রহণেই সন্দেহ! রাজমহিষী হইয়া, অশেষ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিব বলিয়া, যত আশা করিয়াছিলাম, সমুদয় এককালে নির্মূল হইল। শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! বিবেচনা করুন, মহর্ষি কেমন মহানুভাবতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি, তাঁহার অগোচরে, তাঁহার অনুমতিনিরপেক্ষ হইয়া, তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে রোষপ্রকাশ বা অসন্তোষপ্রদর্শন না করিয়া বিলক্ষণ সন্তোষপ্রদর্শন করিয়াছেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কন্যারে আপনকার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে, প্রত্যাখ্যান করিয়া তাদৃশ সদাশয় মহানুভাবের অবমাননা করা, মহারাজের কোনও মতেই কর্তব্য নহে। আপনি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া কর্তব্যনির্ধারণ করুন।

শারদ্বত শার্ঙ্গরব অপেক্ষা উদ্ধতস্বভাব ছিলেন; তিনি কহিলেন, অহে শার্ঙ্গরব! স্থির হও, আর তোমার বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তারিত করিবার প্রয়োজন নাই। আমি এক কথায় সকল বিষয়ের শেষ করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া, তিনি শকুন্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, শকুন্তলে! আমাদের যাহা বলিবার ছিল, বলিয়াছি; মহারাজ এইরূপ বলিতেছেন; এক্ষণে তোমার যাহা বলিবার থাকে, বল, এবং যাহাতে উঁহার প্রতীতি জন্মে, তাহা কর। তখন শকুন্তলা অতি মৃদু স্বরে কহিলেন, যখন তাদৃশ অনুরাগ এতাদৃশ ভাব অবলম্বন করিয়াছে, তখন আমি পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব; কিন্তু, আত্মশোধনের নিমিত্ত কিছু বলা আবশ্যক। এই বলিয়া, আর্যপুত্র! এইমাত্র সম্ভাষণ করিয়া, শকুন্তলা কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর কহিলেন, যখন পরিণয়েই সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আর আর্যপুত্রশব্দে সম্ভাষণ করা উচিত হইতেছে না। এইরূপ বলিয়া তিনি কহিলেন, পৌরব! আমি সরলহৃদয়া, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। তৎকালে তপোবনে তাদৃশী অমায়িকতা দেখাইয়া, ও ধর্মপ্রমাণ প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে এরূপ দুর্বাক্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নয়।

রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ঋষিতনয়ে! যেমন বর্ষাকালের নদী তীরতরুকে পতিত ও আপন প্রবাহকে পঙ্কিল করে, তেমনই তুমিও আমায় পতিত ও আপন কুলকে কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। শকুন্তলা কহিলেন, ভাল, যদি তুমি যথার্থই পরিণয়ে সন্দেহ করিয়া পরস্ত্রীবোধে পরিগ্রহ করিতে শঙ্কিত হও, কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইয়া তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। রাজা কহিলেন, এ উত্তম কল্প; কই, কি অভিজ্ঞান দেখাইবে, দেখাও। শকুন্তলা রাজদত্ত অঙ্গুরীয় অঞ্চলের কোণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে, ব্যস্ত হইয়া অঙ্গুরীয় খুলিতে গিয়া দেখিলেন, অঞ্চলের কোণে অঙ্গুরীয় নাই। তখন তিনি বিষণ্ণা ও ম্লানবদনা হইয়া গৌতমীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। গৌতমী কহিলেন, বোধ হয়, আলগা বাঁধা ছিল, নদীতে স্নান করিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, স্ত্রীজাতি অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি, এই যে কথা প্রসিদ্ধ আছে, ইহা তাহার এক অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

শকুন্তলা রাজার এইরূপ ভাব দর্শনে ম্রিয়মাণা হইয়া কহিলেন, আমি দৈবের প্রতিকূলতাবশতঃ অঙ্গুরীয়প্রদর্শনবিষয়ে অকৃতকার্য হইলাম বটে; কিন্তু এমন কোনও কথা বলিতেছি যে, তাহা শুনিলে, পূর্ববৃত্তান্ত অবশ্যই তোমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইবেক। রাজা কহিলেন, এক্ষণে শুনা আবশ্যক; কি বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মাইতে চাও, বল। শকুন্তলা কহিলেন, মনে করিয়া দেখ, এক দিন তুমি ও আমি দুজনে নবমালিকামণ্ডপে বসিয়া ছিলাম। তোমার হস্তে একটি জলপূর্ণ পদ্মপত্রের ঠোঙা ছিল। ইহা কহিয়া শকুন্তলা রাজার মুখপানে তাকাইলে, রাজা কহিলেন, ভাল, বলিয়া যাও, শুনিতেছি। শকুন্তলা কহিলেন, সেই সময়ে আমার কৃতপুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামে মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইল। তুমি উহারে সেই জল পান করিতে আহ্বান করিলে। তুমি অপরিচিত বলিয়া সে তোমার নিকটে আসিল না; পরে, আমি হস্তে করিলে, আমার নিকটে আসিয়া অনায়াসে পান করিল। তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে, সকলেই স্বজাতীয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে; তোমরা দুজনেই জঙ্গলা, এজন্য ও তোমার নিকটে গেল। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কামিনীদিগের এইরূপ মধুমাখা প্রবঞ্চনাবাক্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বশীকরণমন্ত্রস্বরূপ। গৌতমী শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এ জন্মাবধি তপোবনে প্রতিপালিত, প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। রাজা কহিলেন, অয়ি বৃদ্ধতাপসি! প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা, শিখিতে হয় না; মানুষের ত কথাই নাই, পশু-পক্ষীদিগেরও বিনা শিক্ষায় প্রবঞ্চনানৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ, কেহ শিখাইয়া দেয় না, অথচ কোকিলারা, কেমন কৌশল করিয়া স্বীয় সন্তানদিগকে অন্যপক্ষী দ্বারা, প্রতিপালিত করিয়া লয়। শকুন্তলা রুষ্টা হইয়া কহিলেন, অনার্য! তুমি আপনি যেমন, সকলকেই সেইরূপ মনে কর। রাজা কহিলেন, তাপসকন্যে! দুষ্মন্ত গোপনে কোনও কর্ম করে না; যখন যাহা করিয়াছে,

সমস্তই সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কই, কেহ বলুক দেখি, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। শকুন্তলা কহিলেন, তুমি আমায় স্বেচ্ছাচারিণী প্রতিপন্ন করিলে। পুরুবংশীয়েরা অতি উদারস্বভাব, এই বিশ্বাস করিয়া, যখন আমি মধুমুখ হলাহল-হৃদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে যে এরূপ ঘটিবেক, ইহা বিচিত্র নহে। এই বলিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কর্ম করিলে, পরিশেষে এইরূপ মনস্তাপ পাইতে হয়। এই নিমিত্ত, সকল কর্মই, বিশেষতঃ যাহা নির্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া, করা কর্তব্য নহে। পরস্পরের মন না জানিয়া বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধুতা পরিশেষে শত্রুতাতে পর্যবসিত হয়। শার্ঙ্গরবের তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, কেন আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার উপর অকারণে এরূপ দোষারোপ করিতেছেন? শার্ঙ্গরব কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে চাতুরী শিখে নাই, তাহার কথা অপ্রমাণ; আর, যাহারা পরপ্রতারণা বিদ্যা বলিয়া শিক্ষা করে, তাহাদের কথাই প্রমাণ হইবেক? তখন রাজা শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি বড় যথার্থবাদী। আমি স্বীকার করিলাম, প্রতারণাই আমাদের বিদ্যা ও ব্যবসায়। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইঁহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ হইবেক? শার্ঙ্গরব কোপে কম্পিত-কলেবর হইয়া কহিলেন, নিপাত! রাজা কহিলেন, পুরুবংশীয়েরা নিপাত লাভ করে, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। এইরূপে উভয়ের বিবাদারম্ভ দেখিয়া শারদ্বত কহিলেন, শার্ঙ্গরব! আর উত্তরোত্তর বাক্‌ছলের প্রয়োজন নাই; আমরা গুরুনিয়োগের অনুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়াছি; এক্ষণে ফিরিয়া যাই, চল। এই বলিয়া তিনি রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ইনি তোমার পত্নী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর; পত্নীর উপর পরিণেতার সর্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এই বলিয়া, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, ও গৌতমী, তিন জনে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন।

শকুন্তলা, সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিলেন, ইনি ত আমার এই করিলেন; তোমরাও আমায় ফেলিয়া চলিলে; আমার কি গতি হইবেক; এই বলিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৌতমী কিঞ্চিৎ থামিয়া কহিলেন, বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের সঙ্গে আসিতেছে; দেখ, রাজা প্রত্যাখ্যান করিলেন, এখানে থাকিয়া আর কি করিবেক, বল। আমি বলি, আমাদের সঙ্গেই আসুক। শার্ঙ্গরব শুনিয়া সরোষ নয়নে মুখ ফিরাইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, আঃ পাপীয়সি! স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছ? শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে কহিলেন, দেখ, রাজা যেরূপ কহিতেছেন, যদি তুমি যথার্থ সেরূপ হও, তাহা হইলে, তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হইলে; তাত কণ্ব আর তোমার মুখাবলোকন করিবেন না। আর, যদি তুমি আপনাকে

পতিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে, পতিগৃহে থাকিয়া দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অতএব, এইখানেই থাক, আমরা চলিলাম।

তপস্বীদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, রাজা শাঙ্গ'রবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি উহাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছেন কেন? পুরুবংশীয়েরা প্রাণান্তেও পরবনিতাপরিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় না; চন্দ্র কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন; সূর্য কমলিনীকেই উল্লাসিত করিয়া থাকেন। তখন শাঙ্গ'রব কহিলেন, মহারাজ! আপনি পরকীয় মহিলার আশঙ্কা করিয়া অধর্মভয়ে শকুন্তলাপরিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইতেছেন; কিন্তু ইহাও অসম্ভাবনীয় নহে, আপনি পূর্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া, রাজা পার্শ্বোপবিষ্ট পুরোহিতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মহাশয়কে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি, পাতকের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া, উপস্থিত বিষয়ে কি কর্তব্য, বলুন। আমিই পূর্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছি, অথবা এই স্ত্রীলোক মিথ্যা বলিতেছেন; এমন সন্দেহস্থলে, আমি দারত্যাগী হই, অথবা পরস্ত্রীস্পর্শ-পাতকী হই।

পুরোহিত শুনিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ বিবেচনা করিয়া, কহিলেন, ভাল, মহারাজ! যদি এরূপ করা যায়। রাজা কহিলেন, কি, আজ্ঞা করুন। পুরোহিত কহিলেন, ঋষিতনয়া প্রসবকাল পর্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। যদি বলেন, এ কথা বলি কেন? সিদ্ধ পুরুষেরা কহিয়াছেন, আপনকার প্রথম সন্তান চক্রবর্তিলক্ষণাক্রান্ত হইবেন। যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ হয়, ইঁহারে গ্রহণ করিবেন; নতুবা ইঁহার পিতৃসমীপগমন স্থিরই রহিল। রাজা কহিলেন, যাহা আপনাদের অভিরুচি। তখন পুরোহিত কহিলেন, তবে আমি ইঁহাকে প্রসবকাল পর্যন্ত আমার আলয়ে লইয়া রাখি। পরে, তিনি শকুন্তলাকে বলিলেন, বৎসে! আমার সঙ্গে আইস। শকুন্তলা, পৃথিবি! বিদীর্ণ হও, আমি প্রবেশ করি; আর আমি এ প্রাণ রাখিব না; এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে পুরোহিতের অনুগামিনী হইলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে পর, রাজা নিতান্ত উন্মনাঃ হইয়া শকুন্তলার বিষয়ে অনন্য মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, কি আশ্চর্য ব্যাপার! কি আশ্চর্য ব্যাপার! এই আকুল বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি, কি হইল! কি হইল! বলিয়া, পার্শ্ববর্তিনী প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসাকরিতে লাগিলেন। পুরোহিত, সহসা রাজসমীপে আসিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! বড় এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল। সেই স্ত্রীলোক, আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে, অপ্সরাতীর্থের নিকট আপন অদৃষ্টের দোষকীর্তন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল; অমনি এক জ্যোতিঃপদার্থ স্ত্রীবেশে সহসা আবির্ভূত হইয়া তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা কহিলেন, মহাশয়! যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, সে বিষয়ের আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই; আপনি আবাসে গমন করুন। পুরোহিত, মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া,

প্রস্থান করিলেন। রাজাও শকুন্তলাবৃত্তান্ত লইয়া নিতান্ত আকুলহৃদয় হইয়াছিলেন; এজন্য, অবিলম্বে সভাভঙ্গ করিয়া শয়নাগারে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নদীতে স্নান করিবার সময়, রাজদত্ত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঞ্চলকোণ হইতে সলিলে পতিত হইয়াছিল। পতিত হইবামাত্র এক অতিবৃহৎ রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। সেই মৎস্য, কতিপয় দিবসের পর, এক ধীবরের জালে পতিত হইল। ধীবর, খণ্ড খণ্ড বিক্রয় করিবার মানসে, ঐ মৎসকে বহু অংশে বিভক্ত করিতে করিতে তদীয় উদরমধ্যে অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইল। ঐ অঙ্গুরীয় লইয়া, পরম উল্লাসিত মনে, সে এক মণিকারের আপণে বিক্রয় করিতে গেল। মণিকার, সেই মণিময় অঙ্গুরীয় রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া, ধীবরকে চোর স্থির করিয়া, নগরপালের নিকট সংবাদ দিল। নগরপাল আসিয়া ধীবরকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল এবং জিজ্ঞাসিল, অরে বেটা চোর! তুই এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি, বল্? ধীবর কহিল, মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই বেটা যদি চোর নহিস্, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি? যদি চুরি করিস্ নাই, রাজা কি সুব্রাহ্মণ দেখিয়া তোরে দান করিয়াছেন?

এই বলিয়া নগরপাল চৌকীদারকে হুকুম দিলে, চৌকীদার ধীবরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ধীবর কহিল, অরে চৌকীদার! আমি চোর নহি, আমায় মার কেন? আমি কেমন করিয়া এই আঙটি পাইলাম, বলিতেছি। এই বলিয়া সে কহিল, আমি ধীবরজাতি, মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি। নগরপাল শুনিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, মর্ বেটা, আমি তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসিতেছি না কি? এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল, বল্। ধীবর কহিল, আজ সকালে আমি শচীতীর্থে জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে। মাছটা কাটিয়া উহার পেটের ভিতরে এই আঙটি দেখিতে পাইলাম। তার পর, এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি, এমন সময় আপনি আমায় ধরিলেন, আমি আর কিছুই জানি না; আমায় মারিতে হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন; আমি চুরি করি নাই।

নগরপাল শুনিয়া আঘ্রাণ লইয়া দেখিল, অঙ্গুরীয়ে আমিষগন্ধ নির্গত হইতেছে। তখন সে সন্দিহান হইয়া চৌকীদারকে কহিল, তুই এ বেটাকে এইখানে সাবধানে বসাইয়া রাখ্। আমি রাজবাটীতে গিয়া এই বৃত্তান্ত রাজার গোচর করি। রাজা শুনিয়া যেরূপ অনুমতি করেন। এই বলিয়া নগরপাল অঙ্গুরীয় লইয়া রাজভবনে গমন করিল; এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া চৌকীদারকে কহিল, অরে! ত্বরায় ধীবরের বন্ধন খুলিয়া দে, এ চোর নয়। অঙ্গুরীয়প্রাপ্তিবিষয়ে ও যাহা কহিয়াছে, বোধ হইতেছে, তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। আর, রাজা উহারে অঙ্গুরীয়ের তুল্যমূল্য

এই মহামূল্য পুরস্কার দিয়াছেন। এই বলিয়া পুরস্কার দিয়া নগরপাল ধীবরকে বিদায় দিল, এবং চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হইবামাত্র, শকুন্তলাবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত রাজার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি, নিরতিশয় কাতর হইয়া, যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, এবং শকুন্তলার পুনর্দর্শনবিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া সর্ববিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলেন। আহার, বিহার, রাজকার্যপর্যালোচনা প্রভৃতি এক বারেই পরিত্যক্ত হইল। শকুন্তলার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, তিনি সর্বদাই ম্লান ও বিষণ্ণ বদনে কালযাপন করিতে লাগিলেন ; লোকমাত্রের সহিত বাক্যালাপ এক কালে রহিত হইল ; কোনও ব্যক্তির, কোনও কারণে, রাজসন্নিধানে গতিবিধি এক বারে প্রতিষিদ্ধ হইয়া গেল। কেবল প্রিয় বয়স্য মাধব্য সর্বদা সমীপে উপবিষ্ট থাকেন। মাধব্য সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিত ; নয়নযুগল হইতে অবিরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে থাকিত।

এক দিবস, রাজার চিত্তবিনোদনার্থে, মাধব্য তাঁহাকে প্রমোদবনে লইয়া গেলেন। উভয়ে শীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে, মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল বয়স্য ! যদি তুমি তপোবনে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে, তবে, তিনি উপস্থিত হইলে, প্রত্যাখ্যান করিলে কেন ? রাজা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, বয়স্য ! ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর ? রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া আমি শকুন্তলাবৃত্তান্ত এক বারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কেন বিস্মৃত হইলাম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিবস প্রিয়া কত প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু, আমার কেমন মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, কিছুই স্মরণ হইল না। তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারিণী মনে করিয়া, কতই দুর্বাক্য কহিয়াছি, কতই অবমাননা করিয়াছি। এই বলিতে বলিতে নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল ; বাক্‌শক্তিরহিতের ন্যায় কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; অনন্তর, মাধব্যকে কহিলেন, ভাল, আমিই যেন বিস্মৃত হইয়াছিলাম ; তোমায় ত সমুদায় বলিয়াছিলাম ; তুমি কেন কথাপ্রসঙ্গেও কোনও দিন শকুন্তলার কথা উত্থাপিত কর নাই ? তুমিও কি আমার মত বিস্মৃত হইয়াছিলে ?

তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য ! আমার দোষ নাই ; সমুদয় কহিয়া পরিশেষে তুমি বলিয়াছিলে, শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল কথা বলিলাম, সমস্তই পরিহাসমাত্র, বাস্তবিক নহে। আমিও নিতান্ত নির্বোধ ; তোমার শেষ কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম ; এই নিমিত্ত, কখনও সে বিষয়ের উল্লেখ করি নাই। বিশেষতঃ, প্রত্যাখ্যানদিবসে আমি তোমার নিকটে ছিলাম না ; থাকিলে, যাহা শুনিয়াছিলাম, আবশ্যক বোধ হইলে বলিতে পারিতাম। রাজা, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বাষ্পাকুল লোচনে শোকাকুল বচনে কহিলেন, বয়স্য ! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এই বলিয়া তিনি সাতিশয় শোকাভিভূত হইলেন। তখন

মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! শোকে এরূপ অভিভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। দেখ, সৎপুরুষেরা শোকের ও মোহের বশীভূত হয়েন না। প্রাকৃত জনেরাই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। যদি উভয়ই বায়ুভরে বিচলিত হয়, তবে বৃক্ষে ও পর্বতে বিশেষ কি? তুমি গম্ভীরস্বভাব, ধৈর্য অবলম্বন ও শোকাবেগ সংবরণ কর।

প্রিয় বয়স্যের প্রবোধবাণী শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, সখে! আমি নিতান্ত অবোধ নহি; কিন্তু, মন আমার কোনও ক্রমে প্রবোধ মানিতেছে না; কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিব। প্রত্যাখ্যানের পর, প্রিয়া, প্রস্থানকালে, সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শন-পূর্বক আমার দিকে যে বারংবার বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই কাতর দৃষ্টিপাত আমার বক্ষঃস্থলে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমি তৎকালে তাঁহার প্রতি যে ক্রূরের ব্যবহার করিয়াছি, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মরিলেও আমার এ দুঃখ যাইবে না।

মাধব্য রাজাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আশ্বাসপ্রদানার্থে কহিলেন, বয়স্য! অত কাতর হইও না; কিছু দিন পরে, পুনরায় শকুন্তলার সহিত নিঃসন্দেহ তোমার সমাগম হইবেক। রাজা কহিলেন, বয়স্য! আমি এক মুহূর্তের নিমিত্তেও আর সে আশা করি না। এ দেহধারণে, আর আমি প্রিয়ার দর্শন পাইব না। ফলকথা এই, এ জন্মের মত আমার সকল সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে; নতুবা, তৎকালে আমার তেমন দুর্বুদ্ধি ঘটিল কেন? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! কোনও বিষয়েই নিতান্ত হতাশ হওয়া উচিত নয়। ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে! দেখ, এই অঙ্গুরীয় যে পুনরায় তোমার হস্তে আসিবেক, কাহার মনে ছিল।

ইহা শুনিয়া, অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিপাতপূর্বক রাজা উহাকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অঙ্গুরীয়! তুমিও আমার মত হতভাগ্য; নতুবা, প্রিয়ার কমনীয় কোমল অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়া, কি নিমিত্ত সেই দুর্লভ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তুমি কি উপলক্ষে তাঁহার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলে? রাজা কহিলেন, রাজধানী প্রত্যাগমনসময়ে, প্রিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার হস্তে ধরিয়া কহিলেন, আর্যপুত্র! কত দিনে আমায় নিকটে লইয়া যাইবে? তখন আমি এই অঙ্গুরীয় তাঁহার কোমল অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া কহিলাম, প্রিয়ে! তুমি প্রতিদিন আমার নামের এক একটি অক্ষর গণিবে; গণনাও সমাপ্ত হইবেক, আমার লোক আসিয়া তোমায় লইয়া যাইবেক। প্রিয়ার নিকট সরল হৃদয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু মোহান্ধ হইয়া, এক বারেই বিস্মৃত হই।

তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া রোহিত মৎস্যের উদরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা কহিলেন, শুনিয়াছি, শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় প্রিয়ার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে সলিলে পতিত হইয়াছিল। মাধব্য কহিলেন, হাঁ সম্ভব বটে, সলিলে পতিত হইলে রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। রাজা অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আমি এই অঙ্গুরীয়ের যথোচিত তিরস্কার করিব। এই বলিয়া কহিলেন,

অরে অঙ্গুরীয়! প্রিয়ার কোমল করপল্লব পরিত্যাগ করিয়া জলে মগ্ন হইয়া তোর কি লাভ হইল, বল্। অথবা, তোরে তিরস্কার করা অন্যায়; কারণ, অচেতন ব্যক্তি কখনও গুণগ্রহণ করিতে পারে না। নতুবা, আমিই কি নিমিত্ত প্রিয়ারে পরিত্যাগ করিলাম? এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমায় অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি; অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে; দর্শন দিয়া প্রাণরক্ষা কর।

রাজা শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে চতুরিকানাম্নী পরিচারিকা এক চিত্রফলক আনিয়া দিল। রাজা চিত্তবিনোদনার্থে ঐ চিত্রফলকে স্বহস্তে শকুন্তলার প্রতিমূর্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন। মাধব্য দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, বয়স্য! তুমি চিত্রফলকে কি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছ! দেখিয়া কোনও মতে চিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে না। আহা মরি, কি রূপলাবণ্যের মাধুরী! কি অঙ্গসৌষ্ঠব! কি অমায়িক ভাব! মুখারবিন্দে কি সলজ্জ ভাব প্রকাশ পাইতেছে! রাজা কহিলেন, সখে! তুমি প্রিয়াকে দেখ নাই, এই নিমিত্ত আমার চিত্রনৈপুণ্যের এত প্রশংসা করিতেছ। যদি তাঁহারে দেখিতে, চিত্র দেখিয়া কখনই সন্তুষ্ট হইতে না। তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যের কিঞ্চিৎ অংশমাত্র এই চিত্রফলকে আবির্ভূত হইয়াছে। এই বলিয়া, পরিচারিকাকে কহিলেন, চতুরিকে! বর্তিকা ও বর্ণপাত্র লইয়া আইস; অনেক অংশ চিত্রিত করিতে অবশিষ্ট আছে।

এই বলিয়া চতুরিকাকে বিদায় করিয়া রাজা মাধব্যকে কহিলেন, সখে! আমি, স্বাদুশীতলনির্মলজলপূর্ণ নদী পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃগতৃষ্ণিকায় পিপাসা শান্তি করিতে উদ্যত হইয়াছি; প্রিয়াকে পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে চিত্রদর্শন দ্বারা চিত্তবিনোদনের চেষ্টা পাইতেছি। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! চিত্রফলকে আর কি লিখিবে? রাজা কহিলেন, তপোবন ও মালিনী নদী লিখিব; যে রূপে হরিণগণকে তপোবনে সচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে এবং হংসগণকে মালিনী নদীতে কেলি করিতে দেখিয়াছিলাম, সে সমুদয়ও চিত্রিত করিব; আর, প্রথম দর্শনের দিবসে প্রিয়ার কর্ণে শিরীষপুষ্পের যেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম, তাহাও লিখিব।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে, প্রতিহারী আসিয়া রাজহস্তে একখানি পত্র দিল। রাজা পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কোথাকার পত্র, পত্র পড়িয়া এত বিষণ্ণ হইলে কেন? রাজা কহিলেন, বয়স্য! ধনমিত্র নামে এক সাংযাত্রিক সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার। এই নিমিত্ত অমাত্য আমায় তদীয় সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছেন। দেখ, বয়স্য! নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়! নামলোপ হইল, বংশলোপ হইল, এবং বহু যত্নে বহু কষ্টে বহু কালে উপার্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, আমার লোকান্তর হইলে, আমারও নাম, বংশ, ও রাজ্যের এই গতি হইবেক।

রাজার এইরূপ আক্ষেপ শুনিয়া মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তুমি অকারণে এত পরিতাপ কর কেন? তোমার সন্তানের বয়স অতীত হয় নাই। কিছু দিন পরে, তুমি অবশ্যই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবে। রাজা কহিলেন, বয়স্য! তুমি আমায় মিথ্যা প্রবোধ দিতেছ কেন? উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতের প্রত্যাশা করা মূঢ়ের কর্ম। আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার পুত্রমুখনিরীক্ষণের আশা নাই।

এইরূপে কিয়ৎ ক্ষণ বিলাপ করিয়া রাজা অপুত্রতানিবন্ধন শোকের সংবরণপূর্বক, প্রতিহারীকে কহিলেন, শুনিয়াছি, ধনমিত্রের অনেক ভার্যা আছে; তন্মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা থাকিতে পারে; অমাত্যকে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বল। প্রতিহারী কহিল, মহারাজ! অযোধ্যানিবাসী শ্রেষ্ঠীর কন্যা ধনমিত্রের এক ভার্যা। শুনিয়াছি, শ্রেষ্ঠিকন্যা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে অমাত্যকে বল, সেই গর্ভস্থ সন্তান ধনমিত্রের সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক।

এই আদেশ দিয়া, প্রতিহারীকে বিদায় করিয়া, রাজা মাধব্যের সহিত পুনরায় শকুন্তলাসংক্রান্ত কথোপকথনের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবরথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা, দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া, মাতলিকে স্বাগত জিজ্ঞাসা পুরঃসর আসনপরিগ্রহ করিতে বলিলেন। মাতলি আসনপরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! দেবরাজ যদর্থে আমায় আপনকার নিকটে পাঠাইয়াছেন, নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কালনেমির সন্তান দুর্জয় নামে দুর্দান্ত দানবগণ দেবতাদিগের বিষম শত্রু হইয়া উঠিয়াছে; কতিপয় দিবসের নিমিত্ত দেবলোকে গিয়া আপনাকে দুর্জয় দানবদলের দমন করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন, দেবরাজের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম; পরে মাধব্যকে কহিলেন, বয়স্য! অমাত্যকে বল, আমি কিয়ৎ দিনের নিমিত্ত দেবকার্যে ব্যাপৃত হইলাম; আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত তিনি একাকী সমস্ত রাজকার্যের পর্যালোচনা করুন।

এই বলিয়া সসজ্জ হইয়া রাজা ইন্দ্ররথে আরোহণপূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজা দানবজয়কার্যে ব্যাপৃত হইয়া দেবলোকে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। দেবকার্য সমাধানের পর, মর্তলোকে প্রত্যাগমনকালে মাতলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, দেবরাজ আমার যে গুরুতর সৎকার করেন, আমি আপনাকে সেই সৎকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে অতিশয় সঙ্কুচিত হই। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই সমান। আপনি দেবতাদিগের যে উপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে তদপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিয়া সঙ্কুচিত

হন ; দেবরাজও স্বকৃত সৎকারকে মহারাজকৃত উপকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, দেবরাজসারথে! এমন কথা বলিও না ; বিদায় দিবার সময় দেবরাজ যে সৎকার করিয়া থাকেন, তাহা মাদৃশ জনের মনোরথেরও অগোচর। দেখ, সমবেত সর্ব দেব সমক্ষে অর্ধাসনে উপবেশন করাইয়া, স্বহস্তে আমার গলদেশে মন্দারমালা অর্পণ করেন। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! আপনি সময়ে সময়ে দানবজয় করিয়া দেবরাজের যে মহোপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে আমি তদপেক্ষা অধিক বোধ করি না। বিবেচনা করিতে গেলে, আজ কাল মহারাজের ভুজবলেই দেবলোক নিরুপদ্রব রহিয়াছে। রাজা কহিলেন, আমি যে অনায়াসে দেবরাজের আদেশ সম্পন্ন করিতে পারি, সে দেবরাজেরই মহিমা ; নিযুক্তেরা প্রভুর প্রভাবেই মহৎ মহৎ কর্ম সকল সম্পন্ন করিয়া উঠে। যদি সূর্যদেব আপন রথের অগ্রভাগে না রাখিতেন, তাহা হইলে, অরুণ কি অন্ধকার দূর করিতে পারিতেন ? তখন মাতলি সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বিনয় সদ্গুণের শোভাসম্পাদন করে, এ কথা আপনাতেই বিলক্ষণ বর্তিয়াছে।

এইরূপ কথোপকথনে আসক্ত হইয়া, কিয়ৎ দূর আগমন করিয়া, রাজা মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজসারথে! ঐ যে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পর্বত স্বর্ণনির্মিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ও পর্বতের নাম কি ? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও হেমকূট পর্বত, কিন্নর ও অপ্সরাদিগের বাসভূমি ; তপস্বীদিগের তপস্যাসিদ্ধির সর্বপ্রধান স্থান ; ভগবান্ কশ্যপ ঐ পর্বতে তপস্যা করেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাইব ; এতাদৃশ মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া, বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণ চলিয়া যাওয়া অবিধেয়। তুমি রথ স্থির কর, আমি এই স্থানেই অবতীর্ণ হইতেছি।

মাতলি রথ স্থির করিলেন। রাজা, রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজসারথে! এই পর্বতের কোন্ অংশে ভগবানের আশ্রম ? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষির আশ্রম অধিক দূরবর্তী নহে ; চলুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইতেছি। কিয়ৎ দূর গমন করিয়া, এক ঋষিকুমারকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া, মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন ? ঋষিকুমার কহিলেন, এক্ষণে তিনি নিজপত্নী অদিতিকে ও অন্যান্য ঋষিপত্নীদিগকে পতিব্রতা ধর্ম শ্রবণ করাইতেছেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি এখন তাঁহার নিকটে যাইব না। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! আপনি, এই অশোকবৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ অপেক্ষা করুন ; আমি মহর্ষির নিকট আপনকার আগমনসংবাদ নিবেদন করিতেছি। এই বলিয়া মাতলি প্রস্থান করিলেন।

রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিজ হস্তকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে হস্ত! আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে

পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই ; তুমি কি নিমিত্ত বৃথা স্পন্দিত হইতেছ ? রাজা মনে মনে এই আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে, বৎস ! এত উদ্ধত হও কেন, এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এ অবিনয়ের স্থান নহে ; এখানে যাবতীয় জীব জন্তু স্থানমাহাত্ম্যে হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সৌহার্দ্যে কালযাপন করে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অনুচিত ব্যবহার করে না ; এমন স্থানে কে ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইল।

এইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজা শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তপোবনের কি অনির্বচনীয় মহিমা ! মানবশিশু সিংহ-শিশুর উপর অত্যাচার করিতেছে ; সিংহশিশু অবিকৃত চিত্তে সেই অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অনন্তর, তিনি কিঞ্চিৎ নিকটবর্তী হইয়া সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহপরিপূর্ণ চিত্তে কহিতে লাগিলেন, আপন ঔরস পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন ? অথবা, আমি পুত্রহীন বলিয়া এই সর্বাঙ্গসুন্দর শিশুকে দেখিয়া আমার মনে এরূপ স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে।

এ দিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন, বৎস ! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি ; তুমি কেন অকারণে উহারে ক্লেশ দাও ? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও ; ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর, যদি তুমি উহারে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমায় জব্দ করিবেক। বালক শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া সিংহশাবকের উপর অধিকতর উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাপসীরা ভয়প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া প্রলোভনার্থে কহিলেন, বৎস ! তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমায় একটি ভাল খেলানা দিব।

রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু, সহসা তাঁহাদের সম্মুখে না গিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, সস্নেহ নয়নে সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই বালক, কই কি খেলানা দিবে দাও বলিয়া, হস্তপ্রসারণ করিল। রাজা, বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া, চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য ! এই বালকের হস্তে চক্রবর্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তাপসীদের সঙ্গে কোনও খেলানা ছিল না ; সুতরাং, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক কুপিত হইয়া কহিল, তোমরা খেলানা দিলে না, তবে আমি উহারে ছাড়িব না।

তখন এক তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন, সখি! ও কথায় ভুলাইবার ছেলে নয়; কুটীরে মাটির ময়ূর আছে, ত্বরায় লইয়া আইস। তাপসী মৃণ্ময় ময়ূরের আনয়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে! পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয়, আমি পূর্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহারে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে; হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অর্ধ বিনির্গত কুন্দসন্নিভ দন্তগুলি অবলোকন করে; যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে; তখন সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি কি অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। আমি অতি হতভাগ্য। সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া সর্ব শরীর শীতল করিব; পুত্রের অর্ধ বিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব; এবং অর্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্মূল হইয়া গিয়াছে।

ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া কুপিত হইয়া বালক কহিল, এখনও ময়ূর দিলে না, তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না; এই বলিয়া, সিংহশিশুকে অতিশয় বলপ্রকাশপূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তদীয় হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে কোনও মতে মুক্ত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এমন সময়ে, এখানে কোনও ঋষিকুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়। এই বলিয়া পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র তিনি রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া নিরীহ সিংহশিশুকে এই দুর্দান্ত বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। রাজা, তৎক্ষণাৎ নিকটে গিয়া, সেই বালককে ঋষিপুত্রবোধে তদনুরূপ সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, অহে ঋষিকুমার! তুমি কেন তপোবনবিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নয়। রাজা কহিলেন, বালকের আকার দেখিয়া বোধ হইতেছে ঋষিকুমার নয়; কিন্তু, এ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগমসম্ভাবনা নাই, এজন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পরকীয় পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইতেছে; যাহার পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার গাত্র স্পর্শ করিয়া কি অনুপম সুখ অনুভব করে, তাহা বলা যায় না।

বালক নিতান্ত দুর্দান্ত হইয়াও রাজার নিকট একান্ত শান্তস্বভাব হইল, ইহা দেখিয়া, এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা ঐ বালক ঋষিকুমার নহে, ইহা অবগত হইয়া, তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন, মহাশয়! এ পুরুবংশীয়। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, ইহারও সেই বংশে জন্ম। পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে, তাঁহারা, প্রথমতঃ সাংসারিক সুখভোগে সচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে সস্ত্রীক হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন।

পরে রাজা তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে; তবে এই বালক কি সংযোগে এখানে আসিল? তাপসী কহিলেন, ইহার জননী অপ্সরাসম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পুরুবংশ ও অপ্সরাসম্বন্ধ, এই দুই কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে পুনর্বার আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহা হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহভঞ্জন হইবেক।

এই বলিয়া তিনি তাপসীকে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, আপনি জানেন, এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ ব্যক্তির পুত্র? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! কে সেই ধর্মপত্নীপরিত্যাগী পাপাত্মার নাম কীর্তন করিবেক? রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ কথা আমারেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই এক কালে সকল সন্দেহ দূর হইবেক; অথবা পরস্ত্রীসংক্রান্ত কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। আমি যখন মোহান্ধ হইয়া স্বহস্তে আশালতার মূলচ্ছেদ করিয়াছি, তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক; অতএব ও কথায় আর কাজ নাই।

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে অপরা তাপসী কুটীর হইতে মৃণ্ময় ময়ূর আনয়ন করিলেন এবং কহিলেন, বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ। এই বাক্যে শকুন্তলাশব্দ শ্রবণ করিয়া বালক কহিল, কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন, না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। আমি তোমায় শকুন্তের লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি। ইহা বলিয়া রাজাকে কহিলেন, মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনার কাহাকেও দেখে নাই; নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে; এই নিমিত্ত নিতান্ত মাতৃবৎসল। শকুন্তলাবণ্যশব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার জননীর নাম শকুন্তলা।

সমুদায় শ্রবণগোচর করিয়া রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহার জননীর নাম শকুন্তলা? কি আশ্চর্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে! এই সকল কথা শুনিয়া আমার আশাই বা না জন্মিবেক কেন? অথবা আমি মৃগতৃষ্ণিকায়

ভ্রান্ত হইয়াছি; এজন্য নামসাদৃশ্যশ্রবণে মনে মনে বৃথা এত আন্দোলন করিতেছি; এরূপ নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।

শকুন্তলা অনেক ক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই, এ নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে, সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নযুগলে প্রবলবেগে জলধারা বহিতে লাগিল; বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও, অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া, স্থির নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল, মা! ও কে, ওকে দেখে তুই কাঁদিস্ কেন? তখন শকুন্তলা গদ্‌গদ বচনে কহিলেন, বাছা! ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাজা মনের আবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই অবমাননাপূর্বক তোমায় বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই, সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে উপনীত হইয়াছিল; তদবধি আমি কি অসুখে কালহরণ করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। পুনরায় তোমার দর্শন পাইব, আমার সে আশা ছিল না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যানদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ মার্জনা কর।

রাজা এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা অস্তব্যস্তে রাজার হস্তে ধরিয়া কহিলেন, আর্যপুত্র! উঠ, উঠ; তোমার দোষ কি; সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এত দিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে শকুন্তলার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! প্রত্যাখ্যানকালে তোমার নয়নযুগল হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম; পরে সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া দিয়া সকল দুঃখ দূর করি। এই বলিয়া তিনি স্বহস্তে শকুন্তলার চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। শকুন্তলার শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল; প্রবল প্রবাহে নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর দুঃখাবেগের সংবরণ করিয়া শকুন্তলা রাজাকে কহিলেন, আর্যপুত্র! তুমি যে এই দুঃখিনীকে পুনরায় স্মরণ করিবে, সে আশা ছিল না। কি রূপে আমি পুনর্বার তোমার স্মৃতিপথে উপনীত হইলাম, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! তৎকালে তুমি আমায় যে অঙ্গুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিবস পরে উহা আমার হস্তে

পড়িলে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। এই সেই অঙ্গুরীয়। এই বলিয়া, স্বীয় অঙ্গুলীস্থিত সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া, পুনর্বার শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন, আর্যপুত্র! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই; ওই আমার সর্বনাশ করিয়াছিল; ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে মাতলি আসিয়া প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, মহারাজ! এত দিনের পর আপনি যে ধর্মপত্নীর সহিত সমাগত হইলেন, ইহাতে আমরা কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। ভগবান্ কশ্যপও শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে আশ্রমে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করুন; তিনি আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে! চল, আজ উভয়ে এক সমভিব্যাহারে ভগবানের চরণদর্শন করিব। শকুন্তলা কহিলেন, আর্যপুত্র! ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে গুরুজনের নিকট যাইতে পারিব না। তখন রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! শুভ সময়ে এক সমভিব্যাহারে গুরুজনের নিকটে যাওয়া দোষাবহ নহে। চল, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।

এই বলিয়া রাজা শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া, মাতলি সমভিব্যাহারে কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, ভগবান্ অদিতির সহিত একাসনে বসিয়া আছেন; তখন সস্ত্রীক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কশ্যপ, বৎস! চিরজীবী হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য কর, এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন; অনন্তর শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! তোমার স্বামী ইন্দ্রসদৃশ, পুত্র জয়ন্তসদৃশ; তোমায় অন্য আর কি আশীর্বাদ করিব; তুমি শচীসদৃশী হও। এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া কশ্যপ উভয়কে উপবেশন করিতে বলিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়পূর্ণ বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! শকুন্তলা আপনকার সগোত্র মহর্ষি কণ্বের পালিত তনয়া। মৃগয়াপ্রসঙ্গে তদীয় তপোবনে উপস্থিত হইয়া আমি গান্ধর্ব বিধানে ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে, ইনি যৎকালে রাজধানীতে নীত হন, তখন আমার এরূপ স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল যে, ইঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি মহাশয়ের ও মহর্ষি কণ্বের নিকট, যার পর নাই, অপরাধী হইয়াছি। কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জনা করুন; আর, যাহাতে ভগবান্ কণ্ব আমার উপর অক্রোধ হন, আপনাকে তাহারও উপায় করিতে হইবেক।

কশ্যপ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! সে জন্য তুমি কুণ্ঠিত হইও না। এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্র অপরাধ নাই। যে কারণে তোমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, তুমি ও শকুন্তলা উভয়েই অবগত নহ। এই নিমিত্ত আমি সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি; শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যাননিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর

হইবেক। এই বলিয়া তিনি শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! রাজা তপোবন হইতে স্বীয় রাজধানী প্রতিগমন করিলে পর, এক দিন তুমি পতিচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া কুটীরে উপবিষ্ট ছিলে। সেই সময়ে দুর্বাসা আসিয়া অতিথি হন। তুমি এক কালে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছিলে, সুতরাং তাঁহার সৎকার বা সংবর্ধনা করা হয় নাই। তিনি কুপিত হইয়া তোমায় এই শাপ দিয়া চলিয়া যান, তুই যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, সে কখনও তোরে স্মরণ করিবেক না। তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই। তোমার সখীরা শুনিতে পাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া অনেক অনুনয় করিলেন। তখন তিনি কহিলেন, এ শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে যদি কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহা হইলে স্মরণ করিবেক। অনন্তর, রাজাকে কহিলেন, বৎস! দুর্বাসার শাপপ্রভাবেই তোমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, তাহাতেই তুমি ইঁহাকে চিনিতে পার নাই। শকুন্তলার সখীর অনুনয়বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া দুর্বাসা অভিজ্ঞানদর্শনকে শাপমোচনের উপায় নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত অঙ্গুরীয়দর্শনমাত্র শকুন্তলাবৃত্তান্ত পুনর্বার তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

দুর্বাসার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়া রাজা কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমি সকলের নিকট সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম। শকুন্তলাও শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই নিমিত্তই আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছিল; নতুবা, আর্যপুত্র এমন সরলহৃদয় হইয়া কেন আমায় অকারণে পরিত্যাগ করিবেন? দুর্বাসার শাপই আমার সর্বনাশের মূল। এই জন্যেই, তপোবন হইতে প্রস্থানকালে, সখীরাও যত্নপূর্বক আর্যপুত্রকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে কহিয়াছিলেন। আজ ভাগ্যে এই কথা শুনিলাম; নতুবা, যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে আর্যপুত্র অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষোভ থাকিত।

পরে, কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক, এবং সকল ভুবনের ভর্তা হইয়া উত্তর কালে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন, তখন ইহাতে কি না সম্ভবিতে পারে? অদিতি কহিলেন, অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক। তদনুসারে, কশ্যপ দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদ-প্রদানার্থে প্রেরণ করিলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, বৎস! বহু দিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ; অতএব, আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণ-পূর্বক, পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন, এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্বক পরম সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

মহাভারত

(উপক্রমণিকাভাগ)

বিজ্ঞাপন

মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পৃথক প্রচারিত হয় আমার এরূপ অভিলাষ ছিল না। অবশেষে কতিপয় বন্ধুর সবিশেষ অনুরোধে পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। পুস্তকাকারে প্রচারিত করিতে গেলে পরিশ্রমসহকারে সংশোধনাদি করা আবশ্যক, কিন্তু অবকাশ-বিরহাদি কারণবশতঃ তাহা সম্যক্ সমাহিত হইয়া উঠে নাই ; সুতরাং বিশেষজ্ঞ মহাশয়েরা স্থানে স্থানে অশেষ দোষ দর্শন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

মহাভারতে নির্দ্দেশ আছে, কেহ প্রথম অবধি, কেহ আস্তীকপর্ব্ব অবধি, কেহ উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি, ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা শেষ কল্প অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মতে উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি ভারতের প্রকৃত আরম্ভ ; সুতরাং তত্তন্মতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সকল তদীয় উপক্রমণিকাস্বরূপ। এই পুস্তক ঐ অংশের অনুবাদ মাত্র ; এই নিমিত্ত শেষ কল্প অবলম্বন করিয়া অনুবাদিত অংশ উপক্রমণিকাভাগ বলিয়া উল্লিখিত হইল।

মূলগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করাই তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল, আমিও অনুবাদকালে তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু সভার অভিপ্রায়রক্ষাবিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, মূলের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে অনেক স্থলে অর্থগত ও তাৎপর্য্যনিষ্ঠ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক, তাহার সংশয় নাই। মূলগ্রন্থে অনেক স্থান এরূপ আছে যে, সহজে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। সেই সকল স্থল, অনুধাবন করিয়া অথবা টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা দেখিয়া পূর্ব্বাপর যেরূপ বোধ হইয়াছিল, তদনুসারেই অনুবাদিত হইয়াছে ; সুতরাং তত্তৎস্থলের অনুবাদ সর্ব্বসম্মত হওয়া সম্ভাবিত নহে। ফলতঃ নানা কারণ-বশতঃ মহাভারতের অনুবাদ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়।

যাহা হউক, এই পুস্তক পাঠ করিয়া সকলে প্রীত হইবেন, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। যদি ইহা পাঠকবিশেষের পক্ষে কিঞ্চিৎ অংশেও প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।
সংবৎ ১৯১৬। ১লা মাঘ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

আদিপর্ব

প্রথম অধ্যায়—অনুক্রমণিকা।

নারায়ণ, সর্বনরোত্তম নর (১), এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয় (২) উচ্চারণ করিবেক।

কুলপতি (৩) শৌনক নৈমিষারণ্যে (৪) দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক দিবস ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্মাবসানে একত্র সমাগত হইয়া

---

(১) বিষ্ণুর অবতার ঋষিবিশেষ। বিষ্ণু ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যা মূর্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ এই মূর্তিদ্বয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই ঋষিরূপে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। যথা,

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ॥ ভাগবত ২।৭।৭।

তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ॥ ভাগ ১।৩।৭।

পুরাণান্তরে নর নারায়ণের উৎপত্তি প্রকারান্তরে নির্দিষ্ট আছে। মহাদেব সরভরূপ পরিগ্রহ করিয়া দন্তাগ্রভাগপ্রহার দ্বারা বিষ্ণুর নরসিংহমূর্তি দুই খণ্ড করেন, তাহার নরভাগ দ্বারা নর ও সিংহভাগ দ্বারা নারায়ণ এই দুই দিব্যরূপী ঋষি উৎপন্ন হয়েন। যথা,

ততো দেহপরিত্যাগং কর্ত্তুং সমভবদ্‌যদা।
তদা দংষ্ট্রাগ্রভাগেন নরসিংহং মহাবলম্।
সরভো ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকার হ॥
নরসিংহে দ্বিধাভূতে নরভাগেন তস্য তু।
নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহানৃষিঃ॥
তস্য পঞ্চাস্যভাগেন নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ।
অভবৎ স মহাতেজা মুনিরূপী জনার্দ্দনঃ॥
নরো নারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টিহেতু মহামতী।
যয়োঃ প্রভাবো দুর্দ্ধর্ষঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসু চ॥ কালিকাপুরাণ।

(২) রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস ও অষ্টাদশ পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সংসার জয় হয়, অর্থাৎ জীব জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ সংসারশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হয়, এই নিমিত্ত তত্তৎ শাস্ত্রের নাম জয়। যথা,

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমঞ্চ যন্মহাভারতং বিদুঃ॥
তথৈব শিবধর্ম্মাশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
জয়েতি নাম তেষাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
সংসারজয়নং গ্রন্থং জয়নামানমীরয়েৎ॥ ভবিষ্যপুরাণ।

(৩) আশ্রমের মধ্যে সর্বপ্রধান মুনি।

(৪) ভগবান্ গৌরমুখ ঋষিকে কহিয়াছিলেন যে আমি এই অরণ্যে এক নিমিষে দুর্জয় দানবসৈন্য ধ্বংস করিলাম, এই নিমিত্তে ইহা নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। যথা,

এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা।
উবাচ নিমিষেণেদং নিহতং দানবং বলম্।
অরণ্যেঽস্মিংস্ততস্ত্বেতন্নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্॥

কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে সূতকুলপ্রসূত (৫) লোমহর্ষণতনয় (৬) পৌরাণিক (৭) উগ্রশ্রবাঃ বিনীতভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বিগণ, দর্শনমাত্র অদ্ভুত কথা শ্রবণবাসনাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উগ্রশ্রবাঃ বিনয়নম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদনপূর্বক সেই সমস্ত মুনিদিগকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত অতিথিসৎকারান্তে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পরে সমুদয় ঋষিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে তিনিও নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর, তাঁহার শ্রান্তি দূর হইলে, কোন ঋষি কথা প্রসঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পদ্মপলাশ-লোচন সূতনন্দন! তুমি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ, এবং এত কাল কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিলে বল।

এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাগ্মী উগ্রশ্রবাঃ সেই সভাস্থ প্রশান্তচিত্ত মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া যথানিয়মে পরিশুদ্ধ বচনে এই উত্তর দিলেন, হে মহর্ষিগণ! প্রথমতঃ মহানুভাব

(৫) ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সঙ্কীর্ণ জাতি। যথা,

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ। যাজ্ঞবল্ক্য ১ অধ্যায়।

(৬) লোমহর্ষণ ব্যাসদেবের বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপ্রণীত সমস্ত পুরাণ সংহিতা সমর্পণ করেন। এই নিমিত্ত তিনি পুরাণবক্তা। লোমহর্ষণ সর্বত্র সূত নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা তাঁহার কুলানুযায়ী নাম, প্রকৃত নাম নহে, যে হেতু কল্কিপুরাণে সূতপুত্র বলিয়া লোমহর্ষণের বিশেষণ আছে; এবং লোমহর্ষণ নামও তাঁহার আদি নাম নহে, তাঁহার নিকট পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষ অর্থাৎ লোমাঞ্চ হইত, এই নিমিত্ত তাঁহার লোমহর্ষণ নাম হয়। যথা,

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাস্তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥ বিষ্ণু ৩। ৬। ১৬।
তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ।
বলরামাস্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষেঽভূৎ স্ববাঞ্ছয়া॥ কল্কি ২৭ অ।
লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যঃ স্বভাষিতৈঃ।
কর্ম্মণা প্রথিতস্তেন লোমহর্ষণসংজ্ঞয়া॥ কূর্ম্মপুরাণ।

(৭) উগ্রশ্রবার পিতা লোমহর্ষণ ব্যাসাসনে আসীন হইয়া নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেছেন, এমন সময়ে বলদেব তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলে ঋষিগণ গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁহার সংবর্ধনা ও সৎকার করিলেন, কিন্তু লোমহর্ষণ গাত্রোত্থানাদি করিলেন না। বলদেব তদ্দর্শনে তাঁহাকে গর্বিত বোধ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া করস্থ কুশাগ্রপ্রহার দ্বারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। পরে ঋষিদিগের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, ইঁহার আর পুনর্জীবন হইবেক না, ইঁহার পুত্র উগ্রশ্রবাঃ আপনাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইবেন। তদবধি উগ্রশ্রবাঃ পুরাণবক্তা হইলেন। যথা,

তমাগতমভিপ্রেত্য মুনয়ো দীর্ঘজীবিনঃ।
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোত্থায় চার্চ্চয়ন্॥ ১৩॥
অনভ্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বনাঞ্জলিম্।
অধ্যাসীনঞ্চ তান্ বিপ্রান্ চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ॥ ১৫॥
এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি।
ভাবিত্বাত্তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ॥১৯॥

রাজাধিরাজ জনমেজয়ের সর্পসত্র (৮) দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় বৈশম্পায়ন-মুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত (৯) মহাভারতীয় পরমপবিত্র বিবিধ অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলাম। অনন্তর, তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, নানা তীর্থ পরিভ্রমণ ও অশেষ আশ্রম দর্শনপূর্বক, বহুব্রাহ্মণসমাকীর্ণ সমন্তপঞ্চক তীর্থে উপস্থিত হইলাম। ঐ সমন্তপঞ্চকে পূর্বে পাণ্ডব ও কৌরব এবং উভয়পক্ষীয় নরপতিগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। তথা হইতে, মহাশয়দিগের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া, এই পরমপবিত্র আশ্রমে উপনীত হইয়াছি। আপনারা আমাদিগের ব্রহ্মস্বরূপ। হে তেজঃপুঞ্জ মহাভাগ ঋষিগণ! আপনারা স্নান আহ্নিক অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পূত হইয়া সুস্থ মনে আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, আজ্ঞা করুন, ধর্মার্থসম্বদ্ধ পরমপবিত্র পৌরাণিকী কথা, অথবা মহানুভাব নরপতিগণ ও ঋষিগণের ইতিহাস, কি বর্ণনা করিব?

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! ভগবান্ ব্যাসদেব যে ইতিহাস কীর্তন করিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিমণ্ডল যাহা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে বহু প্রশংসা করেন, এবং দ্বৈপায়নশিষ্য মহর্ষি বৈশম্পায়ন তদীয় আদেশানুসারে সর্পসত্রসময়ে রাজা জনমেজয়কে যাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, আমরা সেই ভারতাখ্য পরমপবিত্র বিচিত্র ইতিহাস শ্রবণে বাসনা করি। ভারত বেদচতুষ্টয়ের সারসমাকর্ষণপূর্বক সঙ্কলিত এবং শাস্ত্রান্তরের সহিত অবিরুদ্ধ; ভারতে অনির্বচনীয় অতর্কণীয় আত্মতত্ত্বাদি বিষয়ের সবিশেষ মীমাংসা আছে; ভারত পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপভয় নিবারণ হয়।

ঋষিগণের প্রার্থনা শুনিয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি নিখিল জগতের আদিভূত, যিনি অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্বীয় অনন্তশক্তিপ্রভাবে স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবর, জঙ্গম, নিখিল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাজ্ঞিক পুরুষেরা যে অনাদি পুরুষের প্রীতি উদ্দেশে হুতাশনমুখে আহুতি প্রদান করেন, শত শত সামগ ব্রাহ্মণ যাঁহার গুণ গান করিয়া থাকেন, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মায়াপ্রপঞ্চরূপ অতাত্ত্বিক বিশ্ব যাঁহার বিরাটমূর্তি, লোকে ভোগাভিলাষে ও পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থপ্রার্থনায় যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে, সেই অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, কালত্রয়ে অবিকৃত, সকলমঙ্গল-নিদানভূত, মঙ্গলমূর্তি, ত্রিলোকপাতা, যজ্ঞফলদাতা, চরাচরগুরু হরির চরণারবিন্দ বন্দনা করিয়া সর্বলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাসের অশেষমত নিঃশেষে কীর্তন করিব।

আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্।
তস্মাদস্য ভবেদ্বক্তা আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান্ ॥ ২৭ ॥ ভাগ ১০।৮।

(৮) সর্পযজ্ঞ। সর্পকুলধ্বংসের নিমিত্ত ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ইহার সবিশেষ বিবরণ কিঞ্চিৎ পরে মূলেই প্রাপ্ত হইবেক।

(৯) বেদব্যাসের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরে বেদ বিভাগ করিয়া ব্যাস, বেদব্যাস, ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন এই নিমিত্ত কৃষ্ণ, আর যমুনার দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন এই নির্মিত্ত দ্বৈপায়ন। এই দুই শব্দ সমষ্টি, ব্যষ্টি, উভয়থাই ব্যাসবোধক হয়।

অনেকানেক অতীতদর্শী মহাশয়েরা নরলোকে এই বিচিত্র ইতিহাস কীর্তন করিয়া গিয়াছেন, বর্তমান কালে অনেকে কীর্তন করিতেছেন, এবং উত্তর কালেও অনেকে কীর্তন করিবেন। দ্বিজাতিরা দৃঢ়ব্রত হইয়া সংক্ষেপে ও বাহুল্যে যাহা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, সেই সর্বজ্ঞানের অদ্বিতীয় আকর বেদশাস্ত্র এই পরম পবিত্র ইতিহাসরূপে আবির্ভূত। এই বিচিত্র গ্রন্থ অশেষবিধ শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সময়ে (১০) বহুতর মনোহর শব্দে ও নানা ছন্দে অলঙ্কৃত, এই নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলীতে সবিশেষ আদরণীয় হইয়াছে।

প্রথমে এই জগৎ ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত হইয়া একান্ত অলক্ষিত ছিল। অনন্তর সৃষ্টিপ্রারম্ভে সকলব্রহ্মাণ্ডবীজভূত এক অলৌকিক অণ্ড প্রসূত হইল। নিরাকার, নির্বিকার, অচিন্তনীয়, অনির্বচনীয়, সর্বত্রসম, সনাতন, জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম সেই অণ্ডে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্বলোকপিতামহ (১১) দেবগুরু ব্রহ্মা তাহাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

তদনন্তর রুদ্র, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রাচেতস, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, ও একবিংশতি প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন। যাঁহাকে সমস্ত ঋষিগণ যোগদৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, বিশ্বদেবগণ, একাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, যমজ অশ্বিনীকুমারযুগল, যক্ষগণ, সাধ্যগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ, ও পিতৃগণ জন্মিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ ও সর্বগুণসম্পন্ন অনেকানেক রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। আর জল, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, ও বিশ্বান্তর্গত অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইল।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ প্রলয়কালে পুনর্বার স্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। যেমন পর্যায়কাল উপস্থিত হইলে ঋতুগণ স্ব স্ব অসাধারণ লক্ষণ সকল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যুগপ্রারম্ভে সমুদায় পদার্থ স্ব স্ব নাম, রূপ, ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনাদি, অনন্ত, সর্বভূতসংহারকারী সংসারচক্র এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন (১২)। আর বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি,

---

(১০) নীলকণ্ঠমতে সময়শব্দের অর্থ সঙ্কেত, অর্জুনমিশ্রমতে আচার।

(১১) স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশানুসারে মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তু প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি সর্ব লোকের পিতৃস্বরূপে পরিগণিত। ব্রহ্মা সেই আদিপিতা স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা, এই নিমিত্ত তিনি সর্বলোকপিতামহ।

(১২) ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।
ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবানাং সৃষ্টিঃ সংক্ষেপলক্ষণা॥

এই মূলের যথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল। শতসহস্রাদি সংখ্যা পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে। এই পরস্পরবিরুদ্ধ ত্রিবিধ সংখ্যার টীকাকার নীলকণ্ঠ এই সমন্বয় করিয়াছেন যে, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র, ও প্রজাপতি এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা। ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত অথবা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র

ও মহ্য, দিবের (১৩) এই একাদশ পুত্র জন্মিলেন। সর্বকনিষ্ঠ মহ্যের পুত্র দেবভ্রাজ্, তৎপুত্র সুভ্রাজ্। সুভ্রাজের দশজ্যোতিঃ, শতজ্যোতিঃ, সহস্রজ্যোতিঃ নামে তিন পুত্র হইলেন। দশজ্যোতির দশ সহস্র পুত্র, শতজ্যোতির লক্ষ পুত্র, ও সহস্রজ্যোতির দশ লক্ষ পুত্র হইল। ইহাদিগের হইতেই কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ, ইক্ষ্বাকুবংশ, ও অন্যান্য রাজর্ষি বংশের উদ্ভব হইল।

মহর্ষি বেদব্যাস যোগবলে প্রাণীদিগের অবস্থিতিস্থান (১৪), ত্রিবিধ রহস্য (১৫), বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম, অর্থ, কাম, ও তত্তৎপ্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোকযাত্রাবিধান (১৬), এতৎসমুদায় অবগত ছিলেন। এই ভারতগ্রন্থে ব্যাখ্যা-সহিত সমস্ত ইতিহাস ও অশেষবিধ বেদার্থ যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। লোকে কেহ কেহ সংক্ষেপে কেহ কেহ বা বাহুল্যে জানিতে বাসনা করে, এই নিমিত্ত মহর্ষি এই জ্ঞানশাস্ত্রকে সংক্ষেপে ও বাহুল্যে কহিয়াছেন। কোনও কোনও ব্রাহ্মণেরা প্রথম মন্ত্র (১৭) অবধি, কেহ কেহ আস্তীকপর্ব অবধি, কেহ কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি, এই ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন। মনীষিগণ অশেষ প্রকারে এই পবিত্র সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ গ্রন্থব্যাখ্যাবিষয়ে পটু, কেহ কেহ বা গ্রন্থার্থধারণাবিষয়ে নিপুণ।

ভগবান্ সত্যবতীনন্দন, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য প্রভাবে সনাতন বেদশাস্ত্র বিভাগ করিয়া, তদীয় সারসঙ্কলনপূর্বক মনে মনে এই পরমাদ্ভুত পবিত্র ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। রচনানন্তর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি রূপে এই গ্রন্থ শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইব। ভূতভাবন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, পরাশরতনয়ের উৎকণ্ঠার বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে ও নরলোককে চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া কৃতার্থম্মন্য ও বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, এবং স্বহস্তদত্ত আসনে উপবেশন করাইয়া

সংখ্যা তাঁহাদিগের পরিবারাদিসহ গণনাভিপ্রায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই বাহুল্য সংখ্যাও সংক্ষেপ সৃষ্টি অভিপ্রায়ে উল্লিখিত। বিস্তারিত সৃষ্টি অভিপ্রায়ে পুরাণান্তরে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি সংখ্যার উল্লেখ আছে। অর্জুনমিশ্র প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়া পরিশেষে যথাশ্রুত গ্রন্থার্থ সামঞ্জস্য সংস্থাপনে ব্যগ্র হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ এই তিনের সমষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ ৩৩৩৩৩ দেবতাদিগের সংক্ষেপ সৃষ্টি।

(১৩) অর্জুনমিশ্রমতে দিব্ শব্দের অর্থ স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অথবা অদিতি।

(১৪) গ্রাম, নগর, দুর্গ, তীর্থ, আশ্রম প্রভৃতি।

(১৫) ধর্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য। রহস্য শব্দের অর্থ গূঢ়তত্ত্ব, অর্থাৎ যাহার মর্ম বুঝিতে পারা যায় না।

(১৬) সংসারযাত্রা নির্বাহের বিধিদর্শক নীতিশাস্ত্র বিশেষ।

(১৭) নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অঞ্জলিবন্ধপূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে আসনপরিগ্রহের অনুমতি প্রদান করিলে তিনি প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে তদীয় আসনসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া বিনয়বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি মনে মনে এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদ বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ সমুদায়ের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সমর্থন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কালত্রয়ের নির্ণয়, জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি ভাব অভাব নিরূপণ, নানাবিধ ধর্ম ও আশ্রমের লক্ষণ নির্দেশ, চাতুর্বণ্য মীমাংসা, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র ও চতুর্যুগের বিবরণ, নারায়ণ যে যে কারণে যে যে দিব্য ও মানব যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কীর্তন, এবং অশেষ পবিত্র তীর্থ, নানা দেশ, নদ, নদী, বন, পর্বত, সাগর, গ্রাম, নগর, দুর্গ, সেনা, ব্যূহরচনা, যুদ্ধকৌশল, বক্তৃবিশেষে কথনবৈচিত্র্য, লোকযাত্রাবিধান, এই সমস্ত ও অপরাপর যাবতীয় বিষয়ের সবিশেষ নিরূপণ করিয়াছি, কিন্তু ভূতলে তদুপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহাপ্রভাব ঋষি আছেন, কিন্তু রহস্যজ্ঞানশালিতাপ্রযুক্ত তুমি সর্বোৎকৃষ্ট। জন্মাবধি তুমি কখনও বিতথ বাক্য উচ্চারণ কর নাই; এক্ষণে তুমি স্বরচিত গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া নির্দেশ করিলে, অতএব তোমার এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া বিখ্যাত হইবেক। যেমন গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সেইরূপ তোমার এই কাব্য অন্যান্য যাবতীয় কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এক্ষণে তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার কাব্যের লেখক হইবেন।

ইহা বলিয়া ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলে সত্যবতীতনয় গণপতিকে স্মরণ করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ গণনায়ক স্মৃতমাত্র ব্যাসদেবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি যথোপযুক্ত পূজাপ্রাপ্তিপূর্বক আসন পরিগ্রহ করিলে বেদব্যাস নিবেদন করিলেন, হে গণেশ্বর! আমি মনে মনে ভারত নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, আমি বলিয়া যাই, আপনি লিখিয়া যান। ইহা শুনিয়া বিঘ্নরাজ কহিলেন, হে তপোধন! লিখিতে আরম্ভ করিলে যদি আমার লেখনীকে বিশ্রাম করিতে না হয় তবে আমি লেখক হইতে পারি। ব্যাসও কহিলেন, কিন্তু আপনিও অর্থগ্রহ না করিয়া লিখিতে পারিবেন না। গণনায়ক তথাস্তু বলিয়া লেখকতা অঙ্গীকার করিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই নিমিত্তই কৌতুক করিয়া মধ্যে মধ্যে দুরূহ গ্রন্থগ্রন্থি রচনা করিয়াছেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছেন, এই গ্রন্থে এরূপ অষ্ট সহস্র অষ্ট শত শ্লোক আছে যে, কেবল শুক ও আমি তাহার অর্থ বুঝিতে পারি; অপরের কথা দূরে থাকুক, সঞ্জয় বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ। অস্ফুটার্থতাপ্রযুক্ত সেই সকল ব্যাসকূটের অদ্যাপি কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। গণেশ সর্বজ্ঞ হইয়াও সেই সকল স্থলে অর্থবোধানুরোধে মন্থর হইতেন, ব্যাসদেব সেই অবকাশে বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন।

জীবলোক অজ্ঞানতিমিরে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ অনর্থ ভ্রমণ করিতেছিল, এই মহাভারত জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা মোহাবরণ নিরাকরণ করিয়া তাহাদের নেত্রোন্মীলন করিয়াছেন। এই ভারতরূপ দিবাকর সংক্ষেপে ও বাহুল্যে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ রূপ বিষয় সকল প্রকাশ ও মানবগণের মোহান্ধকার নিরাস করিয়াছেন। পুরাণরূপ পূর্ণ-চন্দ্রের উদয় দ্বারা বেদার্থরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইয়াছে, এবং মনুষ্যের বুদ্ধিরূপা কুমুদ্বতী বিকাশ পাইয়াছে। এই ইতিহাসরূপ মহোজ্জ্বল প্রদীপ মোহান্ধকার নিরাকরণপূর্বক সংসাররূপ মহাগৃহ আলোকময় করিয়াছে। যেমন জলধর সকল জীবের উপজীব্য, সেইরূপ এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ ভবিষ্য কবিদিগের উপজীব্য হইবেক। সংগ্রহাধ্যায় এই মহাদ্রুমের বীজ, পৌলোম ও আস্তীক পর্ব মূল, সম্ভবপর্ব স্কন্ধ (১৮), সভা ও বন পর্ব বিটঙ্ক (১৯), অরণ্যপর্ব পর্ব (২০), বিরাট ও উদ্যোগ পর্ব সার, ভীষ্মপর্ব মহাশাখা, দ্রোণপর্ব পত্র, কর্ণপর্ব পুষ্প, শল্যপর্ব সৌরভ, স্ত্রীপর্ব ও ঐষীকপর্ব ছায়া, শান্তিপর্ব মহাফল, অশ্বমেধপর্ব অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব আধারস্থান, আর মৌসলপর্ব অত্যুচ্চ শাখান্তভাগ। এই নিরুক্ত ভারতদ্রুমের পরমপবিত্র সুরস ফল পুষ্প বর্ণনা করিব।

পূর্ব কালে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, স্বীয় জননী সত্যবতী ও পরমধার্মিক ধীরবুদ্ধি ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে, বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়তুল্য (২১) তেজস্বী পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ও বিদুরকে জন্ম দিয়া তপস্যানুরোধে পুনর্বার আশ্রমপ্রবেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলে তিনি নরলোকে ভারত প্রচার করিলেন। পরে সর্পসত্রকালে স্বয়ং রাজা জনমেজয় ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ভারতশ্রবণার্থে ঔৎসুক্য ও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করাতে, স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারতকীর্তনের আদেশ প্রদান করিলেন। বৈশম্পায়ন সদস্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী হইয়া দৈনন্দিন কর্মাবসানে ভারত শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস ভারতে কুরুবংশের বৃত্তান্ত, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সাধুতা, ধার্তরাষ্ট্রদিগের দুর্বৃত্ততা, এই সকল বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ভারতসংহিতাকে চতুর্বিংশতি সহস্রশ্লোকময়ী রচনা করিয়াছিলেন। উপাখ্যানভাগ পরিত্যাগ করিলে ভারতের

---

(১৮) মূল অবধি শাখানির্গমস্থান পর্যন্ত বৃক্ষভাগ, গুঁড়ি।

(১৯) পক্ষীর উপবেশনযোগ্য স্থান।

(২০) গ্রন্থি, গাঁটি।

(২১) দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়। কোনও যজ্ঞীয় অগ্নি অথবা গার্হপত্য অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত করা যায়, তাহার নাম দক্ষিণাগ্নি। গৃহস্থ ব্যক্তি চির কাল অবিচ্ছেদে যে অগ্নি গৃহে রাখে, তাহার নাম গার্হপত্য। গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমার্থ যে অগ্নির সংস্কার করা যায়, তাহার নাম আহবনীয়।

সংখ্যা ঐরূপ হয়। অনন্তর সংক্ষেপে সর্বার্থসঙ্কলনপূর্বক সার্ধশত শ্লোক দ্বারা অনুক্রমণিকা রচনা করিলেন।

ব্যাসদেব ভারত রচনা করিয়া সর্বাগ্রে আপন পুত্র শুকদেবকে, তৎপরে শুশ্রূষাপরায়ণ অন্যান্য বুদ্ধিজীবী শিষ্যদিগকে, অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ষষ্টিলক্ষশ্লোকময়ী ভারত-সংহিতা রচনা করিলেন। তন্মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশৎ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, গন্ধর্বলোকে চতুর্দশ, আর নরলোকে এক লক্ষ শ্লোক প্রতিষ্ঠিত আছে। নারদ দেবতাদিগকে, অসিত দেবল পিতৃগণকে, গন্ধর্ব, যক্ষ, ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান, আর ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন নরলোকে প্রচার করেন। তিনিই পরীক্ষিৎপুত্র রাজাধিরাজ জনমেজয়কে শ্রবণ করান। ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা কীর্তন করিয়াছিলেন। আমি এক্ষণে নরলোকপ্রতিষ্ঠিত শতসহস্রশ্লোকময়ী সংহিতা কীর্তন আরম্ভ করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। দুর্যোধন অধর্মময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন পুষ্প ও ফল, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রীপুত্র নকুল সহদেব পুষ্প ও ফল, কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল। যুধিষ্ঠিরের চরিতকীর্তনে ধর্মবৃদ্ধি, ভীমসেনের চরিতকীর্তনে পাপপ্রণাশ, ও অর্জুনের চরিতকীর্তনে শৌর্যবৃদ্ধি হয়, আর নকুল-সহদেবের চরিতকীর্তনে রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

রাজা পাণ্ডু, বুদ্ধিবলে ও বিক্রমপ্রভাবে নানা দেশ জয় করিয়া, পরিশেষে মৃগয়ানুরাগ-পরবশ হইয়া ঋষিগণের সহিত অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি দৈবদুর্বিপাক-বশতঃ সম্ভোগাসক্ত মৃগ বধ করিয়া ঘোরতর আপদে (২২) পতিত হইয়াছিলেন। তথাপি শাস্ত্রবিধানানুসারে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র, ও অশ্বিনীকুমারযুগলের সমাগম দ্বারা পাণ্ডবদিগের জন্মলাভ ও সদাচারভ্যাসাদি যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কুন্তী ও মাদ্রী পরম পবিত্র অরণ্যে ঋষিদিগের আশ্রমে তাহাদিগের লালন পালন করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে, ঋষিগণ সেই ব্রহ্মচারিবেশ, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ, সর্বগুণসম্পন্ন রাজকুমার-দিগকে রাজধানীতে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট আনয়ন করিলেন, এবং, ইঁহারা পাণ্ডুর পুত্র, তোমাদিগের পুত্র, ভ্রাতা, শিষ্য, ও সুহৃদ, এই বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহা শুনিয়া সমুদায় কৌরব ও সুশীল ধর্মপরায়ণ পুরবাসিগণ কোলাহল করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিল, ইহারা তাঁহার পুত্র নহে, কেহ কেহ বলিল, তাঁহারই বটে ; কেহ কেহ কহিল, বহু কাল হইল পাণ্ডুর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কি রূপে সন্ততি হইতে পারে। অনন্তর সর্বত্র এই বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল, অদ্য আমরা ভাগ্যক্রমে পাণ্ডুর সন্ততি দেখিলাম ; হে পাণ্ডবগণ! তোমরা কুশলে আসিয়াছ ? তাঁহারা

(২২) অপুত্রত্বরূপ আপদ্। মৃগয়াকালে পাণ্ডু মৃগরূপধারী ঋষির সম্ভোগসময়ে প্রাণবধ করিয়াছিলেন। ঋষি তাঁহাকে এই শাপ দেন যে, তোমারও সম্ভোগকালে মৃত্যু হইবেক, তাহাতেই পাণ্ডুর পুত্রোৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে।

কহিলেন, আমরা কুশলে আসিয়াছি। অনন্তর কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, মহাশব্দে আকাশবাণী হইল, এবং পুষ্পবৃষ্টি, সৌরভসঞ্চার, ও শঙ্খদুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। পাণ্ডুপুত্রেরা নগরপ্রবেশ করিলে এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। উক্ত সমস্ত ব্যাপার দর্শনে হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া পৌরগণ আহ্লাদে কোলাহল করিতে লাগিল।

পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরমাদরে ও অকুতোভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সমুদায় লোক যুধিষ্ঠিরের সদাচার, ভীমের ধৈর্য, অর্জুনের বিক্রম, এবং নকুল-সহদেবের গুরুভক্তি, ক্ষমা, ও বিনয় দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর অর্জুন সমাগত রাজগণসমক্ষে দুরূহ কর্ম সম্পন্ন করিয়া স্বয়ংবরা কন্যা আনয়ন করিলেন। তদবধি তিনি ভূমণ্ডলে সকল শস্ত্রবেত্তার পূজ্য হইলেন, এবং সমরকালে প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। তিনি পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত সমুদায় নৃপতিদিগকে পরাজিত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ আহরণ করেন। যুধিষ্ঠির, বাসুদেবের পরামর্শে এবং ভীম ও অর্জুনের বাহুবলে, বলগর্বিত জরাসন্ধ ও শিশুপালের বধ সাধন করিয়া, অন্নদান দক্ষিণাপ্রদানাদি সর্বাঙ্গসম্পন্ন রাজসূয় মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপন করিলেন। নানা প্রদেশ হইতে পাণ্ডবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, রত্ন, গো, হস্তী, অশ্ব, বিচিত্র বস্ত্র, শিবির, কম্বল, অজিন, জবনিকা, রাঙ্কব আস্তরণ (২৩), এই সমস্ত উপঢৌকন উপস্থিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের তাদৃশ ঐশ্বর্য দর্শনে দুর্যোধনের অন্তঃকরণে অত্যন্ত ঈর্ষা ও দ্বেষ উপস্থিত হইল। তিনি ময়দানবনির্মিত পরমাশ্চর্য সভা দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ পাইলেন। সেই সভায় তিনি ভ্রমবশে (২৪) স্খলিতগতি হওয়াতে, ভীম কৃষ্ণের সমক্ষে তাঁহাকে গ্রাম্য লোকের ন্যায় উপহাস করিয়াছিলেন। দুর্যোধন অশেষবিধ ভোগসুখ ও নানারত্ন সম্পন্ন হইয়াও মনের অসুখে দিনে দিনে বিবর্ণ ও কৃশ হইতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মনঃপীড়ার বিষয় অবগত হইয়া দ্যূতক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিলেন। তৎশ্রবণে কৃষ্ণ অত্যন্ত রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন, বিবাদভঞ্জনের চেষ্টা না পাইয়া বরং তদ্বিষয়ে অনুমোদন প্রদর্শন করিলেন, দ্যূত প্রভৃতি অশেষবিধ কুনীতিও সহ্য করিলেন। কারণ বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, ও কৃপাচার্যের অনভিমতে আরব্ধ সেই তুমুল যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলধ্বংস হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের জয়রূপ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ এবং দুর্যোধন, কর্ণ, ও শকুনির প্রতিজ্ঞা (২৫) স্মরণ করিয়া বহু ক্ষণ চিন্তাপূর্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয়! আমি তোমায় সমুদায় কহিতেছি, শ্রবণ কর; কিন্তু শুনিয়া আমারে অপ্রাজ্ঞ বিবেচনা করিও না। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান্, ও পরম প্রাজ্ঞ। আমি বিবাদেও সম্মত ছিলাম না, এবং কুলক্ষয়দর্শনেও প্রীত হই নাই। আমার স্বপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রে বিশেষ

(২৩) রঙ্কুরোমনির্মিত। রঙ্কু মৃগবিশেষ।

(২৪) জলে স্থলভ্রম, স্থলে জলভ্রম, অদ্বারে দ্বারভ্রম, দ্বারে অদ্বারভ্রম ইত্যাদি।

(২৫) জয়ই হউক অথবা মৃত্যুই হউক, পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্ধপ্রদান করিব না।

ছিল না। পুত্রেরা সদা ক্রোধপরায়ণ, আমারে বৃদ্ধ বলিয়া অবজ্ঞা করিত ; আমি অন্ধ, লঘুচিত্ততাপ্রযুক্ত পুত্রস্নেহে সকলই সহ্য করিতাম ; অচেতন দুর্যোধন মোহাভিভূত হইলে আমিও মোহাভিভূত হইতাম। সে রাজসূয় যজ্ঞে মহানুভাব যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখিয়া, এবং সভাপ্রবেশকালে সেই রূপে উপহসিত হইয়া, অবমানিত বোধে ক্রোধে অন্ধ হইল ; এবং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অশক্ত ও রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিবার বিষয়ে হতোৎসাহ হইয়া, গান্ধাররাজের সহিত পরামর্শ করিয়া কপট দ্যূতক্রীড়ার মন্ত্রণা করিল। এই সকল বিষয়ে আমি আদ্যোপান্ত যাহা অবগত আছি, কহিতেছি শুন। তুমি আমার বুদ্ধিযুক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমারে প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া জানিতে পারিবে।

যখন শুনিলাম, অর্জুন বিচিত্র শরাসন সমাকর্ষণপূর্বক লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিয়া, সমবেত রাজগণসমক্ষে দ্রৌপদীরে হরণ করিয়া আনিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন দ্বারকাতে সুভদ্রারে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছে, অথচ বৃষ্ণিকুলাবতংস কৃষ্ণ বলরাম মিত্রভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দেবরাজ ভূরি পরিমাণে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জুন দিব্য শরজাল দ্বারা সেই বারিবর্ষণ নিবারণ করিয়া খাণ্ডবদাহে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পঞ্চ পাণ্ডব কুন্তীসহিত জতুগৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর তাহাদের ইষ্টসাধনে যত্নবান্ হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন রঙ্গক্ষেত্রে লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদী লাভ করিয়াছে, এবং মহাপরাক্রান্ত পাঞ্চাল পাণ্ডব উভয় কুল একত্র হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে অতি তেজস্বী মগধেশ্বর জরাসন্ধের প্রাণবধ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডুতনয়েরা দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হইয়া পরাক্রমপ্রভাবে সমস্ত ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্রুমুখী, অতিদুঃখিতা, একবস্ত্রা, রজস্বলা, সনাথা দ্রৌপদীকে অনাথার ন্যায় সভায় লইয়া গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধূর্ত মন্দবুদ্ধি দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিয়াছে, অথচ বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করিয়াছে, অথচ তাহার অপ্রমেয়প্রভাবশালী সহোদরেরা অনুগত আছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন জ্যেষ্ঠভক্তিপরতন্ত্রতাপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশসহিষ্ণু ধর্মশীল পাণ্ডবদিগের বনপ্রস্থানকালে নানা চেষ্টা শ্রবণ করিলাম, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহস্র সহস্র ভিক্ষাজীবী মহানুভাব স্নাতক ব্রাহ্মণ (২৬) বনবাসী যুধিষ্ঠিরের

(২৬) ব্রহ্মচর্য সমাধানপূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট।

প্যারীচরণ সরকার

শ্যামাচরণ দে

বিদ্যাসাগরের দুই অকৃত্রিম সুহৃদ্

বেথুন

মেরি কার্পেন্টার

স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের দুই বিশিষ্ট সহযোগী

অনুগত হইয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন দেব্যাদিদেব কিরাতরূপী মহাদেবকে যুদ্ধে প্রসন্ন করিয়া পাশুপত মহাস্ত্র লাভ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সত্যসন্ধ ধনঞ্জয় স্বর্গে গিয়া দেবরাজের নিকট যথাবিধানে অস্ত্রশিক্ষা করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন বরদানগর্বিত দেবতাদিগের অজেয় পুলোমপুত্র কালকেয়দিগকে (২৭) পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শত্রুঘাতী অর্জুন অসুরবধার্থে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা সেই মানুষের অগম্য দেশে কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণমতানুযায়ী ঘোষযাত্রাপ্রস্থিত মৎপুত্রদিগকে গন্ধর্বেরা বদ্ধ করিয়াছিল, অর্জুন তাহাদিগের উদ্ধারসাধন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম যক্ষরূপ পরিগ্রহপূর্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, আমার পুত্রেরা, বিরাটরাজ্যে দ্রৌপদীসহিত অজ্ঞাতবাসকালে, পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধান করিতে পারে নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, উত্তর গোগ্রহে অর্জুন একাকী অস্মৎপক্ষীয় অতি প্রধান বীরদিগকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাট রাজা আপন কন্যা উত্তরাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া অর্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন, এবং অর্জুন তাহাকে আপন পুত্রের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিষ্ঠির নির্জিত, নির্ধন, নির্বাসিত, ও স্বজনবিযোজিত হইয়াও সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যিনি এই পৃথিবীকে এক পদক্ষেপে অধিকৃত করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জুন নরনারায়ণাবতার, তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদের দর্শন করেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ লোকহিতার্থে কুরুদিগের বিরোধ ভঞ্জন করিতে আসিয়া অকৃতকার্য প্রতিগমন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও দুর্যোধন কৃষ্ণের নিগ্রহচেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিশ্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক তাহাদিগকে হতদৃষ্টি করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণের প্রস্থানকালে কুন্তী নিতান্ত কাতরা হইয়া একাকিনী রথের অগ্রে দণ্ডায়মানা হইলে, তিনি তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী

(২৭) আত্তদুর্দান্ত মহাপরাক্রান্ত ষষ্টি সহস্র অসুর।

হইয়াছেন, এবং দ্রোণাচার্য তাহাদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, তুমি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধ করিব না, কর্ণ ভীষ্মকে এই কথা কহিয়া সেনা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব, অর্জুন, ও অপ্রমেয় গাণ্ডীব ধনু, এই তিন মহাবীর্য একত্র হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন রথোপরি মোহাভিভূত ও বিষণ্ণ হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে স্বশরীরে চতুর্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর আমি জয়েয় আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শত্রুমর্দন ভীষ্ম, সংগ্রামে প্রতিদিন অযুতঘাতী হইয়াও, পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপন বধোপায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহারাও হৃষ্ট চিত্তে সেই উপায় সাধন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া অতি দুর্ধর্ষ মহাপরাক্রান্ত ভীষ্মকে হতবীর্য করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম কেবল মৎপক্ষীয়দিগকেই অল্পাবশিষ্ট করিয়া শরজালে ক্ষতকলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যাশয়ান হইয়া পানীয় আহরণার্থে আদেশ করিলে, অর্জুন ভূভেদ করিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য পাণ্ডবদিগের অনুকূল হইয়াছেন, এবং হিংস্র জন্তুগণ নিরন্তর আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অদ্ভুত যোদ্ধা দ্রোণাচার্য সমরে নানাবিধ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিয়াও পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধানদিগকে নষ্ট করিতে পারিতেছেন না, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, আমরা অর্জুনবধার্থে যে মহারথ (২৮) সংসপ্তকগণ নিযুক্ত করিয়াছিলাম, অর্জুন তাহাদিগের বিনাশ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহাবীর অভিমন্যু দ্রোণাচার্যরক্ষিত অন্যের অভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে একাকী প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অস্মৎপক্ষীয় মহারথেরা অর্জুনবধে অসমর্থ হইয়া সকলে মিলিয়া শিশুপ্রায় অভিমন্যুকে বধ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অস্মৎপক্ষীয়েরা অভিমন্যুকে বধ করিয়া হর্ষে মহাকোলাহল করিতেছে, কিন্তু অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া জয়দ্রথবধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন জয়দ্রথবধার্থে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, শত্রুমণ্ডলীমধ্যে সেই প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম,

(২৮) যে ব্যক্তি অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও একাকী দশ সহস্র ধনুর্ধারী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহাকে মহারথ বলে।

অর্জুনের অশ্ব সকল একান্ত ক্লান্ত হইলে, বাসুদেব বন্ধনমোচন ও জলোপসেবন পূর্বক তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনিয়া পুনর্বার যোজিত করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাহনগণ অক্ষম হইলে, অর্জুন রথোপরি অবস্থিত হইয়া সমুদায় যোদ্ধাদিগকে পরাভূত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সাত্যকি অতি দুর্ধর্ষ যুদ্ধাসক্ত দ্রোণসৈন্য পরাভূত করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ কোদণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া অশেষ ক্লেশপ্রদানপূর্বক ভীমকে ধরিয়া আনিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিল, কিন্তু সে কর্ণহস্তে পতিত হইয়াও মৃত্যুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ও শল্য প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া জয়দ্রথবধ সহ্য করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জুনবধার্থ স্থাপিত দিব্য শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ মরণার্থে কৃতনিশ্চয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রথোপরি অবস্থিত হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্মমার্গ অতিক্রম করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নকুল উভয়পক্ষীয় সৈন্যসমক্ষে সমকক্ষ হইয়া অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণবধানন্তর অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রাণবধ করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছে, দুর্যোধন প্রভৃতি কেহ তাহার নিবারণ করিতে পারে নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন অতি দুর্ধর্ষ পরাক্রান্ত কর্ণের প্রাণসংহার করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিষ্ঠির পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা, দুঃশাসন, ও কৃতবর্মাকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য সংগ্রামে কৃষ্ণকে পরাজিত করিব বলিয়া স্পর্ধা করিত, যুধিষ্ঠির সেই পরাক্রান্ত পুরুষের প্রাণসংহার করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব বিবাদ ও দ্যূতক্রীড়ার মূল মায়াবী পাপিষ্ঠ শকুনির প্রাণবধ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্যোধন হতসৈন্য ও নিঃসহায় হইয়া জলস্তম্ভ করিয়া একাকী হ্রদপ্রবেশ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডবেরা বাসুদেব সমভি-ব্যাহারে সেই হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া অসহন দুর্যোধনের তিরস্কার করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্যোধন গদাযুদ্ধে অশেষ কৌশল প্রদর্শনপূর্বক পরিভ্রমণ করিতেছিল, ভীম কৃষ্ণের পরামর্শে কপট প্রহার দ্বারা তাহার উরুভঙ্গ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়া দ্রৌপদীর নিদ্রিত পুত্রপঞ্চকের বধরূপ অতি

ঘৃণিত কলঙ্ককর কর্ম করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম প্রতিফল প্রদানার্থে অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মহাস্ত্র প্রয়োগপূর্বক সুভদ্রার গর্ভ বিনাশ করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জুন স্বস্তি বলিয়া স্বীয় অস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মশিরঃ (২৯) অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে, এবং অশ্বত্থামা মণিরত্ন প্রদান করিয়াছেন (৩০), তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মহাস্ত্র দ্বারা উত্তরার গর্ভনাশ করিলে, দ্বৈপায়ন ও বাসুদেব উভয়ে অশ্বত্থামাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। গান্ধারীর পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, পিতৃ, ভ্রাতৃ প্রভৃতি সমুদায় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অতি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। পাণ্ডবেরা অতি দুষ্কর কার্য করিয়াছে ও পুনর্বার অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কি কষ্ট! শুনিলাম, আমাদের তিন জন ও পাণ্ডবদিগের সাত জন, সমুদায়ে দশ জন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর সময়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। সঞ্জয়! আমি চারি দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছি, মোহে অভিভূত হইতেছি, আমার চেতনা লোপ হইতেছে, মন বিহ্বল হইতেছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কহিয়া বহুতর বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও মূর্ছিত হইলেন। পরে আশ্বাসিত ও চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয়! যখন আমার ভাগ্যে এরূপ ঘটিল, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, আর আমি জীবনধারণের কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কহিয়া বিলাপ, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, ও পুনঃ পুনঃ মোহাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ধীমান্ সঞ্জয় প্রবোধদানার্থে কহিলেন, মহারাজ! দ্বৈপায়ন ও নারদ মুখে শ্রবণ করিয়াছ, শৈব্য, সৃঞ্জয়, সুহোত্র, রন্তিদেব, কাক্ষীবান্, ঔশিজ, বাহ্লীক, দমন, শর্যাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অম্বরীষ, মরুত্ত, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত, দাশরথি রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীর্য, জনমেজয়, শুভকর্মা বহুযজ্ঞানুষ্ঠাতা যযাতি, এই সকল মহোৎসাহ মহাবল দিব্যাস্ত্রবেত্তা শক্রতুল্যতেজস্বী রাজারা সর্বগুণসম্পন্ন প্রধান প্রধান রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ধর্মতঃ পৃথিবী জয়, নানা যজ্ঞানুষ্ঠান, ও যশোলাভ করিয়া পরিশেষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। পূর্ব কালে চৈদ্যরাজ পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে এই চতুর্বিংশতি রাজার উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পুরু, কুরু, যদু, বিশ্বগশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, পর, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু,

(২৯) ব্রহ্মতেজোময় মহাপ্রভাব অস্ত্রবিশেষ। অশ্বত্থামা অর্জুনবধার্থে ঐ অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করেন।
(৩০) ভীমকে অক্রোধ ও প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত।

দীপ্তকেতু, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শ্রুতি, এই সমস্ত ও অন্যান্য শত শত সহস্র সহস্র ও পদ্মসংখ্য নরপতিগণ প্রসিদ্ধ আছেন ; ইঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিশালী ছিলেন, এবং অশেষ ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া পরিশেষে তোমার পুত্রগণের ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন ; বিদ্যাবান্ সৎকবিগণ পুরাণে তাঁহাদিগের অলৌকিক কর্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ, দয়া, আর্জব, কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সর্বপ্রকারসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও নানাগুণে অলঙ্কৃত হইয়াও নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তোমার পুত্রেরা দুরাত্মা, ক্রোধান্ধ, লুব্ধ, অতি দুর্বৃত্ত ছিল, তাহাদিগের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান্, ও পরম প্রাজ্ঞ। যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি শাস্ত্রানুগামিনী হয়, তাঁহারা মোহাভিভূত হয়েন না। দৈব নিগ্রহ ও দৈব অনুগ্রহ তোমার অবিদিত নহে। অতএব, পুত্রগণের নিমিত্ত তোমার এতাবতী মমতা উচিত হয় না। যাহা ভবিতব্য ছিল ঘটিয়াছে, তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়। কোন্ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে দৈবকার্য অন্যথা করিতে পারে ? বিধাতার নিয়ম অতিক্রম করা কাহার সাধ্য ? ভাব, অভাব, সুখ, অসুখ, সমুদায় কালমূলক। কাল সর্ব জীবের সৃষ্টি করেন, কাল সর্ব জীবের সংহার করেন, কাল সর্ব জীবের দাহ করেন, কাল সর্ব জীবের শান্তি করেন। ইহ লোকে যে সকল শুভাশুভ ঘটনা হয়, সে সমুদায় কালকৃত। কাল সর্বজীবসংহারকারী, কালই পুনর্বার সর্ব জীব সৃষ্টি করেন। সর্ব জগৎ সুপ্ত হইলেও কাল জাগরিত থাকেন। অতএব কাল দুরতিক্রম। কাল অপ্রতিহত প্রভাবে সমভাবে সর্বভূত শাসন করেন। অতীত, অনাগত, সাম্প্রতিক, সমুদায় পদার্থ কালকৃত বোধ করিয়া তোমার ধৈর্যাবলম্বন করা উচিত। সঞ্জয় পুত্রশোকার্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া সুস্থচিত্ত করিলেন। পরম কারুণিক ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লোকহিতার্থে এই বিষয়ে পবিত্র উপনিষৎ কীর্তন করিয়াছেন, এবং বিদ্বান্ সৎকবিগণ পুরাণে সেই উপনিষৎ কীর্তন করিয়া থাকেন।

ভারত অধ্যয়নে পুণ্য জন্মে। অধিক কি কহিব, শ্রদ্ধাপূর্বক শ্লোকের এক চরণ মাত্র পাঠ করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয়। এই গ্রন্থে দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, উরগ প্রভৃতির ও সনাতন ভগবান্ বাসুদেবের কীর্তন আছে। তিনি সত্য, পবিত্র, মঙ্গলপ্রদ, পরিচ্ছেদাতীত, কালত্রয়ে অবিকৃত, জ্যোতির্ময়, ও সনাতন ; পণ্ডিতেরা তাঁহার অলৌকিক কর্ম সকল কীর্তন করিয়া থাকেন, তিনি এই কার্যকারণরূপ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তিনি ব্রহ্মাদি দেবতার ও যজ্ঞাদি কার্যের সৃষ্টি করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কারণ, তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহের অধিষ্ঠাতা জীব ও নির্বিশেষ পরব্রহ্ম স্বরূপ। যতিগণ সমাহিত হইয়া ধ্যান ও যোগবলে দর্পণতলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন।

ধর্মপরায়ণ নর শ্রদ্ধা ও নিয়ম পূর্বক এই অধ্যায় পাঠ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। আস্তিক ব্যক্তি ভারতের এই অনুক্রমণিকাধ্যায় প্রথমাবধি সর্বদা শ্রবণ করিলে

বিপদে পতিত হয় না। দুই সন্ধ্যা অনুক্রমণিকার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিলে, তৎক্ষণাৎ অহোরাত্রসঞ্চিত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই অধ্যায় ভারতের শরীর-স্বরূপ, ইহাতে সত্য ও অমৃত উভয় আছে। যেমন গব্যের মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু, সেইরূপ মহাভারত সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ততঃ ভারতীয় শ্লোকের এক চরণ শ্রবণ করায়, তাহার পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থ সমর্থন করিবেক। বেদ অল্পজ্ঞের নিকট এই ভয় করেন যে, এ আমাকে প্রহার করিবেক। বিদ্বান্ ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই বেদ শ্রবণ করাইয়া অর্থলাভ করেন, এবং নিঃসন্দেহ ভ্রূণহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হন। যে ব্যক্তি শুচি ও সংযত হইয়া পর্বে পর্বে এই পরমপবিত্র অধ্যায় পাঠ করে, আমার মতে, তাহার সমুদায় ভারত অধ্যয়ন করা হয়। যে নর প্রতিদিন শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র শ্রবণ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ুঃ, কীর্ত্তি, ও স্বর্গ লাভ হয়।

পূর্ব কালে সমুদায় দেবতা একত্র হইয়া তুলাযন্ত্রের এক দিকে চারি বেদ ও অপর দিকে এই ভারত স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা ভারে অধিক হয়, এজন্য তদবধি ইহ লোকে ভারত মহাভারত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরিমাণকালে ইহার মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব উভয়ই অধিক হইল, সেই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত। যে ব্যক্তি মহাভারত শব্দের ব্যুৎপত্তি জানে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

তপস্যা পাপজনক নহে, বেদাধ্যয়ন পাপজনক নহে, বর্ণাশ্রমাদিনিয়মিত বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান পাপজনক নহে, অশেষ ক্লেশ স্বীকারপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করা পাপজনক নহে ; এই সমস্ত অসদভিপ্রায়দূষিত হইলেই পাপজনক হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়—পর্বসংগ্রহ

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন ! তুমি যে সমন্তপঞ্চক তীর্থের উল্লেখ করিয়াছ, আমরা তাহার স্বরূপ ও সবিশেষ বিবরণ জানিতে বাঞ্ছা করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে সাধু ব্রাহ্মণগণ ! আমি সমন্তপঞ্চকবৃত্তান্ত ও অন্যান্য নানা শুভ কথা কীর্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। সকলশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে পিতৃবধক্রোধে অধীর হইয়া ভূয়োভূয়ঃ ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই অনল-তুল্য তেজস্বী ঋষি নিজ বীর্যে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ রুধিরহ্রদ করেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া সেই সেই রুধিরহ্রদের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ রাম ! আমরা তোমার এইরূপ পিতৃ-ভক্তি ও বিক্রমাতিশয় দর্শনে সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর।

রাম কহিলেন, হে পিতৃগণ! যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ও আমাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর দেন যে, আমি রোষবশে ক্ষত্রিয়-কুল সংহার করিয়া যে পাপগ্রস্ত হইয়াছি, যেন তাহা হইতে মুক্ত হই, এবং যেন এই সকল হ্রদ তীর্থরূপে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ও পরিগণিত হয়। পিতৃগণ যথাপ্রার্থিত বর প্রদানপূর্বক ক্ষমস্ব বলিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞাত ক্ষত্রিয়কুল-সংহারক্রিয়া হইতে বিরত হইলেন।

সেই পঞ্চ রুধিরহ্রদের অদূরে যে পরম পবিত্র দেশ আছে, তাহাকে সমন্তপঞ্চক কহে। পণ্ডিতেরা কহেন, যে দেশ যে চিহ্নে চিহ্নিত, তদ্দ্বারাই সে দেশের নামনির্দেশ হওয়া উচিত। কলি ও দ্বাপরের অন্তরে সমন্তপঞ্চকে কুরু পাণ্ডব সৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধবাসনায় সেই ভূদোষ (৩১) বর্জিত ক্ষেত্রে সমাগত ও নিধন প্রাপ্ত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ! সেই দেশের নামের এই ব্যুৎপত্তি। সে দেশ পবিত্র ও রমণীয়। হে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ! উক্ত দেশ ত্রিলোকে যে রূপে বিখ্যাত, তৎসমুদায় নিবেদন করিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দ প্রয়োগ করিলে আমরা তাহার যথার্থ অর্থ শ্রবণের বাসনা করি। তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব কত পদাতি, কত অশ্ব, কত রথ, ও কত গজে এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহার সবিশেষ বর্ণনা কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক রথ, এক গজ, পাঁচ পদাতি, তিন অশ্ব, ইহাতে এক পত্তি হয়, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনাতে এক চমূ, তিন চমূতে এক অনীকিনী, আর দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। সমুদায়ে এক অক্ষৌহিণীতে ২১৮৭০ এক বিংশতি সহস্র অষ্টশত সপ্ততি সংখ্যক রথ, তাবৎ সংখ্যক গজ, ১০৯৩৫০ এক লক্ষ নয় সহস্র তিন শত পঞ্চাশ পদাতি, আর ৬৫৬১০ পঞ্চষষ্টি সহস্র ছয় শত দশ অশ্ব থাকে। আমি আপনাদিগকে যে অক্ষৌহিণীর কথা কহিয়াছিলাম, সংখ্যাতত্ত্ববেত্তারা তাহার এইরূপ সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সংগ্রামে এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমন্তপঞ্চকে একত্র হইয়াছিল, এবং কৌরবদিগকে উপলক্ষমাত্র করিয়া অদ্ভুতশক্তিকালপ্রভাবে সেই স্থানেই নিধন প্রাপ্ত হয়; পরমাস্ত্রবেত্তা ভীষ্মদেব দশ দিবস যুদ্ধ করেন; তৎপরে দ্রোণাচার্য পাঁচ দিন কুরুসৈন্য রক্ষা করেন; শত্রুঘাতী কর্ণ দুই দিন যুদ্ধ করেন; শল্য অর্ধ দিবস মাত্র; তৎপরেই ভীম ও দুর্যোধনের অর্ধদিনব্যাপী গদাযুদ্ধ; সেই দিবসের নিশাগমে অশ্বত্থামা কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য তিন জনে পরামর্শ করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত সমস্ত যুধিষ্ঠিরসৈন্য সংহার করেন।

হে শৌনক! আমি আপনার যজ্ঞে যে ভারতকীর্তন আরম্ভ করিতেছি, ব্যাস-

---

(৩১) হিংসা স্তেয় মিথ্যা প্রতারণা প্রভৃতি।

শিষ্য ধীমান্ বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের যজ্ঞে তাহার কীর্তন করিয়াছিলেন। এই ইতিহাসের আদিভাগে মহানুভাব নরপতিগণের যশঃ ও বীর্যের সবিস্তর বর্ণনা নিমিত্ত পৌষ্য, পৌলম, ও আস্তীক এই তিন পর্ব আছে। এই গ্রন্থ বিচিত্র অর্থ, পদ, আখ্যান, ও বহুবিধ আচারনিয়মে পরিপূর্ণ। যেমন মোক্ষার্থীরা একমাত্র উপায় বোধে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ নরেরা একমাত্র শ্রেয়ঃসাধন বোধ করিয়া এই পরম পবিত্র ইতিহাসগ্রন্থের উপাসনা করেন। যেমন সমুদায় জ্ঞাতব্য পদার্থমধ্যে আত্মা এবং সমস্ত প্রিয়বস্তুমধ্যে জীবন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই পরম পবিত্র ইতিহাস সর্ব-শাস্ত্রমধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন আহার ব্যতিরেকে শরীরধারণের আর উপায় নাই, সেইরূপ এই ইতিহাসগ্রন্থোক্ত কথা ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী ভৃত্যেরা সৎকুলজাত প্রভুর সেবা করে, সেইরূপ কবিগণ জ্ঞানলাভবাসনায় এই মহাভারতের সেবা করিয়া থাকেন। যেমন সমুদায় লৌকিক ও বৈদিক বাক্য স্বর ও ব্যঞ্জনে অর্পিত, সেইরূপ এই উৎকৃষ্ট ইতিহাসগ্রন্থে শ্রেয়ঃসাধনী বুদ্ধি অর্পিত আছে।

এক্ষণে আপনারা সেই অশেষ প্রজ্ঞার আকর, সুচারু রূপে রচিত, অতর্কণীয় বিষয়ের মীমাংসাযুক্ত, বেদার্থভূষিত, ভারতাখ্য ইতিহাসের পর্বসংগ্রহ শ্রবণ করুন। সর্বপ্রথম অনুক্রমণিকাপর্ব, দ্বিতীয় পর্বসংগ্রহপর্ব, তৎপরে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, ও আদিবংশাবতারণ পর্ব, তৎপরে পরমাদ্ভুত সম্ভবপর্ব, তৎশ্রবণে শরীরে রোমাঞ্চ হয়; তৎপরে জতুগৃহদাহ, তৎপরে হিড়িম্ববধ, তৎপরে বকবধ, তৎপরে চৈত্ররথ, তৎপরে দ্রৌপদীস্বয়ংবর, তৎপরে বৈবাহিকপর্ব, তৎপরে বিদুরাগমন ও রাজ্যলাভপর্ব, তৎপরে অর্জুনবনবাস, তৎপরে সুভদ্রাহরণ, সুভদ্রাহরণের পর যৌতুকাহরণপর্ব, তৎপরে খাণ্ডবদাহ ও ময়দানবদর্শনপর্ব, তৎপরে সভাপর্ব, তৎপরে মন্ত্রণাপর্ব, তৎপরে জরাসন্ধবধ, তৎপরে দিগ্বিজয়পর্ব, দিগ্বিজয়ের পর রাজসূয়পর্ব, তৎপরে অর্ঘাভিহরণ, তৎপরে শিশুপালবধ, তৎপরে দ্যূতপর্ব, তৎপরে অনুদ্যূতপর্ব, তৎপরে অরণ্যপর্ব, তৎপরে কির্মীরবধপর্ব, তৎপরে অর্জুনাভিগমনপর্ব, তৎপরে কিরাতপর্ব, এই পর্বে মহাদেবের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ বর্ণিত আছে; তৎপরে ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা-পর্ব, তৎপরে জটাসুরবধপর্ব, তৎপরে যক্ষযুদ্ধ, তৎপরে ইন্দ্রলোকাভিগমন, তৎপরে নলোপাখ্যানপর্ব, তৎশ্রবণে ধর্মলাভ ও করুণরসের উদয় হয়; তৎপরে পতিব্রতা-মাহাত্ম্য, তৎপরে পরমাদ্ভুত সাবিত্রীমাহাত্ম্য, তৎপরে নিবাতকবচযুদ্ধ, তৎপরে অজগরপর্ব, তৎপরে মার্কণ্ডেয়সমস্যা,' তৎপরে দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদ, তৎপরে ঘোষযাত্রা, তৎপরে মৃগস্বপ্ন, তৎপরে ব্রীহিদ্রৌণিক, তৎপরে ইন্দ্রদ্যুম্নপর্ব, তৎপরে জয়দ্রথ কর্তৃক বন হইতে দ্রৌপদীহরণ, তৎপরে রামোপাখ্যান, তৎপরে কুণ্ডলাহরণ, তৎপরে অরণীহরণপর্ব, তৎপরে বিরাটপর্ব, তৎপরে পাণ্ডবপ্রবেশ, তৎপরে সময়পালন; তৎপরে কীচকবধ, তৎপরে গোগ্রহণ, তৎপরে অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহপর্ব, তৎপরে পরমাদ্ভুত উদ্যোগপর্ব, তৎপরে সঞ্জয়যাত্রা, তৎপরে চিন্তাপ্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্রের জাগরণ, তৎপরে পরমগুহ্য সনৎসুজাতপর্ব, ইহাতে আত্মজ্ঞানের কথা আছে; তৎপরে তৎপরে যানসন্ধি, তৎপরে ভগবদ্‌যাত্রা, তৎপরে মাতলীয়োপাখ্যান, তৎপরে

গালবচরিত, তৎপরে সাবিত্রী-উপাখ্যান, বামদেবোপাখ্যান, বৈণ্যোপাখ্যান, জামদগ্ন্যোপাখ্যান, তৎপরে ষোড়শরাজিকপর্ব, তৎপরে কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ, তৎপরে বিদুলাপুত্রশাসন, তৎপরে কৃষ্ণপ্রত্যাখ্যান ও বিদুলাপুত্রদর্শন, তৎপরে সৈন্যোদ্যোগ ও শ্বেতোপাখ্যান, তৎপরে মহাত্মা কর্ণের বিবাদ, তৎপরে মন্ত্রনিশ্চয়পূর্বক কার্যচিন্তন, তৎপরে সেনাপতিনিয়োগাখ্যান, তৎপরে শ্বেতবাসুদেবসংবাদ, তৎপরে কুরুপাণ্ডব-সৈন্যনির্যাণ, তৎপরে সৈন্যসংখ্যা, তৎপরে অমর্ষবর্ধক উলক নামক দূতের আগমন, তৎপরে অম্বোপাখ্যান, তৎপরে অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেকপর্ব, তৎপরে জম্বুদ্বীপসন্নিবেশপর্ব, তৎপরে ভূমিপর্ব, তৎপরে দ্বীপবিস্তারকথনপর্ব, তৎপরে ভগবদ্গীতাপর্ব, তৎপরে ভীষ্মবধপর্ব, তৎপরে দ্রোণাভিষেক, তৎপরে সংশপ্তক সৈন্যবধ, তৎপরে অভিমন্যুবধপর্ব, তৎপরে প্রতিজ্ঞাপর্ব, তৎপরে জয়দ্রথবধ, তৎপরে ঘটোৎকচবধ, তৎপরে পরমাদ্ভুতদ্রোণ-বধ, তৎপরে নারায়ণাস্ত্রত্যাগপর্ব, তৎপরে কর্ণপর্ব, তৎপরে শল্যপর্ব, তৎপরে হ্রদপ্রবেশ, তৎপরে গদাযুদ্ধপর্ব, তৎপরে অতিবীভৎস সৌপ্তিকপর্ব, তৎপরে অতি নিদারুণ ঐষীকপর্ব, তৎপরে জলপ্রদানিকপর্ব, তৎপরে স্ত্রীবিলাপপর্ব, তৎপরে কুরুবংশীয়দিগের ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়াপর্ব, তৎপরে ব্রাহ্মণবেশধারী চার্বাক রাক্ষসের নিগ্রহপর্ব, তৎপরে শান্তিপর্ব, এই পর্বে রাজধর্মানুশাসন ও আপদ্ধর্ম উক্ত হইয়াছে ; তৎপরে মোক্ষধর্মপর্ব, তৎপরে শুকপ্রশ্নাভিগমন, ব্রহ্মপ্রশ্নানুশাসন, দুর্বাসার প্রাদুর্ভাব ও মায়াসংবাদপর্ব, তৎপরে আনুশাসনিকপর্ব, তৎপরে ধীমান্ ভীষ্মের স্বর্গারোহণপর্ব, তৎপরে সর্বপাপ-ক্ষয়কারী অশ্বমেধপর্ব, তৎপরে অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রতিপাদক অনুগীতাপর্ব, তৎপরে আশ্রমবাসপর্ব, তৎপরে পুত্রদর্শনপর্ব, তৎপরে নারদাগমনপর্ব, তৎপরে অতি দারুণ মৌষলপর্ব, তৎপরে মহাপ্রস্থান, তৎপরে স্বর্গারোহণপর্ব, তৎপরে খিলনামক হরিবংশপর্ব, ইহাতে বিষ্ণুপর্ব, শিশুচর্যা, কংসবধ, ও পরমাদ্ভুত ভবিষ্যপর্ব উক্ত হইয়াছে। মহাত্মা ব্যাসদেব এই শত পর্ব কীর্তন করিয়াছিলেন, পরে লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে অষ্টাদশপর্ব কীর্তন করেন। ভারতসংক্ষেপরূপ পর্বসংগ্রহ উক্ত হইল।

পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, হিড়িম্ববধ, বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীস্বয়ংবর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জুনবনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকানয়ন, খাণ্ডবদাহ, ময়দর্শন, এই সমস্ত আদিপর্বের অন্তর্গত। পৌষ্যপর্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য ও পৌলোমে ভৃগুবংশের বিস্তার বর্ণিত আছে। আস্তীকপর্বে সমুদায় সর্পকুল ও গরুড়ের উৎপত্তি, ক্ষীরসমুদ্রমথন, উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রানুষ্ঠানপ্রতিজ্ঞা ও ভরতবংশীয় মহাত্মাদিগের কীর্তন আছে। সম্ভবপর্বে অশেষ রাজকুল, অন্যান্য বীরপুরুষ, ও মহর্ষি দ্বৈপায়নের উৎপত্তি, দেবতা-গণের অংশাবতার, সর্প, গন্ধর্ব, পক্ষী, ও অন্য অন্য নানা জীবের উদ্ভব, যে ভরতের নামানুসারে লোকে ভারতকুল প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তপঃপরায়ণ কণ্বমুনির আশ্রমে দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে তাঁহার জন্মগ্রহণ, শান্তনুগৃহে গঙ্গাগর্ভে মহাত্মা বসুদিগের পুনর্জন্ম ও তাঁহাদিগের স্বর্গারোহণ, তদীয় তেজোভাগসমষ্টি, ভীষ্মের জন্ম,

তাঁহার রাজ্যপরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্যাবলম্বন, প্রতিজ্ঞাপালন, স্বীয় ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের রক্ষা, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের রক্ষা ও তাঁহাকে রাজ্যপ্রতিপাদন, অণীমাণ্ডব্যশাপে ধর্মের নরলোকে উৎপত্তি ও বরদানবলে দ্বৈপায়নের ঔরসে জন্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ও পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি, দুর্যোধনের বারণাবতযাত্রামন্ত্রণা, ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের হিতার্থে পথে তাঁহাকে ম্লেচ্ছভাষায় বিদুরের হিতোপদেশপ্রদান, বিদুরের পরামর্শে সুরঙ্গনির্মাণ, জতুগৃহে পঞ্চপুত্রসহিত নিদ্রিতা নিষাদীর ও পুরোচননামক ম্লেচ্ছের দাহ, ঘোর অরণ্যে পাণ্ডবদিগের হিড়িম্বাদর্শন ও সেই স্থানে মহাবল ভীম কর্তৃক হিড়িম্ববধ, ঘটোৎকচের জন্ম, মহাতেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেবের সন্দর্শন, তদীয় আদেশানুসারে একচক্রা নগরে ব্রাহ্মণগৃহে পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাস, বকরাক্ষসবধ ও তদ্দর্শনে নগরবাসী লোকের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, ব্রাহ্মণমুখে দ্রৌপদীর পরমাদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাসের উপদেশানুসারে দ্রৌপদীলাভাভিলাষে স্বয়ংবর দর্শনার্থে পাণ্ডবদিগের পাঞ্চাল দেশ যাত্রা, গঙ্গাতীরে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজিত করিয়া তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন ও তৎসমীপে তপতী, বশিষ্ঠ, ও ঔর্বের উপাখ্যান শ্রবণপূর্বক ভ্রাতৃসহিত অর্জুনের পাঞ্চালাভিমুখে গমন, পাঞ্চাল নগরে সমাগত সর্বনৃপতিসমক্ষে লক্ষ্যভেদপূর্বক অর্জুনের দ্রৌপদীলাভ, তদ্দর্শনে জাতক্রোধ রাজগণের এবং শল্য ও কর্ণের ভীমার্জুন কর্তৃক যুদ্ধে পরাজয়, ভীম ও অর্জুনের তাদৃশ অপ্রমেয় অমানুষ বীর্য দর্শনে পাণ্ডব বোধ করিয়া কৃষ্ণ-বলরামের তৎসাক্ষাৎকারার্থ ভার্গবগৃহগমন, পাঁচ জনের এক ভার্যা হইবেক এই নিমিত্ত দ্রুপদের বিমর্ষ, তদুপলক্ষে পরমাদ্ভুত পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান কথন, দ্রৌপদীর দেববিহিত অলৌকিক বিবাহ, ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবসমীপে বিদুর প্রেরণ, বিদুরের উপস্থিতি ও কৃষ্ণদর্শন, পাণ্ডবদিগের খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও রাজ্যার্ধপ্রাপ্তি, নারদের আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদীবিষয়ে নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা, দ্রৌপদীসহিত নির্জনোবিষ্ট যুধিষ্ঠির-সমীপে গমন ও তথা হইতে অস্ত্রগ্রহণপূর্বক শরণাগত ব্রাহ্মণের অপহৃত গোধন প্রত্যানয়ন করিয়া পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে অর্জুনের বনপ্রস্থান, বনবাসকালে উলপীনাম্নী নাগকন্যার সহিত সমাগম, তীর্থপর্যটন ও বভ্রুবাহনজন্ম, তপস্বিব্রাহ্মণশাপে গ্রাহযোণিপ্রাপ্ত পঞ্চ অপ্সরার শাপমোক্ষণ, প্রভাস তীর্থে কৃষ্ণের সহিত সমাগম, দ্বারকাতে কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে সুভদ্রাপ্রাপ্তি, যৌতুকপ্রদানার্থে কৃষ্ণের খাণ্ডবপ্রস্থাগমনের পর সুভদ্রাগর্ভে মহাতেজাঃ অভিমন্যুর জন্ম, দ্রৌপদীর পুত্রোৎপত্তি, কৃষ্ণ ও অর্জুন জলবিহারার্থ যমুনা গমন করিলে তথায় উভয়ের চক্র ও ধনুঃপ্রাপ্তি, খাণ্ডবদাহ এবং ময়দানব ও ভুজঙ্গের অগ্নিদাহ হইতে মোক্ষণ, মন্দপালনামক মহর্ষির শার্ঙ্গীগর্ভে তনয়োৎপত্তি। বহুবিস্তৃত আদিপর্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। মহর্ষি ব্যাসদেব এই পর্ব দুই শত সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। মহাত্মা মুনি ইহাতে আট সহস্র আট শত চতুরশীতি শ্লোক কহিয়াছেন।

বহুবৃত্তান্তযুক্ত সভানামক দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হইতেছে। পাণ্ডবদিগের সভানির্মাণ, কিঙ্করদর্শন, দেবর্ষি নারদ কর্তৃক ইন্দ্রাদি লোকপাল সভা বর্ণন, রাজসূয়যজ্ঞারম্ভ,

জরাসন্ধবধ, গিরিব্রজনিরুদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধার, পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়, উপঢৌকন লইয়া রাজাদিগের রাজসূয় মহাযজ্ঞে আগমন, রাজসূয়ের অর্ঘ্য দান প্রস্তাব কালে শিশুপালবধ, যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ ঐশ্বর্য দর্শনে দুর্যোধনের বিষাদ ও ঈর্ষা, সভামণ্ডপে ভীমকৃত দুর্যোধনোপহাস, দুর্যোধনের ক্রোধ, দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান, দ্যূতকার শকুনি কর্তৃক দ্যূতে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, দ্যূতার্ণবমগ্না পরম দুঃখিতা স্নুষা দ্রৌপদীর মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক উদ্ধার, পাণ্ডবদিগের উদ্ধার দর্শনে দুর্যোধন কর্তৃক পুনর্বার দ্যূতক্রীড়ার্থে তাঁহাদিগের আহ্বান ও পরাজয়পূর্বক বনপ্রেষণ। মহাত্মা দ্বৈপায়ন সভাপর্বে এই সমস্ত ব্যাপার কীর্তন করিয়াছেন। এই পর্বে অষ্ট সপ্ততি অধ্যায় আছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! সভাপর্বে দ্বিসহস্র পঞ্চশত একাদশ শ্লোক আছে জানিবেন।

অতঃপর অরণ্যনামক তৃতীয় পর্ব। মহাত্মা পাণ্ডবেরা বনপ্রস্থান করিলে পুরবাসিগণের যুধিষ্ঠিরানুগমন, অনুগত দ্বিজগণের ভরণপোষণনির্বাহার্থ ধৌম্যমুনির উপদেশানুসারে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সূর্যারাধনা, সূর্যপ্রসাদাৎ অন্নলাভ, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক হিতবাদী বিদুরের পরিত্যাগ, ধৃতরাষ্ট্রপরিত্যক্ত বিদুরের যুধিষ্ঠিরাদিসমীপগমন, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে তাঁহার পুনরাগমন, কর্ণের পরামর্শক্রমে দুর্মতি দুর্যোধনের বনস্থপাণ্ডববিনাশমন্ত্রণা, তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ব্যাসের সত্বর আগমন, ব্যাস কর্তৃক দুর্যোধনাদির বনগমন নিবারণ, সুরভির উপাখ্যান, মৈত্রেয়ের ধৃতরাষ্ট্রসমীপে আগমন, মৈত্রেয়ের ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দান, মৈত্রেয়ের রাজা দুর্যোধনকে শাপপ্রদান, ভীমসেন কর্তৃক সংগ্রামে কির্মীর রাক্ষস বধ, শকুনি ছলপূর্বক দ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিয়াছে শুনিয়া বৃষ্ণিবংশীয় ও পাঞ্চালদিগের আগমন, জাতক্রোধ কৃষ্ণের অর্জুন কর্তৃক সান্ত্বনা, কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ ও পরিতাপ, দুঃখার্তা দ্রৌপদীকে কৃষ্ণের আশ্বাস প্রদান, সৌভপতি শাল্বের বধ কীর্তন, কৃষ্ণ কর্তৃক সপুত্রা সুভদ্রার দ্বারকানয়ন, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দ্রৌপদীতনয়দিগের পাঞ্চাল নগর নয়ন, পাণ্ডবদিগের রমণীয় দ্বৈতবনে প্রবেশ, তথায় দ্রৌপদী ও ভীমের সহিত যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন, ব্যাসদেবের পাণ্ডবসমীপে আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতিনামক বিদ্যা দান, ব্যাসের অন্তর্ধানের পর পাণ্ডবদিগের কাম্যকবন প্রস্থান, অস্ত্রলাভার্থে মহাবীর্য অর্জুনের প্রবাসগমন, কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ, ইন্দ্রাদি লোকপাল দর্শন, অস্ত্রলাভ, অস্ত্রশিক্ষার্থে ইন্দ্রলোকগমন, পাণ্ডববৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা, পাণ্ডবদিগের পরম জ্ঞানী মহর্ষি বৃহদশ্বের দর্শন, দুঃখার্ত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ও পরিতাপ, ধর্ম ও করুণরসজনক নলোপাখ্যান, দময়ন্তী ও নলের চরিতকীর্তন, যুধিষ্ঠিরের বৃহদশ্ব হইতে অক্ষহৃদয়নামক বিদ্যাপ্রাপ্তি, স্বর্গ হইতে লোমশ ঋষির পাণ্ডবদিগের নিকটে আগমন, বনবাসগত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকটে লোমশ কর্তৃক স্বর্গবাসী অর্জুনের বৃত্তান্তকথন, অর্জুনবাক্যানুসারে পাণ্ডবদিগের তীর্থাভিগমন, তীর্থের ফল ও পবিত্রত্ব কীর্তন, মহর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থ যাত্রা, মহাত্মা পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রা, কুণ্ডলদ্বয় দান দ্বারা কর্ণের

ইন্দ্রহস্ত হইতে মুক্তি, গয়াসুরের যজ্ঞবর্ণন, অগস্ত্যোপাখ্যান ও বাতাপিভক্ষণ, সন্তান লাভার্থে অগস্ত্য মুনির লোপামুদ্রাপরিগ্রহ, কৌমারব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিতকীর্তন, অতিতেজস্বী জামদগ্ন্য রামের চরিতকীর্তন, কার্তবীর্য ও হৈহয়দিগের বধবর্ণন, প্রভাসতীর্থে যদুবংশীয়দিগের সহিত পাণ্ডবদিগের সমাগম, সুকন্যার উপাখ্যান, শর্যাতি রাজার যজ্ঞে চ্যবনমুনি কর্তৃক অশ্বিনীকুমার যুগলের সোমপীথিকার্যে বরণ, অশ্বিনীকুমার যুগলের অনুগ্রহে চ্যবনের যৌবনপ্রাপ্তি, মান্ধাতার উপাখ্যান, জন্তুনামক রাজপুত্রের উপাখ্যান, সমধিক পুত্রলাভবাসনায় সোমকরাজার জন্তুনামক পুত্রের প্রাণবধপূর্বক যজ্ঞানুষ্ঠান ও শতপুত্রপ্রাপ্তি, অত্যুৎকৃষ্ট শ্যেনকপোতোপাখ্যান, ইন্দ্র ও অগ্নির শিবি রাজাকে ধর্মজিজ্ঞাসা, অষ্টাবক্রোপাখ্যান, জনকযজ্ঞে নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ বরুণপুত্র বন্দির সহিত অষ্টাবক্র মুনির বিবাদ, অষ্টাবক্রের বন্দিপরাজয়পূর্বক সাগরজলমগ্ন পিতার উদ্ধার, যবক্রীত ও মহাত্মা রৈভ্যের উপাখ্যান, পাণ্ডবদিগের গন্ধমাদন যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস, গন্ধমাদনে অবস্থানকালে পুষ্পাহরণার্থে দ্রৌপদীর ভীমপ্রেরণ, গমনকালে ভীমকর্তৃক কদলীবনমধ্যস্থ মহাবল হনুমানের দর্শন, পুষ্পাহরণার্থে ভীমের সরোবরাবগাহন, মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসগণের ও মণিমান্ প্রভৃতি মহাবীর্য যক্ষদিগের সহিত ভীমের যুদ্ধ, ভীম কর্তৃক জটাসুর নামক রাক্ষসের বধ, রাজর্ষি বৃষপর্বার অভিগমন, পাণ্ডবদিগের আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে গমন ও বাস, দ্রৌপদীর মহাত্মা ভীমসেনকে উৎসাহপ্রদান, ভীমের কৈলাসারোহণ, তথায় মণিমান্ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত যক্ষগণের সহিত যুদ্ধ, পাণ্ডবদিগের কুবেরের সহিত সমাগম, দিব্যাস্ত্র লাভানন্তর অর্জুনের ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগম, হিরণ্যপুরবাসী নিবাতকবচগণের ও পুলোমপুত্র কালকেয়দিগের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, অর্জুন কর্তৃক তাহাদিগের রাজার প্রাণবধ, যুধিষ্ঠিরসমীপে অর্জুনের অস্ত্রসন্দর্শনের উপক্রম, দেবর্ষি নারদ কর্তৃক তৎপ্রতিষেধ, গন্ধমাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবতরণ, গহনবনে পর্বততুল্য প্রকাণ্ডকায় মহাবল ভুজগেন্দ্র কর্তৃক ভীমগ্রহণ, প্রশ্নকথনপূর্বক যুধিষ্ঠিরের ভীমোদ্ধার, মহাত্মা পাণ্ডবদিগের পুনর্বার কাম্যকবনে আগমন, কাম্যকস্থিত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদিগের পুনর্দর্শনার্থে কৃষ্ণের আগমন, মার্কণ্ডেয় সমস্যা, মার্কণ্ডেয় কর্তৃক বেণপুত্র পৃথুরাজার উপাখ্যানকীর্তন, সরস্বতী ও তার্ক্ষ্য মুনি সংবাদ, তদনন্তর মৎস্যোপাখ্যান-কথন, ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, ধুন্ধুমারোপাখ্যান, পতিব্রতার উপাখ্যান, অঙ্গিরার উপাখ্যান, দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদ, পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে পুনরাগমন, ঘোষযাত্রা, গন্ধর্বগণ কর্তৃক দুর্যোধনের বন্ধন, অর্জুন কর্তৃক গন্ধর্ববন্ধন হইতে দুর্যোধনের মোচন, যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্নদর্শন, কাম্যকবনে পুনর্গমন, বহুবিস্তৃত ব্রীহিদ্রৌণিক উপাখ্যান, দুর্বাসার উপাখ্যান, আশ্রমমধ্য হইতে জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদীহরণ, মহাবল মহাবেগ ভীম কর্তৃক জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ, বহুবিস্তৃত রামায়ণোপাখ্যান, যুদ্ধে রাম কর্তৃক রাবণবধ, সাবিত্রীর উপাখ্যান, কুণ্ডলদ্বয় দান দ্বারা ইন্দ্র হইতে কর্ণের মুক্তি, সন্তুষ্ট ইন্দ্রের কর্ণকে এক পুরুষঘাতিনী শক্তি দান, আরণেয় উপাখ্যান, ধর্মের স্বপুত্রানুশাসন, বরপ্রাপ্তিপূর্বক পাণ্ডবদিগের পশ্চিম দিক্ প্রস্থান। আরণ্যকপর্বে এই সমস্ত বৃত্তান্ত

কীর্তিত আছে। এই পর্বে দুই শত একোনসপ্ততি অধ্যায় ও একাদশ সহস্র ছয় শত চৌষট্টি শ্লোক আছে।

হে মুনিগণ! অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরাটপর্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা বিরাটনগরে গমনপূর্বক শ্মশানে অতি প্রকাণ্ড শমীতরু দৃষ্টিগোচর করিয়া তাহাতে স্ব স্ব অস্ত্র স্থাপন করিলেন, এবং নগরে প্রবেশ করিয়া ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ভীমসেন দ্রৌপদীসম্ভোগাভিলাষী কামান্ধ দুরাত্মা কীচকের প্রাণদণ্ড করেন। রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ চতুর্দিকে সুচতুর চরমণ্ডলী প্রেরণ করেন; তাহারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সন্ধান করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ত্রিগর্তেরা বিরাট রাজার গোধন হরণ করে। তাহাদিগের সহিত বিরাটের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ত্রিগর্তেরা বিরাটকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, ভীম তাঁহাকে মুক্ত করেন। পাণ্ডবেরা ত্রিগর্তদিগকে পরাভূত করিয়া বিরাটের অপহৃত গোধন উদ্ধার করিলেন। তৎপরে কৌরবেরা তাঁহার গোধন হরণ করেন। অর্জুন নিজ বিক্রমে সমস্ত কৌরবদিগকে রণে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করিলেন। বিরাট রাজা সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত শত্রুঘাতী অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়া অর্জুনকে নিজ কন্যা উত্তরা সম্প্রদান করিলেন। অতি বিস্তৃত বিরাটনামক চতুর্থ পর্ব বর্ণিত হইল। এই পর্বে মহর্ষি সপ্তষষ্টি অধ্যায় গণনা করিয়াছেন। এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন; এই পর্বে বেদবেত্তা মহর্ষি দ্বিসহস্র পঞ্চাশৎ শ্লোক কীতন করিয়াছেন।

অতঃপর উদ্যোগনামক পঞ্চম পর্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা বিপক্ষজয়ার্থ উৎসুক হইয়া উপপ্লব্যনামক স্থানে অবস্থিত হইলে দুর্যোধন ও অর্জুন বাসুদেবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং উভয়েই প্রার্থনা করিলেন, তুমি এই যুদ্ধে আমার সহায়তা কর। মহামতি কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, এক পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনা, পক্ষান্তরে আমি একাকী, কিন্তু আমি যুদ্ধ করিব না, কেবল মন্ত্রিস্বরূপ থাকিব; তোমরা ইহার কে কি প্রার্থনা কর, বল। হিতাহিতবিবেকানভিজ্ঞ দুর্মতি দুর্যোধন সৈন্য প্রার্থনা করিলেন, অর্জুন যুদ্ধবিমুখ কৃষ্ণকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন। মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ যাইতেছিলেন, দুর্যোধন পথে তাঁহার দর্শন পাইয়া উপহার প্রদান দ্বারা বশীভূত করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, তুমি আমার সাহায্য কর। শল্য অঙ্গীকার করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শান্ত বাক্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রের বৃত্রাসুরজয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। পাণ্ডবেরা কৌরবসমীপে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। প্রতাপবান্ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবপ্রেরিত পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তিস্থাপনবাসনায় সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। বাসুদেবের ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রাত্যাগ হইল। বিদুর মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বহুতর অদ্ভুত হিতবাক্য শ্রবণ করাইলেন। মহর্ষি সনৎসুজাতও রাজাকে মনস্তাপান্বিত ও শোকবিহ্বল দেখিয়া পরমোৎকৃষ্ট অধ্যাত্ম শাস্ত্র শুনাইলেন। সঞ্জয় প্রভাতে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ

ও অর্জুন একাত্মা বলিয়া বর্ণনা করিলেন। মহামতি কৃষ্ণ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বিরোধ-ভঞ্জন ও শান্তিস্থাপনার্থে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। রাজা দুর্যোধন উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। এই স্থলে দম্ভোদ্ভব রাজার উপাখ্যান, মহাত্মা মাতলির নিজ কন্যার্থে বরান্বেষণ, মহর্ষি গালবের চরিত ও বিদুলার স্বপুত্রানু-শাসন কীর্তিত আছে। কৃষ্ণ, কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতির দুষ্ট মন্ত্রণা জ্ঞাত হইয়া সমস্ত রাজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বরত্ব প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর কর্ণকে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার সহিত অশেষবিধ পরামর্শ করিলেন। কর্ণ গর্বান্ধতাপ্রযুক্ত তদীয় পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না। শত্রুঘাতী কৃষ্ণ হস্তিনা হইতে উপপ্লব্যে প্রত্যাগমন করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট আদ্যোপান্ত অবিকল বর্ণনা করিলেন। তাঁহারা তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হিতাহিত মন্ত্রণাপূর্বক সংগ্রামের সমুদায় সজ্জা করিলেন। তদনন্তর সমুদায় পদাতি, অশ্ব, রথ, গজ, যুদ্ধার্থে হস্তিনানগর হইতে নির্গত হইল। রাজা দুর্যোধন যুদ্ধারম্ভের পূর্ব দিবসে উলূকনামক এক ব্যক্তিকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তৎপরে সৈন্যসংখ্যা ও কাশিরাজদুহিতা অম্বার উপাখ্যান। বহুবৃত্তান্তযুক্ত সন্ধিবিগ্রহবিশিষ্ট উদ্যোগনামক ভারতীয় পঞ্চম পর্ব নির্দিষ্ট হইল। মহর্ষি উদ্যোগপর্বে এক শত ষড়শীতি অধ্যায় নির্দেশ করিয়াছেন। হে তপোধনগণ! উদারমতি মহাত্মা ব্যাসদেব এই পর্বে ষট্সহস্র ষট্শত অষ্ট নবতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর অদ্ভুত ভীষ্মপর্ব বর্ণিত হইতেছে। এই পর্বে সঞ্জয় জম্বুখণ্ডনির্মাণ বর্ণনা করেন। যুধিষ্ঠিরসৈন্য অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হয়। দশাহ ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মহামতি বাসুদেব অধ্যাত্মবিদ্যাসম্বন্ধ হেতুবাদ দ্বারা অর্জুনের মায়ামোহজনিত বিষাদ নিরাকরণ করেন। যুধিষ্ঠিরহিতাকাঙ্ক্ষী উদারমতি কৃষ্ণ বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া সত্বর রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্বক অতি দ্রুত গমনে প্রতোদহস্তে নির্ভয় চিত্তে ভীষ্মকে সংহার করিতে যান, এবং সকলশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে বাক্যরূপ দণ্ড দ্বারা তাড়না করেন। অর্জুন শিখণ্ডিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া তীক্ষ্ণতর শরপ্রহার দ্বারা ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করেন। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিলেন। বহুবিস্তৃত ষষ্ঠ পর্ব কথিত হইল। বেদবেত্তা ব্যাস ভীষ্মপর্বে এক শত সপ্তদশ অধ্যায় ও পঞ্চ সহস্র অষ্ট শত চতুরশীতি শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন।

তদনন্তর বহুবৃত্তান্তযুক্ত বিচিত্র দ্রোণপর্ব আরব্ধ হইতেছে। প্রতাপবান্ মহাস্ত্রবেত্তা দ্রোণাচার্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্যোধনের প্রীত্যর্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ধীমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে বদ্ধ করিয়া আনিব। সংশপ্তকেরা অর্জুনকে রণক্ষেত্র হইতে অপসারিত করে। সংগ্রামে শক্রতুল্য মহারাজ ভগদত্ত সুপ্রতীকনামক স্বীয় হস্তীর পরাক্রমে যুদ্ধে অতি দুর্ধর্ষ ও ভয়ানক হইয়া উঠেন। অর্জুন সুপ্রতীকের প্রাণ সংহার করেন। জয়দ্রথ প্রভৃতি অনেক মহারথেরা একত্র হইয়া অতি পরাক্রান্ত অপ্রাপ্তযৌবন শিশুপ্রায় অভিমন্যুর প্রাণবধ করেন। অভিমন্যু হত হইলে অর্জুন

ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংহারপূর্বক জয়দ্রথের জীবন নাশ করেন। মহাবাহু ভীম ও মহারথ সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অর্জুনের অন্বেষণার্থ দেবতাদিগেরও দুর্ধর্ষ কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করেন। হতাবশিষ্ট সংশপ্তকের সংগ্রামে নিঃশেষ হয়। দ্রোণপর্বে অলম্বুষ, শ্রুতায়ুঃ, বীর্যবান্ জলসন্ধ, সোমদত্ত, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ঘটোৎকচ, ও অন্যান্য বীরপুরুষেরা নিহত হয়েন। দ্রোণাচার্য যুদ্ধে নিপাতিত হইলে অশ্বত্থামা অমর্ষপরবশ হইয়া অতি ভয়ঙ্কর নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করেন। এই পর্বে উৎকৃষ্ট রুদ্রমাহাত্ম্য, ব্যাসদেবের আগমন, এবং কৃষ্ণ ও অর্জুনের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। ভারতের সপ্তম পর্ব উদাহৃত হইল। দ্রোণপর্বে যে সকল পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথিবীপাল নির্দিষ্ট হইয়াছেন, প্রায় সকলেই নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি পরাশরসূনু সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দ্রোণপর্বে এক শত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র নব শত নব শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর পরমাদ্ভুত কর্ণপর্ব উক্ত হইতেছে। ধীমান্ শল্যের সারথিকার্যে নিয়োগ, ত্রিপুরনিপাতবর্ণন, প্রস্থানকালে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর কলহ, কর্ণ তিরস্কারার্থ শল্যের হংসকাকীয় উপাখ্যান কথন, মহাত্মা অশ্বত্থামা কর্তৃক পাণ্ড্যরাজার বধ, তৎপরে দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ, সর্বধনুর্ধরসমক্ষে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাণসংশয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কোপ। কৃষ্ণ অনুনয় দ্বারা অর্জুনের কোপ শান্তি করিলেন। ভীম প্রতিজ্ঞাপূর্বক রণক্ষেত্রে দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তদীয় শোণিত পান করেন। অর্জুন দ্বৈরথ যুদ্ধে মহারথ কর্ণের প্রাণসংহার করেন। মহাভারতের অষ্টম পর্ব নির্দিষ্ট হইল। কর্ণপর্বে একোনসপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহস্র নয় শত চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্তিত হইয়াছে!

অতঃপর বিচিত্র শল্যপর্ব আরব্ধ হইতেছে। কৌরবসৈন্য বীরশূন্য হইলে মদ্রেশ্বর শল্য সেনাপতি হইলেন। শল্যপর্বে যাবতীয় রথযুদ্ধ ও কৌরবপক্ষীয় প্রধান বীরদিগের বিনাশ কীর্তিত হইয়াছে। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের হস্তে শল্যের ও সহদেবহস্তে শকুনির প্রাণবধ হয়। দুর্যোধন স্বীয় সৈন্য অল্পমাত্রাবশিষ্ট দেখিয়া হ্রদপ্রবেশপূর্বক জলস্তম্ভ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যাধেরা ভীমকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিল। অত্যন্ত অভিমানী দুর্যোধন ধীমান্ ধর্মরাজের তিরস্কারবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া হ্রদ হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক ভীমসেনের সহিত গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। গদাযুদ্ধ-কালে বলরাম তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে সরস্বতী দেবীর ও অশেষ তীর্থের পবিত্রত্ব কীর্তন ও তুমুল গদাযুদ্ধ বর্ণন। ভীম অতি প্রচণ্ড গদাঘাতে যুদ্ধে রাজা দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করিলেন। অদ্ভুত নবম পর্ব নির্দিষ্ট হইল। এই পর্বে বহুবৃত্তান্ত-সম্বলিত ঊনষষ্টি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা কথিত হইতেছে। কৌরবদিগের কীর্তিকীর্তক মুনি নবম পর্বে তিন সহস্র দুই শত বিংশতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর অতি দারুণ সৌতিকপর্ব বর্ণন করিব। পাণ্ডবেরা রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলে পর, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও অশ্বত্থামা এই তিন মহারথ সায়ংকালে রুধিরাক্ত-সর্বাঙ্গ ভগ্নোরু অভিমানী রাজা দুর্যোধনের নিকট গমন করিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা রণক্ষেত্রে পতিত আছেন। দৃঢ়ক্রোধ মহারথ অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমুদায় পাঞ্চাল ও অমাত্য সহিত সমস্ত পাণ্ডবদিগের প্রাণ সংহার না করিয়া গাত্র হইতে তনুত্রাণ উদ্‌ঘাটন করিব না। রাজাকে এইরূপ কহিয়া তিন মহারথেই তথা হইতে অপক্রান্ত হইয়া সূর্যাস্তসময়ে বনমধ্যে প্রবেশপূর্বক অতি প্রকাণ্ড বটবিটপিতলে উপবিষ্ট হইলেন। অশ্বত্থামা তথায় রাত্রিকালে এক পেচককে অনেক কাকের প্রাণসংহার করিতে দেখিয়া পিতৃবধস্মরণে কোপাবিষ্ট হইয়া নিদ্রান্বিত পাঞ্চালদিগের প্রাণবধ সংকল্প করিলেন। তদনুসারে শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, এক বিকটাকার অতি প্রকাণ্ড ভয়ানক রাক্ষস আকাশ পর্যন্ত রোধ করিয়া তথায় অবস্থিত আছে। অশ্বত্থামা যত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, রাক্ষস সমুদায় ব্যর্থ করিল। তখন তিনি সত্বর মহাদেবের আরাধনা করিয়া কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের সহযোগে নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীনন্দনদিগের প্রাণবধ করিলেন। কৃষ্ণের বলাশ্রয়প্রভাবে কেবল পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকি রক্ষা পাইলেন ; অবশিষ্ট সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি পাণ্ডবদিগকে সংবাদ দিল, অশ্বত্থামা নিদ্রাভিভূত পাঞ্চালদিগের প্রাণবধ করিয়াছে। দ্রৌপদী পুত্রশোকে আর্তা ও পিতৃভ্রাতৃবধশ্রবণে কাতরা হইয়া অনশন সংকল্প করিয়া ভর্তৃগণসন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। মহাপরাক্রান্ত বীর্যবান্ ভীমসেন দ্রৌপদীর মনস্তুষ্টি-সম্পাদনার্থে তদীয় বচনানুসারে গদাগ্রহণপূর্বক কুপিত চিত্তে গুরুপুত্রের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা ভীমভয়ে অভিভূত, রোষপরবশ ও দৈবপ্রেরিত হইয়া, পৃথিবী অপাণ্ডবা হউক, এই বলিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ, এরূপ করিও না, বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিষেধ করিলেন। পাপমতি অশ্বত্থামার অনিষ্টাচরণে এইরূপ অভিনিবেশ দেখিয়া অর্জুন অস্ত্র দ্বারা সেই অস্ত্রের নিবারণ করিলেন। অশ্বত্থামা দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পরস্পর শাপ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা মহারথ দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে মণিগ্রহণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে দ্রৌপদীহস্তে সমর্পিলেন। সৌপ্তিকনামক দশম পর্ব উদাহৃত হইল। উত্তমতেজা ব্রহ্মবাদী মহাত্মা মুনি সৌপ্তিকপর্বে অষ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্ট শত সপ্ততি শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। ঐষীকপর্ব এই পর্বের অন্তর্গত।

অতঃপর করুণরসোদ্বোধক স্ত্রীপর্ব আরব্ধ হইতেছে। এই পর্বে পুত্রশোকসন্তপ্ত প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভীমসেনের প্রাণবধ সংকল্প করিয়া কৃষ্ণানীত লৌহময়ী ভীমপ্রতিমূর্তি ভগ্ন করেন। বিদুর অধ্যাত্মবিদ্যাসম্বদ্ধ হেতুবাদ দ্বারা শোকাভিভূত ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক মায়া মোহ নিরাকরণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরিকাগণের সহিত রণক্ষেত্র দর্শনার্থ গমন করেন। বীরপত্নীদিগের অতি করুণ বিলাপ এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের কোপাবেশ ও মোহ। ক্ষত্রিয়নারীগণ যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত পিতা ভ্রাতা ও পুত্রদিগকে

দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ পুত্রপৌত্রশোককাতরা গান্ধারীর কোপ শান্তি করিলেন। পরমধার্মিক মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির যথাশাস্ত্র রাজাদিগের শরীরদাহ করাইলেন। প্রেততর্পণ আরব্ধ হইলে কুন্তী কর্ণকে স্বীয় গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া অঙ্গীকার ও প্রকাশ করিলেন। মহর্ষি ব্যাস এই একাদশ পর্ব রচনা করিয়াছেন। এই পর্ব শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিলে সজ্জনদিগকে শোকে অভিভূত ও অশ্রুজলে আকুলিত হইতে হয়। ধীমান্ ব্যাসদেব স্ত্রীপর্বে সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সপ্ত শত পঞ্চসপ্ততি শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন।

অতঃপর শান্তিপর্ব ; ইহার অধ্যয়নে বুদ্ধিবৃদ্ধি হয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্র মাতুল প্রভৃতির সংহার করাইয়া যৎপরোনাস্তি নির্বেদ প্রাপ্ত হয়েন। শরশয্যারূঢ় ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম শ্রবণ করান। ঐ সমুদায় ধর্মজ্ঞানাভিলাষী রাজগণের অবশ্যজ্ঞেয়। ভীষ্মদেব কাল ও কারণ প্রদর্শনপূর্বক আপদ্ধর্ম কীর্তন করেন। ঐ সকল ধর্ম অবগত হইলে নর সর্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বিচিত্র মোক্ষধর্মও সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাজ্ঞজনপ্রীতিপ্রদ দ্বাদশ পর্ব নির্দিষ্ট হইল। হে তপোধনগণ! শান্তিপর্বে ত্রিশত ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায় আছে জানিবেন। ধীমান্ পরাশরনন্দন এই পর্বে চতুর্দশ সহস্র সপ্ত শত সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

হে মহর্ষিগণ! ইহার পরেই অতি প্রশস্ত অনুশাসনপর্ব। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথী-পুত্র ভীষ্মের নিকট ধর্মনির্ণয় শ্রবণ করিয়া হতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন। এই পর্বে ধর্ম ও অর্থের অনুকূল যাবতীয় ব্যবহার প্রদর্শন, অশেষবিধ দানের পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দেশ, সদসৎপাত্রবিবেক, দানবিধিকথন, আচারবিধিনির্ণয়, সত্যস্বরূপনিরূপণ, গো-ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যকীর্তন, দেশকালানুসারে ধর্মরহস্যমীমাংসা, ও ভীষ্মদেবের স্বর্গা-রোহণকীর্তন আছে। ধর্মনির্ণয়যুক্ত বহুবৃত্তান্তালঙ্কৃত অনুশাসননামক ত্রয়োদশ পর্ব নির্দিষ্ট হইল। এই পর্বে এক শত ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র শ্লোক সংখ্যাত আছে।

তৎপরে আশ্বমেধিকনামক চতুর্দশ পর্ব। সংবর্তমুনি ও মরুত্তরাজার উপাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত সুবর্ণরাশিপ্রাপ্তি ও পরীক্ষিতের জন্ম। পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন ; কৃষ্ণ পুনর্বার তাঁহাকে জীবন দান করেন। উৎকৃষ্ট যজ্ঞীয় অশ্ব রক্ষার্থ তদনুগামী অর্জুনের নানা স্থানে কুপিত রাজপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ। চিত্রাঙ্গদাগর্ভসম্ভূত নিজপুত্র বভ্রুবাহনের সহিত সংগ্রামে অর্জুনের প্রাণসংশয় ঘটে। অশ্বমেধযজ্ঞে নকুলবৃত্তান্ত কীর্তন। পরমাদ্ভুত আশ্বমেধিকপর্ব উক্ত হইল। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি এই পর্বে এক শত তিন অধ্যায় ও তিন সহস্র তিন শত বিংশতি শ্লোক নির্দেশ করিয়াছেন।

তৎপরে আশ্রমবাসনামক পঞ্চদশ পর্ব। রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বিদুর ও গান্ধারী সমভিব্যাহারে অরণ্যপ্রবেশপূর্বক ঋষিদিগের আশ্রমে বাস করেন। গুরু-শুশ্রূষাপরায়ণা কুন্তী তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া পুত্ররাজ্য পরিত্যাগপূর্বক তদনু-

গামিনী হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধহত লোকান্তরগত পুত্র পৌত্রগণ ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে জীবিত পুনরাগত অবলোকন করিলেন। তিনি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদাৎ এইরূপ অত্যুৎকৃষ্ট আশ্চর্য সন্দর্শন করিয়া শোক পরিত্যাগপূর্বক সস্ত্রীক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। বিদুর ও মহামাত্য বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় সঞ্জয় ধর্মপথ আশ্রয় করিয়া সদ্গতি পাইলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদের সন্দর্শন পাইয়া তাঁহার প্রমুখাৎ যদুবংশীয়দিগের কুলক্ষয়বার্তা শ্রবণ করিলেন। অত্যদ্ভুত আশ্রমবাসাখ্য পর্ব উক্ত হইল। তত্ত্বদর্শী ব্যাস এই পর্বে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক সহস্র পাঁচ শত ছয় শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

হে মহর্ষিগণ! অতঃপর অতি দারুণ মৌষলপর্ব জানিবেন। এই পর্বে ব্রহ্মশাপ-নিগৃহীত পুরুষশ্রেষ্ঠ যাদবেরা আপানে (৩২) সুরাপানে মত্ত ও দৈবপ্রেরিত হইয়া এরকারূপী (৩৩) বজ্র দ্বারা পরস্পর প্রহার করেন। রাম ও কেশব কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে উভয়ে সর্বসংহারকারী উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিলেন না। নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন আসিয়া দ্বারকা যাদবশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিষাদ ও মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আত্মমাতুল নরশ্রেষ্ঠ বসুদেবের সংস্কার করিয়া কৃষ্ণ, বলরাম, ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যাদবদিগেরও সংস্কার করিলেন। অনন্তর দ্বারকা হইতে বালক ও বৃদ্ধদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে যাইতে বিপৎকালে গাণ্ডীবের পরাক্রমক্ষয় ও দিব্যাস্ত্র সমুদায়ের অস্ফূর্তি অবলোকন করিলেন, এবং যাদবরমণী-দিগের অপহরণ এবং প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্যের অনিত্যতা দর্শনে সাতিশয় নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া ধর্মরাজসন্নিধানে প্রত্যাগমনপূর্বক সন্ন্যাসাবলম্বনের বাসনা করিলেন। মৌষলনামক ষোড়শ পর্ব পরিকীর্তিত হইল। তত্ত্বদর্শী দ্বৈপায়ন এই পর্বে আট অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

তৎপরে মহাপ্রস্থানিকনামক সপ্তদশ পর্ব। এই পর্বে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান গমন করেন। তাঁহারা লৌহিত্যসাগরতীরে উত্তীর্ণ হইয়া অগ্নির সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। অর্জুন মহাত্মা অগ্নির আদেশানুসারে পূজাপূর্বক তাঁহাকে সর্বধনুশ্রেষ্ঠ দিব্য গাণ্ডীব প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে ক্রমে ক্রমে নিপতিত ও নিধনপ্রাপ্ত দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মায়া পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রস্থানিক-নামক সপ্তদশ পর্ব নির্দিষ্ট হইল। তত্ত্বদর্শী ঋষি এই পর্বে তিন অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক নিরূপণ করিয়াছেন। (৩৪)

---

(৩২) যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সুরাপান করে।

(৩৩) এরকা তৃণবিশেষ, খড়ী।

(৩৪) শ্লোকানাঞ্চ শতত্রয়ম্। বিংশতিশ্চ তথা শ্লোকাঃ সংখ্যাতাস্তত্ত্বদর্শিনা। এই স্থলে যথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল। কিন্তু মহাপ্রস্থানপর্বে এক শত ত্রয়োবিংশতি শ্লোকের অধিক নাই। এই নিমিত্ত টীকাকার নীলকণ্ঠ সমাসবলে শতত্রয়ম্ এই শব্দে এক শত তিন এই অর্থ করিয়া বিংশতি সহযোগে এক শত ত্রয়ো বিংশতি এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তৎপরে অলৌকিক অত্যাশ্চর্য স্বর্গপর্ব। মহাপ্রাজ্ঞ ধর্মরাজ দয়ার্দ্রহৃদয়তাপ্রযুক্ত স্বসমভিব্যাহারী কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকাগত দিব্য রথে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ধর্ম, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, কুক্কুররূপ পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন, যুধিষ্ঠির তৎসমভিব্যাহারে স্বর্গারোহণ করিলেন। দেবদূত ছলক্রমে তাঁহাকে নরকদর্শন করাইল। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে অবস্থিত আজ্ঞানুবর্তী ভ্রাতৃগণের কাতর শব্দ শ্রবণ করিলেন। ধর্ম ও ইন্দ্র তাঁহার ক্ষোভ নিরাকরণ করিলেন। অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গায় অবগাহন করিয়া মানবদেহ পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গে স্বধর্মার্জিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে পরমাদরে ও পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেবপ্রোক্ত স্বর্গারোহণনামক অষ্টাদশ পর্ব নির্দিষ্ট হইল। মহাত্মা ঋষি এই পর্বে পাঁচ অধ্যায় ও দুই শত নয় শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

এইরূপে অষ্টাদশ পর্ব সবিস্তর উক্ত হইল। তৎপরে হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্ব কীর্তিত হইয়াছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

মহাভারতীয় পর্বসংগ্রহ কীর্তিত হইল। (৩৫)

যুদ্ধাভিলাষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র সমাগত হইয়াছিল। অষ্টাদশ দিবস ঐ মহাদারুণ যুদ্ধ হয়।

যে দ্বিজ অঙ্গ (৩৬) ও উপনিষদ্ সহিত চারি বেদ জানেন, কিন্তু এই আখ্যানগ্রন্থ জানেন না, তিনি কখনই বিচক্ষণ নহেন। অমিতবুদ্ধি ব্যাসদেব এই গ্রন্থকে অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, ও কামশাস্ত্র স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন পুংস্কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকশব্দ শ্রবণে অনুরাগ হয় না, সেইরূপ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রান্তরশ্রবণে অভিরুচি থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকসৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ এই সর্বোত্তম ইতিহাসগ্রন্থ হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেমন চতুর্বিধ (৩৭) প্রজা অন্তরীক্ষের অন্তর্গত, হে দ্বিজগণ! সেইরূপ যাবতীয় পুরাণ এই উপাখ্যানের অন্তর্বর্তী। যেমন মনের ক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, সেইরূপ এই আখ্যানশাস্ত্র অশেষবিধ ক্রিয়া (৩৮) ও গুণের (৩৯) আশ্রয়। যেমন আহার

---

(৩৫) পর্বসংগ্রহে যেরূপ অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা লিখিত হইল, প্রতিপর্বেই তাহার ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বনপর্বে ও হরিবংশে অত্যন্ত অসঙ্গত। প্রতিজ্ঞাত সংখ্যা অপেক্ষা বনপর্বে প্রায় ছয় সহস্র শ্লোক অধিক, হরিবংশে ন্যূনাধিক চারি সহস্র। পণ্ডিতেরা মীমাংসা করেন লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এইরূপ সংখ্যাগত ন্যূনাধিক্য ঘটিয়াছে।

(৩৬) শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ছন্দঃ এই ছয়, বেদের উচ্চারণনিয়মবোধক শাস্ত্রের নাম শিক্ষা, যে শাস্ত্রে বৈদিক ক্রিয়ার বিবরণ আছে, তাহাকে কল্প কহে, আর বেদান্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্রের নাম নিরুক্ত।

(৩৭) জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ।

(৩৮) অধ্যয়ন, দান, যজন প্রভৃতি।

(৩৯) শম, দম, ধৈর্য, ক্ষমা, সত্য প্রভৃতি।

ব্যতিরেকে শরীরধারণের অন্য উপায় নাই, সেইরূপ এই উপাখ্যানের অন্তর্গত কথা ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী ভৃত্যেরা সৎকুলজাত প্রভুর সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ, সমস্ত কবিগণ এই উপাখ্যানের উপাসনা করেন। যেমন গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃত যাবতীয় কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

তোমাদিগের সর্বদা ধর্মে মতি হউক, পরলোকগত ব্যক্তির ধর্মই একমাত্র বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে উপাসিত হইলেও কোন কালে আত্মীয় ও স্থায়ী হয় না।

যে ব্যক্তি দ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুটবিগলিত অপ্রমেয় পরম পবিত্র পাপহর মঙ্গলকর ভারতপাঠ শ্রবণ করে, তাহার পুষ্কর (৪০) জলাভিষেকের প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগে ইন্দ্রিয়সেবা দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, মহাভারত কীর্তন করিলে সায়ংকালে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। আর রাত্রিকালে কায়মনোবাক্যে যে পাপানুষ্ঠান করেন, ভারত কীর্তন করিলে প্রাতঃকালে তাহা হইতে মুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বহুশ্রুত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণশৃঙ্গসমন্বিত গোশত দান করে, আর যে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারতকথা নিত্য শ্রবণ করে, সেই দুই জনের তুল্য ফল লাভ হয়। যেমন বিস্তীর্ণ সমুদ্র তরণীযোগে অনায়াসগম্য হয়, সেইরূপ অগ্রে পর্বসংগ্রহ শ্রবণ করিলে এই অত্যুৎকৃষ্ট মহৎ আখ্যানশাস্ত্র মনুষ্যের পক্ষে সুগম হয়।

তৃতীয় অধ্যায়—পৌষ্যপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয় স্বীয় সহোদরগণ সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে বহুবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ও ভীমসেন নামে তিন সহোদর। তাঁহাদের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে এক কুক্কুর তথায় উপস্থিত হইল। জনমেজয়ের ভ্রাতারা তাহাকে প্রহার করাতে, সে অতিশয় রোদন করিতে করিতে স্বীয় জননীসন্নিধানে গমন করিল। দেবশুনী সরমা পুত্রকে অত্যন্ত রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন রোদন করিতেছ, কে তোমারে প্রহার করিয়াছে? সে এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিল, জনমেজয়ের ভ্রাতারা আমাকে প্রহার করিলেন। তখন সরমা কহিল, আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তুমি কোনও অপরাধ করিয়াছিলে, তাহাতেই তাঁহারা প্রহার করিয়াছেন। সে কহিল, আমার কোন অপরাধ নাই, যজ্ঞীয় হবিতে দৃষ্টিপাত বা জিহ্বাস্পর্শ কিছুই করি নাই। ইহা শুনিয়া তাহার মাতা সরমা পুত্রদুঃখে দুঃখিতা হইল, এবং যে স্থলে জনমেজয় ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞ করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া কোপাবেশ প্রদর্শনপূর্বক জনমেজয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পুত্রের কোন অপরাধ নাই, যজ্ঞীয় হবি অবেক্ষণ বা অবলেহন করে নাই, কি নিমিত্ত প্রহার করিয়াছ? তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

(৪০) পরম পবিত্র তীর্থবিশেষ।

তখন সরমা কহিল, তুমি ইহাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিয়াছ, অতএব অতর্কিত কারণে তোমার ভয় উপস্থিত হইবেক। রাজা জনমেজয় সরমার শাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হইলেন। পরে আরব্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া সবিশেষ যত্নসহকারে সরমাশাপনিবারণসমর্থ পুরোহিতের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

একদা পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় মৃগয়ায় গমন করিয়া নিজ রাজ্যান্তর্গত কোন জনপদে এক আশ্রম দর্শন করিলেন। তথায় শ্রুতশ্রবাঃ নামে এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার সোমশ্রবা নামে তপস্যানুরক্ত পুত্র ছিলেন। জনমেজয় তাঁহার সেই পুত্রের নিকটে গিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া ঋষির নিকট নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আপনকার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন। ঋষি রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, এক সর্পী আমার শুক্র পান করিয়াছিল, আমার এই পুত্র তাহার গর্ভে জন্মেন, ইনি মহাতপস্বী, সদা স্বাধ্যায়রত, মদীয় তপোবীর্যসম্পন্ন, মহাদেবশাপ ব্যতিরেকে অন্যান্য সমুদায় শাপ নিরাকরণে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইঁহার এই এক নিগূঢ় ব্রত আছে যে, ব্রাহ্মণে ইঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, ইনি তাহাই দেন, ইহাতে যদি তোমার সাহস হয়, ইঁহাকে লইয়া যাও। জনমেজয় শ্রুতশ্রবার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! তাহার কোনও ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। অনন্তর তিনি সেই পুরোহিত সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া নিজ ভ্রাতাদিগকে কহিলেন, ইনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে, কোনমতে অন্যথা না হয়। ভ্রাতৃগণ তদীয় আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। জনমেজয় ভ্রাতাদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়া তক্ষশিলা জয়ার্থে প্রস্থান করিলেন, এবং অবিলম্বে সেই দেশ আপন বশীভূত করিলেন।

এই অবসরে প্রসঙ্গক্রমে উপাখ্যানান্তর আরম্ভ হইতেছে। আয়োদধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার উপমন্যু, আরুণি, ও ধৌম্য নামে তিন শিষ্য। তিনি পাঞ্চালদেশীয় আরুণিনামক শিষ্যকে ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। পাঞ্চাল্য আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে তথায় গমন করিলেন, কিন্তু আলি বন্ধন করিতে পারিলেন না। তিনি বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করিয়াও কোনও ক্রমে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে এক উপায় দেখিয়া স্থির করিলেন, ভাল, ইহাই করিব। এই নিশ্চয় করিয়া তিনি সেই কেদারখণ্ডে শয়ন করিলেন। শয়ন করাতে জলনির্গম নিবারিত হইল। পরে উপাধ্যায় আয়োদধৌম্য শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, পাঞ্চাল্য আরুণি কোথায় গেল? তাঁহারা বিনীত বচনে উত্তর করিলেন, ভগবন্! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলিবন্ধনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ঋষি শিষ্যদিগকে কহিলেন, তবে চল আমরা সকলেই সেখানে যাই। অনন্তর তিনি তথায় গমন করিয়া এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন,

অহে বৎস পাঞ্চাল্য আরুণি! তুমি কোথায় আছ, আইস। আরুণি উপাধ্যায়বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা সেই কেদারখণ্ড হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়! আমি উপস্থিত হইয়াছি, কেদারখণ্ড হইতে যে জল নির্গত হইতেছিল, অবারণীয় হওয়াতে তাহা রোধ করিবার নিমিত্ত তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনকার শব্দ শুনিয়া সহসা কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া আপনকার নিকটে উপস্থিত হইলাম, অভিবাদন করি, এক্ষণে কি করিব, আজ্ঞা করুন। শিষ্যবাক্যাবসানে উপাধ্যায় তদীয় গুরুভক্তির দৃঢ়তা দর্শনে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি কেদারখণ্ডের আলি বিদীর্ণ করিয়া উত্থান করিয়াছ, অতএব তুমি অদ্যাবধি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে; আর আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার মঙ্গল হইবেক, বেদ ও সমুদায় ধর্মশাস্ত্র সর্ব কাল স্মরণপথারূঢ় থাকিবেক। আরুণি এইরূপ উপাধ্যায়বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত দেশে প্রস্থান করিলেন।

আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে আর এক শিষ্য ছিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে, বৎস উপমন্যু! তুমি গো রক্ষা কর, এই আদেশ দিয়া গোচারণে প্রেরণ করিলেন। তিনি উপাধ্যায়বচনানুসারে গো রক্ষা করিতে লাগিলেন। উপমন্যু দিবাভাগে গো রক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক উপাধ্যায়ের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় তাহাকে স্থূলকলেবর অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস উপমন্যু! তোমাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিতেছি, তুমি কি আহার করিয়া থাক? তিনি উত্তর করিলেন, ভগবন্! ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা উদরপূর্তি করি। উপাধ্যায় কহিলেন, অতঃপর আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিবে না। উপমন্যু এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সংগৃহীত ভিক্ষান্ন আনিয়া উপাধ্যায়ের নিকট সমর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষান্ন স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। পর দিন উপমন্যু দিবাভাগে গো রক্ষা করিয়া প্রদোষকালে গুরুকুল প্রত্যাগমনপূর্বক গুরুর পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় এক্ষণেও তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস উপমন্যু! আমি তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি, এখন তুমি কি আহার কর? উপমন্যু নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে প্রথম ভিক্ষা সমর্পণ করিয়া আর এক বার ভিক্ষা করি, তাহাতে যাহা পাই তাহাই আহার করিয়া প্রাণধারণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, ইহা গুরুকুলবাসীর ধর্ম নহে; তুমি অন্যান্য ভিক্ষাজীবীর বৃত্তি প্রতিরোধ করিতেছ, এবম্প্রকারে জীবিকানির্বাহ করাতে তোমার লোভিত্ব প্রকাশ পাইতেছে; অতঃপর তুমি দ্বিতীয় বার ভিক্ষা করিও না। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু পূর্ববৎ গো রক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি গোরক্ষান্তে উপাধ্যায়গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার সম্মুখবর্তী হইয়া অভিবাদন করিলেন। উপাধ্যায় এখনও তাঁহাকে স্থূল দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস উপমন্যু! আমি তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি, আর তুমি ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিতেছি; অতএব, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল। এইরূপ

জিজ্ঞাসিত হইয়া উপমন্যু নিবেদন করিলেন, মহাশয়! এই সকল ধেনুর দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণধারণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, আমি তোমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই, তোমার এরূপে দুগ্ধপান করা কোনও রূপেই ন্যায্য নহে। উপমন্যু, আর এরূপ করিব না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং গোরক্ষান্তে যথাকালে উপাধ্যায়গৃহে আগমন করিয়া গুরুসম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় এখনও তাঁহাকে স্থূলকলেবর অবলোকন করিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু! ভিক্ষান্ন ভক্ষণ কর না, বারান্তরও ভিক্ষা কর না, দুগ্ধও পান কর না ; তথাপি তোমাকে স্থূলকায় দেখিতেছি। অতএব, এখন কি আহার করিয়া থাক, বল। উপমন্যু এইরূপ আদিষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়! বৎসগণ স্ব স্ব মাতৃস্তন পান করিতে করিতে যে ফেন উদ্গার করে, তাহাই পান করিয়া থাকি। উপাধ্যায় কহিলেন, সুশীল বৎস সকল তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করে ; ফেনপানে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি বৎসগণের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ ; অতএব তোমার ফেন পান করা উচিত নহে। উপমন্যু, আর করিব না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া পর দিন প্রভাতে গোরক্ষায় প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে প্রতিষিদ্ধ হইয়া উপমন্যু ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করেন না, বারান্তরও ভিক্ষা করেন না, দুগ্ধপান করেন না, দুগ্ধের ফেনও উপভোগ করেন না। এক দিবস অরণ্যে ক্ষুধার্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। ঐ সকল ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, অর্কপত্র অভ্যবহার করাতে চক্ষুর দোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন, এবং অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কূপে পতিত হইলেন। সূর্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইলেন, উপাধ্যায় তথাপি তাঁহাকে অপ্রত্যাগত দেখিয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, উপমন্যু কেন আসিতেছে না? তাঁহারা কহিলেন, সে গো রক্ষা করিতে গিয়াছে। উপাধ্যায় কহিলেন, আমি উপমন্যুর সর্বপ্রকার আহার প্রতিষেধ করিয়াছি, সে কুপিত হইয়াছে সন্দেহ নাই ; এই নিমিত্তই এত বিলম্ব হইল, তথাপি আসিতেছে না ; অতএব তাহার অন্বেষণ করা উচিত। এই বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যপ্রবেশ পুরঃসর এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, বৎস উপমন্যু! কোথায় আছ, শীঘ্র আইস। উপমন্যু উপাধ্যায়বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তর প্রদান করিলেন, আমি কূপে পতিত হইয়াছি। উপাধ্যায় কহিলেন, কূপে পতিত হইলে কেন? তিনি কহিলেন, অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়াছি, তাহাতেই কূপে পতিত হইলাম। উপাধ্যায় কহিলেন, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারযুগলের স্তব কর, তাঁহারা তোমাকে চক্ষুঃ-প্রদান করিবেন।

উপমন্যু উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে ঋগ্বেদবাক্য দ্বারা অশ্বিনীতনয়দ্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন, হে অশ্বিনীকুমারযুগল! তোমরা সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিলে, তোমরাই সর্বজীবপ্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলে, তোমরাই পরে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্য-মান বিচিত্র সংসারপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশমান হইয়াছ, দেশ কাল অবস্থা দ্বারা তোমাদের

পরিচ্ছেদ করা যায় না, তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে সর্ব কাল বিরাজমান রহিয়াছ, তোমরাই পক্ষিরূপে শরীরবৃক্ষে অধিষ্ঠান করিতেছ, তোমরা সৃষ্টিবিষয়ে পরমাণুপরতন্ত্র বা প্রকৃতিসাপেক্ষ নহ (৪১), তোমরা অবাঙ্মনসগোচর, তোমরাই স্বীয় মায়ার বিক্ষেপ (৪২) শক্তি দ্বারা অশেষ ভুবন প্রকাশ করিয়াছ; আমি অভয় প্রার্থনায় শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা তোমাদিগের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। তোমরা পরম রমণীয়, সর্বসঙ্গবিবর্জিত, লয়প্রাপ্ত সর্ব জগতের অধিষ্ঠানভূত, মায়াকার্য-বিনির্মুক্ত ও ক্ষয়োদয়বিকারশূন্য, তোমরা সর্বকাল সর্বোৎকৃষ্ট রূপে বিরাজমান রহিয়াছ, তোমরা বিভাকর সৃষ্টি করিয়া দিনরজনীস্বরূপ শুক্ল কৃষ্ণ সূত্রসমূহ দ্বারা সংবৎসররূপ বিচিত্র বস্ত্র বয়ন করিতেছ, তোমরা জীবদিগকে সঞ্চিত কর্মফল ভোগার্থে ভোগস্থান তত্তৎ ভুবনের পথ প্রদর্শন কর, তোমরা জীবাত্মস্বরূপা পক্ষিণীকে পরমাত্ম-শক্তিরূপ কালপাশ হইতে মুক্ত করিয়া মোক্ষরূপ সৌভাগ্যভাগিনী করিয়া থাক। জীবেরা যাবৎ মায়ামোহিত ও বিষয়রসপরবশ হইয়া ইন্দ্রিয়ের আজ্ঞানুবর্তী থাকে, তাবৎ তাহারা সর্বদোষসংস্পর্শশূন্য বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তোমাদিগকে জড়স্বভাবশরীরা-ভিন্ন ভাবে ভাবনা করে। ত্রিশতষষ্টিদিবসরূপ ধেনুগণ সংবৎসরস্বরূপ যে বৎস প্রসব করে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা ঐ বৎসকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্নফল বেদবিহিতক্রিয়াব্যূহরূপ ধেনুসমূহ হইতে তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করেন, তোমরা সেই সর্বোৎপাদক সর্বসংহার কারী বৎস উৎপাদন করিয়াছ। অহোরাত্ররূপ সপ্তশত অর (৪৩) সংবৎসররূপ নাভিতে অবস্থিত এবং দ্বাদশমাসরূপ প্রধিতে নিবেশিত আছে, তোমাদিগের উদ্ভাবিত এই মায়াময় নেমিশূন্য অক্ষয় কালচক্র নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে; অত্রত্য ও পরলোক-স্থিত প্রজাগণ এই বিচিত্র চক্রের সংস্পর্শ হইতে মুক্ত নহে। দ্বাদশ অর, ছয় নাভি ও এক অক্ষ বিশিষ্ট, কর্মফলের আধারস্বরূপ এক চক্র আছে; কালাধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ঐ চক্রে অধিরূঢ় আছেন; তোমরা আমাকে সেই চক্র হইতে মুক্ত কর, আমি অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইতেছি। তোমরা পরব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও জড়স্বভাব বিশ্ব প্রপঞ্চ-স্বরূপ, তোমরাই কর্ম ও কর্মফলস্বরূপ, আকাশাদি নিখিল জড় পদার্থ তোমাদিগের স্বরূপেই লীন হয়, তোমরাই অবিদ্যাদোষে তত্ত্বজ্ঞানসাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ও বিষয়-সুখাস্বাদ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিয়া সংসারপাশে বদ্ধ হও। তোমরা সৃষ্টির

(৪১) বেদান্তমতে ঈশ্বর অভিধ্যানমাত্রেই সৃষ্টি করেন; তাহাতে পরমাণু বা প্রকৃতির সহযোগিতা আবশ্যক করে না। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা কহেন, পরমাণু সকল নিত্য, সৃষ্টিপ্রারম্ভে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণুপুঞ্জের পরস্পর সংযোগ দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি হয়, তাঁহার অভিধ্যানমাত্রে হয় না, সুতরাং তন্মতে ঈশ্বর সৃষ্টিবিষয়ে পরমাণুপরতন্ত্র। সাংখ্যমতে ঈশ্বরের অভিধ্যানমাত্রে সৃষ্টি নহে, প্রকৃতিই সকল সৃষ্টি করেন, প্রকৃতি ব্যতিরেকে সৃষ্টি হয় না।

(৪২) মায়ার দুই শক্তি, আবরণ ও বিক্ষেপ; আবরণশক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপতিরোধান এবং বিক্ষেপশক্তি দ্বারা বিশ্বপ্রকাশ হয়। লৌকিক দৃষ্টান্তে, রজ্জুসর্প স্থলে, আবরণশক্তি দ্বারা রজ্জুর স্বরূপতিরোধান ও বিক্ষেপশক্তি দ্বারা তাহাতে সর্পের আবির্ভাব হয়।

(৪৩) অর, নাভি, প্রধি, নেমি, অক্ষ প্রভৃতি চক্রের অবয়ব বিশেষ।

প্রাক্কালে দশ দিক্, আকাশমণ্ডল, ও সূর্য সৃষ্টি করিয়াছ ; ঋষিগণ সেই সূর্যকৃত কালানুসারে বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং সমুদায় দেবতা ও মনুষ্য ঐশ্বর্য-ভোগ করিতেছেন। তোমরা আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের পঞ্চী-করণ (৪৪) করিয়াছ, সেই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক হইতে নিখিল বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। জীবগণ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া বিষয়ভোগ করিতেছে, এবং সমস্ত দেবতা ও সমস্ত মনুষ্য ভূতল আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। তোমাদিগের, ও তোমরা যে পুষ্করমালা ধারণ কর, তাহার বন্দনা করি। নিত্যমুক্ত কর্মফলদাতা অশ্বিনীতনয়দ্বয়ের সহায়তা ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবতারা স্ব স্ব ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ নহেন। হে অশ্বিনীকুমার-যুগল! তোমরা অগ্রে মুখ দ্বারা অন্নরূপ গর্ভ গ্রহণ কর, পরে অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই গর্ভ প্রসব করে, ঐ গর্ভ প্রসূত হইবামাত্র মাতৃস্তনপানে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে তোমরা আমার জীবনরক্ষা ও নয়নদ্বয়ের অন্ধত্ববিমোচন কর।

অশ্বিনীকুমারেরা উপমন্যুর এইরূপ স্তবে তুষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি এবং এক অপূপ দিতেছি, ভক্ষণ কর। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু নিবেদন করিলেন, আপনারা যাহা কহেন, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না, কিন্তু আমি গুরুর নিকট নিবেদন না করিয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারি না। তখন আশ্বিনেয়েরা কহিলেন, পূর্বে আমরা তোমার উপাধ্যায়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক অপূপ দিয়াছিলাম, তিনি গুরুর নিকট নিবেদন না করিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন ; অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ কর। ইহা শুনিয়া উপমন্যু কহিলেন, আমি আপনাদিগকে বিনয়-বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আমি গুরুদেবকে না জানাইয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। তদনন্তর অশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন, আমরা তোমার এইরূপ অবিচলিত গুরুভক্তিদর্শনে সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম ; তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত সকল লৌহময়, তোমার দন্ত সকল হিরণ্ময় (৪৫) ; তুমি চক্ষুষ্মান্ ও শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে।

উপমন্যু, অশ্বিনীকুমারবরপ্রভাবে নয়নলাভ করিয়া, উপাধ্যায়সমীপে আগমন ও অভিবাদন পূর্বক আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে, সকল বেদ ও সমুদায় ধর্মশাস্ত্র সর্ব কাল তোমার স্মরণপথারূঢ় থাকিবেক। উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

আয়োদধৌম্যের বেদ নামে আর এক শিষ্য ছিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন, বৎস বেদ! আমার গৃহে থাকিয়া কিছু কাল শুশ্রূষা কর, তোমার মঙ্গল

---

(৪৪) প্রথমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, এই সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়। পরে স্থুল সৃষ্টি সম্পাদনার্থে ঐ পঞ্চ ভূতকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের এক এক অর্ধকে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্বীয় অর্ধ ব্যতিরেকে অন্য চারি অর্ধেএক এক খণ্ড যোজিত করা যায়। ইহাকেই পঞ্চীকরণ কহে।

(৪৫) অর্থাৎ তোমার উপাধ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তুমি অত্যন্ত সুশীল ও গুরুভক্তিসম্পন্ন।

হইবে। তিনি যে আজ্ঞা বলিয়া গুরুশুশ্রূষাতৎপর হইয়া দীর্ঘ কাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিলেন। গুরু তাঁহাকে সর্বদাই কর্মের ভার দিতেন। তিনি শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা জনিত সমস্ত ক্লেশ সহিতেন এবং আদেশ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন, কখনও কোনও বিষয়ে অনিচ্ছা বা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। বহু কালের পর গুরু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তদীয় প্রসাদে বেদ, শ্রেয়ঃ, ও সর্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদেরও এই পরীক্ষা হইল।

বেদ উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া গুরুকুল হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও গৃহাবস্থানকালে তিন শিষ্য হইল। তিনি শিষ্যদিগকে গুরুশুশ্রূষা বা কোনও কর্ম করিতে কহিতেন না। স্বয়ং গুরুকুলবাসের দুঃখাভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য শিষ্যদিগকে কখনও কোনও প্রকার ক্লেশ দিতে চাহিতেন না।

কিয়ৎ কাল পরে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য বেদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে উপাধ্যায়ের কার্যে বরণ করিলেন। তিনি যাজনকার্যোপলক্ষে প্রস্থানকালে উতঙ্ক নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন, বৎস! আমার অনুপস্থিতিকালে গৃহে যে কোনও বিষয়ের অসংস্থান হইবেক, তুমি তাহা সম্পন্ন করিবে। বেদ উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া প্রবাসে প্রস্থান করিলেন। উতঙ্ক গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস উপাধ্যায়পত্নীরা একত্র হইয়া উতঙ্ককে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন, উপাধ্যায় গৃহে নাই; এক্ষণে যাহাতে উহার ঋতু নিষ্ফল না হয়, তাহা কর; কাল অতীত হইতেছে। উতঙ্ক তাঁহাদের কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় কুকর্মে প্রবৃত্ত হইব না, গুরু আমাকে এরূপ আদেশ করেন নাই যে, তুমি কুকর্মও করিবে। কিয়ৎ কাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহপ্রত্যাগমনপূর্বক এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উতঙ্কের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তোমার কি অভীষ্টসম্পাদন করিব বল, তুমি ধর্মতঃ আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমাদের পরস্পর প্রীতি বৃদ্ধি হইল; এক্ষণে আমি তোমাকে গৃহগমনের অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধি হইবেক, প্রস্থান কর।

এইরূপ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক নিবেদন করিলেন, আপনকার কি প্রিয়সম্পাদন করিব, আজ্ঞা করুন। এরূপ আপ্তশ্রুতি আছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া অধ্যাপনা করেন, এবং যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের অন্যতরের মৃত্যু হয়, অথবা পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে। অতএব আপনকার অনুজ্ঞা লইয়া অভিমত গুরুদক্ষিণা আহরণের বাসনা করি। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! অপেক্ষা কর, বলিব। কিয়দ্দিন পরে উতঙ্ক উপাধ্যায়ের নিকট নিবেদন করিলেন, মহাশয় আজ্ঞা করুন, কিরূপ গুরুদক্ষিণা দিলে আপনকার মনঃপ্রীতি হইতে পারে। উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! কিরূপ গুরুদক্ষিণা

আহরণ করিব বলিয়া আমাকে সর্বদাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাক ; অতএব তোমার উপাধ্যায়ানীর নিকটে গিয়া, কি আহরণ করিব বলিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি যাহা কহেন, তাহাই আহরণ কর। এইরূপ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক উপাধ্যায়ানী সন্নিধানে গমনপূর্বক নিবেদন করিলেন, ভগবতি! উপাধ্যায় আমাকে গৃহগমনের অনুমতি দিয়াছেন ; এক্ষণে আমার এই বাসনা, আপনকার অভিমত গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া ঋণমুক্ত হইয়া গৃহপ্রস্থান করি ; অতএব আজ্ঞা করুন, কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব। উপাধ্যায়ানী কহিলেন, বৎস! পৌষ্য রাজার নিকটে যাও ; তাঁহার সহধর্মিণী যে দুই কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন, তাহাই প্রার্থনা করিয়া আন ; চতুর্থ দিবসে ব্রতনিবন্ধন উৎসব হইবেক, সেই দিন ঐ দুই কুণ্ডল পরিয়া শোভমানা হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিব ; ইহাই সম্পন্ন কর, ইহা করিলেই তোমার সকল মঙ্গল লাভ হইবেক, নতুবা তোমার মঙ্গল নাই।

উতঙ্ক এইরূপে উপাধ্যায়ানী কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে এক মহাকায় বৃষভ ও তদুপরি আরূঢ় এক মহাকায় পুরুষ অবলোকন করিলেন। সেই পুরুষ উতঙ্ককে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, অহে উতঙ্ক! তুমি এই বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ক ভক্ষণে সম্মত হইলেন না। তখন সেই পুরুষ পুনর্বার কহিলেন, উতঙ্ক! সংশয় করিতেছ কেন, ভক্ষণ কর, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তখন উতঙ্ক সেই বৃষভের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলেন এবং ব্যস্ততা-প্রযুক্ত উত্থানানন্তর আচমন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে উতঙ্ক আসনোপবিষ্ট পৌষ্যসমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্বাদ প্রয়োগ ও সমুচিত সম্ভাষণপূর্বক কহিলেন, আমি তোমার নিকট যাচকভাবে উপস্থিত হইলাম। রাজা অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! ভৃত্য কি করিবেক, আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন, গুরুদক্ষিণা দিবার নিমিত্ত তোমার মহিষীর কর্ণস্থ কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, তাহা তুমি আমাকে দান কর। পৌষ্য কহিলেন, মহাশয়! অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীর নিকট প্রার্থনা করুন। উতঙ্ক তদীয় বাক্য অনুসারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু পৌষ্যের মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পৌষ্যের নিকটে আসিয়া কহিলেন, আমাকে প্রবঞ্চনা করা উচিত নহে, অন্তঃপুরে তোমার মহিষী নাই, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। পৌষ্য উতঙ্কবাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণমাত্র অনুধ্যান করিয়া কহিলেন, মহাশয়! নিঃসন্দেহ আপনি উচ্ছিষ্ট ও অশুচি আছেন, মনে করিয়া দেখুন ; আমার সহধর্মিণী অতি পতিব্রতা, উচ্ছিষ্ট ও অশুচি থাকিলে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি কখনও অশুচির দৃষ্টিগোচর হয়েন না।

রাজবাক্য শ্রবণান্তর উতঙ্ক স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি উত্থানানন্তর গমন করিতে করিতে আচমন করিয়াছি। পৌষ্য কহিলেন, ঐ আপনকার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, উত্থানাবস্থায় অথবা গমন করিতে করিতে আচমন করা আর না করা দুই সমান। উতঙ্ক, যথার্থ কহিতেছ বলিয়া, প্রাঙ্মুখে উপবেশন ও পাণি পাদ বদন প্রক্ষালনপূর্বক

নিঃশব্দ, অফেন, অনুষ্ণ, হৃদয়দেশ পর্যন্ত প্রবিষ্ট (৪৬) জল দ্বারা বারদ্বয় আচমন ও বারদ্বয় ইন্দ্রিয়মার্জন ও পুনর্বার আচমন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন। পৌষ্যপত্নী দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান, অভিবাদন, ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন কি করিব। উতঙ্ক কহিলেন, গুরুদক্ষিণার্থে কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, তাহা দান কর। তিনি তাঁহার দ্রঢ়ীয়সী গুরুভক্তিদর্শনে প্রসন্না ও প্রীতা হইলেন, এবং ইনি অতি সৎপাত্র, ইঁহার অভ্যর্থনাভঙ্গ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া কর্ণ হইতে অবমোচন-পূর্বক তদীয় হস্তে কুণ্ডলদ্বয় সমর্পণ করিয়া কহিলেন, নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডলের নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইয়া আছেন; অতএব আপনি সাবধান হইয়া লইয়া যাইবেন। উতঙ্ক কহিলেন, তোমার কোনও উদ্বেগ নাই, নাগরাজ তক্ষক আমাকে অভিভব করিতে পারিবেন না।

উতঙ্ক ইহা কহিয়া সমুচিত আমন্ত্রণপূর্বক রাজপত্নীর নিকট বিদায় লইয়া পৌষ্যসকাশে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অনন্তর পৌষ্য উতঙ্কের নিকট নিবেদন করিলেন, ভগবন্! সর্বদা সৎপাত্রসংযোগ ঘটে না। আপনি অতি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব আতিথ্য করিতে চাই, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। উতঙ্ক কহিলেন, ভাল, অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তুমি সত্বর হইয়া যাহা উপস্থিত আছে, তাহাই আনয়ন কর। তদনুসারে তিনি, যে অন্ন উপস্থিত ছিল, তাহাই আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। উতঙ্ক সেই অন্ন কেশসংস্পর্শ-দূষিত ও শীতল দেখিয়া অশুচি বোধ করিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে অশুচি অন্ন দিলে, অতএব অন্ধ হইবেক। শাপ শুনিয়া পৌষ্য কহিলেন, অদুষ্ট অন্ন দূষিত কহিতেছ, অতএব তুমি নির্বংশ হইবে। তখন উতঙ্ক কহিলেন, অশুচি অন্ন আহার করিতে দিয়া পুনর্বার অভিশাপ দেওয়া উচিত নহে; তুমি বরং অন্ন প্রত্যক্ষ কর। অনন্তর পৌষ্য স্বচক্ষে সেই অন্নের অশুচিভাব প্রত্যক্ষ করিলেন।

এইরূপে সেই অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া পৌষ্য উতঙ্ককে অনুনয় করিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমি না জানিয়া এই কেশসংস্পর্শদূষিত শীতল অন্ন আনিয়াছি, অতএব ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; এই অনুগ্রহ করুন, যেন অন্ধ না হই। উতঙ্ক কহিলেন, আমার কথা মিথ্যা হয় না; অতএব এক বার অন্ধ হইয়া অতি ত্বরায় অন্ধত্বদোষ হইতে মুক্ত হইবে। আর তুমি আমাকে যে শাপ দিয়াছ, তাহা কিন্তু যেন না ফলে। পৌষ্য কহিলেন, আমি শাপসংবরণে সমর্থ নহি; এখন পর্যন্তও আমার

(৪৬) মনু কহেন, যে স্থলে বুদ্বুদশব্দ ও ফেনসম্বন্ধ না থাকে ও যাহা উষ্ণ না হয়, তাহাতেই আচমন করিবেক। আর আচমনজল হৃদয়পর্যন্ত গমন করিলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয়েন। যথা,

অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্ম্মবিৎ।
শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ। ২। ৬১।
হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিশ্চ ভূমিপঃ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ। ২। ৬২।

কোপোপশম হয় নাই। আপনি কি ইহা জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল; তাঁহার বাক্য তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের এই দুই বিপরীত; তাহার বাক্য নবনীত ও হৃদয় তীক্ষ্ণধার ক্ষুর। অতএব জাতিস্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণহৃদয়তাপ্রযুক্ত আমি শাপ অন্যথা করিতে পারি না। তখন উতঙ্ক কহিলেন, তুমি অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া আমার অনুনয় করিলে। পূর্বে কহিয়াছিলে, নির্দোষ অন্নকে দূষিত কহিতেছ, অতএব নির্বংশ হইবে, কিন্তু অন্ন যখন দোষসংযুক্ত প্রমাণ হইল, তখন আর আমাকে শাপ লাগিবেক না। এক্ষণে আমি চলিলাম। এই বলিয়া কুণ্ডল লইয়া উতঙ্ক প্রস্থান করিলেন।

উতঙ্ক পথিমধ্যে অবলোকন করিলেন, এক নগ্ন ক্ষপণক (৪৭) বারংবার দৃশ্য ও বারংবার অদৃশ্য হইয়া আগমন করিতেছেন। তদনন্তর সেই দুই কুণ্ডল ভূতলে রাখিয়া শৌচ-আচমনাদি উদককার্য আরম্ভ করিলেন। এই অবসরে সেই ক্ষপণক সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্বক পলায়ন করিল। উতঙ্ক উদককার্য সমাপন করিয়া শুচি ও সংযত হইয়া দেবগুরুপ্রণামপূর্বক অতি বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। এবং তক্ষক অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। সে, গৃহীত-মাত্র ক্ষপণকরূপ পরিত্যাগ করিয়া তক্ষকরূপ পরিগ্রহপূর্বক পৃথিবীতে অকস্মাৎ আবির্ভূত সম্মুখবর্তী মহাগর্তে প্রবিষ্ট হইল, এবং নাগলোকে প্রবেশ করিয়া স্বীয় আবাসে গমন করিল। উতঙ্ক পৌষ্যপত্নীর বাক্য স্মরণ করিয়া তক্ষকের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং প্রবেশমার্গ নিরর্গল করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সেই মহাগর্ত খনন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে এইরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়া, যাইয়া এই ব্রাহ্মণের সাহায্য কর, স্বীয় বজ্রকে এই আদেশ দিয়া তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। বজ্র দণ্ডকাষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া সেই গর্ত বিদীর্ণ করিয়া পথ প্রস্তুত করিলে, উতঙ্ক তদ্দ্বারা নাগলোকে প্রবিষ্ট হইলেন।

উতঙ্ক এইরূপে নাগলোকে প্রবেশ করিয়া অনেকবিধ শত শত প্রাসাদ, হর্ম্য, বলভী (৪৮), নির্যূহ (৪৯), এবং নানাবিধ ক্রীড়াভূমি ও আশ্চর্যস্থান অবলোকন করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে নাগগণের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

উতঙ্ক কহিলেন, ঐরাবত যে সকল সর্পের অধিপতি, এবং যাঁহারা যুদ্ধে অতিশয় শোভমান ও বিদ্যুদ্যুক্ত পবনপ্রেরিত মেঘসমূহের ন্যায় বেগগামী, তাঁহারা ও ঐরাবতোৎপন্ন অন্যান্য সুরূপ বহুরূপ বিচিত্র কুণ্ডলালঙ্কৃত সর্পেরা সূর্যের ন্যায় স্বর্গলোকে

---

(৪৭) কোনও গ্রন্থকার ক্ষপণকদিগকে বৌদ্ধ উদাসীন এবং কেহ কেহ জৈন উদাসীন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আনন্দগিরিকৃত শঙ্করদিগ্‌বিজয়ে লিখিত আছে, তাহারা কালের উপাসনা করিত।

(৪৮) গৃহচূড়া।

(৪৯) নাগদন্ত, অর্থাৎ গৃহাদির ভিত্তিনির্গত কাষ্ঠদ্বয়।

বিরাজমান আছেন। গঙ্গার উত্তরতীরে নাগদিগের যে বহুসংখ্যক বাসস্থান আছে, আমি তত্রত্য মহৎ নাগদিগকে নিরন্তর স্তব করি। ঐরাবতব্যতিরিক্ত আর কে সূর্যরশ্মিসমূহে ভ্রমণ করিতে পারে? যখন এই ধৃতরাষ্ট্র প্রস্থান করেন, তখন অষ্টাবিংশতি সহস্র অষ্ট নাগ তাঁহার অনুগামী হয়েন। যাঁহারা এই ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামী ও যাঁহারা দূরপথপ্রস্থিত, সেই সমস্ত ঐরাবতজ্যেষ্ঠভ্রাতাদিগকে প্রণাম করি। পূর্বকালে যাঁহার কুরুক্ষেত্রে ও খাণ্ডবে বাস ছিল, আমি কুণ্ডলের নিমিত্ত সেই নাগরাজ তক্ষকের স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন উভয়ে সর্বকালে পরস্পর সহচর হইয়া কুরুক্ষেত্রে ইক্ষুমতী নদীতীরে বাস করিয়াছিলেন, যে মহাত্মা তক্ষকপুত্র শ্রুতসেন নাগপ্রাধান্যলাভাকাঙ্ক্ষী হইয়া কুরুক্ষেত্রে সূর্যের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করি।

ব্রহ্মর্ষি উতঙ্ক এইরূপে নাগশ্রেষ্ঠদিগের স্তব করিয়াও কুণ্ডল না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। নাগগণের স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন না, তখন দেখিলেন, দুই স্ত্রী উত্তমবেমযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে, সেই তন্ত্রের সূত্র সকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহাও দেখিলেন, ছয় কুমার দ্বাদশ অরবিশিষ্ট এক চক্র পরিবর্তিত করিতেছে। আর এক পুরুষ ও সুন্দরাকার এক অশ্ব অবলোকন করিলেন। তখন তিনি বক্ষ্যমাণ প্রকারে তাহাদিগের সকলের স্তব করিতে লাগিলেন।

উতঙ্ক কহিলেন, এই আকল্পস্থায়ী নিত্যভ্রমণশীল চতুর্বিংশতিপর্বযুক্ত চক্রে ত্রিশত ষষ্টি তন্তুজাল অর্পিত আছে, ঐ চক্রকে ছয় কুমারে পরিবর্তিত করিতেছে। বিচিত্ররূপা দুই যুবতী শুক্ল কৃষ্ণ সূত্রসমূহ দ্বারা এক তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, তাঁহারাই সমস্ত ভূত ও চতুর্দশ ভুবন উৎপাদন করেন। যে বজ্রধারী, ভুবনপালক, বৃত্রহন্তা, নমুচিঘাতী, কৃষ্ণবর্ণবস্ত্রযুগলপরিধায়ী মহাত্মা লোকে সত্য ও অনৃত বিভক্ত করেন, এবং যিনি এই বিশ্বশরীর সৃজন করিয়া তাহাতে প্রতিবিম্বরূপে প্রবেশ করেন, সেই সকলভুবননিয়ন্তা ত্রিলোকনাথ পুরন্দরকে প্রণাম করি।

অনন্তর সেই পুরুষ উতঙ্ককে কহিলেন, আমি তোমার এই স্তবে প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার কি উপকার করিব, বল। উতঙ্ক কহিলেন, এই করুন, যেন সমস্ত নাগ আমার বশে আইসে। তখন সেই পুরুষ কহিলেন, এই অশ্বের অপানদেশে অগ্নি প্রদান কর। তদনুসারে উতঙ্ক সেই অশ্বের অপানে অগ্নিযোজনা করিলেন। এইরূপ করাতে অশ্বের সমুদায় শরীররন্ধ্র হইতে ধূমসহিত অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা নাগলোক উত্তাপিত হইলে, তক্ষক ব্যাকুল ও অগ্নির উত্তাপভয়ে বিষণ্ণ হইয়া, হস্তে কুণ্ডল লইয়া সহসা স্বীয় আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং উতঙ্ককে কহিলেন, কুণ্ডল গ্রহণ কর। উতঙ্ক কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্য উপাধ্যায়ানীর ব্রতদিবস, কিন্তু আমি অনেক দূরে আসিয়াছি, কি রূপে কার্যসিদ্ধি হইবেক।

উতঙ্ককে এইরূপ চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া সেই পুরুষ কহিলেন, উতঙ্ক! তুমি এই অশ্বে আরোহণ কর, এ তোমাকে ক্ষণকালমধ্যেই গুরুকুলে লইয়া যাইবেক। তদনুসারে

উতঙ্ক সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া উপাধ্যায়গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। উপাধ্যায়ানী স্নান করিয়া উপবেশনপূর্বক কেশসংস্কার করিতে করিতে উতঙ্ক আসিল না বলিয়া তাঁহাকে শাপ দিবার উদ্যম করিতেছেন, এই সময়ে তিনি উপাধ্যায়গৃহ প্রবেশপূর্বক উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদন করিয়া কুণ্ডল প্রদান করিলেন। উপাধ্যায়ানী কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! যথাকালে ও যথাযোগ্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, কেমন, সুখে আসিয়াছ? আমি ভাগ্যে অকারণে তোমাকে শাপ দি নাই। তোমার তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে, তুমি সিদ্ধি প্রাপ্ত হও।

অনন্তর উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীর নিকট বিদায় লইয়া উপাধ্যায়সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। উপাধ্যায় সর্বাগ্রে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! এত বিলম্ব হইল কেন? উতঙ্ক কহিলেন, মহাশয়! নাগরাজ তক্ষক কুণ্ডলা-হরণবিষয়ে বিষম বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল, তন্নিমিত্ত নাগলোকে গিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, দুই স্ত্রী তন্ত্রে বসিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছে, সেই তন্ত্রের সূত্র সকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ; আপনাকে জিজ্ঞাসা করি সে কি? আর দ্বাদশ-অরবিশিষ্ট এক চক্র দেখিলাম, ছয় কুমার ঐ চক্রকে পরিবর্তিত করিতেছে, সেই বা কি? আর এক পুরুষ ও মহাকায় এক অশ্ব দেখিলাম, তাহারাই বা কে? আর গমনকালে এক বৃষ দর্শন করিয়াছিলাম, ঐ বৃষে এক পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি সানুনয় বচনে কহিলেন, উতঙ্ক! এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে আমি তাঁহার কথানুসারে সেই বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ করিলাম, তিনিই বা কে? আমি আপনার নিকট এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি।

উতঙ্কের এইরূপ জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস! যে দুই স্ত্রী দেখিয়াছ, তাঁহারা জীব ও ঈশ্বর; আর শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ সূত্র সকল রাত্রি ও দিবা; যে দ্বাদশ-অরবিশিষ্ট চক্র ছয় কুমারে পরিবর্তিত করিতেছেন, সে চক্র সংবৎসর, ছয় কুমারেরা ছয় ঋতু; যে পুরুষ দেখিয়াছ, তিনি ইন্দ্র; যে অশ্ব, তিনি অগ্নি। আর পথে যাইবার সময় যে বৃষ দেখিয়াছিলে, তিনি কবিরাজ ঐরাবত; যে পুরুষ তদুপরি আরূঢ় ছিলেন, তিনি ইন্দ্র; আর সেই বৃষের যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত; উহা ভক্ষণ করিয়াছিলে, তাহাতেই তুমি নাগলোকে রক্ষা পাইয়াছ। ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তোমার ক্লেশদর্শনে অনুকম্পাপরবশ হইয়া তোমাকে এই অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই কুণ্ডল লইয়া পুনরাগত হইয়াছ। অতএব, প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, গৃহে গমন কর। তুমি সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।

উতঙ্ক উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তক্ষকের বৈরনির্যাতনসঙ্কল্প করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা জনমেজয়ের নিকট গমন করিলেন। রাজা পূর্বে তক্ষশিলা জয়ার্থ প্রস্থান করিয়া-

ছিলেন, তথায় সম্যক্ জয় লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। উতঙ্ক মন্ত্রিবর্গ-পরিবৃত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজাকে, জয়োঽস্তু, বলিয়া যথাবিধি আশীর্বাদ প্রয়োগ করিলেন। পরে অবসর বুঝিয়া সাধুশব্দালঙ্কৃত বাক্যে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! তুমি কর্তব্য কর্মে উপেক্ষা করিয়া বালকপ্রায় কর্মান্তরে ব্যাসক্ত হইয়া আছ।

রাজা জনমেজয় এইরূপ ব্রাহ্মণবাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধি অতিথিসৎকার সমাধান-পূর্বক কহিলেন, মহাশয়! আমার কর্তব্য কর্মে উপেক্ষা নাই, আমি প্রজাপালন দ্বারা ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রতিপালন করিতেছি। এক্ষণে আপনি কি উদ্দেশে আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। পুণ্যশীল উতঙ্ক মহাত্মা রাজার কথা শুনিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি যে কর্মে অনুরোধ করিব, তাহা তোমারই কার্য। যে দুরাত্মা তক্ষক তোমার পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছে, তুমি তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর। ঐ বৈধ কর্মের অনুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব মহারাজ! স্বীয় মহাত্মা পিতার বৈর নির্যাতন কর। দুরাত্মা তক্ষক বিনা অপরাধে তোমার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। সর্পকুলাধম তক্ষক বলদর্পে উদ্ধত হইয়া যে তোমার পিতাকে দংশন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর কি অকার্য হইতে পারে? ধন্বন্তরি রাজর্ষিবংশরক্ষাকর্তা দেবতুল্য রাজার প্রাণরক্ষার্থে আসিতেছিলেন, ঐ পাপাত্মাই তাঁহাকে নিবৃত্ত করে। (৫০) অতএব মহারাজ! অবিলম্বে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপিষ্ঠকে প্রজ্বলিত হুতাশনমুখে আহুতি প্রদান কর। ইহা করিলেই পিতার বৈরনির্যাতন করা হইবেক এবং আনুষঙ্গিক আমারও মহত্তর অভীষ্ট সম্পন্ন হইবেক। মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা আহরণার্থে যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহাতে ঐ দুরাত্মা যৎপরোনাস্তি বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল।

সৌতি কহিলেন, রাজা জনমেজয় শুনিয়া তক্ষকের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন। যেমন হবিঃ প্রয়োগ করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইপ্রকার উতঙ্কবাক্যরূপ হবিঃপ্রক্ষেপ দ্বারা রাজার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন রাজা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া উতঙ্কের সমক্ষেই মন্ত্রীদিগকে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তিবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র জনমেজয় উতঙ্কমুখে পিতার মৃত্যুবৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়—পৌলোমপর্ব

সৌতি কহিলেন, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে যে সমস্ত ঋষি সমাগত হইয়াছিলেন, সূতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণপুত্র পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ পুরাণকীর্তন দ্বারা তাঁহাদের চিত্তরঞ্জন করিতেছিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন,

(৫০) শমীক মুনির পুত্র রাজা পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত করিলে তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিতে যাইতেছিল, ধন্বন্তরি তাহা জানিতে পারিয়া বিষচিকিৎসা দ্বারা রাজার প্রাণরক্ষার্থে গমন করিতে-ছিলেন। পথিমধ্যে তক্ষক তাঁহার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট ধনদানাদি দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করে।

হে মহর্ষিগণ! রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রানুষ্ঠানের কারণান্তরস্বরূপ উতঙ্কচরিত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলাম; এক্ষণে আপনারা আর কি শুনিতে বাসনা করেন? আজ্ঞা করুন, আর কি বর্ণনা করিব।

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণপুত্র! আমরা শ্রবণবাসনাপরবশ হইয়া কথাপ্রসঙ্গ-ক্রমে যে যে বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তৎসমুদায় বর্ণন করিবে। এক্ষণে কুলপতি শৌনক অগ্নিগৃহে অবস্থিত আছেন; তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, সর্প, ও গন্ধর্ব ঘটিত অলৌকিক তাবৎ বৃত্তান্ত জানেন; তিনি বিদ্বান্, কার্যদক্ষ, ব্রতপরায়ণ, বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় গুরু, সত্যবাদী, শান্তচিত্ত, তপস্যারত; তিনি আমা-দিগের সকলের গুরু, মহামান্য, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা কর। তিনি পরমপূজিত আসনে আসীন হইয়া যাহা জিজ্ঞাসিবেন, তাহাই কহিবে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তাহাই ভাল, সেই মহাত্মা আসন পরিগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসিলেই পরম পবিত্র বহুবিধ কথা কীর্তন করিব। অনন্তর বিপ্রকুলতিলক মহর্ষি শৌনক যথাবিধি দেবযজ্ঞ পিতৃতর্পণ প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া সমাপন করিয়া, যে স্থানে উগ্রশ্রবাঃ ও ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ উপবিষ্ট ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়—পৌলোমপর্ব

শৌনক কহিলেন, হে সূতপুত্র! তোমার পিতা, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমীপে, সমস্ত পুরাণ ও আদ্যোপান্ত ভারত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমিও সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছ, সন্দেহ নাই। পুরাণে সমুদায় অলৌকিক কথা ও সমস্ত আদিবংশের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে; তন্মধ্যে প্রথমতঃ আমি ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি। তুমি সেই কথা কীর্তন কর, আমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিব।

এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সূতপুত্র উগ্রশ্রবাঃ নিবেদন করিলেন, বৈশম্পায়ন প্রভৃতি মহানুভব দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ পূর্বকালে সম্যক্ রূপে যাহা অধ্যয়ন ও কীর্তন করিয়াছিলেন, আমার পিতা যাহা অধ্যয়ন করেন, এবং পরে আমি তাঁহার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই সমস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভৃগুবংশ ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণের ও অশেষ ঋষিকুলের পূজনীয়; পুরাণে সেই বিখ্যাত বংশের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা আমি যথাবৎ কীর্তন করিতেছি। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ করিতেছিলেন; আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্ ভৃগু সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে উৎপন্ন হন। ভৃগুর পুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র পরমধার্মিক প্রমতি; ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরু নামে এক পুত্র জন্মেন। প্রমদ্বরাগর্ভে রুরুর শুনকনামা পুত্র জন্মিলেন। তিনিই তোমার কুলের প্রধান পুরুষ। তিনি ধার্মিক, বেদপারগ, তপস্বী, যশস্বী, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ, সত্যবাদী, ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।

শৌনক কহিলেন, হে সূতপুত্র ! মহাত্মা ভৃগুনন্দন চ্যবন নামে বিখ্যাত হইলেন কেন, তুমি তাহার সবিশেষ বর্ণনা কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভগবান্ ভৃগুর পুলোমা নামে ভুবনবিখ্যাতা প্রেয়সী ধর্মপত্নী ছিলেন। তাঁহার সহযোগে পুলোমা গর্ভবতী হইলেন। এক দিবস, পরমধার্মিক ভৃগু স্নানার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলে, পুলোমা নামে এক রাক্ষস তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রমপ্রবেশানন্তর পরমসুন্দরী ভৃগুপত্নীকে নয়নগোচর করিয়া কামাবিষ্ট ও বিচেতন হইল। চারুদর্শনা পুলোমা তপোবনসুলভ ফলমূলাদি দ্বারা সেই অভ্যাগত রাক্ষসের যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন। রাক্ষস মন্মথশরপ্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়া, এই কামিনীকে হরণ করিব, এই নিশ্চয় করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইল। পুলোমা অগ্রে ঐ চারুহাসিনী কন্যাকে, মমেয়ং ভার্য্যা, বলিয়া বরণ করিয়াছিল, পশ্চাৎ তাঁহার পিতা তাঁহাকে শাস্ত্রবিধানানুসারে ভৃগুকে প্রদান করেন। এই অবমাননা অনুক্ষণ তাহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। এক্ষণে অবসর পাইয়া হরণ করিবার মানস করিল।

রাক্ষস এইরূপে পুলোমাহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিল, এবং প্রজ্বলিত হুতাশনসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে পাবক! তুমি দেবতাদিগের মুখ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যথার্থ বল, এই কামিনী কাহার ভার্যা ? আমি এই বরবর্ণিনীকে অগ্রে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলাম, পরে ইহার পিতা অধর্মকারী ভৃগুকে দান করেন। অতএব এই নির্জনবাসিনী নিতম্বিনী যদি ভৃগুর ভার্যা হয় বল, ইহাকে আমি আশ্রম হইতে হরণ করিবার মানস করিয়াছি। ভৃগু যে আমার পূর্ববৃতা রূপবতী ভার্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই ক্রোধানল অদ্যাপি আমার হৃদয় দাহ করিতেছে।

দুরাত্মা রাক্ষস জ্বলিত অগ্নিকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া, ভৃগুভার্যাবিষয়ে সন্দিহান হইয়া, বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, হে হুতাশন! তুমি সর্বকাল সর্বভূতের অন্তরে পুণ্যপাপের সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত আছ ; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, যথার্থ বল, পাপকারী ভৃগু আমার যে পূর্ববৃতা কন্যাকে অপহরণ করিয়াছিল, এই সেই কামিনী আমার ভার্যা কি না ? তোমার নিকট ইহার তত্ত্বার্থ শ্রবণ করিয়া তোমার সমক্ষেই ভৃগুভার্যাকে আশ্রম হইতে হরণ করিব।

রাক্ষসের এইরূপ জিজ্ঞাসা শুনিয়া, অগ্নি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং এক পক্ষে মিথ্যাকথন, পক্ষান্তরে ভৃগুশাপ, উভয় ভয়ে ভীত হইয়া অনুদ্ধত স্বরে কহিলেন, হে দানবনন্দন! তুমি পূর্বে ইহাকে বরণ করিয়াছিলে, যথার্থ বটে, কিন্তু তৎকালে তোমার মন্ত্রপ্রয়োগ ও বিধিপূর্বক বরণ করা হয় নাই। ইহার পিতা সৎপাত্র-লোভাক্রান্ত হইয়া ভৃগুকে দান করিয়াছেন, তোমাকে দেন নাই। মহর্ষি ভৃগুও বেদদৃষ্ট বিধি ও পরম্পরাগত প্রণালী অনুসারে আমাকে সাক্ষী করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি তুমি পূর্বে বরণ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত ইনি

তোমারই ভার্যা। আমি মিথ্যা কহিতে পারিব না, লোকে কোনও কালে মিথ্যার আদর নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়—পৌলোমপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাক্ষস অগ্নির এইরূপ বাক্য শুনিয়া বরাহরূপ ধারণপূর্বক ভৃগু-পত্নীকে হরণ করিয়া অদ্ভুত বেগে পলায়ন করিল। তখন পুলোমার গর্ভস্থ বালক পাপাত্মা রাক্ষসের অত্যাচার দর্শনে রোষপরবশ হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হইলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম চ্যবন হইল। রাক্ষস সেই সূর্যতুল্য তেজস্বী মাতৃগর্ভবিনিঃসৃত শিশুকে নয়নগোচর করিবামাত্র পুলোমা পরিত্যাগপূর্বক ভস্মসাৎ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

অনন্তর পুলোমা, ভৃগুর ঔরস পুত্র চ্যবনকে ক্রোড়ে করিয়া সর্বদুঃখবিনির্মুক্তা হইয়া, অশ্রুমুখে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সর্বলোকপ্রশংসিতা ভৃগুভার্যাকে রোদনপরায়ণা ও অশ্রুপূর্ণনয়না অবলোকন করিয়া তৎসমীপে আগমন-পূর্বক অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। নিতান্ত দুঃখিতা ভৃগুপত্নী রোদন করিতে করিতে যেমন প্রস্থান করিতে লাগিলেন, তাঁহার অশ্রুবিন্দুবর্ষণ দ্বারা এক মহানদী উৎপন্ন হইল। ভগবান্ প্রজাপতি সেই নদীকে পুত্রবধূর অনুসরণে প্রবৃত্তা দেখিয়া তাহার নাম বধূসরা রাখিলেন। প্রতাপশালী ভৃগুপুত্র চ্যবন নামে বিখ্যাত হইবার এই কারণ।

পুলোমা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া এইরূপে আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি ভৃগু স্নানক্রিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় সহধর্মিণী ও তনয়কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া, কোপাকুল চিত্তে পুলোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে চারুহাসিনি! হরণোদ্যত দুরাত্মা রাক্ষসের নিকট কে তোমার পরিচয় দিল? সে পাপিষ্ঠ তোমাকে আমার ভার্যা বলিয়া জানিত না। তুমি সবিশেষ সমস্ত বল; আমি এখনি তাহাকে শাপ দিতেছি। কোন্ ব্যক্তি আমার শাপে ভীত নহে? কাহার এই দুষ্ট কর্ম করিতে সাহস হইল?

এইরূপে স্বামিকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুলোমা নিবেদন করিলেন, ভগবন্! অগ্নি সেই রাক্ষসের নিকট আমার পরিচয় প্রদান করেন, তৎপরে সেই পাপাত্মা আমাকে হরণ করে। আমি অনাথার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম; পরে তোমার এই পুত্রের প্রভাবে রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি; দুরাত্মা নিশাচর ইহার তেজে ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ভৃগু পুলোমাবাক্যশ্রবণে অতিক্রুদ্ধ হইয়া, তুমি সর্বভক্ষ হইবে, এই বলিয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়—পৌলোমপর্ব

অগ্নি ভৃগুদত্ত শাপ শ্রবণে জাতক্রোধ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি কারণে তুমি সহসা আমাকে শাপ দিলে? জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য

কহিয়াছি, ইহাতে আমার অপরাধ কি? আমি ধর্ম প্রতিপালন করিয়াছি ও পক্ষপাতবিহীন হইয়া সত্য কহিয়াছি। যে সাক্ষী, জিজ্ঞাসিত হইয়া, জানিয়াও অন্যথা কহে, সে স্বকুলজাত উর্ধ্বতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে নিরয়গামী করে; আর যে ব্যক্তি উপস্থিত কার্যের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও না কহে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয়। যাহা হউক, আমিও তোমাকে শাপ দিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণকে মান্য করি, এজন্য ক্ষান্ত হইলাম। তুমি সমুদায় জান, তথাপি কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যোগবলে আত্মাকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া মূর্তিভেদে অগ্নিহোত্র, গর্ভাধান, জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া সমুদায়ে অধিষ্ঠিত আছি; বেদোক্ত বিধান অনুসারে আমাতে যে হবিঃ হুত হয়, তদ্দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হয়েন; হূয়মান সোমরস প্রভৃতি দ্রব্য যাবতীয় দেবগণ ও পিতৃগণের শরীররূপে পরিণত হয়। দেবগণ ও পিতৃগণ, উভয়ের উদ্দেশে দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ একত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত দেবগণ ও পিতৃগণ অভিন্নস্বরূপ, পর্বকালে কখন একত্র ও কখন বা পৃথক্‌ভাবে পূজিত হয়েন। আমাতে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, দেবতা ও পিতৃগণ তাহা ভক্ষণ করেন, অতএব আমি দেবতাদিগের ও পিতৃগণের মুখ। অমাবস্যাতে পিতৃগণকে ও পূর্ণিমাতে দেবতাদিগকে উদ্দেশ করিয়া লোকে আমার মুখে আহুতি প্রদান করে, তাঁহারাও আমার মুখেই ভক্ষণ করেন।

ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া অগ্নি দ্বিজগণের অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞক্রিয়া হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অগ্নি অন্তর্ধান করাতে প্রজাগণ, ওঙ্কার, বষট্‌কার, স্বধা, স্বাহা শূন্য হইয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তদ্দর্শনে ঋষিগণ উদ্বিগ্ন চিত্তে দেবতাদিগের নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন, হে দেবগণ! অগ্নির অন্তর্ধানবশতঃ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া লোপ হওয়াতে লোকত্রয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে; অতএব যাহা কর্তব্য হয়, বিধান করুন, কালাতিপাতের সময় নাই। অনন্তর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া অগ্নির শাপ ও তন্নিবন্ধন ক্রিয়ালোপের বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ভৃগু কোনও কারণবশতঃ অগ্নিকে শাপ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি দেবতাদিগের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগভোক্তা হইয়া কি রূপে সর্বভক্ষ হইবেন? সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের নিবেদন শুনিয়া অগ্নিকে আহ্বানপূর্বক মনোহর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি সর্বলোকের কর্তা ও সংহর্তা; তুমি ত্রিলোক ধারণ করিয়া আছ; তুমি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াপ্রবর্তক; হে লোকনাথ! এক্ষণে যাহাতে ক্রিয়ালোপ না হয়, তাহা কর। তুমি ঈশ্বর হইয়া এমন বিমূঢ় হইতেছ কেন? তুমি সর্ব লোকে সর্ব কাল পবিত্র; তুমি সর্ব ভূতের গতি। অতএব তুমি সর্ব শরীরে সর্বভক্ষ হইবে না। তোমার অপানদেশে যে সকল শিখা আছে, তাহারাই সর্ব বস্তু ভক্ষণ করিবেক এবং তোমার মাংসভক্ষণী যে তনু আছে, সেই সর্বভক্ষ হইবেক। যেমন সূর্যকিরণসংস্পর্শে সর্ব বস্তু শুচি হয়, সেইরূপ তোমার শিখাসমূহ দ্বারা দগ্ধ হইয়া সর্ব বস্তু শুচি হইবেক। হে পাবক! তুমি পরম তেজঃপদার্থ, স্বীয় প্রভাবে নির্গত হইয়াছ; এক্ষণে স্বীয়

তেজঃ দ্বারাই ঋষির শাপকে সত্য কর, এবং তোমার মুখে আহুতিরূপে প্রদত্ত দেবভাগ ও আত্মভাগ গ্রহণ কর।

অগ্নি পিতামহবাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া তদীয় আদেশ প্রতিপালনার্থে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ হৃষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। ঋষিগণ পূর্ব্ববৎ সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। দেবলোকে দেবগণ ও পৃথিবীতে যাবতীয় ভূতগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অগ্নিও শাপবিমুক্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

ভগবান্ অগ্নি এইরূপে পূর্ব্বকালে ভৃগু হইতে শাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অগ্নিশাপসম্বন্ধ পূর্ব্বকালীন ইতিহাস, পুলোমা রাক্ষসের বিনাশ, ও চ্যবনের উৎপত্তি কীর্তিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়—পৌলোমপর্ব

সূত কহিলেন, ভৃগুপুত্র চ্যবনের ঔরসে সুকন্যাগর্ভে প্রমতি নামে অতি তেজস্বী তনয় উৎপন্ন হইলেন। প্রমতিও ঘৃতাচীগর্ভে রুরুনামক এবং রুরুও প্রমদ্বরাগর্ভে শুনক-নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই সুপ্রসিদ্ধ মহাতেজাঃ রুরুর আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিব, হে ঋষিপ্রবর শৌনক! শ্রবণ করুন।

পূর্ব কালে স্থূলকেশনামা সর্বভূতহিতকারী তপঃপরায়ণ বিদ্যাবান্ এক মহর্ষি ছিলেন। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুসহযোগে মেনকানাম্নী অপ্সরা গর্ভবতী হইয়াছিল। নির্লজ্জা নির্দয়া মেনকা, যথাকালে স্থূলকেশের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তথায় গর্ভ পরিত্যাগপূর্বক নদীতীরে প্রস্থান করিল। সেই গর্ভে এক পরম সুন্দরী কন্যা জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি স্থূলকেশ তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই দেবকন্যাসদৃশী সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে অসহায়িনী পরিত্যক্তা দেখিয়া, অত্যন্ত করুণাবিষ্ট হইলেন, তাহাকে কন্যাস্বরূপে পরিগ্রহ করিয়া স্বসন্তাননির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং যথাক্রমে বিধি-পূর্বক তাহার জাতকাদি সমস্ত ক্রিয়া নির্বাহ করিলেন। কন্যা সেই শুভপ্রদ আশ্রম-পদে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই কন্যাকে রূপে, গুণে, ও শীলে সকল প্রমদা অপেক্ষা বরা অর্থাৎ উত্তমা দেখিয়া, মহর্ষি তাহার নাম প্রমদ্বরা রাখিলেন।

এক দিবস প্রমতিনন্দন রুরু আশ্রমবাসিনী প্রমদ্বরাকে নয়নগোচর করিয়া মদনবাণে আহত হইলেন, এবং নিজ মনোরথ স্বীয় প্রিয়বয়স্য দ্বারা আত্মপিতার গোচর করিলেন। তদনুসারে প্রমতি স্থূলকেশসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আপন পুত্রার্থে সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। স্থূলকেশ ফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহের দিন স্থির করিয়া রুরুকে প্রমদ্বরা প্রদান করিলেন।

বিবাহের কিছু পূর্বে, এক দিন প্রমদ্বরা সখীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছিল। তাহার ক্রীড়াস্থানে এক সর্প সুপ্ত পতিত ছিল। আসন্নমরণা প্রমদ্বরা অজ্ঞাতসারে সেই সর্পের উপর পদার্পণ করিল, এবং সর্প কুপিত হইয়া বিষাক্ত দশন দ্বারা দংশন করিবা-

মাত্র, বিশ্রী, বিবর্ণা, বিচেতনা ও মুক্তকেশা হইয়া ভূতলে পতিতা হইল। তদ্দর্শনে তদীয় বন্ধুগণ নিরানন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু সে গতজীবনা ও হতশ্রী হইয়াও পুনর্বার রমণীয়দর্শনা হইয়া সুপ্তার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ফলতঃ, প্রমদ্বরা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোহরা হইল।

এইরূপে ভূতলপতিতা গতপ্রাণা প্রমদ্বরাকে সেই অবস্থায় তাহার পিতা ও অন্যান্য তপস্বিগণ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, শঙ্খমেখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, ভরদ্বাজ, কৌণকুৎস্য, আর্ষ্টিষেণ, গৌতম ও পুত্রসহিত প্রমতি ও অন্যান্য বনবাসী তপস্বিগণ অনুকম্পাপরবশ হইয়া তথায় সমাগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে ভুজঙ্গবিষপ্রভাবে কালগ্রাসপতিতা দেখিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। রুরু তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নবম অধ্যায়—পৌলোমপর্ব

সৌতি কহিলেন, সেই সমস্ত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ তথায় উপবিষ্ট রহিলেন, রুরু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গহন বন প্রবেশপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি শোকাভিভূত হইয়া কাতর বচনে বহুতর বিলাপ করত প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, আমার ও বান্ধবগণের শোকোদ্দীপনকারিণী সেই কৃশাঙ্গী ভূশয্যায় শয়ন করিয়া আছে; যদি আমি দান, তপস্যা, বা গুরুজনের আরাধনা করিয়া থাকি, তৎফলে আমার প্রিয়া পুনর্জীবিতা হউক; আমি জন্মাবধি সংযত হইয়া নানা ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে সেই পুণ্যবলে সর্বাঙ্গসুন্দরী প্রমদ্বরা অবিলম্বে মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক।

এইরূপে অরণ্যমধ্যে রুরুকে ভার্যার্থে দুঃখিত ও বিলাপপরায়ণ অবলোকন করিয়া, দেবদূত তৎসমীপে আগমনপূর্বক কহিলেন, হে ধর্মাত্মন্ রুরো! তুমি দুঃখিত হইয়া যাহার বাসনা করিতেছ, তাহা অসম্ভব; মনুষ্য মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে পুনর্জীবিত হয় না। গন্ধর্বের ঔরসে অপ্সরার গর্ভসম্ভূতা এই কন্যার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। অতএব বৎস! বৃথা শোকে অভিভূত হইও না। কিন্তু দেবতারা পূর্বে ইহার এক উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যদি তাহা কর, পুনর্বার প্রমদ্বরাকে পাইতে পার। রুরু কহিলেন, হে দেবদূত! দেবতারা কি উপায় নির্ধারিত করিয়াছেন, যথার্থ বল; আমি শুনিবামাত্র তদনুযায়ী কার্য করিব; বিলম্ব করিও না, ত্বরায় ব্যক্ত করিয়া আমার পরিত্রাণ কর। দেবদূত কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! তুমি স্বভার্যা প্রমদ্বরাকে স্বীয় আয়ুর অর্ধ ভাগ প্রদান কর, তাহা হইলেই সে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইবেক। রুরু কহিলেন, আমি প্রমদ্বরাকে আয়ুর অর্ধ প্রদান করিতেছি, সে পুনর্জীবিত হউক। তখন গন্ধর্বরাজ ও দেবদূত উভয়ে ধর্মরাজের নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন, হে ধর্মরাজ! যদি আপনি

অনুমতি করেন, তবে রুরুভার্যা প্রমদ্বরা তদীয় অর্ধ আয়ু প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জীবিতা হয়। ধর্মরাজ কহিলেন, হে দেবদূত! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, প্রমদ্বরা রুরুর অর্ধ আয়ু পাইয়া পুনর্জীবিতা হউক। দেবরাজ এইরূপ কহিবামাত্র বরবর্ণিনী প্রমদ্বরা রুরুর অর্ধ আয়ু লাভ করিয়া সুপ্তোত্থিতার ন্যায় মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল।

ভবিষ্যবৃত্তান্তে দৃষ্ট হইয়াছে যে, ভার্যার্থে মহাতেজস্বী রুরুর এইরূপে অর্ধ আয়ু লুপ্ত হইয়াছিল।

এইরূপে রুরুর অর্ধ আয়ু লাভ দ্বারা প্রমদ্বরার পুনর্বার জীবনপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহাদের পিতারা পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া শুভ দিবসে উভয়ের উদ্বাহবিধি সমাধান করিলেন, তাঁহারাও পরস্পর হিতৈষী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রুরু এবম্প্রকারে দুর্লভা ভার্যা লাভ করিয়া সর্পকুলধ্বংসার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সর্পদর্শনমাত্র কোপপরতন্ত্র হইয়া শস্ত্রপ্রহার দ্বারা তাহার প্রাণসংহার করেন। এইরূপে সর্পবধপ্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া এক দিবস মহাবন প্রবেশপূর্বক অবলোকন করিলেন, এক অতি বৃদ্ধ জীর্ণকায় ডুণ্ডুভ শয়ন করিয়া আছে। তিনি কালদণ্ডসম দণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইবামাত্র ডুণ্ডুভ কহিল, হে তপোধন! আমি তোমার কোনও অপরাধ করি নাই; তুমি কেন অকারণে রোষাবেশপরবশ হইয়া আমার প্রাণবধের উদ্যম করিতেছ?

দশম অধ্যায়—পৌলোমপর্ব

রুরু কহিলেন, হে উরগ! এক দুষ্ট ভুজঙ্গ আমার প্রাণসমা ভার্যাকে দংশন করিয়াছিল, তদবধি আমি এই অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, দর্শনমাত্র সর্পের প্রাণদণ্ড করিব। সেই নিমিত্ত অদ্য আমি তোমার প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইয়াছি। ডুণ্ডুভ কহিল, হে তপোধন! যাহারা মনুষ্যকে দংশন করে, সে সকল সর্প স্বতন্ত্র, ডুণ্ডুভেরা সে জাতি নহে; অতএব সর্পের নাম গন্ধ পাইয়া বিনা অপরাধে ডুণ্ডুভদিগের প্রাণহিংসা করা তোমার উচিত নহে। আক্ষেপের বিষয় এই, ডুণ্ডুভদিগের প্রবৃত্তি ও সুখভোগ অন্যান্য সর্পের সমান নহে; কিন্তু অনর্থঘটনা ও দুঃখভোগের সময় সমানভাগী। যাহা হউক, তুমি ধর্মজ্ঞ হইয়া হতভাগ্য ডুণ্ডুভদিগের প্রাণহিংসা করিও না।

রুরু সর্পের এই যুক্তিযুক্ত কাতর উক্তি শ্রবণে তাহাকে ডুণ্ডুভ নিশ্চয় করিয়া তাহার প্রাণবধ করিলেন না। অনন্তর প্রশান্ত বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভুজগ! তুমি কে, কি নিমিত্তই বা তুমি সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ, বল। ডুণ্ডুভ কহিল, পূর্ব কালে আমি সহস্রপাদ নামে ঋষি ছিলাম, পরে ব্রহ্মশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা শুনিয়া রুরু কহিলেন, হে ডুণ্ডুভ! ব্রাহ্মণ কি কারণে কুপিত হইয়া তোমাকে শাপ দিয়াছেন, এবং আর কত কালই বা তোমাকে এই কলেবরে কালযাপন করিতে হইবেক, ইহার সবিশেষ শুনিতে বাসনা করি।

একাদশ অধ্যায়—পৌলোমপর্ব

ডুণ্ডুভ কহিল, পূর্ব কালে খগম নামে এক সত্যবাদী তপোবীর্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণ আমার বাল্যকালের সখা ছিলেন। এক দিবস তিনি অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানে সাতিশয় ব্যাসক্ত আছেন, এমন সময়ে আমি, বালস্বভাবসুলভ কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, তৃণ দ্বারা এক ভুজঙ্গ নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিলাম। তিনি মূর্ছিত হইলেন, কিন্তু চেতনাপ্রাপ্তি হইলে কোপানলে দগ্ধ হইয়া কহিলেন, আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যাদৃশ নির্বীর্য সর্প নির্মাণ করিয়াছ, আমার শাপে তুমি তাদৃশ সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। আমি তাঁহার তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলাম ; অতএব অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া প্রণতিপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলাম, ভ্রাতঃ! আমি সখা বলিয়া পরিহাস করিবার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে এই কর্ম করিয়াছি, এক্ষণে ক্ষমা করিয়া শাপ নিবারণ কর।

খগম আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া মুহুর্মুহুঃ উষ্ণনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্বক ব্যাকুল চিত্তে কহিলেন, দেখ, আমি যাহা কহিয়াছি, কোনও ক্রমেই তাহার অন্যথা হইবেক না ; তবে এখন যাহা কহি, অবধানপূর্বক শ্রবণ করিয়া সর্ব কাল স্মরণ করিয়া রাখিবে। মহর্ষি প্রমতির রুরু নামে এক পরম পবিত্র পুত্র জন্মিবেন, তাঁহার দর্শনে তোমার শাপমোচন হইবেক। আপনি রুরু নামে খ্যাত ও প্রমতিরও আত্মজ বটেন। আপনার দর্শন পাইয়াছি, এক্ষণে স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে হিতোপদেশ দিতেছি, শ্রবণ করুন।

শাপভ্রষ্ট সহস্রপাদ ইহা কহিয়া ডুণ্ডুভরূপ পরিত্যাগপূর্বক পুনর্বার স্বীয় ভাস্বর স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, হে মহাপ্রভাব রুরো! অহিংসা পরম ধর্ম, অতএব ব্রাহ্মণের কখনও প্রাণিহিংসা করা উচিত নহে। বেদের আদেশ এই যে, ব্রাহ্মণ সদা প্রশান্তচিত্ত, বেদবেদাঙ্গবেত্তা, ও সর্বভূতের অভয়প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্যকথন, ক্ষমা, ও বেদধারণ ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ধর্ম অবলম্বন করা বিধেয় নহে ; দণ্ডধারণ, উগ্রস্বভাবতা, ও প্রজাপালন এ সকল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। পূর্বে জনমেজয়ের যজ্ঞে সর্পকুলের হিংসা আরম্ভ হইয়াছিল। অবশেষে, তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন বেদবেদাঙ্গপারগ দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক মহাশয় হইতে ভয়ার্ত সর্পদিগের পরিত্রাণ হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়—পৌলোমপর্ব

রুরু কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! কি নিমিত্ত রাজা জনমেজয় সর্পহিংসা করিয়াছিলেন, কি নিমিত্তই বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধীমান্ আস্তীক তাহাদিগের পরিত্রাণ করিলেন, আমি তাহা সবিস্তর শুনিতে বাসনা করি। আপনি ব্রাহ্মণদিগের প্রমুখাৎ মহাফলপ্রদ আস্তীক-চরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবেন, আমার যাইবার ত্বরা আছে, এই বলিয়া সেই ঋষি যোগবলে অন্তর্হিত হইলেন। রুরু আশ্চর্য বোধ করিয়া অন্তর্হিত ঋষির অন্বেষণে

সমস্ত বন ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং সেই ঋষির বাক্য বারংবার চিন্তা করিতে করিতে কিয়ৎ ক্ষণ অচেতনপ্রায় হইয়া রহিলেন। অনন্তর লব্ধচেতন হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্বক নিজজনকসন্নিধানে সমুদায় নিবেদন করিলে, তিনি তাঁহাকে সম্পূর্ণ আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করাইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! রাজাধিরাজ জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পসত্রানুষ্ঠান দ্বারা সর্পকুল সংহার করিয়াছিলেন, কি নিমিত্তই বা জিতেন্দ্রিয়াগ্রগণ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক মহাশয় প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে ভুজগগণের পরিত্রাণ করেন, তাহা সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর। আর যে রাজা সর্পসত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি কাঁহার পুত্র, এবং ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণই বা কাহার তনয়, তাহাও তুমি আমার নিকট কীর্তন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজবর! আমি আপনকার নিকট মহাফলপ্রদ আস্তীকোপাখ্যান আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শৌনক কহিলেন, হে সূতকুলতিলক! যশস্বী পুরাণ ঋষি আস্তীক মহাশয়ের মনোরম আখ্যান সবিস্তর শুনিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা জন্মিয়াছে। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিবর! আমার পিতা ব্যাসশিষ্য মেধাবী লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত সর্বপাপক্ষয়কারী এই ইতিহাস শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহর্ষি আস্তীকের পিতা জরৎকারু সাক্ষাৎ প্রজাপতিতুল্য ব্রহ্মচারী বিষয়বাসনাশূন্য কঠোরতপস্যারত ঊর্ধ্বরেতাঃ যাযাবরাগ্রগণ্য (৫১) ধর্মজ্ঞ ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন। সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহাত্মা যত্রসায়ংগৃহ (৫২) হইয়া তীর্থপর্যটন ও তীর্থস্নান করত পৃথিবীমণ্ডল ভ্রমণ করিতেন। এইরূপে বহু কাল বায়ুভক্ষ, নিরাহার, শুষ্ককলেবর, ও বীতনিদ্র হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্বক দুঃসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান করেন।

এক দিবস জরৎকারু পর্যটনক্রমে কোনও স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পূর্বপুরুষদিগকে ঊর্ধ্বপাদ অধঃশিরাঃ মহাগর্তে লম্বমান অবলোকন করিলেন। তদ্দর্শনে অনুকম্পাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে, কি নিমিত্ত উশীরস্তম্বমাত্র অবলম্বন করিয়া অবাঙ্মুখে লম্বমান আছেন? এই গর্তে গূঢ়বাসী এক মূষিক আপনাদিগের অবলম্বিত উশীরস্তম্বের মূল প্রায় সমুদায় ভক্ষণ করিয়াছে। পিতৃগণ কহিলেন, আমরা যাযাবর নামে ঋষি, বংশলোপের উপক্রম হওয়াতে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা অতি হতভাগ্য, আমাদিগের জরৎকারু নামে এক সন্তান আছে, সেই মূঢ়মতি হতভাগ্য সংসারাশ্রমবিমুখ হইয়া কেবল তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছে,

(৫১) যে তপস্বীদিগের নিয়মিত বাসস্থান নাই, নিয়ত স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাদের নাম যাযাবর।

(৫২) যত্রসায়ংগৃহ, যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হয়, সেই গৃহ অর্থাৎ তথায় অবস্থিতি করে।

পুত্রোৎপাদনার্থে দারপরিগ্রহ করিতেছে না। সুতরাং বংশলোপ উপস্থিত হওয়াতে মহাগর্তে লম্বমান হইয়া আছি। আমরা জরৎকারুরূপ নাথ সত্ত্বেও অনাথ ও পাপাত্মার ন্যায় হইয়াছি। যাহা হউক, তুমি কে, কি নিমিত্ত আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া অনুশোচন ও অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছ ?

জরৎকারু পূর্বপুরুষদিগের এইরূপ কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া নিবেদন করিলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা আমার পূর্বপুরুষ, আমারই নাম জরৎকারু, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবেক। পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! বংশরক্ষণে এবং তোমার ও আমাদিগের পারলৌকিক মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ হও। পুত্রবান্ লোকদিগের যেরূপ সদ্গতি লাভ হয়, ধর্মফল ও চিরসঞ্চিত তপোবল দ্বারা তাদৃশ হয় না। অতএব তুমি আমাদিগের নিয়োগানুসারে দারপরিগ্রহে ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ ও মনোযোগী হও, তাহা হইলেই আমাদিগের পরম মঙ্গল। জরৎকারু কহিলেন, আমি কদাপি ভোগাভিলাষে দারপরিগ্রহ ও ধনোপার্জন করিব না, কেবল আপনাদিগের হিতার্থে দারপরিগ্রহে সম্মত হইলাম। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি কন্যা আমার সনাম্নী হয় ও তাহার বন্ধুগণ স্বেচ্ছাপূর্বক ভিক্ষাস্বরূপ দান করিতে চাহেন, তবেই আমি যথাবিধানে তাহার পাণিগ্রহণ করিব। কিন্তু আমি দরিদ্র, কোন্ ব্যক্তি দেখিয়া শুনিয়া আমাকে কন্যাদান করিবেক। তবে ভিক্ষাস্বরূপ যদি কেহ দান করিতে চাহে, আমি প্রতিগ্রহ করিতে অসম্মত নহি। হে পিতামহগণ! এই নিয়মে আমি দারপরিগ্রহে যত্নবান্ হইব, প্রকারান্তরে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না। এইরূপে পরিণীতা ভার্যার গর্ভে আপনাদিগের উদ্ধারকর্তা পুত্র উৎপন্ন হইবেক, তখন আপনারা অক্ষয় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রমোদে কাল-যাপন করিবেন।

চতুর্দশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎকারু এইরূপে গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশে কৃতসংকল্প হইয়া ভার্যা-লাভার্থে সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোনও ব্যক্তিই তাঁহাকে কন্যাদান করিল না। এক দিন তিনি পিতৃলোকের আদেশ প্রতিপালনার্থে বনপ্রবেশপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন। তখন বাসুকি স্বীয় ভগিনী আনয়ন করিয়া দান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই কন্যা সনাম্নী নহে, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিলেন না, কারণ, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কন্যা সনাম্নী হয় ও তাহার বন্ধুগণ স্বেচ্ছাক্রমে দান করিতে উদ্যত হয়েন, তবেই তাহাকে ভার্যাস্বরূপে পরিগ্রহ করিব। অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপাঃ জরৎকারু বাসুকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভুজঙ্গম! সত্য কহ তোমার এই ভগিনীর নাম কি? বাসুকি কহিলেন, হে জরৎকারু! আমার এই অনুজার নাম জরৎকারু, আমি তোমাকে দান করিতেছি, তুমি প্রতিগ্রহ কর। আমি ইহাকে তোমার নিমিত্তই এত

কাল রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি পরিগ্রহ কর। ইহা কহিয়া বাসুকি জরৎকারুকে ভগিনী দান করিলেন। তিনিও বেদবিহিত বিধান অনুসারে তাঁহাকে ভার্যাস্বরূপে পরিগ্রহ করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ শৌনক! পূর্ব কালে সর্পেরা স্বীয় জননীর নিকট হইতে এই শাপ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেক। সর্পকুলচূড়ামণি বাসুকি সেই শাপ শান্তি করিবার আশয়ে ব্রতপরায়ণ মহাত্মা জরৎকারু ঋষিকে ভগিনী দান করেন। তিনিও তাঁহাকে বিধিপূর্বক ধর্মপত্নী-স্বরূপ পরিগ্রহ করেন। তাঁহার গর্ভে আস্তীক নামে মহানুভব তনয় উৎপন্ন হইলেন। ঐ তনয় তপস্বী মহাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগ ও সর্বভূতসমদর্শী ছিলেন, এবং পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের দাহভয় নিবারণ করেন। বহু কালের পর, পাণ্ডুকুলোদ্ভব রাজা জনমেজয় সর্পসত্র নামে প্রসিদ্ধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই সর্পকুলসংহারকারী যজ্ঞ আরব্ধ হইলে পর, তপঃপ্রভাবসম্পন্ন আস্তীক ভ্রাতৃগণ, মাতুলগণ, ও অন্যান্য সর্পগণের নিস্তার করিয়াছিলেন।

জরৎকারু পুত্রোৎপাদন ও তপস্যা দ্বারা পিতৃলোকের উদ্ধারসাধন, বিবিধব্রতানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের পরিতোষসম্পাদন, ও নানা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসমাধান করিলেন। এইরূপে তিনি ব্রহ্মচর্য, পুত্রোৎপাদন, ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ও দেবঋণরূপ গুরুভার হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের সহিত স্বর্গারোহণ করেন। হে ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ! আমি যথাক্রমে আস্তীকোপাখ্যান কীর্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি বর্ণন করিব, আজ্ঞা করুন।

ষোড়শ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যাহা বর্ণন করিলে, পুনর্বার তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা কর, আস্তীকের সবিস্তর বৃত্তান্ত শ্রবণে আমাদিগের মহীয়সী বাসনা জন্মিয়াছে। তুমি যাহা কীর্তন করিতেছ, তাহা অতি ললিত ও মধুর বোধ হইতেছে; আমরা শুনিয়া পরম পরিতোষ পাইতেছি। তুমি পুরাণ কীর্তন বিষয়ে আপন পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছে। তোমার পিতা যেমন অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পুরাণ শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ শ্রবণ করাও।

উগ্রশ্রবা কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপন পিতার নিকট আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনার নিকট অবিকল সেইরূপ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সত্যযুগে কদ্রু ও বিনতা নামে দক্ষ প্রজাপতির দুই সুলক্ষণা পরম সুন্দরী কন্যা ছিলেন। ঐ দুই ভগিনীর কশ্যপের সহিত বিবাহ হয়। মহাত্মা কশ্যপ সেই দুই

ধর্মপত্নীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিলেন। তাঁহারাও কশ্যপের নিকট স্ব স অভিলাষানুরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় হর্ষ ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। কদ্রু তুল্যতেজস্বী সহস্র নাগ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিনতা এই বর লইলেন যে, আমার দুইটি মাত্র পুত্র হউক, কিন্তু তাহারা যেন কদ্রুর সহস্র পুত্র অপেক্ষা বলে, বিক্রমে, ও কলেবরে শ্রেষ্ঠ হয়। কশ্যপ তাঁহাকে উক্ত অভিলষিত পবিত্র বর প্রদান করিলেন। বিনতা স্বামীর নিকট যথাপ্রর্থিত বর লাভ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্টা ও চরিতার্থা হইলেন। কদ্রুও তুল্যবল সহস্র পুত্র লাভ দ্বারা আপনাকে কৃতার্থা জ্ঞান করিলেন। মহাতপাঃ কশ্যপ পত্নীদিগকে, তোমরা যত্নপূর্বক গর্ভধারণ করিবে, এই উপদেশ দিয়া বন প্রবেশ করিলেন।

বহুকাল অতীত হইলে পর কদ্রু অণ্ডসহস্র ও বিনতা অণ্ডদ্বয় প্রসব করিলেন। পরিচারিকাগণ তাঁহাদিগের প্রসূত অণ্ড সমুদায় উপস্বেদসম্পন্ন ভাণ্ডমধ্যে পঞ্চশত বর্ষ স্থাপন করিল। তদনন্তর কদ্রুপ্রসূত অণ্ডসহস্রমধ্য হইতে এক এক পুত্র নির্গত হইল ; কিন্তু বিনতাপ্রসূত অণ্ড তদবস্থই রহিল। পুত্রার্থিনী দীনা বিনতা তদ্দর্শনে লজ্জিতা হইয়া, কালবিলম্ব সহিতে না পারিয়া স্বপ্রসূত অণ্ডদ্বয়ের অন্যতর ভেদনপূর্বক দেখিলেন, পুত্রের শরীরের পূর্বার্ধমাত্র যথাবৎ সংঘটিত হইয়াছে, অন্যার্ধ কিঞ্চিন্মাত্রও সংঘটিত হয় নাই। তখন সেই পুত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বীয় জননীকে এই শাপ দিলেন, মাতঃ! তুমি লোভপরবশা হইয়া, শরীর সম্পূর্ণ সংঘটিত না হইতেই, আমাকে অকালে অণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিলে ; অতএব তুমি যে সপত্নীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছ, পঞ্চশত বৎসর তাহার দাসী হইয়া থাকিবে। অপর অণ্ডমধ্যে তোমার যে পুত্র আছে, যদি তাহাকেও আমার মত অকালে বহিষ্কৃত করিয়া অঙ্গহীন অথবা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সে তোমার দাসীভাব মোচন করিবেক। যদি তুমি পুত্রের বিশিষ্ট বল বিক্রম বাসনা কর, তবে ধৈর্য অবলম্বন করিয়া ইহার জন্মকাল প্রতীক্ষা কর ; ইহার জন্মের আর পাঁচ শত বৎসর বিলম্ব আছে।

অরুণ, জননীকে এইপ্রকার শাপপ্রদানের পর, অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়া সূর্যদেবের রথের সারথি হইলেন। এই নিমিত্ত সর্ব কাল প্রভাতসময়ে অরুণকে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পভোজী গরুড়ও যথাকালে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি জাতমাত্র ক্ষুধার্ত হইয়া, বিধাতৃবিহিত স্বীয় ভোজ্য বস্তু আহরণার্থে বিনতাকে পরিত্যাগ করিয়া নভোমণ্ডলে গমন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! এই সময়ে কদ্রু ও বিনতা দুই ভগিনী অবলোকন করিলেন, উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্ব তাঁহাদের সমীপ দেশ দিয়া গমন করিতেছে, দেবগণ হৃষ্ট চিত্তে তাহার সাতিশয় সমাদর করিতেছেন। সেই সর্বোত্তম, সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন, শ্রীমান্, অজর, অমোঘবল, দিব্য, অশ্বরত্ন অমৃতমন্থনকালে উৎপন্ন হয়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি কহিলে, সেই পরম সুন্দর মহাবীর্য অশ্বরাজ অমৃতমন্থনকালে উৎপন্ন হয়; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, দেবতারা কি নিমিত্তে ও কোন্ স্থানে অমৃতমন্থন করিয়াছিলেন?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সুমেরু নামে এক পরম সুন্দর ভূধর আছে। তাহার স্বর্ণময় উজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহের জ্যোতির সহিত তুলনা করিলে প্রদীপ্ত সূর্যের প্রভাও মলিন বোধ হয়। ঐ কনকালঙ্কৃত অপ্রমেয় বিচিত্র গিরি দেবগণ ও গন্ধর্বগণের আবাসভূমি। অধর্মপরায়ণ লোকেরা তাহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। অতিদুর্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ তদুপরি নিরন্তর পরিভ্রমণ করে। রজনীতে নানাবিধ দিব্য ওষধি (৫৩) দ্বারা আলোকময় হয়। উচ্চতা দ্বারা দেবলোক আবরণ করিয়া অবস্থিত আছে। বহুতর তরঙ্গিণী ও তরুমণ্ডলী ঐ গিরিবরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। অশেষবিধ মনোহর বিহঙ্গমগণ চারি দিকে অনবরত কোলাহল করিতেছে। ঐ ধরণীধর সামান্য লোক-দিগের মনেরও অগম্য। তপোনিয়মসম্পন্ন মহাবল দেবগণ সেই স্বর্ণময় শৈলের শুভ শৃঙ্গে সমারূঢ় ও আসীন হইয়া অমৃতলাভবিষয়ক মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে দেবতাদিগকে মন্ত্রচিন্তনে সাতিশয় ব্যাসক্ত দেখিয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, দেখ, দেবতারা ও অসুরগণ ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করুক, মন্থন করিতে করিতে সমুদ্রগর্ভ হইতে অমৃত উৎপন্ন হইবেক। অনন্তর দেবতাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা সর্বপ্রকার ওষধি (৫৪) ও সর্বপ্রকার রত্ন পাইয়াও উদধিমন্থনে বিরত হইবে না, উত্তরোত্তর মন্থন করিতে করিতে তোমাদিগের অমৃত লাভ হইবেক।

অষ্টাদশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দেবতারা অমৃতমন্থনের আদেশ পাইয়া মন্দর গিরিকে মন্থনদণ্ড করিবার নিশ্চয় করিলেন। কিন্তু সেই উত্তুঙ্গশৃঙ্গসমূহসুশোভিত, বহুললতাজাল-সংকীর্ণ, বহুবিধবিহগমণ্ডলকোলাহলসঙ্কুল, অনেকব্যালকুলসমাকুল, অপ্সরঃকিন্নর-অমরগণসেবিত, একাদশসহস্র যোজন উন্নত, ও তৎপরিমাণে ভূগর্ভে অবস্থিত গিরি-রাজের উদ্ধরণে অসমর্থ হইয়া, তাঁহারা ব্রহ্মা ও নারায়ণের নিকটে আসিয়া বিনয়বচনে নিবেদন করিলেন, আপনারা আমাদিগের হিতার্থে কোনও সদুপায় নির্ধারণ ও মন্দরের উদ্ধরণে যত্ন করুন।

অপ্রমেয়স্বরূপ নারায়ণ ও ব্রহ্মা তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া ভুজগরাজ অনন্ত-দেবকে মন্দরোদ্ধরণের আদেশ প্রদান করিলেন। মহাবল মহাবীর্য অনন্তদেব তাঁহাদিগের নিদেশানুসারে সমস্ত বন ও বনচরগণ সহিত সেই পর্বতরাজের উদ্ধরণ করিলেন। তদনন্তর দেবগণ অনন্তদেব সমভিব্যাহারে অর্ণবতীরে উপস্থিত হইলেন,

(৫৩) লতা বিশেষ, রজনীতে তাহার দীপ্তি প্রকাশ পায়।

(৫৪) ফল পক্ক হইলেই যাহারা শুষ্ক হইয়া যায়।

এবং অর্ণবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, আমরা অমৃতলাভার্থে তোমার জল মন্থন করিব। সমুদ্র কহিলেন, মন্দরপরিভ্রমণ দ্বারা আমাকে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হইবেক, অতএব আমিও যেন লাভের অংশভাগী হই। অনন্তর সমুদায় দেবতা ও অসুর মণ্ডলী কূর্মরাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তুমি এই গিরির অধিষ্ঠান হও। কূর্মরাজ তথাস্তু বলিয়া মন্দরগিরির অধিষ্ঠানার্থে আপন পৃষ্ঠ পাতিয়া দিলেন। দেবরাজ তৎপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত শৈলরাজকে যন্ত্রসহকারে চালিত করিলেন।

এইরূপে অমরগণ মন্দরকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া অমৃতলাভাভিলাষে সলিলনিধি সমুদ্রের মন্থন আরম্ভ করিলেন। মহাবল দানবাসুরদল রজ্জুস্থানীয় নাগরাজের মুখদেশ ও দেবগণ তাঁহার পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। ভগবান্ অনন্তদেব নারায়ণের অপর মূর্তি, এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার দুর্বিষহ বিষের প্রভাব সংবরণ করিয়া দিলেন। দেবতারা মন্থনার্থে নাগরাজ বাসুকিকে বলপূর্বক আকর্ষণ করাতে, তাঁহার মুখ হইতে বারংবার ধূম ও অগ্নিশিখা সহিত অতি প্রভূত শ্বাসবায়ু নিঃসৃত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত শ্বাসবায়ু সমবেত হইয়া বিদ্যুৎসহিত মেঘসমূহরূপে পরিণত হইল এবং শ্রান্ত ও সন্তপ্ত দেবদানবদিগের উপর বারিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। আর সেই শৈলের শিখরদেশ হইতে সমন্ততঃ পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

এইরূপে মন্দরগিরি দ্বারা সুরাসুরগণ কর্তৃক মথ্যমান সমুদ্র হইতে মেঘরবানুকারী বিশাল শব্দ হইতে লাগিল। নানাবিধ শত শত জলচরগণ মন্দরগিরির মর্দনে নিষ্পিষ্ট হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পাতালতলবাসী অন্যান্য বহুবিধ জলীয় প্রাণিগণ মন্দরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। গিরিরাজ অনবরত ভ্রাম্যমাণ হওয়াতে, তদীয় শিখরদেশস্থিত অতি প্রকাণ্ড মহীরুহ সকল পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া পতগগণ সহিত নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন নীলবর্ণ জলধর সৌদামিনীমণ্ডল দ্বারা সমাবৃত হয়, তদ্রূপ মন্দর সেই সমস্ত ভূরুহের পরস্পরসংঘর্ষণসম্ভূত অতি প্রভূত হুতাশনের শিখা সমূহ দ্বারা সমাবৃত হইল। ঐ হুতাশন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া অরণ্যবিনির্গত কুঞ্জর ও কেশরী সকল দগ্ধ করিল। তদ্ব্যতীত অন্যান্য নানা বনচর ঐ হুতাশনের আহুতি হইল। হুতাশন এইরূপে ইতস্ততঃ দাহ আরম্ভ করাতে, দেবরাজ ইন্দ্র মেঘসম্ভূত সলিলসেক দ্বারা তাহার শান্তি সম্পাদন করিলেন।

তদনন্তর মহাদ্রুমগণের নির্যাস ও অশেষবিধ ওষধিরস সাগরসলিলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই সমস্ত অমৃতগুণসম্পন্ন রসের ও কাঞ্চননিস্রবের প্রভাবে সুরগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অর্ণববারি উক্তবিধ রস, কাঞ্চননিস্রব, ও অন্যান্য বহুবিধ উৎকৃষ্ট রসে মিশ্রিত হইয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইল। সেই ক্ষীর হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

অনন্তর দেবতারা পদ্মাসনে আসীন বরদ ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! দেবাদিদেব নারায়ণ ব্যতিরেকে আমরা সমুদায় দেব দানব একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি। কোন্ কালে মন্থন আরম্ভ করা গিয়াছে, এখন পর্যন্তও অমৃত উদ্ভূত হয়

নাই। তখন ব্রহ্মা নারায়ণকে কহিলেন, তুমি ইহাদিগের বলাধান কর; তোমা ব্যতিরেকে এ বিষয়ে আর গতি নাই। নারায়ণ কহিলেন, যাহারা এই ব্যাপারে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের সকলকেই আমি বল প্রদান করিতেছি। সকলে মিলিত হইয়া মন্দর পরিভ্রমণ দ্বারা সরিৎপতিকে আলোড়িত করুক।

সমুদায় দেব ও দানব নারায়ণের বচন শ্রবণমাত্র বলপ্রাপ্ত ও একবাক্য হইয়া পুনর্বার প্রবল রূপে জলধিমন্থন আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর মথ্যমান অম্ভোধির গর্ভ হইতে শীতলময়ূখসম্পন্ন সৌম্য ও প্রসন্নমূর্তি চন্দ্র উৎপন্ন হইলেন। শ্বেতসরোজসমাসীনা লক্ষ্মী, সুরাদেবী, ও শ্বেতবর্ণ অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবা ঘৃত হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে কৌস্তভনামা শ্রীমান্ মহোজ্জ্বল দিব্য মণি ঘৃত হইতে সমুদ্ভূত হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমান হইল। লক্ষ্মী, সুরা, শশধর, ও মনোজব অশ্বরাজ আদিত্য-পথানুসারী হইয়া দেবপক্ষে গমন করিলেন। অনন্তর মূর্তিমান্ ধন্বন্তরিদেব অমৃতপূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে করিয়া আবির্ভূত হইলেন। এই পরমাদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া দানবগণ, এই অমৃত আমার আমার বলিয়া, কোলাহল করিতে লাগিল। তদনন্তর ধবলকান্তি, দশনচতুষ্টয়সম্পন্ন, মহাকায় ঐরাবতনামা মাতঙ্গরাজ উৎপন্ন হইল। বজ্রধারী দেবরাজ ঐ গজরাজ অধিকার করিলেন।

দেবাসুরগণ ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া সাতিশয় মন্থন করাতে, কালকূট উৎপন্ন হইয়া ধূমবহুল প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহসা জগন্মণ্ডল আকুল করিল। ঐ অতি বিষম বিষের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ত্রৈলোক্য বিচেতন ও মূর্ছিত হইল! ব্রহ্মা তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া অনুরোধ করাতে, ভগবান্ মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বর লোকরক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করিলেন। তদবধি তিনি ত্রিলোকে নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইলেন।

দানবেরা এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া অমৃত ও লক্ষ্মী লাভার্থে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত করিল। তখন নারায়ণ, মোহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া স্ত্রীরূপ পরিগ্রহপূর্বক, দানবদলের নিকট উপস্থিত হইলেন। মূঢ়মতি দৈত্য দানবগণ তাঁহার পরমাদ্ভুত রূপলাবণ্য অবলোকনে মোহিত ও তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অমৃত প্রদান করিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর সমুদায় দৈত্য দানব ঐক্যমত্য অবলম্বনপূর্বক নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র হস্তে লইয়া দেবতাদিগকে আক্রমণ করিল। মহাবীর্য ভগবান্ বিষ্ণু, নরদেব সমভিব্যাহারে দানবেন্দ্রদিগের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিলেন। দেবগণ বিষ্ণুর নিকট হইতে অমৃত প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে পান করিতে বসিলেন। দেবতারা অমৃতপান আরম্ভ করিলে, রাহু নামে এক ধূর্ত দানব অবসর বুঝিয়া দেবরূপ পরিগ্রহ পূর্বক ঐ সমভিব্যাহারে অমৃত পান করিল। অমৃত দানবের কণ্ঠদেশমাত্র গমন

করিয়াছে, এমন সময়ে চন্দ্র ও সূর্য দেবতাদিগের হিতার্থে ঐ গূঢ় ব্যাপার ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি সুদর্শন চক্র দ্বারা দানবের শিরশ্ছেদন করিলেন। রাহুর শৈলশৃঙ্গময় চক্রচ্ছিন্ন প্রকাণ্ড মস্তক তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডলে আরোহণ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার কবন্ধ, সবন, সপর্বত, সদ্বীপ, মহীমণ্ডল কম্পিত করিয়া, ভূতলে পতিত হইল। তদবধি চন্দ্র ও সূর্যের সহিত রাহুমুখের চিরন্তন বৈরনির্বন্ধ হইল। এই নিমিত্তই ঐ মুখ অদ্যাপি তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে গ্রাস করিয়া থাকে। ভগবান্ নারায়ণ নিরুপম নারীরূপ পরিহার করিয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণপূর্বক দানবদল আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর লবণার্ণবতীরে দেবদানবদলের ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণাগ্র প্রাস তোমর প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্র সমন্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। অসুরগণ খড়্গ চক্র শক্তি গদা প্রভৃতি শস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শোণিত বমন করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল। তাহাদিগের তপ্তকাঞ্চনশোভিত মস্তক সকল অতি দারুণ পট্টিশ-প্রহারে কলেবর হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া অনবরত ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। সমরনিহত মহাসুরগণ রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া ধাতুরাগরঞ্জিত গিরিশিখরের ন্যায় ভূশয্যায় শয়ন করিল। পরস্পর শস্ত্র প্রহার দ্বারা রণক্ষেত্রে হাহা রব উত্থিত হইল। দূর হইতে লৌহময় তীক্ষ্ণ পরিঘের আঘাত ও সন্নিকর্ষে মুষ্টিপ্রহার ইত্যাদি প্রকারে রণপ্রবৃত্ত দেবদানবদলের কোলাহল নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল। চারি দিকে কেবল ছিন্ধি, ভিন্ধি, ঘাতয়, পাতয় ইত্যাদি ঘোরতর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাভয়দায়ী তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, নর ও নারায়ণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ, নরদেবের দিব্য ধনু অবলোকন করিয়া, দানবকুল-বিলয়কারী স্বীয় চক্র স্মরণ করিলেন। সেই অরাতিনিপাতন, সূর্যসমপ্রভ, অপ্রতিহত-প্রভাব, ভীষণমূর্তি সুদর্শন চক্র স্মৃতমাত্র অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল। করিকরদীর্ঘ-বাহু ভগবান্, প্রজ্বলিতহুতাশনসম, পরপুরবিদারণ, মহাপ্রভ চক্র বিপক্ষদলে প্রক্ষেপ করিলেন। ভগবৎপ্রেরিত চক্র মহাবেগে গমন করিয়া সহস্র সহস্র দৈত্য দানব সংহার করিল ; কোনও স্থলে অতি প্রদীপ্ত দহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অসুরদল নিপাত করিল ; কোনও স্থলে ভূতলে ও নভোমণ্ডলে বিচরণপূর্বক পিশাচের ন্যায় তাহাদের শোণিত পান করিতে লাগিল।

নবজলধরকলেবর মহাবল পরাক্রান্ত অসুরেরাও গিরিনিক্ষেপ দ্বারা দেবদল দলন করিতে আরম্ভ করিল। তখন আকাশমণ্ডল হইতে অতি প্রকাণ্ড ভয়ানক ভূধর সকল পরস্পরাভিঘাতপূর্বক বহুবিধ জলধরের ন্যায় সমন্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ অবিরত অদ্রিপাতে অভিহতা হইয়া সদ্বীপা সকাননা পৃথিবী বিচলিতা হইল। তখন নরদেব স্বর্ণমুখ শিলীমুখ (৫৫) সমূহ দ্বারা অসুরবিক্ষিপ্ত গিরিসমূহের শিখর বিদারণ-পূর্বক গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দান্ত অসুরদল ভগ্নবল হইয়া

(৫৫) বাণ।

ও নভোমণ্ডলে প্রজ্বলিতহুতাশনসম সুদর্শনচক্রকে পরিকুপিত অবলোকন করিয়া ভয়ে ভূমধ্যে ও লবণার্ণবগর্ভে প্রবেশ করিল।

দেবতারা এইরূপে জয় প্রাপ্ত হইয়া সমুচিতসংকার বিধানপূর্বক মন্দর গিরিকে পূর্ব স্থানে স্থাপিত করিলেন। জলধরেরাও গগনমণ্ডল ও স্বর্গলোক নিনাদিত করিয়া যথাগত প্রতিগমন করিল। তদনন্তর দেবতারা আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া সেই অমৃত-ভাণ্ড সুরক্ষিত করিয়া নারায়ণের নিকট নিহিত করিলেন।

বিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিপ্রবর! যে অমৃতমন্থনে শ্রীমান্ অতুলবিক্রম অশ্বরাজ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। কদ্রু সেই অশ্বরত্ন অবলোকন করিয়া বিনতাকে কহিলেন, বিনতে! শীঘ্র বল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবার কিরূপ বর্ণ। বিনতা কহিলেন, এ অশ্বরাজ শ্বেতবর্ণ, তুমি কি বল, আইস এ বিষয়ে পণ করা যাউক। কদ্রু কহিলেন, হে চারুহাসিনি! আমি বোধ করি, এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ; আইস, এ বিষয়ে এই পণ করা যাউক, যে হারিবেক, সে দাসী হইবেক। তাঁহারা এইরূপে দাসীবৃত্তিস্বীকাররূপ প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইয়া, কল্য অশ্ব দেখিব, এই স্থির করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

কদ্রু গৃহে গিয়া কৌটিল্য করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় পুত্রসহস্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কজ্জলতুল্য রূপ ধারণ করিয়া ত্বরায় ঐ তুরঙ্গশরীরে প্রবেশ কর; যেন আমাকে দাসী হইতে না হয়। যে সকল ভুজঙ্গ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইল, তিনি তাহাদিগকে এই শাপ দিলেন, পাণ্ডুকুলোদ্ভব ধীমান্ রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা কদ্রুদত্ত নিষ্ঠুর শাপ স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন, এবং সর্পগণের সংখ্যা অধিক দেখিয়া, ঐ শাপ প্রজাগণের হিতকর ভাবিয়া, দেবগণসহিত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; আর কহিলেন, কদ্রু স্বীয় সন্তানদিগকে যে এরূপ শাপ দিয়াছেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়; এই সকল মহাবল সর্পের বিষ অতি তীক্ষ্ণ ও বীর্যবৎ। ইহারা স্বভাবতঃ হিংসারত ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর নিয়ত অহিতকারী। অতএব কদ্রু উচিত বিবেচনা করিয়াছেন। তাহারা যেমন ক্রূর, দৈব তেমনই তাহাদিগের উপর প্রাণান্ত দণ্ডপাত করিয়াছেন।

ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এইরূপ সম্ভাষণ ও কদ্রুর সমুচিত প্রশংসা করিয়া কশ্যপকে স্বসমীপে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, হে পুণ্যাত্মন্! যে সকল তীক্ষ্ণবিষ মহাফণ দন্দশূক (৫৬) সর্প তোমার ঔরসে জন্মিয়াছে, জননী তাহাদিগকে শাপ দিয়াছেন। বৎস! তদ্বিষয়ে কোনও ক্রমেই তোমার মন্যু করা বিধেয় নহে। যজ্ঞে সর্পকুলসংহার পূর্বাবধি নির্দিষ্ট আছে। বিধাতা, মহাত্মা কশ্যপ প্রজাপতিকে এইরূপে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহাকে বিষহরী বিদ্যা প্রদান করিলেন।

---

(৫৬) সদা দংশনে উদ্যত।

একবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্রু ও বিনতা পরস্পর দাস্য পণ করিয়া অমর্ষগ্রস্ত ও রোষপরবশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে, রজনী প্রভাত ও দিবাকর উদিত হইবামাত্র, অনতিদূরবর্তী তুরগরাজ উচ্চৈঃশ্রবার দর্শনার্থ প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা জলধি অবলোকন করিলেন ; জলধি অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, সর্বভূতভয়ঙ্কর জলচরসমূহে সতত সমাকীর্ণ, সমস্ত রত্নের অদ্বিতীয় আকর, জলাধিপতি বরুণ দেবতার আলয়, নাগগণের আবাসস্থান, অসুরগণের পরম মিত্র, স্থলচর প্রাণিসমূহের পক্ষে অতি ভয়ানক, অমৃতের একমাত্র উৎপত্তিস্থান, পাঞ্চজন্য শঙ্খের প্রভবভূমি, তাঁহার গর্ভে প্রবল বাড়বানল সর্বকাল অবস্থিতি করিতেছে, এবং জলচরগণ অনবরত ঘোরতর শব্দ করিতেছে, তদীয় কলেবর প্রবল পবনবেগে নিরন্তর পরিচালিত হইতেছে, সুতরাং অবিচ্ছেদে পর্বতাকার তরঙ্গ উঠিতেছে, এবং তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন তিনি তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছেন, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অপ্রমেয়প্রভাব ভগবান্ গোবিন্দ বরাহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্তর্জলে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে আলোড়িত ও আবিল করিয়াছিলেন, ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি অত্রি শত শত বৎসরেও তাঁহার তল স্পর্শ করিতে পারেন নাই, অপ্রমিততেজাঃ ভগবান্ পদ্মনাভ প্রলয়কালে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া তাঁহার তরঙ্গশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, মৈনাক ভূধর দেবরাজের বজ্রপাতভয়ে কাতর হইয়া শরণাগত হইলে তিনি তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন, অসুরদল ঘোর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পরিত্রাণ পায়, এবং সহস্র সহস্র মহানদী প্রতিদ্বন্দ্বিনী অভিসারিকাদিগের ন্যায় সতত তাঁহাকে সমাবেশ করিতেছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ মাতৃশাপশ্রবণানন্তর বিবেচনা করিল, আমাদিগের জননীর অন্তঃকরণে স্নেহ নাই ; সুতরাং তাঁহার মনোরথ সম্পন্ন না হইলে কুপিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারিলে প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের শাপ মোচন করিতে পারেন। অতএব তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্তব্য। চল, সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করি। এই সংকল্প করিয়া তাহারা ঐ অশ্বের পুচ্ছকেশরূপে পরিণত হইল। এমন সময়ে দক্ষতনয়া কদ্রু ও বিনতা আকাশপথে, প্রচণ্ড বায়ুবেগে বিচলিত, ঘোরতরনিনাদসঙ্কুল, তিমিঙ্গিলমকরসমূহসমাকীর্ণ, বহুবিধভয়ঙ্করজন্তুসহস্রপরিবৃত, অতিভীষণমূর্তি, সমস্তনদীনায়ক, সকলরত্নাকর, অমৃতাধার, বরুণদেবভবন, নাগগণালয়, বাড়বানলাশ্রয়, ভয়ঙ্করপ্রাণিসমূহনিবাস, অসুরগণবাসভূমি, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক নদীগণ কর্তৃক নিরন্তর পরিপূর্যমাণ, অতি দুর্ধর্ষ, অতলস্পর্শ, অক্ষোভ্য, অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অতিমনোহর, পবিত্রজল, জলধি অবলোকন করিতে করিতে প্রীত মনে তদীয় অপর পারে উপনীত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্রু ও বিনতা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অনতিবিলম্বে অশ্বসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অশ্ব শশাঙ্ককিরণের ন্যায় শুভ্রাকার, কেবল পুচ্ছদেশের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ। বিনতা তদ্দর্শনে বিষাদসাগরে মগ্না হইলেন, কদ্রু জয়লাভে প্রফুল্লা হইয়া তাঁহাকে দাসীকর্মে নিযোজিতা করিলেন। বিনতাও পণেতে পরাজিতা হইয়াছেন, সুতরাং দুঃসহ দুঃখদাবদহনে দগ্ধ হইয়া দাসীভাব অবলম্বন করিলেন।

এই সময়ে গরুড়ও, সময় উপস্থিত হওয়াতে, মাতৃসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, স্বয়ং অণ্ড বিদারণপূর্বক জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাবল, মহাকায়, প্রলয়কালীন অনলতুল্য দুর্নিরীক্ষ্য, বিদ্যুৎসম সমুজ্জ্বলনেত্র, কামরূপ, কামবীর্য, কামগম (৫৭) বিহঙ্গমরাজ, অতিপ্রদীপ্ত হুতাশনরাশির ন্যায় আভাসমান হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণ ও ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগপূর্বক, সহসা অতিপ্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা ব্যাকুল হইয়া বিশ্বরূপী আসনোপবিষ্ট অগ্নিদেবতার শরণাগত হইলেন এবং প্রণিপাত করিয়া অতি বিনয়ে নিবেদন করিলেন, হে অগ্নে! আর শরীর বৃদ্ধি করিও না, তুমি কি আমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানস করিয়াছ? ঐ দেখ, তোমার প্রদীপ্ত রাশি সর্বতঃ প্রসৃত হইতেছে। অগ্নি কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যাহা বোধ করিতেছ, বাস্তবিক তাহা নহে; আমার তুল্য তেজস্বী বলবান্ বিনতানন্দন গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন; সেই তেজোরাশিদর্শনে তোমরা মোহাবিষ্ট হইয়াছ। সর্পকুলসংহারকারী মহাবল কশ্যপসূনু সদা তোমাদিগের হিতৈষী ও দৈত্য রাক্ষস প্রভৃতির অহিতকারী হইবেন। অতএব তোমাদের ভয়ের বিষয় নাই; তথাপি আইস, সকলে মিলিয়া গরুড়ের নিকটে যাই।

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেবতাগণ, ঋষিগণ সমভিব্যাহারে গরুড়সমীপে গমনপূর্বক, তদীয় স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন, হে মহাভাগ পতগেশ্বব! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎ-পতি, তুমি সুখ, তুমি পদ্মযোনি, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা ও বিধাতা, তুমি সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, তুমি মহান, তুমি সর্বকাল সর্বব্যাপী, তুমি অমৃত, তুমি মহৎ যশঃ, তুমি প্রভা, তুমি অভিপ্রেত, তুমি আমাদিগের পরম রক্ষাস্থান, তুমি মহাবল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিশালী, তুমি দুঃসহ, হে মহাকীর্তে গরুড়! ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল তোমা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তুমি সর্বোত্তম, তুমি চরাচরমূর্তি, তুমি স্বীয় কিরণমণ্ডল দ্বারা দিবাকরের ন্যায় অবভাসমান হইতেছ, তুমি স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা সূর্যের প্রভামণ্ডল ন্যক্কৃত করিতেছ, তুমি অন্তক, তুমি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থস্বরূপ, হে হুতাশনপ্রভ! তুমি পরিকুপিত দিবাকরের ন্যায় প্রজা সকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি লোকসংহারে উদ্যত প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় ভয়ঙ্কর রূপে উত্থিত হইয়াছ। আমরা মহাবল, মহাতেজাঃ, অগ্নিসমপ্রভ, বিদ্যুৎসমানকান্তি, তিমিরনিবারক,

(৫৭) ইচ্ছা অনুসারে শীঘ্র ও সর্বত্র গমনক্ষম।

নভোমণ্ডলমধ্যবর্তী, পরাবরস্বরূপ, বরদ, দুর্ধর্ষবিক্রম, বিহঙ্গমরাজ গরুড়ের শরণ লইলাম। হে জগন্নাথ! তোমার তপ্তসুবর্ণসমানকান্তি তেজোরাশি দ্বারা জগন্মণ্ডল সন্তপ্ত হইয়াছে; অতএব তুমি মহাত্মা দেবতাদিগকে রক্ষা কর; দেবতারা ভয়ে অভিভূত হইয়া আকাশপথে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছেন। হে বিহগবর! তুমি দয়ালু মহাত্মা কশ্যপ ঋষির সন্তান, রোষ পরিহার কর, জগৎকে দয়া কর, শান্তি অবলম্বন কর, আমাদিগের রক্ষা কর। তোমার মহাবজ্রসদৃশ ভয়ঙ্কর রবে দিঙ্মণ্ডল, নভঃস্থল, স্বর্গলোক, ভূলোক, ও আমাদিগের হৃদয় নিরন্তর কম্পিত হইতেছে। অতএব তুমি অনলতুল্য কলেবর সংহার কর। তোমার কুপিতকৃতান্ততুল্য আকার দর্শনে আমাদের মন একান্ত অস্থির হইয়াছে। হে ভগবন্ পতগপতে! আমরা প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্ন, শুভপ্রদ, ও সুখাবহ হও। গরুড় দেবতাদিগের ও দেবর্ষিগণের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া আত্মতেজঃ সংহার করিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

গরুড় দেবতাদিগের এইরূপ স্তুতি ও প্রার্থনা শুনিয়া এবং আপন কলেবর অবলোকন করিয়া তৎপ্রতিসংহার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কহিলেন, আমার দেহদর্শনে সকল প্রাণীকে আর ভীত হইতে হইবেক না। সকলেই ভয়ানক আকার দেখিয়া ভীত হইয়াছে; অতএব আমি আত্মতেজঃ সংহার করিতেছি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কামগম কামবীর্য বিহঙ্গম, অরুণকে আত্মপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া, পিত্রালয় হইতে মহার্ণবের অপরপারবর্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ সময়ে সূর্য স্বীয় উগ্র তেজঃ দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ করিবার উদ্যম করাতে, মহাদ্যুতি অরুণকে পূর্ব দিকে স্থাপিত করিলেন।

রুরু কহিলেন, ভগবান্ সূর্য কি নিমিত্ত সমস্ত ভুবন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আর দেবতারাই বা তাঁহার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তিনি এত কুপিত হইলেন? প্রমতি কহিলেন, যে সময় চন্দ্র ও সূর্য, রাহুকে ছদ্মবেশে অমৃত পান করিতে দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া দেন, তদবধি তাঁহাদের উভয়ের সহিত রাহুর বৈরানুবন্ধ হয়। পরে ঐ দুষ্ট গ্রহ সূর্যকে গ্রাসযন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলে, তিনি এই ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন যে, আমি দেবতাদিগের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া রাহুর কোপে পতিত হইলাম, এবং তন্নিবন্ধন আমিই একাকী নানা অনর্থকর পাপ ভোগ করিতেছি; বিপৎকালে কোন ব্যক্তিকেই সহায়তা করিতে দেখিতে পাই না; যৎকালে রাহু আমাকে গ্রাস করে, দেবতারা দেখিয়া অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে; অতএব নিঃসন্দেহ আমি সকল লোক সংহার করিব।

সূর্যদেব এই মানস করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, এবং লোকবিনাশনমানসে স্বীয় তেজঃ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। মহর্ষিগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া দেবতা-দিগের নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন, অদ্য অর্ধরাত্র সময়ে সর্বলোকভয়প্রদ মহান্

দাহ আরম্ভ হইবেক ; তাহাতে ত্রৈলোক্যবিনাশসম্ভাবনা। তখন দেবতারা ঋষিগণ সমভিব্যাহারে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! অদ্য কোথা হইতে মহৎ দাহভয় উপস্থিত হইল ? সূর্য লক্ষিত হইতেছে না, এক্ষণে রজনী উপস্থিত ; জানি না, সূর্য উদয় হইলে কি দশা ঘটিবেক।

পিতামহ কহিলেন, হে দেবগণ! আমাদের সূর্য লোকসংহারে উদ্যত হইয়াছেন ; অদ্য উদিত হইলেই ত্রিলোক ভস্মরাশি করিবেন। কিন্তু পূর্বেই ইহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছি। কশ্যপের অরুণ নামে মহাকায় মহাতেজাঃ এক পুত্র জন্মিয়াছে, সে সূর্যসম্মুখে অবস্থিতি করিবেক, তাঁহার সারথি হইবেক, এবং তদীয় তেজঃ সংহার করিবেক। প্রমতি কহিলেন, তদনন্তর অরুণ ব্রহ্মার আদেশানুসারে সমস্ত কার্যানুষ্ঠানে সম্মত হইলেন, এবং সূর্য উদিত হইবামাত্র তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। সূর্য যে কারণে কুপিত হইয়াছিলেন, এবং অরুণ যে রূপে তাঁহার সারথি হইলেন, সে সমুদায় কীর্তন করিলাম।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তৎপরে মহাবল মহাবীর্য কামগামী (৫৮) বিহগরাজ অর্ণবের অপরপারবর্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তথায় গরুড়মাতা বিনতা পণে পরাজিতা ও দুঃখদাবানলে দগ্ধা হইয়া দাসীভাবে কালহরণ করিতেছিলেন। একদা তিনি পুত্রসমীপে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময়ে সর্পকুলজননী কদ্রু বিনতাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, শুন বিনতে! সমুদ্রমধ্যে পরম রমণীয় অতি সুশোভন এক দ্বীপ আছে ; ঐ দ্বীপ সর্পগণের আবাসভূমি ; আমাকে তথায় লইয়া চল। বিনতা শ্রবণমাত্র কদ্রুকে পৃষ্ঠে লইয়া চলিলেন, গরুড়ও স্বীয় জননীর আদেশানুসারে সর্পদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া তদনুগামী হইলেন। বিনতাহৃদয়নন্দন বিহগরাজ সূর্যাভিমুখে গমন করাতে, ভুজগগণ অতিপ্রদীপ্ত প্রভাকরপ্রভাজালে তাপিত ও মূর্ছিত হইতে লাগিল।

কদ্রু স্বীয় তনয়দিগের তাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া বৃষ্টিপ্রার্থনায় দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব আরম্ভ করিলেন, হে সর্বদেবনায়ক! হে বলবিনাশন! (৫৯) হে নমুচিনিপাতন! (৬০) হে শচীপতে! সহস্রাক্ষ! তোমাকে প্রণাম করি ; তুমি বারিবর্ষণ দ্বারা সূর্যকিরণতাপিত সর্পগণের প্রাণদান কর। হে অমরোত্তম! তুমিই আমাদিগের একমাত্র পরিত্রাণের উপায় ; কারণ, তুমি অপর্যাপ্ত বারিবর্ষণে সমর্থ। হে পুরন্দর, তুমি মেঘ, তুমি বায়ু, তুমি অগ্নি, তুমিই নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎস্বরূপে বিরাজমান হও, তুমিই মেঘগণ ক্ষেপণ করিয়া থাক, এবং তোমাকেই মহামেঘ কহে, তুমি অতি বিষম ঘোর বজ্রস্বরূপ,

(৫৮) ইচ্ছানুসারে শীঘ্র ও সর্বত্র গমনক্ষম।

(৫৯) বলনামক অসুরের বিনাশকারী।

(৬০) নমুচিনামক অসুরের নিপাতকারী।

তুমি ভীষণগর্জনকারী মেঘ, তুমি সকল লোকের সৃষ্টিকর্তা ও সংহারকারী, তুমি সর্ব ভূতের জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবসু, তুমি পরমাশ্চর্য মহৎ ভূত, তুমি রাজা, তুমি নিখিল দেবের অধীশ্বর, তুমি বিষ্ণু, তুমি সহস্রাক্ষ, তুমি দেব, তুমি পরম গতি, তুমি অমৃত, তুমি পরম পূজিত সোমদেবতা, তুমি তিথি, তুমি লব (৬১), তুমি ক্ষণ, তুমি শুক্ল পক্ষ, তুমি কৃষ্ণ পক্ষ, তুমি কলা (৬১), কাষ্ঠা (৬১), ত্রুটি (৬১), সংবৎসর, ঋতু, মাস, রজনী ও দিবস, তুমি সমস্ত পর্বত ও সমস্ত বন সহিত পৃথিবী, ভাস্করসহিত তিমিররহিত নভোমণ্ডল, এবং উত্তালতরঙ্গবহুল মীনমকরতিমিতিমিঙ্গিল-সঙ্কুল জলধি, তুমি অতি যশস্বী, এই নিমিত্ত নির্মলমনীষা (৬২) সম্পন্ন মহর্ষিগণ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে নিয়ত তোমার অর্চনা করিয়া থাকেন, তুমি স্তুত হইয়া যজমানের হিতার্থে যজ্ঞীয় হবিঃ ও সোমরস পান করিয়া থাক। হে অতুলবল! ব্রাহ্মণেরা পারলৌকিক মঙ্গলফলাভিলাষে সতত তোমার অর্চনা করেন, নিখিল বেদাঙ্গ (৬৩) তোমার মহিমা কীর্তন করে, যাগপরায়ণ দ্বিজেন্দ্রগণ তোমার সাক্ষাৎকারলাভার্থে সর্ব প্রযত্নে সমস্ত বেদাঙ্গের অনুগম (৬৪) করেন।

ষড়্বিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভগবান্ পাকশাসন (৬৫) কদ্রুকৃত স্তব শ্রবণ করিয়া নীল জলদপটল দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন, এবং জলদগণকে এই আদেশ দিলেন, তোমরা শুভ বারিবর্ষণ কর। জলদেরা, দেবরাজের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র, সৌদামিনীমণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত ও উজ্জ্বল হইয়া, আকাশমণ্ডলে অনবরত ঘন ঘোর গর্জন করত তোয়রাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। জলধরগণের অভূতপূর্ব প্রভূত বারিবর্ষ, অজস্র ঘোরতর গর্জন, প্রবল বাত্যাবহন, ও অনবরত বিদ্যুৎকম্পন দ্বারা নভোমণ্ডলে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। জলধরগণ অবিশ্রান্ত জলধারা বর্ষণ করাতে চন্দ্র ও সূর্য এক বারে তিরোহিত হইলেন। নাগগণ যৎপরোনাস্তি হর্ষ প্রাপ্ত হইল, ভূমণ্ডল সলিলভারে সমন্ততঃ পরিপূর্ণ হইল, শীতল বিমল জল রসাতলে প্রবিষ্ট হইল, পৃথিবী জলতরঙ্গে আপ্লাবিতা হইল, এবং সর্পেরা মাতৃ সমভিব্যাহারে রামণীয়কদ্বীপে উত্তীর্ণ হইল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ এইরূপে জলধারায় অভিষিক্ত হইয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইল, এবং গরুড়পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্বরায় সেই মকরগণবাসভূমি বিশ্বকর্মবিনির্মিত রামণীয়কদ্বীপে উপস্থিত হইল। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ অতি প্রকাণ্ড

(৬১) কালের অংশ বিশেষ। (৬২) বুদ্ধি।
(৬৩) শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও জ্যোতিষ।
(৬৪) পরস্পর অবিরোধসম্পাদন, মীমাংসা।
(৬৫) পাকনামক অসুরের শাসনকর্তা, ইন্দ্র।

লবণার্ণব অবলোকন করিল, এবং সেই দ্বীপবর্তী সর্বজনমনোহর পরম পবিত্র শুভপ্রদ কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিহার করিতে লাগিল। ঐ কানন নিরন্তর সাগরসলিলে সিক্ত হইতেছে, বহুবিধ বিহঙ্গগণ অনুক্ষণ চতুর্দিকে কোলাহল করিতেছে, ফলকুসুম-সুশোভিত তরুমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া পরম রমণীয় হইয়া আছে, বিচিত্র অট্টালিকা, পরম সুন্দর সরোবর, ও নির্মলজলপূর্ণ দিব্য হ্রদ সমূহে অনির্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে, অবিশ্রান্ত শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে, অত্যুন্নত চন্দনতরু ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষসমূহ দ্বারা সদা শোভিত হইয়া আছে, ঐ সকল বৃক্ষ বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে, মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে, ঐ কানন অপ্সরা ও গন্ধর্বগণের অতি প্রিয় স্থান, দর্শনমাত্র অন্তঃকরণে অতিমাত্র আহ্লাদ প্রদান করে।

কদ্রুনন্দনেরা কিয়ৎক্ষণ বনবিহার করিয়া মহাবীর্য গরুড়কে কহিল, দেখ, আমাদিগকে আর কোন নির্মলজলসম্পন্ন রমণীয় দ্বীপে লইয়া চল, তুমি আকাশপথে গমনকালে নানা রম্য দেশ দেখিতে পাও। গরুড়, সর্পগণের এইরূপ আদেশ শ্রবণমাত্র, স্বীয় জননীসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! কি কারণে আমাকে সর্পগণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবেক, বল। বিনতা কহিলেন, বৎস! আমি দুর্দৈববশতঃ সর্পগণের মায়াবলে পণে পরাজিত হইয়া সপত্নীর দাসী হইয়াছি। মাতৃমুখে এই কারণ শ্রবণ করিয়া গরুড় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সর্পগণের নিকটে গিয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমগণ! তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, আমি কোন্ বস্তু আহরণ অথবা কি পৌরুষের কর্ম করিলে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিব। সর্পেরা গরুড়ের প্রার্থনা শুনিয়া কহিল, অহে বিহঙ্গম! যদি তুমি আপন পরাক্রমপ্রভাবে অমৃত আহরণ করিতে পার, তবে তোমার দাসত্বমোচন হইবেক।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, গরুড় সর্পগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মাতৃসমীপে আসিয়া কহিলেন, জননি! আমি অমৃত আহরণে যাইতেছি, পথে কি আহার করিব, বলিয়া দাও। বিনতা কহিলেন, সমুদ্রমধ্যে বহু সহস্র নিষাদ (৬৬) বাস করে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া অমৃত আহরণ কর। কিন্তু কোনও ক্রমেই তোমার যেন ব্রাহ্মণবধে বুদ্ধি না জন্মে, ব্রাহ্মণ সর্বভূতের অবধ্য ও অনলতুল্য। ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইলে তিনি অগ্নি, সূর্য, বিষ ও শস্ত্রস্বরূপ হন। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে সর্বভূতের গুরুস্বরূপ পরিকীর্তিত হইয়াছেন। ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণ সাধুদিগের পরম পূজনীয়। অতএব বৎস! তুমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও কোনও ক্রমে কদাপি ব্রাহ্মণের বধ বা বিদ্রোহাচরণ করিবে না। সংশিতব্রত (৬৭) ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ ভস্ম করিতে পারেন, কি অগ্নি, কি সূর্য,

(৬৬) ধীবর, যাহারা মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।
(৬৭) যে ব্যক্তি যথানিয়মে নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত উপাসনাদি ধর্মের অনুষ্ঠান করে।

কেহই সেরূপ পারেন না। বক্ষ্যমাণ বিবিধলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ সকল জীবের অগ্রজ, সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ, সকল লোকের পিতা ও গুরু।

গরুড় মাতৃমুখে ব্রাহ্মণের এইরূপ মহিমা ও প্রভাব শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মাতঃ! ব্রাহ্মণের কিপ্রকার আকার, কীদৃশ শীল ও কিরূপ পরাক্রম, তিনি কি অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্তকলেবর অথবা সৌম্যমূর্তি? আমি যে সমস্ত শুভ লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিব, তৎসমুদায় তুমি হেতুনির্দেশপূর্বক বর্ণন কর। বিনতা কহিলেন, বৎস! যিনি তোমার কণ্ঠপ্রবিষ্ট হইয়া বড়িশপ্রায় ক্লেশকর হইবেন ও জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় কণ্ঠদাহ করিবেন, তাঁহাকে সুব্রাহ্মণ জানিবে। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াও কদাপি ব্রাহ্মণবধ করিবে না। বিনতা পুত্রবাৎসল্যপ্রযুক্ত পুনর্বার কহিলেন, যিনি তোমার জঠরে জীর্ণ হইবেন না, তাঁহাকে সুব্রাহ্মণ জানিবে। সর্পমায়াপ্রতারিতা পরম দুঃখিতা পুত্রবৎসলা বিনতা পুত্রের অতুল বীর্য জানিয়াও প্রীত মনে এই আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, বায়ু তোমার পক্ষদ্বয় রক্ষা করুন, চন্দ্র ও সূর্য পৃষ্ঠদেশ, অগ্নি মস্তক, ও বসুগণ সর্ব শরীর রক্ষা করুন। আর আমিও সংযতা ও ব্রতপরায়ণা হইয়া এই স্থানে তোমার মঙ্গলচিন্তনে তৎপরা রহিলাম। এক্ষণে অভিপ্রেত কার্যসিদ্ধি নিমিত্ত নির্বিঘ্নে প্রস্থান কর।

এইরূপ মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর বিহগরাজ পক্ষবিস্তারপূর্বক নভোমণ্ডলে আরোহণ করিলেন। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ পরে বুভুক্ষিত হইয়া দ্বিতীয়কৃতান্তপ্রায় নিষাদগণের বাসস্থানে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অবতরণবেগ দ্বারা এরূপ ধূলিপ্রবাহ উত্থিত হইল যে, নিষাদেরা অন্ধ ও নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, সমুদ্রের জল শুষ্ক হইতে লাগিল, আর পক্ষপবনবেগে সমীপবর্তী বৃক্ষ সকল বিচলিত হইল। তৎপরে বিহগরাজ নিষাদ-দিগের পথ রুদ্ধ করিয়া অতি প্রকাণ্ড মুখ বিস্তার করিলেন। বিষাদমগ্ন নিষাদগণ, পবনবেগ ও ধূলিবর্ষ দ্বারা অন্ধপ্রায় ও দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, ত্বরিত গমনে সেই ভুজঙ্গভোজীর মুখাভিমুখে ধাবমান হইল। যেমন সমস্ত অরণ্য বায়ুবেগে বিঘূর্ণিত হইলে সহস্র সহস্র পক্ষী কাতর হইয়া অন্তরীক্ষে আরোহণ করে, সেইরূপ নিষাদেরা গরুড়ের অতি প্রকাণ্ড বিস্তৃত মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। বুভুক্ষিত বিহগরাজ এইরূপে নিষাদগণের প্রাণসংহার করিয়া মুখসঙ্কোচন করিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক গরুড়ের কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দাহ করিতে লাগিলেন। তখন বিহগরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি মুখব্যাদান করিয়াছি, তুমি ত্বরায় নির্গত হও; ব্রাহ্মণ সদা পাপ কর্মে রত হইলেও আমার বধ্য নহেন। গরুড়বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমার ভার্যা নিষাদীও আমার সমভিব্যাহারে নির্গতা হউক। গরুড় কহিলেন, তুমি

নিষাদীকে লইয়া অবিলম্বে বহির্গত হও; বিলম্ব করিলে আমার জঠরানলে ভস্ম হইয়া যাইবে। তখন বিপ্র নিষাদীসহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গরুড়ের সমুচিত সংবর্ধনা করিয়া স্বাভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সস্ত্রীক বিপ্র নিষ্ক্রান্ত হইলে, বিহগরাজ দুই পক্ষ বিস্তৃত করিয়া অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ পরে নিজ পিতা কশ্যপের দর্শন পাইলেন। কশ্যপ জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কি না, আর নরলোকে তুমি পর্যাপ্ত ভোজন পাইতেছ কি না। গরুড় কহিলেন, পিতঃ! আমার মাতা ও ভ্রাতা কুশলে আছেন, আর আমিও শারীরিক ভাল আছি, কিন্তু পর্যাপ্ত ভোজন পাই না। সর্পেরা আমাকে অমৃত আহরণে প্রেরণ করিয়াছে, আমি জননীর দাসীভাব-বিমোচনার্থে অমৃত আহরণ করিব। জননী নিষাদভক্ষণের আদেশ দিয়াছিলেন, আমি তদনুসারে সহস্র সহস্র নিষাদ ভক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু ক্ষুধানিবৃত্তি হয় নাই। অতএব, যাহা আহার করিয়া অমৃত আহরণ করিতে পারি, আপনি এরূপ কোনও ভক্ষ্য দ্রব্য নির্দেশ করুন। কশ্যপ কহিলেন, বৎস! সম্মুখে সরোবর অবলোকন করিতেছ, ঐ পবিত্র সরোবর দেবলোকেও বিখ্যাত। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবাঙ্মুখে কূর্মরূপী স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি তাহাদিগের পূর্ব জন্মের বৈরকারণ ও আকারের পরিমাণ সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিভাবসু নামে অতি ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম সুপ্রতীক। সুপ্রতীকের এরূপ অভিলাষ নহে যে, পৈতৃক ধন অবিভক্ত থাকে; এজন্য তিনি জ্যেষ্ঠের নিকট সর্বদাই বিভাগের কথা উত্থাপন করেন। এক দিন বিভাবসু বিরক্ত হইয়া সুপ্রতীককে কহিলেন, দেখ, অনেকেই মোহান্ধ হইয়া সর্বদাই বিভাগ করিতে বাঞ্ছা করে; কিন্তু বিভক্ত হইয়াই অর্থমোহে বিমোহিত হইয়া পরস্পরে বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ় ভ্রাতারা ধনার্থে পৃথগ্‌ভূত হইলে, শত্রুরা মিত্রভাবে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের মনোভঙ্গ জন্মাইয়া দেয়; এবং ক্রমে ক্রমে ভগ্নস্নেহ হইলে, তাহারা পরস্পরের নিকট পরস্পরের দোষারোপ করিয়া বৈর বৃদ্ধি করিয়া দিতে থাকে; এইরূপ হইলে অবিলম্বেই তাহাদিগের সর্বনাশ ঘটে। এই নিমিত্ত ভ্রাতৃবিভাগ সাধুদিগের অনুমোদিত নহে। তুমি নিতান্ত মূঢ় হইয়া ধনবিভাগ প্রার্থনা করিতেছ, কোনও ক্রমেই আমার বারণ শুনিতেছ না; অতএব হস্তিযোনি প্রাপ্ত হইবে। সুপ্রতীক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিলেন, তুমিও কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হইবে। বুদ্ধিভ্রষ্ট সুপ্রতীক ও বিভাবসু এইরূপে পরস্পরদত্তশাপপ্রভাবে গজত্ব ও কচ্ছপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াও রোষদোষবশতঃ পরস্পর দ্বেষরত এবং শরীরগুরুতা ও বলদর্পে দর্পিত হইয়া, পূর্ববৈরানুসরণপূর্বক, এই সরোবরে অবস্থিতি করিতেছে। তীরস্থিত গজের শব্দ শুনিতে পাইয়া জলমধ্যবাসী কচ্ছপ সমস্ত সরোবর আলোড়িত করিয়া উত্থিত হইয়াছে, এবং মহাবীর্য গজও

কচ্ছপকে উত্থিত দেখিয়া শুণ্ড কুণ্ডলীকৃত করিয়া জলে অবতীর্ণ হইয়াছে ; তদীয় দন্ত, শুণ্ড, লাঙ্গুল ও পদচতুষ্টয়ের বেগে সরোবর বিচলিত হইয়াছে, কচ্ছপও মস্তক উদ্যত করিয়া যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইয়াছে। গজের আকার ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত ; কচ্ছপ তিন যোজন উন্নত, তাহার শরীরের মণ্ডল দশযোজনপ্রমাণ। উহারা পরস্পর প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধোন্মত্ত হইয়াছে ; তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া স্বকার্য সাধন কর।

কশ্যপ গরুড়কে ইহা কহিয়া এই আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধকালে তোমার মঙ্গল হউক ; আর পূর্ণকুম্ভ, গো, ব্রাহ্মণ ও আর যে কিছু মঙ্গলকর বস্তু আছে, সে সমস্ত তোমার শুভদায়ক হউক। হে মহাবল পরাক্রান্ত! যৎকালে তুমি দেবতাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋক্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিধ বেদ, পবিত্র যজ্ঞীয় হবিঃ, সমস্ত রহস্যশাস্ত্র ও সমস্ত বেদ, তোমার বলাধান করিবেন। গরুড় পিতার আশীর্বাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং অনতিদূরে সেই নির্মলসলিলপূর্ণ পক্ষিকুলসমাকুল হ্রদ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর পিতৃবাক্য স্মরণপূর্বক এক নখে গজ ও অপর নখে কচ্ছপ গ্রহণ করিয়া আকাশমণ্ডলে অধিরোহণ করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে অলম্বনামক তীর্থে উপস্থিত হইয়া দেববৃক্ষ-গণের উপরি আরোহণের উপক্রম করিলে, তাহারা তদীয় পক্ষপবনে আহত হইয়া সাতিশয় কম্পিত হইল, এবং এই আশঙ্কা করিতে লাগিল, পাছে গরুড়ভরে ভগ্ন হই। গরুড়, সেই অভিলষিতফলপ্রদ দেবদ্রুমদিগকে ভঙ্গভয়ে কম্পিত দেখিয়া, অন্যান্য অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ সমস্ত মহাদ্রুম কাঞ্চনময় ও রজতময় ফলে পরিপূর্ণ ও সতত সাতিশয় শোভমান ; তাহাদের শাখা সকল প্রবালকল্পিত, মূলদেশ অনবরত সাগরসলিলে ক্ষালিত হইতেছে। তন্মধ্যে অত্যুচ্চ অতি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ গরুড়কে প্রবল বেগে আগমন করিতে দেখিয়া কহিল, অহে বিহগরাজ! তুমি আমার এই শতযোজনবিস্তৃত মহাশাখায় অবস্থিত হইয়া গজ ও কচ্ছপ ভক্ষণ কর। পর্বততুল্যকলেবর বেগবান্ বিনতাতনয়ের স্পর্শমাত্র, বহুসহস্রবিহগসেবিত বটবৃক্ষ বিচলিত ও সেই নির্দিষ্ট শাখা ভগ্ন হইল।

ত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাবল বিহগরাজের পদস্পর্শমাত্র সেই তরুশাখা ভগ্ন হইল। ভগ্ন হইবামাত্র তিনি উহাকে ধারণ করিলেন, এবং শাখা ভগ্ন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করত, অধোমুখে লম্বমান তপঃপরায়ণ বালখিল্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঋষিগণ এই শাখায় লম্বমান আছেন, শাখা ভূতলে পতিত হইবামাত্র ইঁহাদিগের প্রাণবিনাশ হইবে। অনন্তর, গজ ও কচ্ছপকে নখর দ্বারা দৃঢ়তর রূপে ধারণ করিয়া ঋষিদিগের প্রাণবিনাশ আশঙ্কাতে চঞ্চুপুট দ্বারা সেই শাখা গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ, গরুড়ের এইরূপ

অতিদৈব (৬৮) কর্ম দেখিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে হেতুবিন্যাসপূর্বক তাঁহার এই নাম রাখিলেন যে, যেহেতু এই বিহঙ্গম গুরু ভার গ্রহণপূর্বক উড্ডীন হইয়াছে, এজন্য অদ্যাবধি ইহার নাম গরুড় (৬৯) রহিল। অনন্তর তিনি পক্ষপবনবেগে পার্শ্ববর্তী পর্বত সকল বিচলিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে পতগরাজ বালখিল্য ব্রহ্মর্ষিগণের প্রাণরক্ষার্থে গজ ও কচ্ছপ লইয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে, পর্বতশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনে উপস্থিত হইয়া, তপঃপরায়ণ স্বীয় পিতা কশ্যপের দর্শন পাইলেন। কশ্যপও সেই বলবীর্যতেজঃসম্পন্ন, মন ও বায়ুসম বেগবান্, শৈলশৃঙ্গসমকায়, অচিন্তনীয়, অতর্কণীয়, সর্বভূতভয়ঙ্কর, মহাবীর্যধর, ভীষণমূর্তি, অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত,দেবদানবরাক্ষসের অধৃষ্য ও অজেয়, গিরিশৃঙ্গভেদনক্ষম, সমুদ্রশোষণসমর্থ, ত্রিলোকদলনক্ষম, সাক্ষাৎ কৃতান্ত, দিব্যরূপী বিহঙ্গমকে সমাগত দেখিয়া ও তদীয় মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, বৎস! সহসা এরূপ অসংসাহসিক কর্ম করিও না, এরূপ করিলে ক্লেশ পাইবে, মরীচিপ (৭০) বালখিল্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে ভস্মসাৎ করিতে পারেন। অনন্তর তিনি পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া তপস্যা দ্বারা হতপাপ মহাভাগ বালখিল্যদিগকে এই বলিয়া প্রসন্ন করিলেন, হে তপোধনগণ! গরুড় লোকহিতার্থে মহৎ কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তোমরা অনুজ্ঞা প্রদান কর। বালখিল্যগণ, ভগবান্ কশ্যপের অভ্যর্থনা শ্রবণ করিয়া, সেই শাখা পরিত্যাগপূর্বক তপস্যার্থে পরম পবিত্র হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

বালখিল্যগণ প্রয়াণ করিলে পর, বিনতাতনয় স্বীয় পিতা কশ্যপকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আমি কোন্ স্থানে এই তরুশাখা পরিত্যাগ করি, আপনি কোনও মানুষশূন্য দেশ নির্দেশ করুন। তখন কশ্যপ মানবসমাগমশূন্য, হিমাচ্ছন্ন, অন্য লোকের মনেরও অগোচর, এক পর্বত নির্দেশ করিয়া দিলেন। মহাকায় বিহঙ্গম তরুশাখা এবং গজ ও কচ্ছপ সহিত অতিবেগে সেই পর্বতোদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি যে তরুশাখা লইয়া গমন করিলেন, তাহা এমন প্রকাণ্ড যে, শত গোচর্মনির্মিত অতি দীর্ঘ রজ্জু দ্বারাও তাহার বেষ্টন ও বন্ধন হইতে পারে না। পতগরাজ অনতিদীর্ঘকালমধ্যে সেই শতসহস্রযোজনান্তরস্থিত পর্বতে উপস্থিত হইয়া পিতৃবাক্যানুসারে তদুপরি তরুশাখা পরিত্যাগ করিলেন। শৈলরাজ তদীয় পক্ষপবনে আহত হইয়া কম্পিত হইল, তত্রত্য তরুগণ বিচলিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল, যে সকল মণিকাঞ্চনশোভিত শৃঙ্গ সেই মহাগিরির শোভা সম্পাদন করিত, সে সমস্ত বিশীর্ণ হইয়া সমন্ততঃ পতিত হইল, বহুসংখ্যক বৃক্ষ গরুড়ানীত শাখা দ্বারা অভিহত হইয়া, সুবর্ণকুসুম দ্বারা, বিদ্যুৎসমূহ-

---

(৬৮) দেবতাদিগেরও অসাধ্য।

(৬৯) গুরু শব্দের অর্থ মহৎ ও ডী ধাতুর অর্থ উড়িয়া যাওয়া; এই উভয়ের যোগে গরুড় পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

(৭০) মরীচি শব্দের অর্থ কিরণ, পা ধাতুর অর্থ পান। বালখিল্যেরা সূর্যের কিরণমাত্র পান করিয়া প্রাণধারণ করেন, এজন্য তাঁহাদিগকে মরীচিপ কহে।

শোভিত জলধরগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, বৃক্ষগণ ভূতলে পতিত ও ধাতুরাগে রঞ্জিত হইয়া সাতিশয় শোভমান হইল। তদনন্তর গরুড়, সেই গিরির শিখরদেশে অবস্থিত হইয়া গজ ও কচ্ছপ ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে সেই কূর্ম ও কুঞ্জর অভ্যবহার করিয়া পর্বতের শিখরাগ্রভাগ হইতে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন।

অতঃপর দেবতাদিগের ভয়সূচক উৎপাতারম্ভ হইল। ইন্দ্রের বজ্র ভয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, দিবাভাগে নভোমণ্ডল হইতে ধূম ও অগ্নিশিখা সম্বলিত উল্কাপাত হইতে লাগিল। বসু, রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ ও অন্যান্য দেবতাগণের অস্ত্র সকল পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। অধিক কি কহিব, দেবাসুরযুদ্ধকালেও এরূপ অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটে নাই। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল, সহস্র সহস্র বজ্রাঘাত ও উল্কাপাত হইতে লাগিল, আকাশে বিনা মেঘে ঘোরতর গর্জন হইতে লাগিল ; যিনি দেবতাগণের দেব, তিনিও রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ; দেবতাদিগের মাল্য ম্লান ও তেজঃ নষ্ট হইয়া গেল ; অতি ভীষণ প্রলয়জলধর সকল অজস্র শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল ; ধূলিপ্রবাহ উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের মুকুট মলিন করিল।

দেবরাজ ইন্দ্র, এই সমস্ত দারুণ উৎপাত দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া, বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! কি নিমিত্ত সহসা এই সকল ঘোরতর উৎপাত আরম্ভ হইল ? আমাদিগকে যুদ্ধে অভিভব করিতে পারে, এমন শত্রু উপস্থিত দেখিতেছি না, তবে কি কারণে এ সকল ঘটিতেছে, বলুন। বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তোমার অপরাধ ও অনবধানদোষে, মহাত্মা বালখিল্য মহর্ষিদিগের তপঃপ্রভাবে, বিনতাগর্ভে কশ্যপমুনির গরুড় নামে পক্ষিরূপী পুত্র জন্মিয়াছে ; সেই মহাবল পরাক্রান্ত কামরূপী বিহঙ্গম অমৃত হরণ করিতে আসিয়াছে। তাহার তুল্য বলবান্ আর নাই, সে অমৃতহরণে সমর্থ বটে, তাহার নিকট কিছুই অসম্ভব নয়, সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

ইন্দ্র সুরাচার্যের বচন শ্রবণ করিয়া অমৃতরক্ষকদিগকে কহিলেন, মহাবল মহাবীর্য পক্ষী অমৃতহরণে উদ্যত হইয়াছে ; অতএব তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি, যেন সে বলপূর্বক হরণ করিয়া না লয় ; বৃহস্পতি কহিয়াছেন, তাহার অতুল বল। দেবগণ ইন্দ্রবাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যত্নপূর্বক অমৃত বেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন, এবং দেবরাজও বজ্রহস্তে সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। দিব্যাভরণভূষিত, উজ্জ্বলকায়, পাপসম্পর্কশূন্য, অনুপমবলবীর্যসম্পন্ন, অসুরসংহারকারী সুরগণ, কাঞ্চনময় বৈদূর্যবিনির্মিত মহামূল্য মহোজ্জ্বল সুদৃঢ় বিচিত্র কবচ, বহুবিধ ভয়ঙ্কর অগণন তীক্ষ্ণ শস্ত্র, ধূম স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখাসহকৃত চক্র, পরিঘ, ত্রিশূল, পরশু, বহুবিধ তীক্ষ্ণ শক্তি, উজ্জ্বল করাল করবাল, প্রচণ্ড গদা ইত্যাদি বিবিধ অস্ত্র গ্রহণপূর্বক অমৃতরক্ষণে তৎপর হইলেন। দেবগণ এইরূপে নানাবিধ অস্ত্রসহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া, ভূতলে অকস্মাৎ আবির্ভূত সূর্যকিরণপ্রকাশিত আকাশমণ্ডলের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্রের কি অপরাধ ও কিরূপ অনবধানদোষ ঘটিয়াছিল, বালখিল্য মহর্ষিগণের তপস্যা দ্বারাই বা গরুড় কেন উৎপন্ন হইলেন, দেবর্ষি কশ্যপেরই বা কেন পক্ষিরাজ পুত্র জন্মিল, আর সেই পক্ষীই বা কি কারণে সর্বভূতের অনভিভবনীয়, অবধ্য, কামচারী ও কামবীর্য হইলেন? আমি এই সমস্ত বিষয় শুনিতে বাসনা করি; যদি পুরাণে বর্ণিত থাকে, কীর্তন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাশয় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা পৌরাণিক বিষয় বটে; আমি সংক্ষেপে সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোনও সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রকামনায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঋষি, দেব ও গন্ধর্বগণ সেই যজ্ঞে তাঁহার সমুচিত সাহায্য করেন। কশ্যপ ইন্দ্রকে এবং বালখিল্য মুনিগণ ও অন্যান্য দেবতাদিগকে যজ্ঞীয় কাষ্ঠের আহরণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র স্বীয় সামর্থ্যানুরূপ পর্বতাকার কাষ্ঠভার লইয়া অক্লেশে আগমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, অতি খর্বাকৃতি বালখিল্য ঋষিরা সকলে মিলিয়া একটিমাত্র পত্রবৃন্ত আনিতেছেন; তাঁহাদের কলেবর অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ; তাঁহারা অতি শীর্ণকায়, নিরাহার, নিতান্ত দুর্বল, গোষ্পদের জলে মগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতেছেন। বীর্যমত্ত পুরন্দর তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া উপহাস করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া সত্বর গমনে প্রস্থান করিলেন। ঋষিগণ এইরূপে যৎপরোনাস্তি অবমানিত হইয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন, এবং যাহাতে ইন্দ্রের ভয় জন্মে, এরূপ এক মহৎ কর্মের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা এই কামনা করিয়া মহার্থ মন্ত্রপ্রয়োগপূর্বক যথাবিধি হুতাশনমুখে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন যে, কামবীর্য, কামগম, দেবরাজভয়প্রদ অন্য এক ইন্দ্র উৎপন্ন হউক, অদ্য আমাদিগের তপস্যাফলে ইন্দ্রের শতগুণ শৌর্যবীর্যসম্পন্ন, মনের তুল্য বেগবান কোনও দারুণ প্রাণী উৎপন্ন হউক।

দেবরাজ ইন্দ্র এই ব্যাপার অবগত হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে কশ্যপের শরণাগত হইলেন। প্রজাপতি কশ্যপ দেবরাজমুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া বালখিল্যগণসমীপে গমনপূর্বক কর্মসিদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। সত্যবাদী বালখিল্যগণ তৎক্ষণাৎ, তথাস্তু, বলিলেন। তখন প্রজাপতি কশ্যপ প্রিয় সম্ভাষণপূর্বক সাদর বচনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, ইনি ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছেন; তোমরাও আবার ইন্দ্রের নিমিত্ত যত্ন করিতেছ; ব্রহ্মার নিয়ম অন্যথা করা তোমাদিগের উচিত নয়; কিন্তু তোমাদিগের সঙ্কল্পও ব্যর্থ করা আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তোমরা যে ইন্দ্রের নিমিত্ত যত্ন করিতেছ, তিনি অতি বলবান্ পক্ষীন্দ্র হউন, আমার অনুরোধে তোমরা দেবরাজের প্রতি প্রসন্ন হও। তপোধন বালখিল্যগণ মুনিশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি কশ্যপের বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহার সমুচিত অর্চনা করিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা সকলে মিলিয়া ইন্দ্রার্থে এই উদ্যোগ করিয়াছি, আপনিও পুত্রার্থে এই অনুষ্ঠান

করিয়াছেন ; অতএব আপনি এই ফলোন্মুখ কর্ম গ্রহণ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয়, করুন।

এই সময়েই যশস্বিনী কল্যাণিনী ব্রতপরায়ণা দক্ষকন্যা বিনতা দেবী বহুকাল তপস্যা করিয়া ঋতুস্নানান্তে পুত্রকামনায় স্বামিসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন কশ্যপ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি ! তুমি যাহা মানস করিয়াছ, তাহা সফল হইবে, বালখিল্যগণের তপঃপ্রভাবে ও আমার সঙ্কল্পবলে তোমার গর্ভে ত্রিভুবনেশ্বর দুই বীর পুত্র জন্মিবেক, তাহারা মহাভাগ ও ত্রিলোকপূজিত হইবেক। ভগবান্ কশ্যপ বিনতাকে পুনর্বার কহিলেন, তুমি সাবধানা হইয়া এই মহোদয় গর্ভ ধারণ কর। এই দুই সর্বলোকপূজিত কামরূপী বিহঙ্গম সকল পক্ষীর ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইবেক। অনন্তর প্রীতিপ্রফুল্লবদনে ইন্দ্রকে কহিলেন, বৎস ! তোমার সেই দুই মহাবীর্য ভ্রাতা তোমার সহায় হইবেক, তাহাদিগের দ্বারা তোমার কখনও কোনও অপকার ঘটিবেক না। অতএব বিষাদ পরিত্যাগ কর, তুমিই ত্রিভুবনের ইন্দ্র থাকিবে। কিন্তু আর কখনও তুমি অতি কোপন বাগ্বজ্র ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদিগকে উপহাস বা অমান্য করিও না। ইন্দ্র এইরূপ পিতৃবাক্য শ্রবণে নিঃশঙ্ক হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন। বিনতাও পতির বরপ্রদান দ্বারা চরিতার্থতা লাভ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্তা হইলেন, এবং যথাকালে অরুণ ও গরুড় দুই পুত্র প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে অরুণ বিকলাঙ্গ, তিনি সূর্যদেবের পুরোবর্তী হইয়াছেন ; আর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা গরুড়কে পক্ষিজাতির ইন্দ্রত্বপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। হে ভৃগুনন্দন ! এক্ষণে সেই বিনতাহৃদয়নন্দন পতগেন্দ্রের অতিমহৎ কর্ম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনক ! দেবতাগণ নানাবিধ অস্ত্র গ্রহণপূর্বক সতর্ক হইয়া অমৃত রক্ষা করিতেছেন, এমন কালে পক্ষিরাজ গরুড় অতি বেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে মহাবল পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়া সুরগণ কম্পান্বিত-কলেবর হইলেন এবং হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। অপ্রমেয়-বলবীর্যসম্পন্ন, বিদ্যুৎ ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলকায় বিশ্বকর্মাও অমৃতরক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন ; তিনি মুহূর্তকাল বিহগরাজ গরুড়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তদীয় পক্ষ, নখ ও চঞ্চু প্রহারে বিক্ষত ও মৃতকল্প হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। তদনন্তর গরুড় পক্ষপবন দ্বারা ধূলিপ্রবাহ উদ্ধত করিয়া সমস্ত লোক নিরালোক ও দেবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন। সেই ধূলিবর্ষ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া অমৃতরক্ষক দেবগণ মোহপ্রাপ্ত ও অন্ধপ্রায় হইলেন। গরুড় এইরূপে দেবলোক আকুল করিয়া পক্ষ ও চঞ্চু প্রহার দ্বারা দেবতাদিগের শরীর বিদীর্ণ করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ সহস্রাক্ষ পবনকে এই আজ্ঞা দিলেন, অহে মারুত ! তুমি ত্বরায় এই ধূলিবর্ষ অপসারিত কর, ইহা তোমার কর্ম। মহাবল পবনদেব তৎক্ষণাৎ ধূলিরাশি

অপসারিত করিলে অন্ধকার নিরস্ত হইল। তখন দেবগণ গরুড়কে আক্রমণ করিলেন। দেবতারা প্রহারারম্ভ করিলে, মহাবল মহাবীর্য বিনতানন্দন, নভোমণ্ডলমধ্যবর্তী মহামেঘের ন্যায় সর্বভূতভয়ঙ্কর ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ গরুড়কে নভস্তলস্থিত অবলোকন করিয়া পট্টিশ, পরিঘ, শূল, গদা, প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্র ও সূর্যরূপী চক্র ইত্যাদি বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। প্রতাপবান্ গরুড়, এইরূপে সুরগণ কর্তৃক নানা অস্ত্র দ্বারা সমন্ততঃ আহত হইয়াও, ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি কোনও ক্রমেই বিচলিত হইলেন না, বরং পক্ষদ্বয় ও বক্ষঃস্থল দ্বারা দেবগণকে বিক্ষিপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবতারা গরুড় কর্তৃক বিক্ষিপ্ত, তাড়িত ও আহত হইয়া, শোণিত বমন করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে, সাধ্য ও গন্ধর্বগণ পূর্ব দিকে, বসু ও রুদ্রগণ দক্ষিণ দিকে, আদিত্যগণ পশ্চিম দিকে, আর অশ্বিনীকুমারেরা উত্তর দিকে, পলাইলেন।

তদনন্তর গগনচর পক্ষিরাজ মহাবীর পরাক্রান্ত অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথন, তপন, উলূক, শ্বসন, নিমিষ, প্ররুজ, পুলিন এই নব যক্ষের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। প্রলয়-কালে রুদ্রদেব যেরূপ ভয়ানক হইয়া থাকেন, তিনিও তদ্রূপ হইয়া পক্ষ, নখ ও চঞ্চুপুটের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। মহাবল মহোৎসাহ যক্ষগণ গরুড়প্রহারে সর্বাঙ্গে বিক্ষত হইয়া রুধিরধারাবর্ষী জলধরসমূহের ন্যায় আভাসমান হইল।

পরিশেষে পতগরাজ সেই সমস্ত যক্ষের প্রাণসংহার করিয়া অমৃতস্থানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, অগ্নি অমৃতের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছে; ঐ অগ্নির জ্বালা অতি ভয়ানক, উহা শিখাসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আছে; বোধ হয়, যেন প্রচণ্ড বায়ুবেগে চালিত হইয়া সূর্যদেবকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন অমিত্রঘাতী বেগবান্ গরুড় শতাধিক অষ্ট সহস্র মুখ ধারণ করিলেন, এবং সেই সমস্ত মুখ দ্বারা বহুসংখ্যক নদী পান করিয়া, মহাবেগে পুনরাগমনপূর্বক, পীত নদীজল দ্বারা ঐ জ্বলন্ত অগ্নি নির্বাণ করিলেন। এইরূপে অগ্নিশান্তি করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অতি ক্ষুদ্র কলেবর অবলম্বন করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পক্ষিরাজ অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণময় কলেবর ধারণ করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অমৃতসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার এক লৌহময় চক্র অবিশ্রামে তচ্চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। দেবতারা, ঐ অগ্নিতুল্য সূর্যসমপ্রভ ভয়ঙ্কর যন্ত্র নির্মাণ করিয়া, অমৃতহরণকারীদিগের ছেদনার্থে নিযোজিত রাখিয়াছিলেন। গরুড় তৎক্ষণাৎ অঙ্গসঙ্কোচ করিয়া অরমধ্যবর্তী স্থান দ্বারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন, মহাবীর্য, মহাঘোর, সদা ক্রুদ্ধ,

অতি বেগবান্, অনিমিষনয়ন দুই প্রকাণ্ড সর্প অমৃত রক্ষা করিতেছে। উহাদের উভয়েরই শরীর অতি প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় উজ্জ্বল, বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা, চক্ষু অনবরত বিষ উদ্গার করিতেছে। তাহাদের মধ্যে এক সর্পও যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। বিনতানন্দন, তাহাদের চক্ষুতে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া উভয়কেই অন্ধ করিলেন, এবং অলক্ষিত হইয়া নভোমণ্ডল হইতে তাড়ন ও প্রহার দ্বারা তাহাদের কলেবর খণ্ড খণ্ড করিয়া অমৃতকুম্ভ গ্রহণপূর্বক অতি বেগে উড্ডীন হইলেন, এবং স্বয়ং অমৃত পান না করিয়া তথা হইতে বহির্গমনপূর্বক সূর্যপ্রভা আচ্ছন্ন করিয়া অপরিশ্রান্ত চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

বিনতানন্দন বিহগরাজ অমৃত গ্রহণপূর্বক আকাশপথে গমন করিতে করিতে নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তিনি তাঁহার এইরূপ অলৌকিক ক্রিয়া ও লোভবিরহদর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, হে বিহগ! প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। গরুড় কহিলেন, আমি তোমার উপরে থাকিবার বাসনা করি। ইহা কহিয়া পুনর্বার নারায়ণকে কহিলেন, আর ইহাও বর দাও, যেন আমি অমৃত পান না করিয়াও অজর ও অমর হই। নারায়ণ তথাস্তু বলিলেন। গরুড় এইরূপে নারায়ণসন্নিধান হইতে বরদ্বয় প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! তুমিও প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বর দিব। বিষ্ণু মহাবল বিহগরাজের নিকট, তুমি আমার বাহন হও, এই প্রার্থনা করিলেন, এবং উপরে থাকিবার বর সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ধ্বজ করিয়া রাখিলেন। গরুড় তথাস্তু বলিয়া বায়ুসম বেগে প্রস্থান করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র, এইরূপে গরুড়কে অমৃত গ্রহণপূর্বক বিমানপথে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, ক্রোধভরে বজ্রপ্রহার করিলেন। তিনি বজ্র দ্বারা তাড়িত হইয়া হাস্যমুখে মধুর বচনে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেখ, এই বজ্রের আঘাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথা বোধ হয় নাই, কিন্তু যে মুনির অস্থিতে বজ্র নির্মিত হইয়াছে, তাঁহার ও বজ্রের ও তোমার মানরক্ষার্থে একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিতেছি, তুমি ইহার অন্ত পাইবে না, ইহা কহিয়া পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সকল প্রাণী ঐ পরিত্যক্ত পক্ষ অতি সুন্দর দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া তাঁহার নাম সুপর্ণ (৭১) রাখিলেন। দেবরাজ এই মহৎ আশ্চর্য দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, এই পক্ষী অবশ্যই মহাপ্রাণী হইবেক, তখন তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, অহে বিহগরাজ! আমি তোমার অদ্ভুত বল বিক্রম জানিতে ও চির কালের নিমিত্ত তোমার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে বাসনা করি।

গরুড় যে পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বজ্রপ্রহারপ্রভাবে তাহা তিন খণ্ডে বিভক্ত হইলে, এক এক খণ্ড হইতে ময়ূর, নকুল ও দ্বিমুখ পক্ষী, এই তিন সর্পসংহারকারীর উৎপত্তি হইল।

(৭১) সু সুন্দর পর্ণ পক্ষ, যাহার পক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

গরুড় কহিলেন, হে দেবরাজ! তোমার ইচ্ছানুসারে অদ্যাবধি তোমার সহিত আমার সখ্য হউক; আমার বল অতি প্রভূত ও অত্যন্ত অসহ্য। সাধুরা কদাপি স্বীয় বল প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন না; তুমি সখা, তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই নিমিত্ত বর্ণন করিব; নতুবা অকারণে আত্মপ্রশংসা করা উচিত নহে। আমার বলের কথা অধিক কি বলিব, এই পৃথিবীকে সমুদায় পর্বত, সমুদায় বন ও সমুদায় সাগর সহিত এক পক্ষে বহন করিতে পারি; আর তুমিও যদি ঐ পক্ষ অবলম্বন কর, ঐ সমভিব্যাহারে তোমাকেও বহিতে পারি; আর যদি আমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভুবন একত্র করিয়া বহন করি, তথাপি আমি পরিশ্রান্ত হইব না। আমার এত বল।

গরুড়ের এইরূপ উক্তি শুনিয়া সর্বলোকহিতকারী কিরীটধারী শ্রীমান্ দেবরাজ কহিলেন, হে বিহগরাজ! তুমি যাহা কহিলে তোমাতে সকলই সম্ভব; এক্ষণে তুমি আমার সহিত পরমোৎকৃষ্ট বন্ধুতা স্থাপন কর। আর যদি তোমার অমৃত প্রয়োজন না থাকে, আমাকে প্রদান কর; তুমি যাহাদিগকে দিবে, তাহারা কেবল আমাদিগের উপর অত্যাচার করিবে। গরুড় কহিলেন, হে সহস্রাক্ষ! আমি কোন কারণবশতঃ অমৃত লইয়া যাইতেছি; কিন্তু কাহাকেও পান করিতে দিব না। আমি যে স্থানে ইহা রাখিব, যদি পার, তথা হইতে হরণ করিয়া আনিও। ইন্দ্র কহিলেন, হে পক্ষীন্দ্র! তুমি যাহা কহিলে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন গরুড় কদ্রুপুত্রগণের দৌরাত্ম্য ও ছলকৃত মাতৃদাস্য স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি সকলের প্রভু হইয়াও তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, মহাবল ভুজগণ আমার ভক্ষ্য হউক। দেবরাজ গরুড়কে তথাস্তু বলিয়া মহাত্মা দেবদেব যোগীশ্বর হরির নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি শুনিয়া গরুড়োক্তবিষয়ে স্বীয় সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ত্রিদশনায়ক পুনর্বার গরুড়কে কহিলেন, তুমি অমৃত স্থাপন করিলেই আমি হরণ করিয়া আনিব।

এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া দেবরাজ বিদায় হইলে, গরুড় মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং হৃষ্ট মনে সমস্ত সর্পদিগকে কহিলেন, আমি অমৃত আনিয়াছি, কুশের উপর রাখিয়া দিব; তোমরা ত্বরায় স্নান ও মঙ্গলাচরণ করিয়া পান কর। দেখ, তোমরা যেরূপ কহিয়াছিলে, আমি তাহাই সম্পাদন করিলাম; অতএব অদ্যপ্রভৃতি আমার জননী দাসীভাব হইতে মুক্ত হউন। সর্পেরা তাঁহাকে তথাস্তু বলিয়া স্নান করিতে গেল; এবং ইন্দ্রও অবসর বুঝিয়া আগমনপূর্বক অমৃত গ্রহণ করিয়া পুনর্বার স্বর্গারোহণ করিলেন। সর্পেরা স্নানক্রিয়া জপবিধি ও মঙ্গলাচরণ সমাধান করিয়া হৃষ্ট চিত্তে অমৃতপানাভিলাষে সেই প্রদেশে উপস্থিত হইল। কিন্তু গরুড় যে কুশাসনে রাখিবেন বলিয়াছিলেন, তথায় অমৃত না দেখিয়া বিবেচনা করিল, আমরা যেমন ছল করিয়া বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনই ছল করিয়া অমৃত গ্রহণ করিয়াছে। পরে, এই স্থানে অমৃত রাখিয়াছিল বলিয়া, তাহারা কুশাসন চাটিতে লাগিল, এবং

তাহাতেই তাহাদের জিহ্বা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল। অমৃতস্পর্শ দ্বারা কুশের নাম পবিত্রী হইল।

মহাত্মা গরুড় এইরূপে অমৃতের হরণ ও আহরণ এবং সর্পগণের দ্বিজিহ্বতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তদনন্তর মহাযশাঃ খগকুলচূড়ামণি পরম হৃষ্ট চিত্তে সেই কাননে বিহার করিয়া ভুজঙ্গগণ ভক্ষণপূর্বক স্বীয় জননীর আনন্দ জন্মাইতে লাগিলেন। যে নর ব্রাহ্মণসভাতে এই উপাখ্যান শ্রবণ অথবা পাঠ করে, সে মহাত্মা বিহগরাজ গরুড়ের মাহাত্ম্যকীর্তন দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করিয়া স্বর্গারোহণ করে, সন্দেহ নাই।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! ভুজঙ্গজননী কদ্রু স্বীয় সন্তানদিগকে, এবং বিনতা-তনয় অরুণ আপন জননীকে, যে কারণে শাপ দেন, আর মহাত্মা কশ্যপ কদ্রু ও বিনতাকে যে বর প্রদান করেন, এবং বিনতাগর্ভসম্ভূত বিহগযুগলের নাম, তুমি ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত বর্ণন করিলে। কিন্তু এ পর্যন্ত সর্পগণের নাম কীর্তন কর নাই। এক্ষণে আমরা প্রধান প্রধান সর্পের নাম শ্রবণে বাসনা করি।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! সর্পগণ অসংখ্য, অতএব তাহাদের সকলের নাম কীর্তন করিব না। প্রধান প্রধানের নামোল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন।

শেষ নাগ সর্ব প্রথমে জন্মেন, তদনন্তর বাসুকি, তৎপরে ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, মণিনাগ, আপূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনিল, কল্মাষ, শবল, আর্যক, উগ্রক, কলসপোতক, শুনামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, করোটক, শঙ্ক, বালিশিখ, নিষ্টানক, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদ্গরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সংবর্তক, পদ্ম, পদ্ম, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্র, বিল্বক, বিল্বপাণ্ডুর, মূষকাদ, শঙ্খশিরাঃ, পূর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বিরজাঃ, সুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিকর্ণ, পিঠরক, সুমুখ, কৌণপাসন, কুঠর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, হল্লিক, কর্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর ও মহোদর। হে দ্বিজোত্তম! প্রধান প্রধান নাগের নাম শুনাইলাম; বাহুল্যভয়ে অপরাপরের নাম কীর্তন করিলাম না। ইহাদের সন্তান ও সন্তানের সন্তান অসংখ্য; এই নিমিত্ত তাহাদের কথা বলিলাম না। বহু সহস্র, বহু প্রযুত, বহু অর্বুদ সর্প আছে, তাহাদের সংখ্যা করা অসাধ্য।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! তুমি মহাবীর্য দুরাধর্ষ সর্পগণের নাম কীর্তন করিলে শ্রবণ করিলাম, সর্পেরা মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণানন্তর কি করিয়াছিল, বল।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাযশাঃ ভগবান্ শেষ নাগ, মাতৃসমীপ পরিত্যাগপূর্বক জটাচীরধর, বায়ুভক্ষ, দৃঢ়ব্রত, একাগ্রচিত্ত, ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, গন্ধমাদন, বদরী, গোকর্ণ, পুষ্কর ও হিমালয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরম পবিত্র তীর্থে ও আশ্রমে ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার শরীরের মাংস, ত্বক্ ও শিরা সকল শুষ্ক হইয়া গেল। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা শেষের অবিচলিত ধৈর্য ও তাদৃশী দশা দর্শন করিয়া কহিলেন, হে শেষ! তুমি এ কি করিতেছ? প্রজা-লোকের মঙ্গল চিন্তা কর, তোমার কঠোর তপস্যা দ্বারা সকল লোক তাপিত হইতেছে; তোমার মনে কি অভিলাষ আছে? আমার নিকট ব্যক্ত কর। শেষ কহিলেন, আমার সহোদর ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত দুরাশয়, আমি তাহাদিগের সহিত বাস করিতে অনিচ্ছু; আপনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করুন। তাহারা সতত শত্রুর ন্যায় পরস্পর দ্বেষ করে; আর যেন তাহাদের মুখাবলোকন করিতে না হয়, এই অভিলাষে আমি তপস্যা করিতেছি। তাহারা অনবরত সপুত্রা বিনতার অহিতাচরণ করে। বিহগরাজ বৈনতেয় আমাদের আর এক ভ্রাতা আছেন; তিনি পিতৃদত্তবরপ্রভাবে অতিশয় বলবান হইয়াছেন। আমার ভ্রাতারা সর্বদা তাঁহার বিদ্বেষ করে। অতএব আমি তপস্যা দ্বারা শরীর পরিত্যাগ করিব; বাসনা এই, যেন জন্মান্তরেও তাহাদের মুখাবলোকন করিতে না হয়।

এইরূপ শেষবাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ কহিলেন, বৎস! আমি তোমার ভ্রাতৃগণের আচরণের বিষয় সকলই জানি; আর মাতৃশাপে তাহাদের যে মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও জানি। কিন্তু পূর্বেই সেই শাপের পরিহার করা আছে। অতএব ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত তোমার খেদ করিবার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, অদ্য আমি তোমাকে বর প্রদান করিব। আমি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি। সৌভাগ্যক্রমে তোমার বুদ্ধি ধর্মপথবর্তিনী হইয়াছে। প্রার্থনা করি, উত্তরোত্তর তোমার ধর্মে অচলা মতি হউক। শেষ কহিলেন, হে পিতামহ! এইমাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন আমার মতি শম, তপ ও ধর্মে সতত রত থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন, আমি তোমার শম দম দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে এক অনুরোধ করিতেছি, প্রজাদিগের হিতার্থে তোমাকে তাহা রক্ষা করিতে হইবেক। তুমি অরণ্য, গিরি, সাগর, গ্রাম, নগরাদি সমেত এই বিচলিতা পৃথিবীকে এরূপে ধারণ কর, যেন উহা অচলা হয়। শেষ কহিলেন, হে বরদ! প্রজাপতে! মহীপতে! ভূতপতে! জগৎপতে! আপনকার আজ্ঞা প্রমাণ, আমি পৃথিবীকে নিশ্চলা করিয়া ধারণ করিব, আপনি আমার মস্তকে ন্যস্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভুজগরাজ! পৃথিবী তোমাকে পথ দিবেন, তদ্দ্বারা তুমি তাঁহার অধোভাগে গমন কর। তুমি পৃথিবীকে ধারণ করিলে আমি পরম পরিতোষ পাইব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পকুলাগ্রজ শেষ নাগ তথাস্তু বলিয়া ভূবিবরে প্রবেশ করিলেন। তদবধি তিনি এই সসাগরা ধরণীকে মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। এইরূপে

প্রতাপবান্ ভগবান্ অনন্তদেব, দেবাদিদেব ব্রহ্মার আদেশানুসারে, একাকী বসুধা ধারণ করিয়া পাতালে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্বদেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পিতামহ বিনতাতনয় বিহগরাজ গরুড়ের সহিত অনন্তদেবের মৈত্রী স্থাপন করিয়া দিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগকুলশ্রেষ্ঠ বাসুকি মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণানন্তর সেই শাপ-মোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ঐরাবত প্রভৃতি ধর্মপরায়ণ সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। বাসুকি কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! জননী আমাদিগকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই বিদিত আছ। আইস, সকলে মিলিয়া সেই শাপমোচনের উপায় চিন্তা করি। সর্বপ্রকার শাপেরই অন্যথা হইবার উপায় আছে; কিন্তু মাতৃদত্ত শাপ হইতে পরিত্রাণের কোনও পথ নাই। বিশেষতঃ, জননী অবিনাশী, অপ্রমেয়স্বরূপ, সত্যলোকাধিপতি ব্রহ্মার সমক্ষে আমাদিগকে শাপ দিয়াছেন, ইহাতেই আমার হৃৎকম্প হইতেছে। নিশ্চিত বুঝিলাম, আমাদের সমূলে বিনাশ উপস্থিত; নতুবা কি নিমিত্ত অবিনাশী ভগবান্ শাপদানকালে জননীকে নিবারণ করিলেন না? অতএব, যাহাতে সমস্ত নাগকুলের ভাবী বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ হয়, আইস, সকলে একত্র হইয়া তাহার উপায় চিন্তা করি; কোনও ক্রমেই কালাতিপাত করা উচিত নহে। আমরা সকলেই বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ; মন্ত্রণা করিয়া অবশ্যই শাপমোক্ষের কোনও উপায় উদ্ভাবিত করিতে পারিব। দেখ! পূর্ব কালে ভগবান্ অগ্নি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবতারা মন্ত্রণাবলে তাঁহার উদ্ভাবন করেন। এক্ষণে যাহাতে জনমেজয়ের সর্পসত্র না হইতে পায়, অথবা বিফল হইয়া যায়, এমন উপায় করিতে হইবেক।

এইরূপ বাসুকিবাক্য শ্রবণ করিয়া, নীতিবিশারদ সমবেত কদ্রুনন্দনেরা তথাস্তু বলিয়া উপস্থিত কার্যসাধনবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিল। তন্মধ্যে কোনও কোনও নাগ কহিল, আমরা ব্রাহ্মণের স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া জনমেজয়ের নিকট এই ভিক্ষা চাহিব যে, তুমি যজ্ঞ করিও না। কতকগুলি পণ্ডিতাভিমানী নাগ কহিল, চল, সকলে গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হই, তাহা হইলে তিনি সকল বিষয়েই কার্যাকার্য নিরূপণের নিমিত্ত আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন; তখন আমরা যাহাতে যজ্ঞ না হইতে পায়, এরূপ পরামর্শ দিব। সেই অসাধারণ বুদ্ধিমান্ রাজা আমাদিগকে নীতিবিদ্যাবিশারদ দেখিয়া অবশ্যই যজ্ঞবিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন। আমরা ঐহিক ও পারলৌকিক অশেষ বিষম দোষ দর্শাইয়া ও অপরাপর ভূরি ভূরি কারণ নির্দেশ করিয়া, এরূপে নিষেধপক্ষে মত দিব যে, আর সে যজ্ঞ হইতে পাইবেক না। অথবা যে সর্পসত্রবিধানজ্ঞ রাজকার্যতৎপর ব্যক্তি সেই যজ্ঞের উপাধ্যায় হইবেন, আমাদের মধ্যে কোনও নাগ গিয়া তাঁহাকে দংশন করুক, তাহা হইলেই তাঁহার মৃত্যু হইবেক। এইরূপে উপাধ্যায় মরিলে আর সে যজ্ঞ হইবেক না। তদ্ভিন্ন সর্পসত্রজ্ঞ আর আর যে সকল ব্যক্তি

যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইবেন, তাঁহাদিগকেও দংশন করিব ; তাহা হইলেই কার্য সিদ্ধ হইবেক। ইহা শুনিয়া অন্যান্য ধর্মাত্মা দয়ালু নাগ কহিল, এ তোমাদের অতি অসৎ পরামর্শ, ব্রহ্মহত্যা কোনও ক্রমেই বিধেয় নহে, বিপৎকালে নির্মলধর্মমূলক প্রতিকার চিন্তা করাই প্রশস্ত কল্প, অধর্মপরায়ণতা সমস্ত জগৎ উচ্ছিন্ন করে। আর আর নাগেরা কহিল, আমরা জলধরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া বারিবর্ষণ দ্বারা যজ্ঞীয় প্রদীপ্ত হুতাশন নির্বাণ করিব ; আর ঋত্বিক্গণ রজনীযোগে যখন অনবহিত থাকিবেন, কোনও কোনও নাগ সেই সময়ে যজ্ঞপাত্র সকল হরণ করিয়া আনিবে, তাহা হইলেই যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিবেক। অথবা, শত সহস্র নাগগণ সকলকেই এক কালে দংশন করুক, এরূপ করিলে অবশ্যই তাহাদের ত্রাস জন্মিবেক। কিংবা ভুজগেরা অতি অপবিত্র স্বীয় মূত্র পুরীষ দ্বারা সংস্কৃত ভোজ্য বস্তু সকল দূষিত করুক। আর আর নাগেরা কহিল, আমরাই সেই যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইব, এবং অগ্রেই দক্ষিণা দাও বলিয়া যজ্ঞ ভঙ্গ করিব। এইরূপ করিলে রাজা জনমেজয় আমাদিগের বশীভূত হইয়া আমাদিগেরই ইচ্ছানুরূপ কর্ম করিবেন। কেহ কেহ কহিল, রাজা যৎকালে জলক্রীড়া করিবেন, তখন তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া গৃহে আনিয়া বন্ধন করিয়া রাখিব, তাহা হইলেই যজ্ঞ রহিত হইবে। আর কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য মূর্খ নাগ কহিল, অন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া রাজাকেই দংশন করা ভাল, তাহা হইলেই সকল সম্পন্ন হইল ; রাজা মরিলেই সকল অনর্থের মূলোচ্ছেদন হইবেক। মহারাজ! আমাদিগের যেরূপ বুদ্ধি তদনুরূপ কহিলাম ; এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিমত হয়, কর।

নাগরাজ বাসুকিকে ইহা কহিয়া নাগগণ তদীয় মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বাসুকি কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমগণ! তোমরা সকলে যে পরামর্শ স্থির করিলে তাহা আমার মতে কর্তব্য বোধ হইতেছে না। তোমরা যাহা যাহা কহিলে, তাহার কিছুই আমার অভিমত নহে। কিন্তু যাহাতে তোমাদের হিত হয়, এমন কোনও উপায় দেখিতে হইবেক। আপনার ও জ্ঞাতিবর্গের হিতার্থে, আমার মতে মহাত্মা কশ্যপকে প্রসন্ন করাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তোমাদিগের বচনানুসারে কার্য করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, তাহা আমিই বিবেচনা করিয়া স্থির করিব। এক্ষণে আমি কুলজ্যেষ্ঠ, সুতরাং যাবতীয় দোষ গুণ আমার উপরেই পড়িবেক ; এই নিমিত্তই আমি বিশেষ দুঃখিত হইতেছি।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণের ও বাসুকির বাক্য শ্রবণ করিয়া এলাপত্র নামে এক নাগ বাসুকিকে সম্বোধিয়া কহিল, হে নাগরাজ! যিনি যাহা বলুন, কোনও ক্রমে সে যজ্ঞ অন্যথা হইবার নহে, পাণ্ডুকুলোদ্ভব যে রাজা জনমেজয় হইতে আমাদের কুলক্ষয়সম্ভাবনা হইয়াছে, তাঁহাকেও বঞ্চনা করিতে পারা যাইবেক না। যে ব্যক্তি

দৈবদুর্বিপাকগ্রস্ত হয়, তাহার দৈবই অবলম্বন করা উচিত ; এমন স্থলে দৈব ব্যতিরেকে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। হে নাগগণ! আমাদিগেরও এ দৈবভয়, অতএব দৈবই অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে আমি যাহা কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

যৎকালে জননী আমাদিগকে শাপ প্রদান করিলেন, আমি মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া ভয়াকুলিত চিত্তে দেবতাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিলাম। দেবতারা শাপশ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া কহিলেন, দেবদেব! কঠিনহৃদয়া কদ্রু আপনার সমক্ষে স্বীয় প্রিয়তম তনয়দিগকে নিষ্ঠুর শাপ দিলেন ; কোনও জননী কোনও কালেই এরূপ বিরূপ আচরণ করেন নাই। আপনিও তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যই প্রমাণ করিলেন। কি কারণে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন না, আমরা জানিতে বাসনা করি। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ! সর্পেরা অতি ক্রূরস্বভাব, তীক্ষবিষ, ঘোররূপ, ও অসংখ্য, অতএব আমি প্রজাদিগের হিতার্থে কদ্রুকে নিবারণ করি নাই। কিন্তু যে সকল সর্প অতি তীক্ষবিষ, ক্ষুদ্রাশয়, ও অকারণে পরহিংসক, তাহাদিগেরই বিনাশ হইবেক ; যাহারা ধর্মপরায়ণ, তাহাদের কোনও ভাবনা নাই। সেই কাল উপস্থিত হইলে, যে উপায়ে তাহাদের ভয়মোচন হইবেক, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাযাবরবংশে জরৎকারু নামে তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, ধীমান্, মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই জরৎকারুর আস্তীক নামে পুত্র জন্মিবেক ; তাহা হইতেই সর্পসত্রের নিবারণ হইবেক এবং যে সকল সর্প ধর্মপরায়ণ তাহারা রক্ষা পাইবেক। দেবগণ পিতামহবাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে প্রভো! মহাতপাঃ মহাবীর্য, মহামুনি জরৎকারু কাহার গর্ভে সেই মহাত্মা পুত্র উৎপাদন করিবেন? ব্রহ্মা কহিলেন, মহাবীর্য জরৎকারু মুনি সনাম্নী কন্যাতে সেই মহাবীর্য পুত্র উৎপাদন করিবেন। সর্পরাজ বাসুকির জরৎকারু নামে এক ভগিনী আছে, তাহার গর্ভে সেই পুত্র জন্মিবেক, এবং সেই পুত্রই সর্পগণের শাপমোচন করিবেক। দেবগণ শ্রবণমাত্র তথাস্তু বলিলেন ; ব্রহ্মাও দেবতাদিগকে পূর্বোক্ত বাক্য কহিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

অতএব, হে নাগরাজ বাসুকে! এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, নাগকুলের ভয়শান্তি নিমিত্ত ব্রতপরায়ণ যাচমান জরৎকারু ঋষিকে ভিক্ষাস্বরূপ জরৎকারুনাম্নী ভগিনী প্রদান কর। আমি শাপমোচনের এই উপায় শ্রবণ করিয়াছি।।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! সমস্ত নাগগণ এলাপত্রবাক্যশ্রবণে সাতিশয় হর্ষিত হইয়া শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। বাসুকিও শুনিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং তদবধি স্বীয় স্বসা জরৎকারুকে পরমাদরে পরিপালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে পর, দেবতারা সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করিলেন। অতি বলবান্ নাগরাজ বাসুকি মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। দেবগণ মন্থনকার্য সমাপন

করিয়া, বাসুকিকে সমভিব্যাহারে লইয়া, ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিনয়বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! বাসুকি মাতৃশাপে ভীত হইয়া সাতিশয় পরিতাপ পাইতেছেন। ইনি জ্ঞাতিবর্গের হিতৈষী, আপনি কৃপা করিয়া ইঁহার মনোবেদনা দূর করুন। বাসুকি সতত আমাদের হিতৈষী ও প্রিয়কারী। হে দেবদেব! প্রসন্ন হইয়া ইঁহার মানসিক ক্লেশ নিরাকরণ করুন।

দেবগণের অভ্যর্থনা শুনিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, হে অমরগণ! পূর্ব কালে এলাপত্র ইঁহাকে যাহা কহিয়াছিল, তাহা আমারই বাক্য। নাগরাজ বাসুকি যথাসময়ে তদনুযায়ী কার্য করুন, যাহারা পাপাত্মা, তাহাদিগেরই বিনাশ হইবেক, ধর্মপরায়ণদিগের কোনও আশঙ্কা নাই। দ্বিজশ্রেষ্ঠ জরৎকারু জন্মগ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যায় একান্ত রত হইয়াছেন; বাসুকি যথাকালে তাঁহাকে ভগিনী দান করুন। এলাপত্র নাগকুলের হিতজনক যে বাক্য কহিয়াছে, তাহা কদাচ অন্যথা হইবেক না।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এইরূপ প্রজাপতিবাক্য শ্রবণানন্তর নাগরাজ বাসুকি জরৎকারুকে ভগিনীদানসংকল্প করিয়া, বহুসংখ্যক নাগগণকে তৎসমীপে নিয়ত অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। কহিয়া দিলেন, জরৎকারু ভার্যাপরিগ্রহের বাসনা প্রকাশ করিলে ত্বরায় আমাকে সংবাদ দিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের সকল রক্ষা হইবেক।

চত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি জরৎকারু নামে যে মহাত্মা ঋষির চরিত কীর্তন করিলে, তাঁহার নামের অর্থ শুনিতে বাসনা করি। তিনি যে জরৎকারু নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইলেন, ইহার কারণ কি? তুমি কৃপা করিয়া জরৎকারু শব্দের যথার্থ অর্থ ব্যাখ্যা কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎশব্দের অর্থ ক্ষীণ, কারুশব্দের অর্থ দারুণ। তাঁহার শরীর অতিশয় দারুণ ছিল, ধীমান্ মহর্ষি সেই দারুণ শরীরকে কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি লোকে জরৎকারু নামে বিখ্যাত। উক্ত হেতুবশতঃ বাসুকির ভগিনীর নামও জরৎকারু।

ধর্মাত্মা শৌনক শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সূতনন্দন! যাহা কহিলে, যুক্তিসিদ্ধ বটে। তুমি যাহা যাহা কহিলে, সকলই শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আস্তীকের জন্মবৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনকবাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে লাগিলেন। মহামতি বাসুকি, সমস্ত নাগগণকে আদেশ দিয়া, জরৎকারু ঋষিকে ভগিনীদান করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়া রহিলেন। বহু কাল অতীত হইল, সেই ঊর্ধ্বরেতাঃ মহর্ষি কোনও ক্রমে দারপরিগ্রহে অভিলাষী হইলেন না; কেবল তপস্যারত, বেদাধ্যয়ন-তৎপর, ও নির্ভয়চিত্ত হইয়া ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল অতীত

হইলে পর, কুরুবংশীয় পরীক্ষিৎ পৃথিবীর রাজা হইলেন। তিনি স্বীয়-প্রপিতামহ মহাবাহু পাণ্ডুর ন্যায় ধনুর্বিদ্যাপারদর্শী, যুদ্ধে দুর্ধর্ষ ও মৃগয়াশীল ছিলেন। রাজা সর্বদাই মৃগ, মহিষ, ব্যাঘ্র, বরাহ, ও অন্য অন্য বহুবিধ বন্য জন্তু বধ করিয়া ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। একদা তিনি বাণ দ্বারা এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশে ধনুর্গ্রহণপূর্বক তদনুসরণক্রমে গহন বনে প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে ভগবান্ মহাদেব যজ্ঞমৃগ বিদ্ধ করিয়া হস্তে ধনুর্ধারণপূর্বক স্বর্গে সেই মৃগের অন্বেষণার্থে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হইয়া কোনও মৃগই জীবিত থাকে না ও পলায়ন করিতে পারে না; কিন্তু সেই মৃগ যে বিদ্ধ হইয়াও অদর্শন প্রাপ্ত হইল, সে কেবল তাঁহার অবিলম্বে স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ হইল।

রাজা পরীক্ষিৎ সেই মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে দূরদেশে নীত হইলেন, এবং শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া এক গোচরস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক ঋষি স্তনপানপরায়ণ বৎসগণের মুখনিঃসৃত ফেন পান করিতেছেন। রাজা ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, অতএব সত্বর গমনে মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভো ভো মুনীশ্বর! আমি অভিমন্যুতনয় রাজা পরীক্ষিৎ। এক মৃগ আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিয়াছে, আপনি দেখিয়াছেন কি না। সেই মুনি মৌনব্রত, অতএব কিছুই উত্তর দিলেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সমীপ-পতিত মৃতসর্প উঠাইয়া তাঁহার স্কন্ধে ক্ষেপণ করিলেন। ঋষি তাহাতে রুষ্ট হইলেন না ও ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না। তখন রাজা মুনিকে তদবস্থ দেখিয়া অক্রোধ হইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু মুনি সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মুনীশ্বর অতিশয় ক্ষমাশীল ছিলেন, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎকে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ জানিতেন, এজন্য নিতান্ত অবমানিত হইয়াও তাঁহাকে শাপ দিলেন না। ভরতকুলপ্রদীপ রাজাও সেই মহর্ষিকে তাদৃশ ধর্মপরায়ণ বলিয়া জানিতেন না, এই নিমিত্তই তাঁহার তাদৃশ অবমাননা করিলেন।

সেই মহর্ষির অতি তেজস্বী তপঃপরায়ণ এক যুবা পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম শৃঙ্গী। শৃঙ্গী স্বভাবতঃ অতিশয় ক্রোধপরায়ণ ছিলেন, একবার ক্রুদ্ধ হইলে শত শত অনুনয়-বচনেও প্রসন্ন হইতেন না। তিনি অতি সংযত হইয়া সময়ে সময়ে সর্বলোকপিতামহ সর্বভূতহিতকারী ব্রহ্মার উপাসনা করিতে যাইতেন। এক দিন তিনি উপাসনান্তে ব্রহ্মার অনুজ্ঞা লইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সখা কৃশ নামে এক ঋষিপুত্র হাসিতে হাসিতে কৌতুক করিয়া তাঁহার পিতৃবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শৃঙ্গী অতিশয় কোপনস্বভাব ও বিষতুল্য, পিতার অপমানবার্তা শ্রবণমাত্র রোষবিষে পরিপূর্ণ হইলেন। কৃশ কহিলেন, অহে শৃঙ্গিন্! তুমি এমন তপস্বী ও তেজস্বী; কিন্তু তোমার পিতা স্কন্ধে মৃত সর্প বহন করিতেছেন। অতএব আর তুমি বৃথা গর্ব করিও না, এবং আমাদিগের মত বেদবিৎ সিদ্ধ তপস্বী ঋষিপুত্রেরা কিছু কহিলেও কোনও কথা কহিও না। এখন তোমার পুরুষত্বাভিমান কোথায় রহিল ও সেই সকল গর্ব-

বাক্যই বা কোথায় গেল? কিঞ্চিৎ পরেই দেখিবে, তোমার পিতা শব বহন করিতেছেন। আমি তোমার পিতার তাদৃশ অবমাননা দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু সেইরূপ অবমানিত হইলে যাহা করা উচিত, তিনি তদনুরূপ কোনও কর্ম করেন নাই।

একচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তেজস্বী শৃঙ্গী কৃশের নিকট পিতার শববহনবার্তা শ্রবণ করিয়া কোপানলে জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং কৃশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রিয় বাক্যে সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কি নিমিত্ত আমার পিতা স্কন্ধে মৃত সর্প ধারণ করিতেছেন, বল। কৃশ কহিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। শৃঙ্গী কহিলেন, হে কৃশ! আমার পিতা রাজা পরীক্ষিতের কি অপরাধ করিয়াছিলেন, স্বরূপ বর্ণন কর; পরে আমি আপন তপস্যার প্রভাব দেখাইতেছি। কৃশ কহিলেন, অভিমন্যুতনয় রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ারসে ব্যাসক্ত হইয়া একাকী অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এক মৃগ তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিলে, রাজা তাহার অন্বেষণার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তোমার পিতাকে পলায়িত মৃগের কথা বারংবার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। তোমার পিতা মৌনব্রতাবলম্বী, অতএব কিছুই উত্তর দিলেন না। রাজা রুষ্ট হইয়া অটনী দ্বারা তাঁহার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছেন। তোমার পিতা তদবধি তদবস্থই আছেন, রাজা নিজ রাজধানী হস্তিনাপুর প্রস্থান করিয়াছেন।

এইরূপে পিতৃস্কন্ধে মৃতসর্পক্ষেপণবার্তা শ্রবণ করিয়া ঋষিকুমার শৃঙ্গী ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইলেন, তাঁহার নয়নযুগল লোহিতবর্ণ হইল। তেজস্বী শৃঙ্গী ক্রোধে অন্ধ হইয়া আচমনপূর্বক এই বলিয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন, যে রাজকুলাধম মৌনব্রতপরায়ণ বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছে, অতি তীক্ষ্ণতেজাঃ তীক্ষ্ণবিষ সর্পরাজ তক্ষক আমার বচনানুসারে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া অদ্য হইতে সপ্ত রাত্রির মধ্যে সেই কুরুকুলের অকীর্তিকর, ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী, পাপিষ্ঠ দুরাচারকে যমালয়ে লইয়া যাইবেক।

শৃঙ্গী ক্রোধভরে রাজা পরীক্ষিৎকে এই শাপ প্রদান করিয়া গোষ্ঠস্থিতপিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তথায় পিতার স্কন্ধে মৃত ভুজগ অবলোকন করিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কোপাবিষ্ট হইলেন, এবং দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! কুরুকুলাধম পরীক্ষিৎ তোমার যেরূপ অবমাননা করিয়াছিল, আমি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে তদুপযুক্ত এই ভয়ানক শাপ দিয়াছি যে, সর্পশ্রেষ্ঠ তক্ষক সপ্ত দিবসে তাহাকে যমালয়ে লইয়া যাইবেক।

শমীক ঋষি ক্রোধান্ধ পুত্রের এইরূপ উগ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি

যে কর্ম করিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। ইহা তপস্বীর ধর্ম নহে। আমরা সেই রাজার অধিকারে বাস করি, তিনি ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া আমাদের রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার অনিষ্টাচরণ করা আমার অভিমত নহে। সৎপথাবলম্বী রাজা কদাচিৎ কোনও অপরাধ করিলেও অস্মাদৃশ লোকের ক্ষমা করা উচিত। ধর্মকে নষ্ট করিলে ধর্ম আমাদিগকে নষ্ট করেন, সন্দেহ নাই। দেখ, যদি রাজা রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, আমাদের ক্লেশের আর পরিসীমা থাকে না, আর ইচ্ছানুরূপ ধর্মানুষ্ঠান করিতে পারি না। ধর্মপরায়ণ রাজারা আমাদের রক্ষা করেন, তাহাতেই আমরা নির্বিঘ্নে বহুলধর্মোপার্জন করি। সেই উপার্জিত ধর্মে ধর্মতঃ রাজাদিগের ভাগ আছে। অতএব রাজা কদাচিৎ অপরাধ করিলে ক্ষমা করাই কর্তব্য। বিশেষতঃ, রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় পিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় আমাদিগের রক্ষা করিতেছেন। প্রজাপালন রাজার পরম ধর্ম। অদ্য সেই মহাত্মা ক্ষুধার্ত ও শ্রান্ত হইয়া, আমার মৌনব্রতধারণের বিষয় না জানিয়াই, এই কর্ম করিয়াছেন। দেশ অরাজক হইলে নিয়ত দস্যুভয়াদি নানা দোষ জন্মে। লোক উচ্ছৃঙ্খল হইলে রাজা দণ্ডবিধান দ্বারা শাসন করেন। দণ্ডভয়েই পুনর্বার শান্তিস্থাপন হয়। ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলে কেহ ধর্মানুষ্ঠান করিতে পারে না, ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলে কেহ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারে না। রাজা ধর্ম স্থাপন করেন, ধর্ম হইতে স্বর্গ স্থাপিত হয়, রাজার প্রভাবেই নির্বিঘ্নে যাবতীয় যজ্ঞক্রিয়া নির্বাহ হয়, অনুষ্ঠিত যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা দেবতাদিগের প্রীতি জন্মে, দেবতা হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্য, শস্য হইতে মনুষ্যদিগের প্রাণধারণ হয়। অতএব অভিষেকাদিগুণসম্পন্ন রাজা মনুষ্যদিগের বিধাতা স্বরূপ। ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, রাজা দশশ্রোত্রিয়ের সমান মান্য। সেই রাজা অদ্য ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আমার মৌনব্রতধারণের বিষয় না জানিয়াই, এরূপ কর্ম করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তুমি বালস্বভাবসুলভ অবিমৃষ্যকারিতাপরবশ হইয়া কি নিমিত্ত সহসা এরূপ দুষ্কর্ম করিলে ? রাজা কোনও ক্রমেই আমাদিগের শাপ দিবার পাত্র নহেন।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

শৃঙ্গী কহিলেন, পিতঃ! শাপ দেওয়াতে যদিও আমার সাহসিকতা অথবা দুষ্কর্ম করা হইয়া থাকে, আর উহা তোমার প্রিয়ই হউক, অপ্রিয়ই হউক, যাহা কহিয়াছি, মিথ্যা হইবার নহে। আমি তোমাকে তত্ত্ব কথা কহিতেছি, উহা কদাচ অন্যথা হইবেক না; আমি পরিহাসকালেও মিথ্যা কহি না, শাপদানকালের ত কথাই নাই। শমীক কহিলেন, বৎস! আমি জানি, তুমি অত্যন্ত উগ্রপ্রভাব ও সত্যবাদী, কখনও মিথ্যা কহ নাই, সুতরাং তোমার শাপ মিথ্যা হইবার নহে। পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও, তাহাকে পিতার শাসন করা কর্তব্য; তাহা হইলে পুত্র উত্তরোত্তর গুণশালী ও যশস্বী হইতে পারে। তুমি ত বালক, তোমাকে অবশ্যই শাসন করিতে পারি। তুমি সর্বদা তপস্যা করিয়া থাক; যাঁহারা তপস্যা ও যোগানুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবসম্পন্ন হয়েন, তাঁহাদের অতিশয় কোপবৃদ্ধি হয়। তুমি পুত্র,

তাহাতে বয়সে বালক, আবার যৎপরোনাস্তি অবিবেচনার কর্ম করিয়াছ, এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তোমাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। অতএব কহিতেছি শুন, তুমি শমপথাবলম্বী হইয়া এবং বন্য ফল মূল মাত্র আহার ও ক্রোধের দমন করিয়া তপস্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। লোকে পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় অশেষ ক্লেশে ধর্মসঞ্চয় করে, কিন্তু ক্রোধবশ হইলে এক কালে সমুদায় সঞ্চিত ধর্ম উচ্ছিন্ন হয়। ধর্মহীনদিগের সদ্গতি নাই। ক্ষমাশীল লোকের শমই সিদ্ধির অদ্বিতীয় সাধন, ক্ষমাশীলের ইহলোক পরলোক উভয়ত্র জয়। অতএব সতত ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া চলিবে। ক্ষমাশীল হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। আমি শমপথাবলম্বী হইয়া যাহা করিতে পারি তাহা করি; রাজাকে এই সংবাদ পাঠাইয়া দি যে, আমার পুত্র নিতান্ত বালক, অদ্যাপি তাহার বুদ্ধির পরিপাক হয় নাই; তুমি আমার যে অবমাননা করিয়াছিলে, সে তদ্দর্শনে অমর্ষবশ হইয়া তোমাকে শাপ দিয়াছে।

এইরূপ কহিয়া সুব্রত তপঃপরায়ণ শমীকমুনি গৌরমুখনামক সুশীল সমাহিত স্বীয় শিষ্যকে রাজা পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইলেন, এবং কহিয়া দিলেন, অগ্রে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরে এই সংবাদ নিবেদন করিবে। গৌরমুখ, গুরুর আদেশানুসারে ত্বরায় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া, দ্বারপাল দ্বারা সংবাদ দিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজকৃত অভ্যাগতসৎকার স্বীকার ও শ্রান্তি পরিহার করিয়া আদ্যোপান্ত শমীকবাক্য নরপতিগোচরে নিবেদন করিতে লাগিলেন, মহারাজ! শান্ত, দান্ত, মহাতপাঃ পরমধর্মাত্মা, মৌনব্রতপরায়ণ শমীকঋষি আপনার রাজ্যে বাস করেন। আপনি অটনী দ্বারা তাঁহার স্কন্ধদেশে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র ক্ষমা না করিয়া পিতার অজ্ঞাতসারে আপনাকে এই শাপ দিয়াছেন, তক্ষক সপ্তরাত্রমধ্যে আপনকার প্রাণসংহার করিবেক। শমীকমুনি পুত্রকে শাপনিবারণের নিমিত্ত বারংবার কহিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে, সে পাপ অন্যথা করে। মহর্ষি কুপিত পুত্রকে কোনও ক্রমেই শান্ত করিতে না পারিয়া, পরিশেষে আপনকার হিতার্থে আমাকে সংবাদ দিতে পাঠাইয়াছেন।

রাজা পরীক্ষিৎ গৌরমুখের এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ ও স্বকৃত গর্হিত কর্ম স্মরণ করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। শমীকমুনি মৌনব্রত, এই নিমিত্তই উত্তর দেন নাই, ইহা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। যে মহাত্মা সেইপ্রকার অবমানিত হইয়াও এরূপ দয়া প্রদর্শন করিলেন, তাঁহার উপরেও আমি তাদৃশ অত্যাচার করিয়াছি, মনোমধ্যে এই আলোচনা করিয়া তাঁহার পরিতাপের আর সীমা রহিল না। বিনা দোষে ঋষির অবমাননা করিয়াছি, ইহা ভাবিয়া তিনি যেরূপ দুঃখিত হইলেন, নিজ মৃত্যুর কথা শুনিয়া তদ্রূপ হইলেন না। অনন্তর গৌরমুখকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন, আপনি মহর্ষিকে বলুন, যেন তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন।

গৌরমুখ প্রস্থান করিবামাত্র, রাজা একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিয়া, এক সর্বতঃসুরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন, তথায় বহু চিকিৎসক, নানা ঔষধ ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে নিযোজিত করিলেন, এবং সেই প্রাসাদে থাকিয়া সর্ব প্রকারে রক্ষিত হইয়া রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কোনও ব্যক্তিই তাঁহার নিকটে যাইতে পায় না, সর্বত্রগামী বায়ুও সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারে না।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ মহর্ষি কাশ্যপ শুনিয়াছিলেন যে, পন্নগপ্রধান তক্ষক দংশন করিয়া রাজাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেক। অতএব তিনি মনে করিয়াছিলেন, তক্ষক দংশন করিলে আমি চিকিৎসা দ্বারা রাজাকে বিষমুক্ত করিব, তাহাতে আমার ধর্ম ও অর্থ উভয় লাভ হইবেক। নির্ধারিত সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে, কাশ্যপ একাগ্র মনে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে নাগেন্দ্র তক্ষক, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আকার পরিগ্রহপূর্বক, পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনীশ্বর! তুমি সত্বর হইয়া কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইতেছ? কাশ্যপ কহিলেন, অদ্য সর্পরাজ তক্ষক কুরুকুলোদ্ভব শত্রুবিনাশন রাজা পরীক্ষিৎকে স্বীয় তেজঃ দ্বারা ভস্মাবশেষ করিবেক, আমি চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে যাইতেছি। তক্ষক কহিলেন, হে মহর্ষে! আমিই সেই তক্ষক, আমিই রাজাকে দগ্ধ করিব। আমি দংশন করিলে তুমি চিকিৎসা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিবে না, অতএব নিবৃত্ত হও। কাশ্যপ কহিলেন, তুমি দংশন করিলে আমি বিদ্যাবলে রাজাকে বিষমুক্ত করিতে পারিব, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

তক্ষক কহিলেন, যদি আমি কোনও বস্তু দংশন করিলে তুমি চিকিৎসা করিয়া নির্বিষ করিতে পার, আমি এই বটবৃক্ষ দংশন করিতেছি, তুমি জীবন দান কর। তুমি যত পার যত্ন কর ও আপন মন্ত্রবল দেখাও, আমি তোমার সমক্ষে এই বটবৃক্ষ দগ্ধ করিতেছি। কাশ্যপ কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! যদি তোমার অভিরুচি হয়, বটবৃক্ষ দংশন কর, আমি এখনই উহাকে পুনর্জীবিত করিতেছি। তক্ষক, মহাত্মা কাশ্যপের এইরূপ বাক্য শুনিয়া, নিকটে গিয়া বটবৃক্ষ দংশন করিলেন। দংশন করিবামাত্র, বৃক্ষ অত্যুগ্রবিষপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ ভস্মাবশেষ হইল। এইরূপে বৃক্ষকে ভস্মীভূত করিয়া তক্ষক কাশ্যপকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই বৃক্ষের জীবনদানবিষয়ে যত্ন কর। তক্ষকবচনান্তে কাশ্যপ দগ্ধ বৃক্ষের সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ করিয়া কহিলেন, হে পন্নগরাজ! আমার বিদ্যাবল দেখ, আমি তোমার সমক্ষে বৃক্ষকে বাঁচাইতেছি। তদনন্তর, দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ভগবান্ কাশ্যপ বিদ্যাপ্রভাবে সেই ভস্মরাশীকৃত বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন। প্রথমতঃ অঙ্কুরমাত্র, তৎপরে ক্রমে ক্রমে পত্রদ্বয়, পত্ররাশি, শাখা, মহাশাখা সমুদায় প্রস্তুত হইল।

এইরূপে কাশ্যপের মন্ত্রবলে বৃক্ষকে পুনর্জীবিত দেখিয়া তক্ষক কহিলেন, হে দ্বিজরাজ! তুমি যে আমার অথবা মাদৃশ অন্য কাহারও বিষ নাশ করিতে পার, এ তোমার অতি আশ্চর্য ক্ষমতা। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আকাঙ্ক্ষা করিয়া তথায় যাইতেছ। তুমি যে অভিলষিত লাভের আশয়ে সেই রাজার নিকটে যাইতেছ, যদি তাহা দুর্লভও হয়, আমি তোমাকে দিব, তুমি তথায় যাইও না। রাজা বিপ্রশাপে পতিত, তাঁহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, এমন স্থলে তথায় যাইলেও তোমার কৃতকার্য হওয়া সন্দেহস্থল। তাহা হইলেই, তোমার ত্রিলোকব্যাপিনী নির্মলা কীর্তি, প্রভাহীন দিবাকরের ন্যায়, এক কালে বিলয়প্রাপ্ত হইবেক। হে দ্বিজবর! যদি তুমি রাজার নিকট ধনলাভবাসনায় যাইতেছ, এমন হয়, তাহা হইলে তুমি সেখানে যত পাইতে পার, আমি তোমাকে তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। মহাতেজাঃ কাশ্যপ, তক্ষকবাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যুর বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, ধ্যানারম্ভ করিলেন। অনন্তর, দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে রাজার আয়ুঃশেষ নিশ্চয় করিয়া, তক্ষকের নিকট হইতে অভিলাষানুরূপ ধনগ্রহণপূর্বক গৃহ প্রতিগমন করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা কাশ্যপ নিবৃত্ত হইলে পর, তক্ষক সত্বর গমনে হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন। গমনকালে লোকমুখে শুনিতে পাইলেন, রাজা বিষহর মন্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া যৎপরোনাস্তি সাবধান হইয়া আছেন। তখন তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, মায়াবলে রাজাকে বঞ্চনা করিতে হইবেক, অতএব কি উপায় অবলম্বন করি? অনন্তর, স্বীয় অনুচর সর্পদিগকে তাপসবেশ ধারণ করাইয়া, রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন, কহিয়া দিলেন, তোমরা, বিশেষ কার্য আছে, এইরূপ ভান করিয়া, অব্যাকুলিত চিত্তে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে আশীর্বাদস্বরূপ ফল কুশ ও জল প্রদান করিবে। ভুজঙ্গমগণ, তক্ষকের আদেশানুসারে তথায় উপস্থিত হইয়া, রাজাকে কুশ কুসুম ফল জল প্রদানপূর্বক যথাবিধি আশীর্বাদ করিল। বীর্যবান্ রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ সেই সকল গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাদের কার্য শেষ করিয়া দিয়া গমন করিতে কহিলেন।

কপটতাপসবেশধারী নাগগণ নির্গত হইলে পর, রাজা যাবতীয় অমাত্য ও সুহৃদ্বর্গকে কহিলেন, আইস, সকলে মিলিয়া তাপসগণের আনীত এই সকল সুস্বাদ ফল ভক্ষণ করি। রাজা ব্রহ্মশাপমূলক দুর্দৈবপ্রযোজিত হইয়া সচিবগণসমভিব্যাহারে ফলভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তক্ষক যে ফলে প্রবিষ্ট ছিলেন, দৈবগত্যা রাজা স্বয়ং ভক্ষণার্থে সেই ফল লইলেন। ভক্ষণ করিতে করিতে তন্মধ্য হইতে অতি ক্ষুদ্র তাম্রবর্ণ কৃষ্ণনয়ন এক কৃমি নির্গত হইল। রাজা, হস্তে সেই কৃমি লইয়া অমাত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, সূর্য অস্তগত হইতেছে, অদ্য আর আমার বিষভয় নাই। অতএব মুনিবাক্য সত্য হউক, এই কৃমি তক্ষকপ্রতিরূপ হইয়া আমাকে দংশন করুক, তাহা হইলেই শাপের পরিহার হইল। মন্ত্রীরাও কালবশীভূত হইয়া তাঁহার মতের অনুবর্তী হইলেন। মুমূর্ষু

হৃতচেতন রাজা সেই কৃমিকে গ্রীবাতে স্থাপন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃমিরূপী তক্ষক তৎক্ষণাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ফণমণ্ডল দ্বারা রাজার গ্রীবা বেষ্টনপূর্বক ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া তাঁহাকে দংশন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষকের ফণমণ্ডলে বেষ্টিত দেখিয়া বিষণ্ণবদন ও সাতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহারা তক্ষকের ভয়ঙ্কর গর্জন শ্রবণে ভয়ার্ত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং দেখিতে পাইলেন, তক্ষক নভোমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় গমন করিতেছেন। তদনন্তর, সেই প্রাসাদকে ভুজগরাজের বিষজনিত হুতাশনে বেষ্টিত ও প্রজ্বলিত অবলোকন করিয়া, তাঁহারা চারিদিকে পলায়ন করিলেন। রাজা বজ্রাহতপ্রায় ভূতলে পতিত হইলেন।

এইরূপে রাজা তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে, অমাত্যগণ রাজপুরোহিত দ্বারা তদীয় পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সমাধান করাইলেন, এবং যাবতীয় পৌরগণকে সমবেত করিয়া রাজার শিশু পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। লোকে এই কুরুকুলপ্রবীর শত্রুঘাতী রাজাকে জনমেজয় নামে ঘোষণা করে। মহামতি রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয় বালক হইয়াও, পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, স্বীয় প্রপিতামহ মহাবীর অর্জুনের ন্যায়, রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রিগণ, অভিনব রাজাকে দুষ্টদমনাদিকার্যে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী দর্শন করিয়া, তাঁহার দারক্রিয়া সমাধানার্থে কাশিরাজ সুবর্ণবর্মার নিকট তদীয় বপুষ্টমানাম্নী কন্যা প্রার্থনা করিলেন। কাশিরাজ কুরুকুলপ্রদীপ রাজা জনমেজয়কে বপুষ্টমা প্রদান করিলেন। জনমেজয় তাঁহাকে সহধর্মিণী পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কদাপি অন্য নারীতে আসক্তচিত্ত হয়েন নাই। যেমন পুরূরবা পূর্ব কালে উর্বশীকে পাইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইনিও এই মহিষী পাইয়া প্রসন্ন হইয়া নানা মনোহর সরোবর ও রমণীয় উপবনে তাঁহার সহিত বিহারসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা বপুষ্টমাও হৃষ্টচিত্তা হইয়া অনুরাগাতিশয় সহকারে বিহার-কালে সেই সৎপতিকে পরম সুখী করিয়াছিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এই সময়েই অতি তেজস্বী মহাতপস্বী মহর্ষি জরৎকারু কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইয়া নানা পবিত্র তীর্থে স্নান করিয়া ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এইরূপে বায়ুভক্ষ, নিরাহার, দিন দিন ক্ষীণকলেবর, ও যত্রসায়ংগৃহ হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে, একদা তিনি অতি দীনভাবাপন্ন, অনাহারী, শুষ্কশরীর, ঊর্ধ্বপাদ, অধঃশিরাঃ, গর্তে লম্বমান স্বীয় পিতৃগণকে অবলোকন করিলেন। তাঁহাদিগকে পরিত্রাণেচ্ছু বোধ

করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনারা কে বলুন, আমি দেখিতেছি আপনারা একমাত্র উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া অধোমুখে গর্তে লম্বমান আছেন, গর্তস্থিত মূষিক উশীরস্তম্বের মূল প্রায় সমস্ত ভক্ষণ করিয়াছে, একমাত্র তন্তু অবশিষ্ট আছে, তাহাও অবিলম্বেই নিঃশেষ হইবে, অনন্তর আপনারাও এই গর্তে পতিত হইবেন। আপনাদিগকে এপ্রকার ঘোর বিপদাপন্ন দেখিয়া আমার শোক উদ্ভূত হইতেছে ; অতএব আজ্ঞা করুন, আপনাদিগের কি সাহায্য করিব, আমার সঞ্চিত তপস্যার চতুর্থ ভাগ, তৃতীয় ভাগ, অর্ধ ভাগ বা সমগ্র দ্বারা আপনারা নিষ্কৃতি লাভ করুন।

পিতৃপুরুষেরা কহিলেন, হে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিন্‌! তুমি আপন তপস্যার ফল দিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু তপস্যাবলে আমাদিগের উদ্ধারলাভ হইতে পারে না, আমাদিগেরও তপস্যার ফল আছে। আমরা কেবল বংশলোপের উপক্রম হওয়াতেই অপবিত্র নরকে পতিত হইতেছি। আমরা এই মহাগর্তে লম্বমান হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছি ; এজন্য তোমার পৌরুষ সর্বত্র বিখ্যাত, তথাপি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। হে মহাভাগ! তুমি আমাদিগকে শোকাবিষ্ট ও সাতিশয় দুঃখিত দেখিয়া অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ ; অতএব তুমি আমাদিগের পরিচয় শ্রবণ কর। আমরা যাযাবর নামে ঋষি, বংশনাশের উপক্রম হওয়াতেই পুণ্যলোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি, আমাদিগের প্রগাঢ় তপস্যার ফল বিলুপ্ত হইয়াছে, আমাদের আর কোনও উপায় নাই। আমরা অতি হতভাগ্য, আমাদিগের একমাত্র সন্তান আছে, কিন্তু সেই হতভাগ্যের থাকা না থাকা তুল্য হইয়াছে। তাহার নাম জরৎকারু। জরৎকারু বেদবেদাঙ্গপারগ, নিয়তাত্মা ও ব্রতপরায়ণ, সে সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তপস্যাধর্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহার তপস্যালোভদোষেই আমাদের দুর্দশা ঘটিয়াছে। তাহার ভার্যা নাই, পুত্র নাই, বান্ধবও নাই, তাহাতেই আমরা অনাথের ন্যায় হতজ্ঞান হইয়া এই মহাগর্তে লম্বমান আছি। হে দ্বিজবর! আমরা যে উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া আছি, উহা আমাদিগের কুলস্তম্ব ; আর যে স্তম্বমূল দেখিতেছ, তাহা আমাদিগের কালগ্রস্ত সন্তানপরম্পরা, এবং যে অর্ধাবশিষ্ট মূল দেখিতেছ ও যাহাতে আমরা লম্বিত আছি, ওই তপস্যারত মূঢ়মতি অচেতন জরৎকারু ; আর যে মূষিক দেখিতেছ, ইনি মহাবল পরাক্রান্ত কাল, ইনিই অল্পে অল্পে তাহাকে সংহার করিতেছেন। জরৎকারুর কঠোর তপস্যায় আমাদিগের উদ্ধার সাধন হইবে না। আমরা হতভাগ্য, আমাদিগের মূল প্রায় শেষ হইয়াছে ; এই দেখ, আমরা পাপাত্মার ন্যায় অধঃপতিত হইতেছি ; আমরা সবান্ধবে এই গর্তে পতিত হইলে জরৎকারুও কালপ্রেরিত হইয়া নিরয়গামী হইবেক। তপস্যা যজ্ঞ প্রভৃতি যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ পরম পবিত্র কর্ম আছে, সে সকল সন্তানের সমান উপকারক নহে। তুমি আমাদের দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছ, এ এ নিমিত্ত তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি আমাদিগকে যেপ্রকার দেখিলে তাহার সহিত দেখা করিয়া সমস্ত অবিকল বর্ণন করিবে, এবং এই অনুরোধ করিবে

যে, তুমি দারপরিগ্রহে ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ হও। সে যাহা হউক, তুমি আমাদিগের পরম বন্ধুর ন্যায় অনুকম্পা করিতেছ, অতএব, তুমি কে আমরা শুনিতে বাসনা করি।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎকারু, পিতৃগণের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে একান্ত শোকাভিভূত হইয়া, অশ্রুজলপূর্ণ লোচনে অর্ধস্ফুট বচনে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা আমার পূর্ব পুরুষ, আমারই নাম জরৎকারু, আমি আপনাদিগের অপরাধী সন্তান, অতি পাপাত্মা ও অকৃতাত্মা, অতএব আপনারা আমার যথোচিত দণ্ডবিধান করুন এবং আজ্ঞা করুন, আপনাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবেক। পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! তুমি আমাদিগের ভাগ্য-বশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত এ পর্যন্ত দারপরিগ্রহ কর নাই। জরৎকারু কহিলেন, হে পিতামহগণ! আমার বাসনা এই, আমি ঊর্ধ্ব'রেতাঃ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিব। আমি দারপরিগ্রহ করিব না, এই আমার একান্ত ইচ্ছা। এক্ষণে, আপনাদিগকে এই গর্তে পক্ষীর ন্যায় লম্বমান দেখিয়া, ব্রহ্মচর্য হইতে নিবৃত্ত হইলাম। আমি আপনাদিগের অভিপ্রেত সম্পাদনার্থে নিঃসন্দেহ দারপরিগ্রহ করিব। যদি কখনও সনাম্নী কন্যা প্রাপ্ত হই, যদি সেই কন্যা বিনা প্রার্থনায় স্বয়ং উপস্থিত হয়, আর যদি তাহার ভরণ পোষণ করিতে না হয়, তাহার পাণিগ্রহণ করিব। হে পিতামহগণ! আমি যথার্থ কহিতেছি, আপনাদিগের অনুরোধে আমি এই নিয়মে দারপরিগ্রহে সম্মত আছি, প্রকারান্তরে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না। এই প্রকারে পরিণীতা ভার্যার গর্ভে আপনাদিগের উদ্ধারক সন্তান উৎপন্ন হইবেক, এবং আপনারাও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবেন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে শৌনক! জরৎকারু পিতৃগণকে এইরূপ কহিয়া ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ বলিয়া ভার্যালাভে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। তখন তিনি নির্বিণ্ণ মনে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং পিতৃগণের হিতসাধন-মানসে কন্যালাভার্থে উচ্চৈঃস্বরে তিন্ বার এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন, এই স্থলে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম অথবা অদৃষ্ট প্রাণী আছে, তাহারা আমার বাক্য শ্রবণ করুক; আমি অতি কঠোর তপস্যায় কালযাপন করিতেছিলাম, কিন্তু আমার পূর্ব পুরুষেরা অতিশয় কাতর হইয়া বংশরক্ষার্থে আমারে দারপরিগ্রহের আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে আমি দারপরিগ্রহে কৃতসংকল্প হইয়া কন্যালাভার্থে সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়াছি, আমি দরিদ্র ও দুঃখশীল, আমার উল্লিখিত প্রাণিসমূহের মধ্যে যদি কাহারও কন্যা থাকে, তিনি আমাকে প্রদান করুন, কিন্তু যে কন্যা সনাম্নী ও ভিক্ষান্ন স্বরূপে উপনীতা হইবেক, এবং আমাকে যাহার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিতে হইবেক না, আমাকে তোমরা এরূপ কন্যা প্রদান কর। বাসুকি যে সকল নাগকে

জরৎকারুর অন্বেষণে নিযোজিত করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার নিকটে গিয়া এই সংবাদ প্রদান করিল। নাগরাজ বাসুকি শ্রবণমাত্র আপন ভগিনীকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, অরণ্য প্রবেশপূর্বক জরৎকারুসমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ভিক্ষান্ন স্বরূপে প্রদান করিলেন। কিন্তু সে কন্যা সনাম্নী কি না ও তাহার ভরণপোষণের ভার লইতে হইবেক কি না, এই সংশয়ে তৎপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বাসুকিকে কহিলেন, যদি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করি, আমি ভরণ পোষণ করিতে পারিব না।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগরাজ বাসুকি মহর্ষি জরৎকারুকে কহিলেন, হে মুনিবর! আমার ভগিনী তোমার সনাম্নী বটেন, ইঁহারও নাম জরৎকারু। ইনি তোমার মত তপস্যায় রত। তুমি ইঁহাকে সহধর্মিণীরূপে পরিগ্রহ কর, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যাবজ্জীবন প্রাণপণে ইঁহার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। আমি তোমারে দান করিবার নিমিত্তই এত দিন ইঁহারে অবিবাহিত রাখিয়াছি। ঋষি কহিলেন, তবে এই নিয়ম স্থির হইল, আমি ইঁহার ভরণপোষণ করিব না। আর, ইনি কখনও আমার অপ্রিয় কর্ম করিবেন না, করিলেই পরিত্যাগ করিব।

নাগরাজ, ভগিনীর ভরণপোষণ করিব, এই অঙ্গীকার করিলে পর, ধর্মাত্মা জরৎকারু তদীয় আলয়ে গমনপূর্বক যথাবিধানে নাগরাজভগিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ হর্ষিত মনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর জরৎকারু সহধর্মিণীসমভিব্যাহারে বাসগৃহে প্রবেশপূর্বক, পরিকল্পিত পরম রমণীয় শয্যায় শয়ন করিলেন। তথায় তিনি পত্নীর সহিত এই নিয়ম করিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তুমি কদাচ অপ্রিয় বাক্য কহিবে না ও অপ্রিয় কর্ম করিবে না, করিলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব, এবং আর তোমার আবাসে অবস্থিতি করিব না; যাহা কহিলাম, স্মরণ করিয়া রাখিবে। নাগরাজভগিনী, স্বামিবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত উদ্বিগ্না ও দুঃখিতা হইয়া, তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইলেন, এবং অতিসাবধানে ও অতিকষ্টে স্বামীর পরিচর্যা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে জরৎকারুর গর্ভাধানকাল উপস্থিত হইলে, তিনি. যথাবিধানে স্বামি-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি জলন্তঅনলতুল্য তেজস্বী গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কতিপয় দিবস অতীত হইলে, একদা মহাযশস্বী জরৎকারু মুনি, নিতান্ত ক্লান্তের ন্যায়, নাগভগিনী জরৎকারুর ক্রোড়দেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদ্রাগত হইলেন। বহু ক্ষণ অতীত হইল, তথাপি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, সূর্যদেব অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। মনস্বিনী বাসুকিভগিনী, স্বামীর সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি বিধির অতিক্রমনিমিত্তক ধর্মলোপদর্শনে সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,

এক্ষণে আমার কি কর্তব্য, ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ করি কি না। ইনি অত্যন্ত উগ্রস্বভাব, যদি ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ করি, নিঃসন্দেহ কোপ করিবেন। নিদ্রাভঙ্গ না করিলে সন্ধ্যার সময় বহিয়া যায়, তাহাতে ধর্মলোপ হয়। এক্ষণে কি করিলে আমি অপরাধিনী না হই, বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু কোপ ও ধর্মশীলের ধর্মলোপ, এই উভয়ের মধ্যে ধর্মলোপ সমধিক দোষাবহ। অতএব যাহাতে ধর্মলোপ নিবারণ হয়, তাহাই কর্তব্য।

মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, মধুরভাষিণী বাসুকীভগিনী সেই জ্বলন্তঅনলপ্রায় প্রদীপ্ততেজাঃ নিদ্রিত মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বিনয়বচনে কহিলেন, মহাভাগ! সূর্য অস্তগত হইতেছেন, গাত্রোত্থানপূর্বক আচমন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা কর। অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত, পশ্চিম দিকে সন্ধ্যা প্রবৃত্ত হইতেছে। মহাতপাঃ ভগবান্ জরৎকারু, স্বীয় সহধর্মিণীর বাক্য শ্রবণে রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! তুমি আমার অবমাননা করিলে, আর আমি তব সমীপে অবস্থিতি করিব না, অতঃপর স্বস্থানে প্রস্থান করিব। আমার স্থির সিদ্ধান্ত আছে, আমি নিদ্রাগত থাকিতে সূর্যদেবের সামর্থ্য কি যথাকালে অস্তগমন করেন। সামান্য ব্যক্তিও অবমানিত হইলে অবমাননাস্থলে বাস করিতে পারে না; আমার অথবা মাদৃশ ধর্মশীল ব্যক্তির কথাই নাই।

জরৎকারু, স্বামীর এইরূপ হৃদয়কম্পকর বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ভীতা হইয়া, নিবেদন করিলেন, ভগবন্! তোমার ধর্মলোপ হয়, এই ভয়ে আমি তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, অবমাননার অভিসন্ধিতে করি নাই। তখন মহাতপাঃ জরৎকারু ঋষি সাতিশয় কোপাবিষ্ট ও ভার্যাত্যাগাভিলাষী হইয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, আমি অবশ্যই প্রস্থান করিব। পূর্বে বাসগৃহে তোমার সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলাম। যাহা হউক, যত দিন ছিলাম, সুখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম। তোমার ভ্রাতাকে বলিও, মুনি চলিয়া গিয়াছেন। আর, আমি প্রস্থান করিলে পর, তুমিও শোকাকুল হইও না।

এইরূপ স্বামিবাক্য শ্রবণে জরৎকারুর সহসা মুখশোষ ও হৃদয়কম্প হইল। পরিশেষে ধৈর্য অবলম্বন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ বচনে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে ধর্মজ্ঞ! তোমার আমাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। দেখ, আমি কখনও কোনও অপরাধ করি নাই। সদা ধর্মপথে আছি, নিয়ত তোমার প্রিয়কর্ম ও হিতচিন্তা করিয়া থাকি। যে ফলোদ্দেশে ভ্রাতা আমাকে তোমায় দান করিয়াছেন, আমি মন্দভাগিনী, অদ্যাপি তাহা লাভ করি নাই। অতএব ভ্রাতা আমাকে কি কহিবেন? আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত হইয়া আছেন। তাঁহাদের অভিলাষ এই, তোমার ঔরসে আমার এক পুত্র জন্মে। কিন্তু অদ্যাপি তাহা সম্পন্ন হয় নাই। তোমার ঔরসে পুত্র জন্মিলে তাঁহাদের শাপবিমোচন হইবেক। তাহা হইলেই তোমার সহিত আমার পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অতএব হে মহাত্মন্!

জ্ঞাতিকুলের হিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্ন হও। এক অব্যক্ত গর্ভ আধান করিয়া বিনা অপরাধে কি রূপে আমারে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ। স্বীয় সহধর্মিণীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মহর্ষি তাঁহাকে এই যুক্তিযুক্ত উপযুক্ত বাক্য কহিলেন, হে সুভগে! তোমার এই গর্ভে এক পরম ধর্মাত্মা বেদবেদাঙ্গ-পারগ অনলতুল্য তেজস্বী ঋষি জন্মিয়াছেন। এই বলিয়া জরৎকারু পুনর্বার কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইয়া অরণ্য প্রবেশ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগভগিনী জরৎকারু অবিলম্বে ভ্রাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বামীর প্রস্থানবৃত্তান্ত যথাতথ নিবেদন করিলেন। ভুজগরাজ এই অতি মহৎ অপ্রিয় শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া ভগিনীকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি জান, যে উদ্দেশে তোমায় আমি জরৎকারুকে দান করিয়াছিলাম। তাহা কেবল সর্পকুলের হিতার্থে; যদি তাহার ঔরসে তোমার পুত্র জন্মে, সেই পুত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে আমাদিগের পরিত্রাণ করিবেক। ভগবান্ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা পূর্বে সর্বসুরসমক্ষে ইহাই কহিয়াছিলেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি, তৎসহযোগে তোমার গর্ভসম্ভাবনা হইয়াছে কি না। আমার বাসনা এই, জরৎকারুকে যে ভগিনী দান করিয়াছিলাম, তাহা নিস্ফল না হয়। তোমাকে আমার এরূপ প্রশ্ন করা কোনও ক্রমেই ন্যায্য নহে; কিন্তু গুরুতর কার্যসংক্রান্ত বিষয় বলিয়া অগত্যা এরূপ অনুচিত জিজ্ঞাসা করিতে হইল। আর আমি বিলক্ষণ জানি, তাঁহার তপস্যায় যেরূপ অনুরাগ, কোনও মতেই প্রত্যাগমনে সম্মত হইবেন না। এই নিমিত্ত আমি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইব না। তিনি যেরূপ উগ্রস্বভাব, আমাকে শাপ দিলেও দিতে পারেন। অতএব মুনি কি বলিলেন, কি করিলেন, আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিয়া আমার চিরস্থির ঘোর হৃদয়শল্য উদ্ধার কর।

এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া জরৎকারু শোকসন্তপ্ত ভুজগরাজ বাসুকিকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, যৎকালে সেই মহাতপাঃ মহাত্মা গমন করেন, আমি তাঁহাকে পুত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি, অস্তি অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এইমাত্র উত্তর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি পরিহাসকালেও ভুলিয়া কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই, সুতরাং এমন গুরুতর বিষয়ে মিথ্যা কহিবেন কেন? তিনি, হে ভুজঙ্গমে! তুমি পরিতাপ করিও না, তোমার গর্ভে প্রদীপ্ত দিবাকর ও প্রজ্বলিত অনলতুল্য তেজস্বী এক পুত্র জন্মিবেক, এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব ভ্রাতঃ! তোমার মনে যে বিষম দুঃখ আছে, তাহা দূর কর।

নাগরাজ বাসুকি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিলেন, এবং আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া ভগিনীর যথোচিত সম্মান ও সমাদর করিলেন। যেমন শুক্লপক্ষের শশাঙ্ক অন্তরীক্ষে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তদ্রূপ তাঁহার গর্ভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। পূর্ণ কাল উপস্থিত হইলে, নাগভগিনী জরৎকারু পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের ভয়হারক দেবকুমারতুল্য এক কুমার প্রসব করিলেন। নাগভাগিনেয় মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি ও জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণসম্পন্ন বালক বাল্যকালেই ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া ভৃগুকুলোদ্ভব চ্যবন মুনির নিকট যাবতীয় বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। যৎকালে তিনি গর্ভস্থ ছিলেন, তাঁহার পিতা, অস্তি, বলিয়া বনপ্রস্থান করেন, এই নিমিত্ত তিনি লোকে আস্তীক নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ভুজগরাজ পরম যত্নে সেই অপ্রমিতবুদ্ধিশালী বালকের লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনিও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নাগকুলের আনন্দ বর্ধন করিতে লাগিলেন।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

শৌনক কহিলেন, রাজা জনমেজয় নিজ মন্ত্রীদিগকে আত্মপিতার স্বর্গারোহণবিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট পুনর্বার সবিস্তর বর্ণন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! রাজা মন্ত্রীদিগকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং মন্ত্রীরা পরীক্ষিতের পরলোকপ্রাপ্তির বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। জনমেজয় কহিলেন, হে অমাত্যগণ! আমার ভুবনবিখ্যাত অতিযশস্বী পিতা কালবশ হইয়া যে রূপে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তোমরা সবিশেষ জান, এক্ষণে তোমাদিগের নিকট পিতৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তদীয় হিতসাধনে যত্নবান্ হইব, কিন্তু তদুপলক্ষে কদাচ অন্যের অহিতাচরণ করিব না।

ধর্মবেত্তা প্রজ্ঞাগুণসম্পন্ন মন্ত্রিগণ, মহাত্মা নৃপতিকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনকার মহাত্মা রাজাধিরাজ পিতার যেরূপ চরিত্র ছিল ও যে রূপে তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। আপনকার ধর্মাত্মা মহাত্মা প্রজাপালনতৎপর পিতা যাদৃশ গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি। সেই ধর্মবেত্তা রাজা মূর্তিমান্ ধর্মের ন্যায় ধর্মতঃ প্রজাপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে চারি বর্ণ স্ব স্ব ধর্মে রত ছিল। সেই অতুলবিক্রমশালী শ্রীমান্ ভূপতি পৃথ্বীদেবীকে ন্যায়ানুসারে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কেহ দ্বেষ্টা ছিল না, তিনিও কাহারও দ্বেষ করিতেন না, প্রজাপতির ন্যায় সর্ব ভূতে সমদর্শী ছিলেন। তদীয় অপ্রতিহতশাসনপ্রভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র স্ব স্ব কর্মে রত ছিল। তিনি বিধবা, অনাথ, বিকলাঙ্গ, ও দীন দরিদ্র গণের ভরণ পোষণ করিতেন। সেই সত্যবাদী, দৃঢ়বিক্রম, সর্বতোষক, সর্বপোষক, শ্রীমান্ রাজা দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় সর্ব ভূতের নয়নরঞ্জন ও সর্বলোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি শারদ্বতের নিকট ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন, কৃষ্ণের অতি প্রিয় ছিলেন। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে, অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ। তিনি

রাজধর্মনিপুণ, সর্বগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, মনস্বী, মেধাবী ধর্মপরায়ণ, ষড়বর্গ (৭২) জয়ী, মহাবুদ্ধি, ও অদ্বিতীয় নীতিশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন ; ষাটি বৎসর (৭৩) প্রজাপালন করেন ; পরে সকলকে দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তদনন্তর আপনি সহস্র বৎসরের জন্য এই কুলক্রমাগত রাজ্য ধর্মতঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; আপনি শৈশবকালেই অভিষিক্ত হইয়া সর্বভূতের পালন করিতেছেন।

জনমেজয় কহিলেন, ধর্মপরায়ণ পূর্বপুরুষদিগের চরিত্র অনুশীলন করিয়া বোধ হইতেছে, এই কুলে কোনও কালে এমন রাজা হয়েন নাই যে, তিনি প্রজাদিগের প্রিয় ও হিতকারী ছিলেন না। আমার পিতা তথাবিধ রাজা হইয়া কেন অকালে কালগ্রাসে পরিক্ষিপ্ত হইলেন বল, আমি আদ্যোপান্ত অবিকল শুনিতে বাসনা করি। প্রিয়কারী হিতৈষী মন্ত্রিগণ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরীক্ষিতের মৃত্যুবৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পিতা রাজাধিরাজ পাণ্ডুর ন্যায় শস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় ও সতত মৃগয়াশীল ছিলেন। একদা তিনি আমাদিগের হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শর দ্বারা এক মৃগ বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ মৃগ পলায়ন করিল। রাজা তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, কিন্তু পলায়িত মৃগকে আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি ষষ্টিবর্ষবয়স্ক ও জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এজন্য ত্বরায় পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হইলেন। সেই নিবিড় অরণ্যে এক মুনি মৌনব্রত অবলম্বনপূর্বক সমাধি করিতেছিলেন, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি কিছুই উত্তর দিলেন না। রাজা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত ছিলেন, মুনিকে মৌনাবলম্বী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রোষবশ হইলেন। তিনি তাঁহাকে মৌনব্রতী বলিয়া জানিতেন না, এই নিমিত্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, অটনী দ্বারা ধরাতল হইতে এক মৃত সর্প উদ্ধৃত করিয়া, সেই শুদ্ধচিত্ত ঋষির স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ঋষি এইরূপে অবমানিত হইয়াও কুপিত হইলেন না, রাজাকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না, স্কন্ধে মৃত সর্প ধারণপূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে মুনির স্কন্ধদেশে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়া নিজরাজধানী প্রস্থান করিলেন। সেই ঋষির গোগর্ভে সমুৎপন্ন মহাতেজাঃ মহাবীর্য অতি কোপনস্বভাব শৃঙ্গী নামে এক মহাযশস্বী পুত্র ছিলেন। এই মুনিকুমার সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার উপাসনার্থে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

(৭২) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য।

(৭৩) রাজা পরীক্ষিৎ ষাটি বৎসর বয়সে তক্ষকের দংশনে প্রাণত্যাগ করেন, সুতরাং তাঁহার ষাটি বৎসর প্রজাপালন সম্ভব ও সঙ্গত হয় না। টীকাকার নীলকণ্ঠ কহেন, মূলে যে ষাটি বৎসর নির্দেশ আছে, তাহা জন্ম অবধি গণনা অভিপ্রায়ে, রাজ্যলাভাবধি গণনা অভিপ্রায়ে নহে, কারণ পরীক্ষিৎ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে রাজ্যলাভ করিয়া চব্বিশ বৎসর মাত্র প্রজাপালন করেন।

উপাসনান্তে ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া পৃথিবীতে প্রত্যাগমনপূর্বক স্বীয় সখার মুখে পিতার অবমাননাবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সখা কহিলেন, বয়স্য! তোমার পিতা মৌনপরায়ণ হইয়া সমাধি করিতেছিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ! মহাতেজাঃ শৃঙ্গী বয়সে বালক হইয়াও তপস্যা ও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রবণমাত্র কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া, উদক স্পর্শপূর্বক, স্বীয় সখাকে সম্বোধন করিয়া, তোমার পিতাকে শাপ দিলেন, বয়স্য! আমার তপস্যার বল দেখ, যে দুরাত্মা বিনা অপরাধে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছে, তীক্ষ্ণবিষ তীক্ষ্ণবীর্য নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সপ্তম দিবসে তাহার প্রাণসংহার করিবেক। ইহা কহিয়া শৃঙ্গী পিতার সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া শাপপ্রদানবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন সেই সাধু সদাশয় মুনিশ্রেষ্ঠ, সুশীল গুণবান্ গৌরমুখনামক শিষ্যকে, ইহা কহিবার নিমিত্ত, আপনকার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, আমার পুত্র তোমাকে শাপ দিয়াছে, তুমি সাবধান হও, তক্ষক তোমাকে স্বীয় তেজঃ দ্বারা দগ্ধ করিবেক। গৌরমুখ আপনকার পিতার নিকট আসিয়া বিশ্রামান্তে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। আপনার পিতা এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষকের ভয়ে অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হইয়া রহিলেন।

সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মর্ষি কাশ্যপ সত্বর গমনে আপনকার পিতার নিকট আসিতেছিলেন। তক্ষক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহর্ষে! তুমি কোথায় ও কি প্রয়োজনসাধনার্থ এত সত্বর গমন করিতেছ? তিনি কহিলেন, অদ্য তক্ষক রাজা পরীক্ষিৎকে ভস্মাবশেষ করিবেক, আমি তাহার প্রতিকারার্থে যাইতেছি, আমি সমীপে থাকিলে, তক্ষক রাজার প্রাণবিনাশ করিতে পারিবেক না। তক্ষক কহিল, হে ঋষে! আমি সেই তক্ষক, আমি তাঁহাকে দংশন করিব। তুমি কি নিমিত্ত তাঁহাকে বাঁচাইতে বৃথা চেষ্টা পাইবে? আমি দংশন করিলে তুমি কোনও ক্রমেই রাজাকে বাঁচাইতে পারিবে না, তুমি আমার অদ্ভুত বীর্য দেখ। এই বলিয়া তক্ষক এক বৃক্ষকে দংশন করিল। বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। কাশ্যপও তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক, তুমি কি অভিলাষে যাইতেছ বল, এই বলিয়া তাঁহাকে লোভপ্রদর্শন করিল। কাশ্যপ কহিলেন, আমি ধনলাভপ্রত্যাশায় যাইতেছি। তক্ষক কহিল, তুমি রাজার নিকট যত ধনের প্রত্যাশা কর, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, লইয়া নিবৃত্ত হও। কাশ্যপ তক্ষকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলে, তক্ষক ছদ্ম বেশে আপনকার পিতার নিকট আসিয়া স্বীয় দুর্বিষহ বিষবহ্নি দ্বারা তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিল। তদনন্তর আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। মহারাজ! এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার আমরা যেরূপ দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, অবিকল বর্ণন করিলাম, এক্ষণে নিজ পিতার ও মহর্ষি উতঙ্কের পরাভব বিবেচনা করিয়া যাহা কর্তব্য হয়, করুন।

রাজা জনমেজয়, পিতৃপরাভববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তক্ষক যে বৃক্ষকে ভস্মসাৎ করিয়াছিল, এবং কাশ্যপ যে সেই ভস্মীভূত বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত তোমরা কাহার নিকট শুনিয়াছিলে? বোধ করি, সর্পকুলাধম তক্ষক এই বিবেচনা করিয়াছিল, কাশ্যপ মন্ত্রবলে রাজার প্রাণরক্ষা করিবেক, সন্দেহ নাই। আমি দংশন করিলে যদি এ ব্রাহ্মণ রাজাকে বাঁচায় তাহা হইলে আমাকে লোকে উপহাসাস্পদ হইতে হইবেক। এই ভাবিয়াই সে ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিল। সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে তাহাকে সমুচিত প্রতিফল দিব। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তক্ষক ও কাশ্যপের বৃত্তান্ত নির্জন বনে ঘটিয়াছিল, তাহা কে বা দেখিল, কে বা শুনিল, তোমরাই বা কি রূপে অবগত হইলে বল, সবিশেষ শুনিয়া সর্পকুলনিপাতের উপায় বিধান করিব। মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! তক্ষক ও কাশ্যপের বৃত্তান্ত যে রূপে যে ব্যক্তি আমাদিগকে কহিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। কোনও ব্যক্তি কাষ্ঠ আহরণ নিমিত্ত পূর্বেই সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। তক্ষক ও কাশ্যপ উভয়েই তাহা জানিতে পারেন নাই। ঐ ব্যক্তি সেই বৃক্ষের সহিতই ভস্মীভূত হয়, ও সেই বৃক্ষের সহিতই পুনর্জীবিত হয়। সেই আসিয়া আমাদিগকে এই অদ্ভুত বিষয়ের সংবাদ দেয়। মহারাজ! যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত সমুদায় নিবেদন করিলাম, এক্ষণে যাহা বিহিত হয়, করুন।

এইরূপ মন্ত্রিবাক্য শ্রবণে রাজা জনমেজয়, রোষরসে কলুষিত হইয়া, করে করে পরিপেষণ এবং মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুধারা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে অশ্রুনিবারণ ও যথাবিধি উদকস্পর্শ করিয়া অমর্ষভাবে কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে চিন্তা করিলেন, অনন্তর মনে মনে কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, আমি তোমাদিগের নিকট পিতার পরলোকপ্রাপ্তিবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যে কর্তব্য স্থির করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার মত এই, যে দুরাত্মা তক্ষক শৃঙ্গীকে হেতুমাত্র করিয়া পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে, তাহাকে সমুচিত প্রতিফল দেওয়া কর্তব্য। যদি কাশ্যপ আসিতেন, পিতা অবশ্যই জীবন পাইতেন, কিন্তু তক্ষকের এমনই দুরাত্মতা যে, তাঁহাকে অর্থ দিয়া দিয়া নিবৃত্ত করিল। যদিই পিতা কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রিগণের মন্ত্রণাবলে জীবন পাইতেন, তাহাতে তাহার কি হানি হইত? কিন্তু কাশ্যপ আসিয়া পাছে রাজাকে জীবন দেন, এই আশঙ্কায় সেই দুরাত্মা অর্থদান দ্বারা বশীভূত করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছে। এ অত্যন্ত অসহ্য অত্যাচার। অতএব আমি, আমার নিজের, উতঙ্কের ও তোমাদের সকলের মনোরথ সম্পাদনের নিমিত্ত পিতার বৈরনির্যাতন করিব।

একপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর রাজা জনমেজয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া সর্পসত্রানুষ্ঠানের প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং পুরোহিত ও ঋত্বিক্‌দিগকে আহ্বান করিয়া

জিজ্ঞাসিলেন, যে দুরাত্মা তক্ষক পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে, এক্ষণে আমি কি উপায়ে তাহাকে যথোচিত প্রতিফল দিতে পারি, আপনারা তাহা বলুন। আপনারা এমন কোনও কর্ম জানেন কি না যে, তদ্দ্বারা আমি তাহাকে তাহার বন্ধুবর্গের সহিত প্রদীপ্ত অনলে নিক্ষিপ্ত করিতে পারি। সে যেমন আমার পিতাকে বিষবহ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছে, আমিও সেই পাপিষ্ঠকে তদ্রূপ দগ্ধ করিতে বাসনা করি। ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! পুরাণে সর্পসত্রনামে এক মহৎ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। দেবতারা তোমার নিমিত্তই ঐ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। পৌরাণিকেরা কহেন, তোমা ভিন্ন ঐ যজ্ঞ করিবার অন্য লোক নাই, আর আমরাও ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে জানি।

রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়াই তক্ষককে প্রদীপ্ত অগ্নিমুখে প্রবিষ্ট ও দগ্ধ বোধ করিলেন, এবং সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, আমি সেই যজ্ঞ করিব, আপনারা সমুদায় আয়োজন করুন। তদনুসারে সেই বেদবিদ্ বহুজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণ, শাস্ত্রপ্রমাণ পরিমাণ করিয়া পরমসমৃদ্ধিযুক্ত প্রভূতধনধান্যাদিসম্পন্ন অভিপ্রায়ানুরূপ যজ্ঞায়তন নির্মাণপূর্বক, রাজাকে সর্পসত্রে দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু প্রথমতই যজ্ঞের বিঘ্নকর এক মহৎ লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞায়তননির্মাণকালে বাস্তুবিদ্যাবিশারদ পুরাণবেত্তা বুদ্ধিজীবী সূত্রধার কহিল, যে স্থানে ও যে সময়ে যজ্ঞায়তনের মাপনা আরম্ভ হইল, তাহাতে বোধ হইতেছে, এক ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবেক। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া, দীক্ষিত হইবার পূর্বে, দ্বারপালকে এই আদেশ দিলেন, যেন কোনও ব্যক্তিই আমার অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিতে না পারে।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর সর্পসত্রবিধানানুসারে ক্রিয়ারম্ভ হইল। যাজকগণ যথাবিধি স্ব স্ব কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয়ধারণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনবরত ধূমসম্পর্ক দ্বারা তাঁহাদের চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা সর্পদিগের উল্লেখ করিয়া আহুতি-প্রদান আরব্ধ করিলে, তাহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তদনন্তর সর্পগণ, নিতান্ত ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং মস্তক ও লাঙ্গুল দ্বারা পরস্পর বেষ্টন ও আর্তনাদ করিতে করিতে, সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে অনবরত পতিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, বৃদ্ধ, শিশু, ক্রোশপ্রমাণ, যোজনপ্রমাণ, গোকর্ণপ্রমাণ, পরিঘপ্রমাণ, অশ্বাকার, করিশুণ্ডাকার, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাকায়, মহাবল, বহুবিধ, শত শত, সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, অর্বুদ অর্বুদ, মহাবিষ বিষধরগণ মাতৃশাপদোষে অবশ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতনন্দন। পাণ্ডুকুলাবতংস রাজা জনমেজয়ের ভয়ঙ্কর সর্পসত্রে কোন্ কোন্ মহর্ষি ঋত্বিকের কর্ম করিয়াছিলেন, আর কাঁহারাই বা সদস্য হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত সবিস্তর বর্ণন কর, তাহা হইলেই কাঁহারা সর্পসত্রবিধানজ্ঞ, তাহা জানা যাইবেক। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যে সকল মনীষিগণ সেই যজ্ঞে ঋত্বিক্ ও সদস্য ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। চ্যবনবংশোদ্ভব অদ্বিতীয় বেদবেত্তা সুবিখ্যাত চণ্ডভার্গব হোতা, বৃদ্ধ বিদ্বান্ কৌৎস উদ্গাতা, জৈমিনি ব্রহ্মা, শাঙ্গ´রব ও পিঙ্গল অধ্বর্য্যু, আর ব্রাহ্মণোত্তম উতঙ্ক উন্নেতা ছিলেন। পুত্র ও শিষ্য সহিত ব্যাসদেব, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অশিত, দেবল, নারদ, পর্বত, আত্রেয়, কুণ্ড, জঠর, কালঘট, বাৎস্যবংশপ্রসূত বয়োবৃদ্ধ তপঃস্বাধ্যায়শীলসম্পন্ন শ্রুতশ্রবাঃ, কোহল, দেবশর্মা, মৌদ্গল্য, সমসৌরভ ইত্যাদি অনেকানেক বেদপারগ ব্রাহ্মণ সদস্য হইয়াছিলেন।

ঋত্বিক্গণ আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, সর্বপ্রাণিভয়ঙ্কর সর্প সকল হুতাশনে নিপতিত হইতে লাগিল। সর্পগণের বসা ও মেদঃ দ্বারা বহুসংখ্যক হ্রদ হইয়া গেল। তাহাদিগের অনবরতদাহ দ্বারা উৎকট গন্ধ নির্গত হইতে লাগিল। অগ্নিপতিত ও আকাশস্থিত সর্পগণের চীৎকার ও কোলাহল অবিশ্রান্ত শ্রুত হইতে লাগিল।

নাগরাজ তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। দেবরাজ তক্ষকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে নাগরাজ। সে সর্পসত্রে তোমার কোনও ভয় নাই। তোমার হিতার্থে আমি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া রাখিয়াছি, তোমার ভয় নাই, তুমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও। ইন্দ্রের নিকট এই আশ্বাস পাইয়া তক্ষক হৃষ্ট মনে তদীয় ভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

সর্পগণ অনবরত অগ্নিতে পতিত হওয়াতে, বাসুকি স্বীয় পরিবার অল্পাবশিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, এবং একান্ত শোকাকুল ও ব্যাকুলহৃদয় হইয়া ভগিনীকে কহিলেন, অয়ি কল্যাণিনি। আমার সর্বাঙ্গ শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, দশ দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছি, মোহে অবসন্ন হইতেছি, মন ও নয়ন ঘূর্ণিত হইতেছে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ; অদ্য আমি একান্ত অবশ হইয়া সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইব। জনমেজয়ের যজ্ঞ সর্পকুলসংহারের নিমিত্ত আরব্ধ হইয়াছে ; অতএব আমিও নিঃসন্দেহ যমালয়ে যাইব। আমি তোমাকে যদর্থে জরৎকারুকে দান করিয়াছিলাম, তাহার সময় উপস্থিত। এক্ষণে আমাদিগের সবান্ধবে সপরিবারে পরিত্রাণ কর। পিতামহ স্বয়ং আমাকে কহিয়াছিলেন, আস্তীক জনমেজয়ের যজ্ঞ নিবারণ করিবেক। অতএব এক্ষণে তুমি আমার সপরিবারের পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বীয় প্রিয় তনয়কে অনুরোধ কর।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর নাগভগিনী জরৎকারু স্বীয় সহোদরের বচনানুসারে আপন পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার ভ্রাতা কোনও প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে আমারে তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই প্রয়োজন উপস্থিত, তাহা সম্পন্ন কর।

মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া আস্তীক কহিলেন, জননি! মাতুল মহাশয় কি প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে তোমারে আমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, তুমি আমাকে তাহার সবিশেষ কহ, শুনিয়া আমি তাহা সম্পন্ন করিব। বন্ধুকুলহিতৈষিণী নাগরাজভগিনী জরৎকারুপুত্রকে সবিশেষ সমস্ত কহিতে লাগিলেন।

বৎস! শ্রবণ কর। সমস্ত নাগকুলের জননী কদ্রু রোষবশা হইয়া আপন পুত্রদিগকে এই শাপ দিয়াছিলেন যে, আমি বিনতার সহিত দাসত্ব পণ করিয়া শুক্লবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবাকে কৃষ্ণবর্ণ করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার সে কথা রক্ষা করিলে না; অতএব রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন; তাহাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমরা প্রেতলোকে গমন করিবে। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা নাগজননীর শাপদান শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া অনুমোদন করিলেন। বাসুকি এইরূপ পিতামহবাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতমন্থনকালে দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন। দেবতারা অমৃতলাভে কৃতকার্য হইয়া আমার ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া পিতামহসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং স্তুতি ও প্রণতি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া শাপনিবারণের উপায় প্রার্থনা করিলেন; কহিলেন, ভগবন্! নাগরাজ বাসুকি জ্ঞাতিকুলক্ষয়সম্ভাবনাদর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছেন। আপনি কৃপা করিয়া শাপমোচনের উপায় বিধান করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, জরৎকারু জরৎকারুনাম্নী যে ভার্যা পরিগ্রহ করিবেন, তাঁহার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সর্পকুলকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিবে। পন্নগরাজ বাসুকি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমায় তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন। তুমিও প্রয়োজনসাধনের সময় উপস্থিত হইবার পূর্বেই আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত, উপস্থিত ভয় হইতে নাগকুলের পরিত্রাণ কর, আমার ভ্রাতাকে সেই বিষম হুতাশন হইতে রক্ষা কর। আমার ভ্রাতা যে অভিপ্রায়ে আমায় তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, যেন তাহা বিফল হয় না; এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায় বল।

আস্তীক এইরূপ মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গীকার করিলেন, এবং শোকসন্তপ্ত বাসুকিকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, মাতুল! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনাকে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত করিব। আপনি সুস্থচিত্ত হউন, আপনকার কোনও ভয় নাই, যাহাতে আপনাদিগের মঙ্গল হয়, আমি তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ হইব। অন্য কথা দূরে থাকুক, পরিহাসকালেও আমি কখনও মিথ্যা কহি নাই।

অদ্য আমি সর্পসত্রদীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকট গিয়া, মাঙ্গলিক বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া, যাহাতে সেই যজ্ঞ নিবারণ হয়, তাহা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি সমুদায় সম্পন্ন করিব, আপনি আমার বিষয়ে কোনও ক্রমেই সন্দিহান হইবেন না। বাসুকি কহিলেন, বৎস! আমি মাতৃদণ্ডনিগৃহীত হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে, দিগ্‌ভ্রম জন্মিতেছে। আস্তীক কহিলেন, মহাশয়! আপনকার আর পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। সর্পসত্রের প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে মহাশয়ের যে ভয় জন্মিয়াছে, আমি তাহা দূর করিব, প্রলয়কালীন অনলতুল্য মহাঘোর ব্রহ্মদণ্ড নিরাকরণ করিব, আপনি কোনও ক্রমেই ভীত হইবেন না।

এইরূপ আশ্বাসপ্রদান দ্বারা বাসুকির অতিবিষম শোকানল শান্তি করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক ভুজগকুলের পরিত্রাণের নিমিত্ত সত্বর গমনে রাজা জনমেজয়ের সর্বগুণসম্পন্ন সর্পসত্রে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, সূর্য ও বহ্নি সম তেজস্বী সদস্যগণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞায়তনে উপবিষ্ট আছেন। প্রবেশকালে দ্বারবানেরা নিবারণ করিল। তখন সেই অদ্বিতীয় পুণ্যশীল দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবেশলাভের নিমিত্ত সর্পসত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। অনন্তর যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাজার, ঋত্বিক্‌গণের, সদস্যবর্গের, এবং যজ্ঞীয় হুতাশনের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

আস্তীক কহিলেন, পূর্ব কালে প্রয়াগে সোম, বরুণ ও প্রজাপতি যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ শত ও অযুত সংখ্যক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। গয়, শশবিন্দু, বৈশ্রবণ, এই তিন সুবিখ্যাত নৃপতি যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। নৃগ, অজমীঢ় ও দশরথতনয় রাজা রামচন্দ্র যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ; প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। রাজা দিবিদেবসূনু, যুধিষ্ঠির ও অজমীঢ়ের যেরূপ যজ্ঞ বিখ্যাত আছে, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। সত্যবতীতনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের যজ্ঞ যেরূপ, এবং সেই ভগবান্ স্বয়ং যে যজ্ঞের সমুদায় কর্ম করিয়াছেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। তোমার এই দেবরাজকৃতযজ্ঞতুল্য যজ্ঞে সূর্যসম তেজস্বী ঋত্বিক্‌গণ অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইঁহাদের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা যায় না। ইঁহাদিগকে দান করিলে

অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হয়। আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে, ত্রিভুবনে দ্বৈপায়নের তুল্য ঋত্বিক্ নাই। ইঁহার শিষ্যেরা সমস্ত ভূমণ্ডল ব্যাপিয়াছেন। তাঁহাদের তুল্য সর্বকর্ম-দক্ষ ঋত্বিক্ আর নাই। ভগবান্ অগ্নি দেবতাগণের তৃপ্তি নিমিত্ত প্রদীপ্ত ও দক্ষিণাবর্ত-শিখাবিশিষ্ট হইয়া তোমার এই যজ্ঞে হব্যগ্রহণ করিতেছেন। জগতে তোমার তুল্য প্রজাপালনপরায়ণ নৃপতি দ্বিতীয় নাই। তোমার ধৈর্যগুণদর্শনে আমি সদা প্রীত আছি। তুমি, বরুণ ও ধর্মরাজের তুল্য। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যেমন প্রজাদিগের রক্ষাকর্তা, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের মতে তুমি প্রজাদিগের সেইরূপ রক্ষাকর্তা। কোনও কালে কোনও রাজা তোমার তুল্য যজ্ঞ করিতে পারেন নাই। হে সুব্রত! তুমি রাজা খট্টাঙ্গ, নাভাগ ও দিলীপের তুল্য, তোমার প্রভাব যযাতি ও মান্ধাতার সদৃশ, তোমার তেজঃ সূর্যের সমান, তুমি ভীষ্মদেবের ন্যায় বিরাজমান হইতেছ। তোমার বীর্য বাল্মীকি মুনির বীর্যের ন্যায় অপ্রকাশিত, তোমার কোপ মহর্ষি বশিষ্ঠের কোপের ন্যায় বশীকৃত, তোমার প্রভুত্ব ইন্দ্রত্বতুল্য, তোমার প্রভাব নারায়ণের প্রভাবসদৃশ শোভা পাইতেছে। তুমি যমের ন্যায় ধর্মনির্ণয় করিতে জান, কৃষ্ণের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন, তুমি সকল সম্পত্তির নিবাসস্বরূপ এবং সকল যজ্ঞের একাধারস্বরূপ। তুমি দম্ভপুত্র বলনামক অসুরের তুল্য পরাক্রমী, রামের তুল্য শাস্ত্রবেত্তা ও শস্ত্রবেত্তা, ঔর্ব ও ত্রিতের তুল্য তেজস্বী, ভগীরথের তুল্য দুষ্প্রেক্ষণীয়।

এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া রাজা, সদস্যবর্গ, ঋত্বিক্‌গণ ও অগ্নি, সকলেই প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

জনমেজয় কহিলেন, এই ব্রাহ্মণকুমার বয়সে বালক হইয়াও বুদ্ধি ও জ্ঞানে বৃদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। আমার মতে ইনি বালক নহেন, বৃদ্ধ। আমি ইঁহাকে অভি-লষিত প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। হে সদস্যগণ! আপনারা এ বিষয়ে যথাবিহিত আদেশ করুন। সদস্যগণ কহিলেন, ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের মহামান্য; যে ব্যক্তি বিদ্বান্ হন, তিনি বিশেষ মান্য। ইনি মহারাজের সর্বপ্রকার বরদানপাত্র। কিন্তু নাগরাজ তক্ষক যাহাতে মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া ত্বরায় আমাদের বশে আইসে, তাহাও চিন্তা করা কর্তব্য।

অনন্তর রাজা অভিলষিত দানে উদ্যত হইয়া, তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর, আস্তীককে ইহা কহিতে উপক্রম করিবামাত্র, হোতা অনতিহৃষ্ট চিত্তে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! তক্ষক এখনও আইসে নাই। জনমেজয় কহিলেন, যাহাতে আমার এই কর্ম সমাপন হয়, এবং যাহাতে তক্ষক শীঘ্র আইসে, আপনারা সকলে তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ হউন, তক্ষক আমার পরম শত্রু। ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে যেরূপ কহিতেছে, এবং যজ্ঞীয় হুতাশন যেরূপ ব্যক্ত করিতেছেন, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, তক্ষক প্রাণভয়ে কাতর হইয়া ইন্দ্রভবনে অবস্থিতি করিতেছে।

লোহিতনয়ন পুরাণবেত্তা মহাত্মা সূত পূর্বে যজ্ঞায়তন নির্মাণকালে বিঘ্নসম্ভাবনা কহিয়াছিলেন। এক্ষণেও নরপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বিপ্রগণ যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। পুরাণশাস্ত্রে যেরূপ নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে নিবেদন করিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র তক্ষককে অভয়দান করিয়াছেন; কহিয়াছেন, তুমি আমার নিকটে থাক, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।

সর্পসত্রদীক্ষিত রাজা শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং হোতাকে কর্মসমাপন-বিষয়ে সত্বর হইবার নিমিত্ত বারংবার কহিতে লাগিলেন। হোতাও মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক তক্ষককে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহানুভাব দেবরাজ বিমানারোহণপূর্বক নভোমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন। জলধরগণ, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরাগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিল। দেবগণ তাঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। নাগরাজ তক্ষক তাঁহার উত্তরীয়বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, সে ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া অত্যন্ত অসুখে কালহরণ করিতে লাগিল।

রাজা তক্ষকের প্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছিলেন, অতএব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্বার ঋত্বিক্‌দিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! যদি তক্ষক ইন্দ্রের ভবনে থাকে, তবে তাহাকে ইন্দ্রসহিত হুতাশনে পাতিত করুন। হোতা রাজা জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া, ইন্দ্রসহিত তক্ষককে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। তিনি এইরূপে আহুতি প্রদান করিলে নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, ইন্দ্র ও তক্ষক উভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। তথা হইতে যজ্ঞ দর্শন করিয়া ইন্দ্র যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, এবং তক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন।

এইরূপে দেবরাজ পলায়ন করিলে পর, তক্ষক ভয়ে অচেতন ও অনায়ত্ত হইয়া মন্ত্রপ্রভাবে যজ্ঞীয় অগ্নিশিখাসন্নিধানে উপস্থিত হইল। তখন ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! আপনার কর্ম বিধিপূর্বক সম্পন্ন হইল, এখন আপনি ব্রাহ্মণকে বরদান করিতে পারেন। অনন্তর জনমেজয় আস্তীককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অপ্রমেয়প্রভাব ব্রহ্মবীর্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার! আমি তোমাকে অভিলষিত প্রদান করিব, তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর, যদি তাহা অদেয় হয়, তথাপি দান করিব। এই সময়ে ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখ! তক্ষক তোমার বশে আসিতেছে, তাহার ভয়ঙ্কর গর্জন শুনা যাইতেছে। নিশ্চিত বোধ হইতেছে, ইন্দ্র তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতেই মন্ত্রবলে বিকলাঙ্গ বিচেতন ও ঘূর্ণমান হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আসিতেছে।

নাগরাজ তক্ষক হুতাশনে পতিত হয়, এমন সময়ে অবসর বুঝিয়া আস্তীক কহিলেন, রাজন্ জনমেজয়! যদি আমাকে বর দেওয়া অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি এই প্রার্থনা করি, তোমার এই যজ্ঞ রহিত হউক, এবং সর্পগণ যেন আর এই যজ্ঞীয়

হুতাশনে পতিত না হয়। রাজা এইরূপে প্রার্থিত হইয়া অনতিহৃষ্ট মনে আস্তীককে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বর্ণ, রজত, গো, অথবা আর যাহা কিছু প্রার্থনা কর, তাহা তোমাকে দিতেছি, আমার যজ্ঞ রহিত করিও না। আস্তীক কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার নিকট স্বর্ণ, রজত, অথবা গোধন প্রার্থনা করি না, আমার এইমাত্র প্রার্থনা, তোমার যজ্ঞ রহিত হউক, তাহা হইলে আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হয়। জনমেজয় এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। কিন্তু তিনি কোনও মতেই অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। তখন বেদজ্ঞ সদস্যবর্গ সকলে মিলিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণকে প্রার্থিত বর প্রদান কর।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

শৌনক কহিলেন, হে সূতকুলতিলক! রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে যে সকল সর্প হুতাশনে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের নাম শ্রবণের অভিলাষ করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! বহু সহস্র, বহু প্রযুত, বহু অর্বুদ সর্প সর্পসত্রে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের সংখ্যা করা অসাধ্য, তথাপি, যত দূর স্মরণ হয়, কহিতেছি, শ্রবণ করুন! প্রথমতঃ বাসুকিকুলোৎপন্ন যে সকল নীলবর্ণ রক্তবর্ণ শুক্লবর্ণ অতি ভয়ঙ্কর মহাকায় মহাবিষ ভুজঙ্গমগণ, মাতৃশাপরূপ বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া, যজ্ঞীয় হুতাশনে পতিত হয়, তাহাদেরই বাহুল্যে নামোল্লেখ করিব।

কোটিশ, মানস, পূর্ণ, শল, পাল, হমীল, পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক, কালদন্ত, এই সকল বাসুকিজাত সর্প প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত বাসুকিবংশসম্ভূত অতি ভয়ঙ্কর মহাবলশালী আর আর অনেক নাগ প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

এক্ষণে তক্ষককুলোদ্ভূত নাগগণের নামোল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন। পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক, পিণ্ডসক্ত, রভেণক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজাঃ, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপন, মুদ্গর, শিশুরোমা, সুরোমা, মহাহনু, এই সমস্ত তক্ষকজাত নাগ হব্যবাহনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

পারাবত, পারিপাত্র, পাণ্ডুর, হরিণ, কৃশ, বিহত, শরভ, মেদ, প্রমোদ, সংহতাপন, ঐরাবতকুলোৎপন্ন এই সকল নাগ অগ্নিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল।

হে দ্বিজোত্তম! অতঃপর কৌরব্যকুলজাত নাগদিগের উল্লেখ করিব, শ্রবণ করুন। এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধুর্তক, প্রাতর, অন্তক, এই সকল কৌরব্যকুলজাত সর্প হুতাশনপ্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রকুলপ্রসূত বায়ুসমবেগশালী মহাবিষ সর্পগণের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক, কুঠার, মুখসেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি,

হরি, অমাহঠ, কামহঠ, সুষেণ, মানস, ব্যয়, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উণ্ড্রপারক, ঋষভ, বেগবান্, নাগ, পিণ্ডারক, মহাহনু, রক্তাঙ্গ, সর্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পটবাসক, বরাহক, বীরণক, সুচিত্র, চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মনিস্কন্ধ, আরুণি।

হে ব্রহ্মন্! বিখ্যাত প্রধান প্রধান নাগের নামকীর্তন করিলাম; বাহুল্যপ্রযুক্ত সকলের উল্লেখ করিতে পারিলাম না। ইহাদের যে সকল সন্তান ও সন্তানের সন্তান প্রদীপ্ত পাবকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা করা অসংখ্য। অতি ভয়ঙ্কর, প্রলয়কালীন অনলতুল্যবিষবিশিষ্ট, দ্বিশীর্ষ, সপ্তশীর্ষ, দশশীর্ষ, এবং অন্যান্য শত শত সহস্র সহস্র সর্প সেই যজ্ঞীয় হুতাশনে হুত হইয়াছে। মহাকায়, মহাবেগ, শৈলশৃঙ্গ-সমুন্নত, যোজনায়ত, দ্বিযোজনায়ত, পঞ্চযোজনায়ত, দশযোজনায়ত, দ্বাদশযোজনায়ত, কামরূপী, কামবল, প্রদীপ্ত অনলতুল্য বিষশালী মহাসর্প সকল ব্রহ্মদণ্ডে নিগৃহীত হইয়া সেই মহাসত্রে দগ্ধ হইয়াছে।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমেজয় আস্তীককে এইরূপে বরদানে উদ্যত হইলে, আমরা তাঁহার আর এই এক অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছি। নাগরাজ তক্ষক ইন্দ্রহস্ত হইতে চ্যুত হইয়া নভোমণ্ডলেই থাকিল। তখন রাজা জনমেজয় অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। ভয়ার্ত তক্ষক সেই বিধিপূর্বক হুত প্রদীপ্ত যজ্ঞীয় হুতাশনে পতিত হইল না। শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! মনীষাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্র সকল কি নিস্তেজ হইয়াছিল, যে তক্ষক অগ্নিতে পতিত হইল না। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পন্নগরাজ ইন্দ্রহস্ত হইতে চ্যুত ও বিচেতন হইয়া পতিত হইতেছে, এমন সময়ে আস্তীক, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, এই বাক্য তিন বার উচ্চারণ করিলেন, এবং তক্ষকও উদ্বিগ্ন চিত্তে অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইল। তখন রাজা সদস্যগণের উপদেশবশবর্তী হইয়া কহিলেন, আস্তীক যাহা কহিলেন, তাহাই হউক, এই কর্ম সমাপিত হউক, নাগগণ নিরাপদ্ হউক, আস্তীক প্রীত হউন, এবং সূতের বাক্য সত্য হউক।

রাজা আস্তীককে বরপ্রদান করিবামাত্র, চারি দিকে প্রীতিপূর্ণ কোলাহল উত্থিত হইল, সর্পসত্র নিবৃত্ত হইল, ভরতকুলতিলক রাজা জনমেজয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, যে সমস্ত ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ সেই সর্পসত্রে সমাগত হইয়াছিলেন; রাজা তাঁহাদিগকে অপর্যাপ্ত অর্থ প্রদান করিলেন, আর যে লোহিতনয়ন সূত যজ্ঞায়তননির্মাণকালে কহিয়াছিলেন যে, এক ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া সর্পসত্র রহিত হইবেক, প্রীত হইয়া তাঁহাকেও প্রভূত অর্থ, অন্যান্য নানা দ্রব্য, এবং অন্ন ও বস্ত্র দান করিলেন। তদনন্তর যথাবিধি অবভৃথক্রিয়া (৭৪) সম্পাদন করিলেন। পরে প্রীত মনে যথোচিত সংকার করিয়া কৃতকৃত্য মহাত্মা আস্তীককে স্বগৃহে প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার প্রস্থানকালে

(৭৪) যদি কোনও অংশে ন্যূনতা ঘটিয়া থাকে, এই আশঙ্কা করিয়া সম্ভাবিত ন্যূনতার পরিহারার্থে যে যজ্ঞ করিয়া প্রধান যজ্ঞের সমাপন করে তাহার নাম অবভৃথ।

কহিলেন, ভগবন্! পুনর্বার যেন আপনকার আগমন হয়। যৎকালে আমি অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, আপনাকে সেই যজ্ঞে সদস্য হইতে হইবেক।

আস্তীক, এইরূপে স্বকার্যসাধন ও রাজার সন্তোষসম্পাদন করিয়া, তথাস্তু বলিয়া হৃষ্ট চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং পরম প্রীত মনে মাতুলের ও জননীর সন্নিধানে গমনপূর্বক, তদীয় পাদবন্দন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যে সমস্ত নাগ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, শ্রবণমাত্র তাহাদের শোক ভয় ও মোহ দূর হইল। তাহারা সাতিশয় প্রীত হইয়া আস্তীককে কহিল, বৎস! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তাহারা চারি দিক্ হইতে ভূয়োভূয়ঃ ইহাই কহিতে লাগিল, হে বিদ্বন্! আমরা তোমার কি প্রিয় কর্ম করিব বল; আমরা পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আমাদের সকলকে ঘোর বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছ; বৎস! আমরা তোমার কি অভীষ্ট সম্পাদন করিব বল। আস্তীক কহিলেন, যে সকল ব্রাহ্মণ অথবা অন্যান্য মানবগণ প্রসন্ন মনে সায়ং ও প্রাতঃকালে আমার এই উপাখ্যান পাঠ করিবেক, এই বর দাও, যেন তোমাদের হইতে তাহাদিগের কোনও ভয় থাকে না। নাগগণ প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিল, হে ভাগিনেয়! তুমি যে প্রার্থনা করিলে, আমরা প্রীত চিত্তে নিঃসন্দেহ তাহা সম্পাদন করিব।

যে ব্যক্তি দিবাভাগে অথবা রাত্রিকালে অসিত, আর্তিমান্, ও সুনীথকে স্মরণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবে না। হে মহাভাগ নাগগণ! যে মহাযশস্বী মহাপুরুষ মহর্ষি জরৎকারুর ঔরসে নাগভগিনী জরৎকারুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে তোমাদিগের রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি; অতএব তোমাদের আমাকে হিংসা করা উচিত নহে। হে মহাবিষ সর্প! অপসর্পণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, চলিয়া যাও, জনমেজয়ের যজ্ঞান্তে আস্তীক যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। যে সর্প আস্তীকবাক্য শুনিয়া নিবৃত্ত না হয়, তাহার মস্তক শিংশবৃক্ষফলের ন্যায় শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দ্বিজেন্দ্র আস্তীক সমাগত ভুজঙ্গগণ কর্তৃক এইপ্রকার উক্ত হইয়া, পরম প্রীতি প্রাপ্ত ও গমনাভিলাষী হইলেন। তিনি ভুজগগণকে সর্পসত্রভয় হইতে মুক্ত করিয়া পুত্র পৌত্র রাখিয়া যথাকালে কাল প্রাপ্ত হইলেন। হে ঋষিপ্রবর! আমি আপনকার নিকট আস্তীকের উপাখ্যান যথাবৎ কীর্তন করিলাম। এই উপাখ্যান কীর্তন করিলে কখনও সর্পভয় থাকে না। হে ভৃগুকুলাবতংস! আপনকার পূর্ব পুরুষ ভগবান্ প্রমতি, স্বীয় পুত্র রুরু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে আস্তীকের পরম পবিত্র চরিত্র যেরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন, এবং আমিও তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, আপনকার নিকট আদ্যোপান্ত অবিকল বর্ণন করিলাম। আপনি ভৃগুভবাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আস্তীকের সেই পরমপবিত্র ধর্মময় আখ্যান শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে আপনকার অতি মহৎ কৌতূহল নিবৃত্ত হউক।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতসূচনা

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি আমার নিকট ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অখিল মহৎ আখ্যান কীর্তন করিলে, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে পুনর্বার অনুরোধ করিতেছি, ব্যাসসংক্রান্ত যে সমস্ত কথা আছে, সে সমুদায় আমার নিকট কীর্তন কর। অতি দুঃসাধ্য সর্পসত্রে মহাত্মা সদস্যগণ অবসরকালে যে যে বিষয়ে যে সকল বিচিত্র কথা কীর্তন করিয়াছিলেন, আমরা তোমার নিকট সেই সমস্ত কথা যথাবৎ শ্রবণ করিতে বাসনা করি; তুমি আমাদিগের নিকট বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্রনিযুক্ত ব্রাহ্মণেরা অবসরকালে বেদমূলক নানা আখ্যান কীর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাসদেব মহাভারতরূপ বিচিত্র আখ্যান কীর্তন করেন। শৌনক কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অবসরকালে, রাজা জনমেজয় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, পাণ্ডবদিগের যশস্কর যে মহাভারতরূপ আখ্যান বিধিপূর্বক শ্রবণ করাইয়াছিলেন, মহানুভাব মহর্ষির মনঃসাগরসম্ভূত সেই পরম পবিত্র কথা যথাবিধি শুনিতে অভিলাষ করি, হে সাধুশ্রেষ্ঠ! তুমি তাহা কীর্তন কর; আমি অদ্যাপি আখ্যানশ্রবণে তৃপ্ত হই নাই। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিপ্রবর! আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত মহৎ উৎকৃষ্ট মহাভারতনামক আখ্যান প্রথমাবধি সমুদায় কীর্তন করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমারও এই আখ্যান কীর্তন করিতে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মিতেছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতসূচনা

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজা জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যে পাণ্ডবপিতামহ মহাপুরুষ যমুনাদ্বীপে শক্ত্রিপুত্র পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর কন্যাবস্থাতেই তদীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি জাতমাত্র স্বেচ্ছাক্রমে দেহবৃদ্ধি করিয়াছিলেন; যিনি অঙ্গসহিত সমস্ত বেদ ও সমস্ত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কেহ যাঁহার তুল্য হইতে পারেন নাই; যে অদ্বিতীয় বেদবেত্তা, সর্বজ্ঞ, সচ্চরিত্র, সত্যপরায়ণ, কবি, ব্রহ্মর্ষি এক বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; যে পবিত্রকীর্তি মহাযশস্বী মহাপুরুষ শান্তনুর বংশরক্ষার্থে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে জন্ম দিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগ শিষ্যগণসমভিব্যাহারে রাজর্ষি জনমেজয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাজা বহুসংখ্যক সদস্য, নানাদেশীয় নরপতিগণ, এবং যজ্ঞানুষ্ঠাননিপুণ প্রজাপতিতুল্য ঋত্বিক্‌গণে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন।

ভরতকুলপ্রদীপ রাজর্ষি জনমেজয় মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া সত্বর হইয়া, স্বগণসমভি-ব্যাহারে প্রত্যুদ্গমনপূর্বক বসিবার নিমিত্ত কাঞ্চননির্মিত আসন প্রদান করিলেন।

দেবগণ ও ঋষিগণের পূজনীয় মহর্ষি উপবিষ্ট হইলে, রাজা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন ; প্রথমতঃ পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয় প্রদান করিয়া, পরিশেষে মধুপর্কোক্তবিধানে এক গো নিবেদন করিয়া দিলেন। ব্যাসদেব জনমেজয়ের পূজা গ্রহণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন, এবং নিরপরাধে গোবধ করা বিধেয় নহে, এই বলিয়া উহার প্রাণবধ নিবারণ করিলেন।

রাজা, এইরূপে প্রপিতামহের পূজা সমাধান করিয়া, প্রীত মনে তৎসমীপে উপবেশন পুরঃসর তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ও আত্মকুশল নিবেদিলেন। পরে সমুদায় সদস্যগণ তাঁহার স্তব করিলেন ; তিনিও তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করিলেন। অনন্তর জনমেজয়, সমস্ত সদস্যগণসহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া, এই জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! আপনি কৌরব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন ; অতএব আমার একান্ত বাসনা এই, আপনি তাঁহাদের চরিত কীর্তন করেন। আমার পিতামহেরা রাগদ্বেষাদিশূন্য ছিলেন, তথাপি কি নিমিত্ত তাদৃশ বিবাদ ও তাদৃশ সর্বসংহারকারী মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল, আপনি কৃপা করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সমীপোপবিষ্ট স্বীয় শিষ্য বৈশম্পায়নকে এই আদেশ করিলেন, পূর্বে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যেরূপে আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকট তুমি যেরূপ শুনিয়াছ, সেই সমস্ত ইঁহাকে শ্রবণ করাও। বৈশম্পায়ন গুরুদেবের আদেশ পাইয়া, রাজা, সদস্যবর্গ ও অন্যান্য নৃপতিগণের নিকট কুরুপাণ্ডবের গৃহবিচ্ছেদ ও কুলক্ষয় সংক্রান্ত পুরাতন ইতিহাস আদ্যোপান্ত কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতসূচনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রথমতঃ গুরুদেবকে ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে একাগ্র চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া এবং সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের সম্মান ও সৎকার করিয়া, সর্বলোকবিখ্যাত ধীমান্ মহর্ষি ব্যাসদেবের অশেষ মত বর্ণন করিব। মহারাজ ! আপনি এই ভারতীয় কথা শ্রবণের যোগ্য পাত্র, এবং গুরুদেবের আদেশ পাইয়া আমারও এই মহতী কথার কীর্তনে উৎসাহ জন্মিতেছে।

মহারাজ ! শ্রবণ করুন। রাজ্যের নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়া দ্বারা যেরূপে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের আত্মবিচ্ছেদ, পাণ্ডবদিগের বনবাস ও সর্বসংহারকারী সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, তাহা আমি আপনার নিকট বর্ণন করিব। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ বীর, পিতার পরলোক প্রস্থানের পর, অরণ্য হইতে আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অচিরকালমধ্যেই বেদে ও ধনুর্বেদে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে এইরূপ শ্রী, কীর্তি, রূপ, বল, বীর্য ও ঔদার্য সম্পন্ন এবং পুরবাসিগণের প্রিয় দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষাপরবশ হইলেন। ক্রূরস্বভাব দুর্যোধন, কর্ণ ও সৌবল, একমতাবলম্বী হইয়া, পাণ্ডবদিগের

নানা নিগ্রহ করিতে ও তাঁহাদিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। পাপাত্মা দুর্যোধন ভীমকে অন্নের সহিত বিষপান করাইয়াছিল ; কিন্তু ভীম তাহা জীর্ণ করিয়াছিলেন। ভীম গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা দুর্যোধন সেই অবস্থায় তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া গঙ্গাপ্রবাহে প্রক্ষেপপূর্বক গৃহে আসিয়াছিল। পরে কুন্তীনন্দন জাগরিত হইয়া নিজ বাহুবলে বন্ধনচ্ছেদনপূর্বক গঙ্গাপ্রবাহ হইতে উত্থান করেন। একদা ভীমকে নিদ্রিত দেখিয়া, দুর্যোধন অতি তীক্ষ্ণবিষ কৃষ্ণসর্প দ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গে দংশন করায়, তথাপি তাঁহার প্রাণনাশ হয় নাই।

এইরূপে দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের যে সকল নিগ্রহ করিত, মহামতি বিদুর তৎপ্রতীকার ও তৎসমুদায় হইতে তাঁহাদের রক্ষণবিষয়ে সতত অবহিত ছিলেন। স্বর্গবাসী দেবরাজ ইন্দ্র যেমন জীবলোকের সুখপ্রদ, বিদুর পাণ্ডবদিগের নিয়ত সেইরূপ সুখপ্রদ ছিলেন।

যখন দুরাত্মা দুর্যোধন, কি গুপ্ত কি প্রকাশিত, কোনও উপায়েই পাণ্ডবদিগের বিনাশ করিতে পারিল না, তখন কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া জতুগৃহ নির্মাণ করাইল। পুত্রের চিত্তরঞ্জনকারী রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগাভিলাষে পাণ্ডবদিগকে নির্বাসিত করিলেন। তাঁহারা পঞ্চ-ভ্রাতা ও জননী ছয় জনে হস্তিনাপুর হইতে প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর মহাশয় প্রস্থানকালে তাঁহাদের মন্ত্রিস্বরূপ হইয়াছিলেন ; তাঁহারই মন্ত্রণাপ্রভাবে তাঁহারা নিশীথ সময়ে জতুগৃহদাহ হইতে মুক্ত হইয়া বনপ্রস্থান করিতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা বারণাবতনগরে উপস্থিত হইয়া জননীসহিত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে, অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক লইয়া, জতুগৃহে সংবৎসর বাস করিলেন। অনন্তর বিদুরের উপদেশক্রমে প্রথমতঃ সুরঙ্গ প্রস্তুত করিলেন ; পরে সেই জতুগৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া এবং দুরাচার পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া জননীসহিত গুপ্ত ভাবে পলায়ন করিলেন।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া পাণ্ডবেরা এক বননির্ঝরের সমীপে হিড়িম্বনামক এক মহাভয়ানক রাক্ষস দেখিতে পাইলেন, এবং ঐ রাক্ষসরাজের প্রাণবধ করিয়া প্রকাশভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। ভীমসেন এই স্থলে হিড়িম্বা রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করেন। এই হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। অনন্তর পাণ্ডবেরা একচক্রানামক নগরীতে উপস্থিত হইলেন, এবং ব্রহ্মচারিবেশ পরিগ্রহপূর্বক বেদাধ্যয়নরত ও ব্রতপরায়ণ হইয়া, কিছু কাল এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অবস্থিতি করিলেন। তথায় এক মহাবল পরাক্রান্ত বকনামক ভয়ানক ক্ষুধার্ত রাক্ষস ছিল ; মহাবাহু ভীমসেন তাহার নিকটে গিয়া, নিজ বাহুবীর্যপ্রভাবে তাহার প্রাণবধ করিয়া, নগরবাসীদিগের ভয় নিরাকরণ ও শোক নিবারণ করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে পাণ্ডবেরা শ্রবণ করিলেন, পাঞ্চালদেশে দ্রৌপদীনামে এক কন্যা স্বয়ংবরা হইয়াছেন। স্বয়ংবরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তথায় গমন করিলেন, এবং দ্রৌপদী লাভ করিয়া সংবৎসর কাল পাঞ্চালদেশে অবস্থান করিলেন। অনন্তর

তাঁহাদিগকে সকলে পাণ্ডব বলিয়া জানিতে পারিবাতে, পুনর্বার তাঁহারা হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মদেব পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ! কিসে তোমাদিগের ভ্রাতৃবিরোধ না হয়, এই বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, তোমাদিগকে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে হইবেক ; অতএব তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থ প্রস্থান কর। ঐ নগর পরম রমণীয়, বাসের উপযুক্ত স্থান। তাঁহারা, তাঁহাদিগের দুই জনের বচনানুসারে, আপনাদিগের সমুদায় সম্পত্তি গ্রহণপূর্বক সমস্ত সুহৃজ্জন সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থ প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবেরা তথায় বহু বৎসর বাস করিলেন, এবং শস্ত্রবলপ্রভাবে অন্যান্য নরপতিদিগকে বশীভূত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ধর্মনিষ্ঠ, সত্যব্রতপরায়ণ, সর্ব বিষয়ে সাবধান ও ক্ষমাশীল হইয়া অনেকানেক বিপক্ষগণকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। মহাযশস্বী ভীমসেন পূর্ব দিক্ জয় করিলেন, মহাবীর অর্জুন উত্তর দিক্, নকুল পশ্চিম দিক্, বিপক্ষপক্ষক্ষয়কারী সহদেব দক্ষিণ দিক্ জয় করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে সমস্ত পৃথিবীকে আপনাদিগের বশীভূত করিলেন। সূর্যদেব স্বভাবতঃ সতত বিরাজমান আছেন, এক্ষণে যথার্থ বিক্রমশালী পঞ্চ পাণ্ডব সূর্যদেবের ন্যায় বিরাজমান হওয়াতে, পৃথিবী ষট্‌সূর্যসম্পন্নার ন্যায় হইল।

অনন্তর, যথার্থবিক্রমশালী তেজস্বী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, কোনও প্রয়োজনবশতঃ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, পুরুষশ্রেষ্ঠ, স্থিরমতি, সর্বগুণালঙ্কৃত অর্জুনকে বনপ্রেরণ করিলেন। তিনি পূর্ণ সংবৎসর ও এক মাস বনবাস করিয়া, কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, দ্বারকা গমন করিলেন। তথায় তিনি বাসুদেবের অনুজা রাজীবলোচনা মধুরভাষিণী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন। যেমন ইন্দ্রের শচী, নারায়ণের লক্ষ্মী, সেইরূপ সুভদ্রা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের সহধর্মিণী হইলেন।

কুন্তীতনয় অর্জুন, বাসুদেবের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া, খাণ্ডবদাহে হব্যবাহনের তৃপ্তি সম্পাদন করিলেন। বাসুদেব সহায় থাকাতে খাণ্ডবদাহ অর্জুনের কষ্টসাধ্য হইল না। অগ্নি প্রীত হইয়া অর্জুনকে ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব, অক্ষয়বাণপূর্ণ দুই তূণ, এবং কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জুন খাণ্ডবদাহকালে ময়নামক অসুরকে মুক্ত করেন, এই নিমিত্ত ময়াসুর রাজসূয়যজ্ঞকালে সর্বরত্নালঙ্কৃত দিব্য সভা নির্মাণ করিয়াছিলেন। নিতান্ত দুর্মতি হীনবুদ্ধি দুর্যোধন সেই সভা দর্শনে লোভাক্রান্ত হইলেন, তৎপরে শকুনির সহিত পাশক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চনা করিয়া দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বনপ্রেরণ করিলেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিলেন।

পাণ্ডবেরা, এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া, যখন চতুর্দশ বর্ষে স্বীয় রাজ্যাধিকার প্রার্থনা করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না, তখন যুদ্ধারম্ভ হইল। তাঁহারা সেই

যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস ও রাজা দুর্যোধনের প্রাণবধ করিয়া পুনরায় রাজ্যাধিকার লাভ করিলেন।

মহাত্মা পাণ্ডবদিগের পুরাবৃত্ত, রাজ্যাধিকারের নিমিত্ত ভ্রাতৃভেদ ও যুদ্ধজয়ের বৃত্তান্ত এই।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতপ্রশংসা

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কৌরবচরিত মহাভারত উপাখ্যান সমুদায় সংক্ষেপে কীর্তন করিলেন; কিন্তু বিস্তারিত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব আপনি সেই বিচিত্র কথা বিস্তারিত করিয়া পুনর্বার কীর্তন করুন। আমি পূর্বপুরুষদিগের মহৎ চরিত্র শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি না। পাণ্ডবেরা যে ধর্মজ্ঞ হইয়াও অবধ্য জ্ঞাতিবর্গ প্রভৃতির প্রাণবধ করিয়াছিলেন, অথচ সর্বজনপ্রশংসনীয় হইয়াছেন, ইহা অল্প হেতুতে হইতে পারে না। কি নিমিত্ত সেই নিরপরাধ মহাপুরুষেরা, বিপৎপ্রতীকারসমর্থ হইয়াও, দুরাত্মা কৌরবদিগের প্রযোজিত সেই সমস্ত অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, কি নিমিত্ত অযুতহস্তিবলধারী বাহুশালী বৃকোদর, অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও, ক্রোধ সংবরণ করিয়াছিলেন, দুরাত্মারা দ্রৌপদীকে অশেষ প্রকারে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রতীকারসমর্থা হইয়াও কি নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ক্রোধনেত্র দ্বারা দগ্ধ করেন নাই; দুরাত্মারা, নরশ্রেষ্ঠ ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে যথেষ্ট ক্লেশ দিয়াছিল, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতব্যসনে আসক্ত দেখিয়াও কি নিমিত্ত তাঁহার অনুগত ছিলেন; সর্বধার্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্মবেত্তা ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির এরূপ ক্লেশভোগের যোগ্য নহেন, তিনিই বা কি নিমিত্ত এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন; আর কি রূপেই বা অর্জুন একাকী কেবল কৃষ্ণকে সারথিরূপে সহায় পাইয়া অসংখ্য সেনা বিনাশ করিতে পারিয়াছিলেন? হে তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং সেই মহাপুরুষেরা তত্তৎকালে যে সকল কর্ম করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ক্ষণ কাল বিলম্ব করুন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নকীর্তিত অতি সুবিস্তৃত পবিত্র আখ্যান কীর্তন করিতে হইবে। মহাত্মা মহাতেজাঃ সর্বলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাসের সমুদায় অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিতেছি। অমিততেজাঃ সত্যবতীতনয় পবিত্র লক্ষ শ্লোক দ্বারা এই বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যে বিদ্বান্ ইহা পাঠ করেন ও যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবতুল্যতা প্রাপ্ত হন। মহর্ষিপ্রণীত এই উৎকৃষ্ট পুরাণ বেদতুল্য, পবিত্র, সুশ্রাব্য ও ঋষিগণপূজিত। এই পরম পবিত্র ইতিহাসে অর্থ, কাম ও তত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ লক্ষণ স্পষ্ট রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি দানশীল সত্যবাদী ধার্মিক মহাত্মাদিগকে এই ব্যাসপ্রণীত বেদ শ্রবণ করাইয়া অর্থ লাভ করেন। চন্দ্র যেরূপ রাহু হইতে বিনির্মুক্ত হয়েন, সেইরূপ লোকেরা দুরাত্মা হইলেও এই পুরাণ পাঠে

ভ্রূণহত্যাদি মহাপাপ হইতে নিঃসন্দেহ পরিত্রাণ পায়। এই ইতিহাসের নাম জয়, অতএব বিজিগীষুদিগের ইহা শ্রবণ করা কর্তব্য। রাজারা ইহা শ্রবণ করিলে পৃথিবী জয় ও অরাতি পরাজয় করিতে পারেন। ইহা মহৎ স্বস্ত্যয়ন ও পুংসবন সংস্কারস্বরূপ; যুবরাজ মহিষীর সহিত ইহা বারংবার শ্রবণ করিলে, তাঁহাদিগের অতি বীর্যশালী পুত্র ও রাজ্যভাগিনী কন্যা জন্মে। অপরিমিতবুদ্ধিশালী মহর্ষি বেদব্যাস, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ও মোক্ষশাস্ত্র স্বরূপ এই ভারত রচনা করিয়াছেন। এই ভারত বর্তমান কালে অনেকে কীর্তন করিতেছে, এবং উত্তর কালে অনেকে শ্রবণ করিবে। পুত্রেরা ভারত শ্রবণ করিলে পিতার আজ্ঞানুবর্তী ও প্রিয়কারী হয়। যে নর ইহা শ্রবণ করে, সে কায়মনোবাক্যে কৃত পাপ হইতে শীঘ্র বিনির্মুক্ত হয়। যে সকল ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া ভরতবংশীয়দিগের মহৎ জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করে, তাহাদিগের ব্যাধিভয় ও পরলোকভয় থাকে না। মহাত্মা পাণ্ডবদিগের কীর্তি কীর্তন করিবার উদ্দেশে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যশস্কর আয়ুষ্কর এবং স্বর্গ ও অর্থ সাধন এই পবিত্র পুরাণ রচনা করিয়াছেন। যিনি শুদ্ধচরিত পবিত্র ব্রাহ্মণদিগকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি সনাতন ধর্ম লাভ করেন। যিনি শুচি হইয়া বিখ্যাত কুরুকুলের ও অন্যান্য প্রভূতধনসম্পন্ন অতি তেজস্বী সর্ববিদ্যাবিশারদ বিখ্যাতকীর্তি নরপতিদিগের প্রসিদ্ধ বংশ কীর্তন করেন, তাঁহার বংশের বিপুল বৃদ্ধি হয়, এবং সকলে তাঁহার সম্মান ও পূজা করে। যে ব্রাহ্মণ ব্রতপরায়ণ হইয়া বর্ষা চারি মাস পবিত্র ভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যিনি নিত্য ভারত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে সকল বেদের পারদর্শী বলা যায়। যাহাতে দেবতাদিগের, রাজর্ষিদিগের, বিধূতপাপ পুণ্যশালী ব্রহ্মর্ষিদিগের ভগবান্ দেবেশ কেশবের ও দেবীর কীর্তন আছে, যাহাতে কার্তিকেয়ের জন্মবিবরণ বর্ণিত আছে, যাহাতে গোব্রাহ্মণমহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, সমস্তবেদস্বরূপ সেই ভারত ধর্মলাভাকাঙ্ক্ষীদিগের শ্রবণ করা কর্তব্য। যে বিদ্বান্ পর্বদিনে বিপ্রদিগকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোক জয় করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করেন। শ্রাদ্ধদিবসে অন্ততঃ ইহার এক পাদ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইলে, সেই শ্রাদ্ধ পিতৃলোকদিগের অক্ষয় তৃপ্তি সম্পাদন করে। দিবসে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ মনুষ্য যে সকল পাপ সঞ্চয় করে, মহাভারত শুনিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ভরতবংশীয়দিগেষ মহৎ জন্মবিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত; যিনি মহাভারতশব্দের এই ব্যুৎপত্তি অবগত হয়েন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। এই ভারতে ভারতবংশীয়দিগের বিচিত্র চরিত্র কীর্তিত হইয়াছে, ইহা পাঠ করিলে মনুষ্যেরা মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। লব্ধকাম মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ক্রমাগত তিন বৎসর শুচি ও যত্নশীল হইয়া নিয়মপূর্বক এই ভারত রচনা করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্মণদিগের নিয়মযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করা উচিত। এই ব্যাসপ্রোক্ত পবিত্র ভারতকথা যে সকল ব্রাহ্মণ পাঠ করেন, ও যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহারা যথেষ্টাচারী হইলেও নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান ও বিহিত কর্মের অননুষ্ঠান জন্য দোষে লিপ্ত হয়েন না। ধর্মকামনায় আদ্যন্ত এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে

কামনা সিদ্ধ হয়। এই পরম পবিত্র সর্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস শ্রবণে যাদৃশ সুখ ও সন্তোষ লাভ হয়, মনুষ্য স্বর্গলাভেও তাদৃশ সুখ ও সন্তোষের অধিকারী হইতে পারে না। যে সকল পুণ্যশীল লোক এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করেন, এবং শ্রবণ করান, তাঁহাদিগের রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। যেমন সমুদ্র ও সুমেরু রত্ননিধি বলিয়া বিখ্যাত, এই ভারতও সেইরূপ রত্ননিধি। এই মহাভারত বেদতুল্য পবিত্র, উৎকৃষ্ট, শ্রুতিসুখপ্রদ ও শীলবর্ধন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি যাচকদিগকে এই ভারত দান করে, তাহার সসাগরা পৃথিবী দান করা হয়। আমি পুণ্য ও বিজয়ের নিমিত্ত সন্তোষদায়িনী এই দিব্য মহাভারতকথা বিস্তারিত রূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষি বেদব্যাস সতত যত্নশীল হইয়া তিন বৎসরে এই অদ্ভুত মহাভারত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। হে ভরতকুলপ্রদীপ! ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষের বিষয়ে যাহা ইহাতে লিখিত আছে, তাহাই অন্যত্র দেখা যায়, যাহা ইহাতে লিখিত হয় নাই, তাহা আর কুত্রাপি নাই।

সীতার বনবাস

বিজ্ঞাপন

সীতার বনবাস প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত হইয়াছে। ঈদৃশ করুণরসোদ্বোধক বিষয় যে রূপে সঙ্কলিত হওয়া উচিত, এই পুস্তকে সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে; সুতরাং, সহৃদয় লোকে পাঠ করিয়া সন্তোষ-লাভ করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি, সীতার বনবাস, কিঞ্চিৎ অংশেও, পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই, আমি চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ। সংবৎ ১৯১৭।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে, স্বল্প সময়েই সমস্ত কোশলরাজ্য সর্বত্র সর্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ, তদীয় অধিকারকালে প্রজালোকের সর্বাংশে যাদৃশ সৌভাগ্যসঞ্চার ঘটিয়াছিল, ভূমণ্ডলে কোনও কালে কোনও রাজার শাসনসময়ে সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। তিনি, প্রতিদিন, যথাকালে, অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, অবহিত চিত্তে রাজকার্যের পর্যা-লোচনা করিতেন ; অবশিষ্ট সময় ভ্রাতৃত্রয়ের ও জনকতনয়ার সহবাসসুখে অতিবাহিত হইত।

কালক্রমে জানকীর গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে রামের ও রামজননী কৌশল্যার আহ্লাদের সীমা রহিল না ; সমস্ত রাজভবন উৎসবে পূর্ণ হইল ; পুরবাসিগণ, অচিরে রাজকুমার দেখিব, এই মনের উল্লাসে স্ব স্ব আবাসে অশেষবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজা রামচন্দ্র, পরিবারবর্গের সহিত তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রিত হইলেন। এই সময়ে জানকীর গর্ভ প্রায় পূর্ণ অবস্থায় উপস্থিত, এজন্য তিনি, এবং তদনুরোধে রাম ও লক্ষ্মণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না ; কেবল বৃদ্ধ মহিষীরা বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী সমভিব্যাহারে, জামাতৃযজ্ঞে গমন করিলেন। তাঁহারাও, পূর্ণগর্ভা জানকীরে গৃহে রাখিয়া, তথায় যাইতে কোনও মতে সম্মত ছিলেন না ; কেবল, জামাতৃকৃত নিমন্ত্রণের উল্লঙ্ঘন সর্বথা অবিধেয়, এই বিবেচনায় নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক যজ্ঞদর্শনে গমন করেন।

কতিপয় দিবস পূর্বে, রাজা জনক, তনয়া ও জামাতাকে দেখিবার নিমিত্ত, অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। তিনি, কৌশল্যাপ্রভৃতির নিমন্ত্রণগমনের অব্যবহিত পরেই, মিথিলায় প্রতিগমন করিলেন। প্রথমতঃ শ্বশ্রূজনবিরহ, তৎপরেই পিতৃবিরহ, উভয় বিরহে জানকী একান্ত শোকাকুলা হইলেন। পূর্ণগর্ভ অবস্থায় শোকমোহাদি দ্বারা অভিভূত হইলে, অনিষ্টাপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ; এজন্য রামচন্দ্র, সর্বকর্ম-পরিত্যাগপূর্বক, সীতার সান্ত্বনার নিমিত্ত সতত তৎসন্নিধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এক দিবস, রামচন্দ্র জানকীসমীপে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে, প্রতীহারী আসিয়া বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ ! মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে সংবাদ লইয়া অষ্টাবক্র মুনি আসিয়াছেন। রাম ও জানকী শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তাঁহাকে ত্বরায় এই স্থানে আন। প্রতিহারী, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে

প্রস্থানপূর্বক, পুনর্বার অষ্টাবক্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অষ্টাবক্র, দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রাম ও জানকী প্রণাম করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে, রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের কুশল? তাঁহার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে? সীতাও জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, আমার গুরুজন ও আর্যা শান্তা সকলে কুশলে আছেন? তাঁহারা আমাদিগকে মনে করেন, না এক বারেই ভুলিয়া গিয়াছেন?

অষ্টাবক্র, সকলের কুশলবার্তাবিজ্ঞাপন করিয়া, সমুচিত সম্ভাষণপূর্বক জানকীকে বলিলেন, দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আপনারে বলিয়াছেন, ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী তোমায় প্রসব করিয়াছেন; সাক্ষাৎ প্রজাপতি রাজা জনক তোমার পিতা; তুমি সর্বপ্রধান রাজকুলের বধূ হইয়াছ; তোমার বিষয়ে আর কোনও প্রার্থয়িতব্য দেখিতেছি না; অহোরাত্র এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও। সীতা শুনিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা হইলেন। রাম যার পর নাই হর্ষিত হইয়া বলিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব যখন এরূপ আশীর্বাদ করিতেছেন, তখন অবশ্যই আমাদের মনোরথ সম্পন্ন হইবেক। অনন্তর, অষ্টাবক্র রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহারাজ! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী, বৃদ্ধ মহিষীগণ, ও কল্যাণিনী শান্তা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন, সীতা দেবী যখন যে অভিলাষ করিবেন, যেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হয়। রাম বলিলেন, আপনি তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, ইনি যখন যে অভিলাষ করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইতেছে; সে বিষয়ে আমার এক মুহূর্তের জন্যেও আলস্য বা ঔদাস্য নাই।

অনন্তর, অষ্টাবক্র বলিলেন, দেবি জানকি! ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ সাদর ও সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্বক বলিয়াছেন, বৎসে! তুমি পূর্ণগর্ভা, এজন্য তোমায় আনিতে পারি নাই, তন্নিমিত্ত আমি যেন তোমার বিরাগভাজন না হই: আর রাম ও লক্ষ্মণকে তোমার চিত্তবিনোদনার্থে রাখিতে হইয়াছে; আরব্ধ যজ্ঞ সমাপিত হইলেই, আমরা সকলে অযোধ্যায় গিয়া তোমার ক্রোড়দেশ একবারে নব কুমারে সুশোভিত দেখিব। রাম শুনিয়া স্মিতমুখ ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া অষ্টাবক্রকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আমার প্রতি কোনও আদেশ করিয়াছেন? অষ্টাবক্র বলিলেন, মহারাজ! বশিষ্ঠ দেব আপনারে বলিয়াছেন, বৎস! জামাতৃযজ্ঞে রুদ্ধ হইয়া, আমাদিগকে, কিছু দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তুমি বালক, অল্প দিন মাত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ; প্রজারঞ্জনকার্যে সর্বদা অবহিত থাকিবে; প্রজারঞ্জনসম্ভূত নির্মল কীর্তিই রঘুবংশীয়দিগের পরম ধন। রাম বলিলেন, আমি ভগবানের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম; তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সর্বদাই আমার শিরোধার্য। আপনি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া বলিবেন, যদি প্রজালোকের সর্বাঙ্গীণ অনুরঞ্জনের জন্য আমায় স্নেহ, দয়া, বা সুখভোগ বিসর্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীর মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি

কিছুমাত্র কাতর হইব না। তিনি যেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন; আমি প্রজারঞ্জনকার্যে ক্ষণকালের জন্যেও অলস ও অনবহিত নহি। সীতা শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, এরূপ না হইলেই বা আর্যপুত্র রঘুকুলধুরন্ধর হইবেন কেন?

অনন্তর, রামচন্দ্র সন্নিহিত পরিচারকের প্রতি অষ্টাবক্রকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ-প্রদান করিলেন। অষ্টাবক্র সমুচিত সম্ভাষণ ও আশীর্বাদপ্রয়োগ পূর্বক বিদায় লইয়া বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলে, রাম ও জানকী পুনরায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া বলিলেন, আর্য! আমি এক চিত্রকরকে আপনকার চরিত্র চিত্রিত করিতে বলিয়াছিলাম; সে এই আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে, অবলোকন করুন। রাম বলিলেন, বৎস! দেবী দুর্মনায়মানা হইলে, কিরূপে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে হয়, তাহা তুমিই বিলক্ষণ জান; তা জিজ্ঞাসা করি, এই চিত্রপটে কি পর্যন্ত চিত্রিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যা জানকীর অগ্নিপরিশুদ্ধিকাণ্ড পর্যন্ত।

রাম শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি আমার সমক্ষে আর ও কথা মুখে আনিও না; ও কথা শুনিলে অথবা মনে হইলে, আমি সাতিশয় কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই। কি আক্ষেপের বিষয়! যিনি জন্মপরিগ্রহ করাতে জগৎ পবিত্র হইয়াছে, তাঁহাকেও আবার অন্য পাবন দ্বারা পূত করিতে হইয়াছিল। হায়, লোক-রঞ্জন কি দুরূহ ব্রত! সীতা বলিলেন, নাথ! সে সকল কথা মনে করিয়া আপনি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতেছেন কেন? আপনি তৎকালে সদ্বিবেচনার কর্মই করিয়া-ছিলেন; সেরূপ না করিলে চিরনির্মল রঘুকুলে কলঙ্কস্পর্শ হইত, এবং আমারও অপবাদ বিমোচন হইত না। সীতার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বলিলেন, প্রিয়ে! আর ও কথায় কাজ নাই; এস, আলেখ্য দেখি।

সকলে আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা কিয়ৎ ক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আলেখ্যের উপরিভাগে ঐ সমস্ত কি চিত্রিত রহিয়াছে? রাম বলিলেন, প্রিয়ে! ও সকল সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র। ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণ, বেদরক্ষার নিমিত্ত, দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ঐ সকল তপোময় তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরুপরম্পরায় ভগবান্ কৃশাশ্বের নিকট সমাগত হইলে, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত মহাস্ত্র পাইয়াছিলেন। পরম কৃপালু রাজর্ষি, সবিশেষ কৃপাপ্রদর্শনপূর্বক, তাড়কানিধনকালে আমায় তৎসমুদায় দিয়াছিলেন। তদবধি উহারা আমার অধিকারে আছে, তোমার পুত্র হইলে তাহাদের আশ্রয়গ্রহণ করিবেক।

লক্ষ্মণ বলিলেন, দেবি! এ দিকে মিথিলাবৃত্তান্তে দৃষ্টিপাত করুন। সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, তাই ত, ঠিক যেন আর্যপুত্র হরধনু উত্তোলিত করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার, বিস্ময়াপন্ন হইয়া

অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি মরি, কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে। আবার, এ দিকে বিবাহকালীন সভা ; সেই সভায় তোমরা চারি ভাই, তৎকালোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া, কেমন শোভা পাইতেছ। চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছি। শুনিয়া, পূর্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম বলিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ বলিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পিত করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় বর্তমান রহিয়াছে।

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, এই আর্যা, এই আর্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্তি ; কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ ঊর্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে ঊর্মিলার দিকে অঙ্গুলি-প্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এ দিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে ? লক্ষ্মণ কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দেবি! দেখুন দেখুন, হরশরা-সনের ভঙ্গবার্তাশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন আমাদের অযোধ্যাগমনপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন ; আর, এ দিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য তাঁহার দর্পসংহার করিবার নিমিত্ত শরাসনে শরসন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্মপ্রশংসাবাদশ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন, এজন্য বলিলেন, লক্ষ্মণ! এই চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় আছে, ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন ? সীতা রামবাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, নাথ! এমন না হইলে, সংসারের লোকে একবাক্য হইয়া আপনার এত প্রশংসা করিবেক কেন ?

তৎপরেই অযোধ্যাপ্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে, রাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, আমরা বিবাহ করিয়া আসিলে, কত উৎসবে দিনপাত হইয়াছিল ; পিতৃদেবের কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ ; মাতৃদেবীরা অভিনব বধূদিগকে পাইয়া কেমন আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন ; সতত, তাহাদের প্রতি কতই যত্ন, কতই বা মমতাপ্রদর্শন, করিতেন ; রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদময় ও উৎসবপূর্ণ হইয়াছিল। হায়! সে সকল কি আহ্লাদের, কি উৎসবের, দিনই গিয়াছে। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই মন্থরা। রাম, মন্থরার নামশ্রবণে অন্তঃকরণে বিরক্ত হইয়া, কোনও উত্তর না দিয়া অন্য দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্বক বলিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, শৃঙ্গবের নগরে যে তাপসতরুর তলে পরম বন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল, উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

সীতা দেখিয়া হর্ষপ্রদর্শন করিয়া বলিলেন, নাথ! এ দিকে জটাবন্ধন ও বল্কলধারণ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে, দেখুন। লক্ষ্মণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বৃদ্ধবয়সে পুত্রহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া অরণ্যে বাস করেন ; কিন্তু আর্যকে বাল্যকালেই কঠোর আরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অনন্তর, তিনি রামকে বলিলেন, আর্য! মহর্ষি ভরদ্বাজ, আমাদিগকে চিত্রকূটে যাইবার পথ দেখাইয়া

দিয়া যাহার কথা বলিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দীতটবর্তী বটবৃক্ষ। তখন সীতা বলিলেন, কেমন নাথ! এই প্রদেশের কথা মনে হয়? রাম বলিলেন, প্রিয়ে! কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই স্থলে তুমি, পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়া, আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক দিয়া নিদ্রা গিয়াছিলে।

সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বনপূর্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ-বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফল মূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; গোদাবরীতীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া বলিলেন, আর্যে! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এইরূপ ভাবিয়া ম্লানবদনে বলিলেন, হা নাথ! এই পর্যন্তই দেখা শুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, অয়ি বিয়োগকাতরে! এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য! চিত্রদর্শনে চিরাতীত জনস্থানবৃত্তান্ত বর্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দুরাচার মারীচ হিরণ্ময় মৃগের আকৃতি ধারণ করিয়া যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ বৈরনির্যাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে মর্মবেদনা প্রদান করে। এই ঘটনার পর, আর্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থান ভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকিত হইলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সীতা, লক্ষ্মণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়! এ অভাগিনীর জন্যে আর্যপুত্রকে কতই ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে, রামেরও নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে

লাগিল। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! চিত্র দেখিয়া আপনি এত শোকাভিভূত হইতেছেন কেন? রাম বলিলেন, বৎস! তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্যাতনসঙ্কল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে, আমি কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। চিত্রদর্শনে সেই অবস্থার স্মরণ হওয়াতে বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে দেখিয়াছ; এখন অনভিজ্ঞের মত কথা বলিতেছ কেন।

লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন; এবং বিষয়ান্তরের সংঘটন দ্বারা রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তরসম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বলিলেন, আর্য! এদিকে দণ্ডকারণ্যভূভাগ দৃষ্টিগোচর করুন; এই স্থানে দুর্ধর্ষ কবন্ধ রাক্ষসের বাস ছিল; এ দিকে ঋষ্যমূক পর্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম; এই সেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা; এই এ দিকে পম্পা সরোবর। রাম পম্পাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সীতাকে বলিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর; আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পা-তীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, প্রফুল্ল কমল সকল মন্দ মারুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের নিরতিশয় শোভাসম্পাদন করিতেছে; উহাদের সৌরভে চতুর্দিক্ আমোদিত হইয়া রহিয়াছে; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ বারিবিহঙ্গগণ মনের আনন্দে নির্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনির্গত হইতেছিল; সুতরাং সরোবরের শোভার সম্যক্ অনুভব করিতে পারি নাই; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে মুহূর্তমাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল এক এক বার অস্পষ্ট অবলোকন করিয়াছিলাম।

সীতা, চিত্রপটের আর এক অংশে দৃষ্টিযোজনা করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্বতে কুসুমিত কদম্বতরুর শাখায় ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্যপুত্র তরুতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রু নয়নে উঁহারে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষণ বলিলেন, আর্যে! ঐ পর্বতের নাম মাল্যবান; মাল্যবান বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন, নবজলধরমণ্ডলের সহযোগে শিখরদেশে কি অনির্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়া, পূর্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও; আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না; শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্য বেগে উথলিয়া উঠিতেছে; জানকীর বিরহ পুনরায় নবীভাব অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে সীতার আলস্য-লক্ষণ আবির্ভূত হইল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; আর্যা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে। এক্ষণে উঁহার বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।

এই বলিয়া বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ প্রস্থানোন্মুখ হইলে, সীতা রামকে বলিলেন, নাথ! চিত্র দেখিতে দেখিতে, আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! কি অভিলাষ বল, অবিলম্বেই সম্পাদিত হইবেক। তখন সীতা বলিলেন, আমার অভিলাষ এই, পুনর্বার মুনিপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া, তপোবনে বিহার ও নির্মল ভাগীরথীসলিলে অবগাহন করিব। সীতার অভিলাষ শ্রবণগোচর করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! এইমাত্র গুরুজন আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, জানকী যখন যে অভিলাষ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। অতএব, গমনের উপযোগী আয়োজন কর; কল্য প্রভাতেই ইনি অভিলষিত প্রদেশে প্রেরিত হইবেন। সীতা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, নাথ! আপনিও সঙ্গে যাবেন। রাম বলিলেন, অয়ি মুগ্ধে! তাহাও কি আবার তোমারে বলিতে হইবেক। আমি কি তোমায় নয়নের অন্তরাল করিয়া এক মুহূর্তও সুস্থ হৃদয়ে থাকিতে পারিব? তৎপরে সীতা সস্মিত মুখে লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বৎস! তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবেক। তিনি, যে আজ্ঞা বলিয়া, গমনের উপযোগী আয়োজন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মণ নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, রাম ও সীতা বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া অসঙ্কুচিত ভাবে অশেষবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সীতার নিদ্রাকর্ষণের উপক্রম হইল। তখন রাম বলিলেন, প্রিয়ে! যদি ক্লান্তিবোধ হইয়া থাকে, আমার গলদেশে ভুজলতা অর্পিত করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। সীতা কোমল বাহুবল্লী দ্বারা রামের গলদেশ অবলম্বন করিলে, তিনি অনির্বচনীয় স্পর্শসুখের অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার বাহুলতার স্পর্শে, আমার সর্ব শরীরে যেন অমৃতধারার বর্ষণ হইতেছে, ইন্দ্রিয় সকল অভূতপূর্ব রসাবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে, চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে; অকস্মাৎ আমার নিদ্রাবেশ, কি মোহাবেশ, উপস্থিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সীতা, রামমুখবিনিঃসৃত অমৃতায়মান বচন-পরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, নাথ! আপনি চিরানুকূল ও স্থির-প্রসাদ। যাহা শুনিলাম, ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে। প্রার্থনা এই, যেন চির দিন এইরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ থাকে।

সীতার মৃদু মধুর মোহন বাক্য কর্ণগোচর করিয়া রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার কথা শুনিলে, শরীর শীতল হয়, কর্ণকুহর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকল বিমোহিত হয়, অন্তঃকরণে সজীবতা সম্পাদিত হয়। সীতা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, নাথ! এই নিমিত্তই সকলে আপনাকে প্রিয়ংবদ বলে। যাহা হউক, অবশেষে এ অভাগিনীর যে এত সৌভাগ্য ঘটিবেক, ইহা স্বপ্নের অগোচর। এই বলিয়া, সীতা শয়নের নিমিত্ত উৎসুক হইলে, রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এখানে অন্যবিধ শয্যার সঙ্গতি

নাই ; অতএব, যে অনন্যসাধারণ রামবাহু, বিবাহসময় অবধি, কি গৃহে, কি বনে, কি শৈশবে, কি যৌবনে, উপাধানস্থানীয় হইয়া আসিয়াছে, আজও সেই তোমার উপাধানকার্য সম্পন্ন করুক। এই বলিয়া, রাম বাহু প্রসারিত করিলেন ; সীতা তদুপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইলেন।

রাম স্নেহভরে কিয়ৎ ক্ষণ সীতার মুখনিরীক্ষণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে বলিতে লাগিলেন, কি চমৎকার ! যখনই প্রিয়ার বদনসুধাকরে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ ও অন্তরাত্মা অনির্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। ফলতঃ, ইনি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী ; ইঁহার স্পর্শ চন্দনরসে অভিষেকস্বরূপ ; বাহুলতা, কণ্ঠদেশে বিনিবেশিত হইলে, শীতল মসৃণ মৌক্তিক হারের কার্য করে। কি আশ্চর্য ! প্রিয়ার সকলই অলৌকিকপ্রীতিপ্রদ। রাম মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে সীতা নিদ্রাবেশে বলিয়া উঠিলেন, হা নাথ! কোথায় রহিলে।

সীতার স্বপ্নভাষিত শ্রবণগোচর করিয়া রাম বলিতে লাগিলেন, কি চমৎকার! চিত্রদর্শনে প্রিয়ার অন্তঃকরণে যে অতীত বিরহভাবনার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই স্বপ্নে অস্তিত্ব পরিগ্রহ করিয়া যাতনা প্রদান করিতেছে। এই বলিয়া, সীতার গাত্রে হস্তাবর্তন করিতে করিতে, রাম প্রেমভরে প্রফুল্লকলেবর হইয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ। কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কি যৌবন, কি বার্ধক্য, সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত। ঈদৃশ প্রণয়সুখের অধিকারী হওয়া অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এরূপ প্রণয় জগতে নিতান্ত বিরল ও একান্ত দুর্লভ ; যদি এত বিরল ও এত দুর্লভ না হইত, সংসারে সুখের সীমা থাকিত না।

রামের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই, প্রতীহারী সম্মুখে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! দুর্মুখ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, কি আজ্ঞা হয়। দুর্মুখ অন্তঃপুরচারী অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য। রাম, নূতন রাজ্যশাসনবিষয়ে প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত, তাহাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সে প্রতি দিন, প্রচ্ছন্ন ভাবে ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিত, এবং যে দিন যাহা জানিতে পারিত রামের গোচর করিয়া যাইত। এক্ষণে উহাকে সমাগত শুনিয়া রাম প্রতীহারীকে বলিলেন, ত্বরায় উহারে আমার নিকটে আসিতে বল। দুর্মুখ আসিয়া প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাম তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে দুর্মুখ! আজ কি জানিতে পারিয়াছ, বল ? দুর্মুখ বলিল, মহারাজ ! কি পৌরগণ, কি জানপদগণ, সকলেই বলে, আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে আছি।

এই কথা শুনিয়া রাম বলিলেন, তুমি প্রতি দিনই প্রশংসাবাদের সংবাদ দিয়া থাক ; যদি কেহ কোনও দোষকীর্তন করিয়া থাকে, বল, তাহা হইলে প্রতিবিধানে যত্নবান্ হই ; আমি স্তুতিবাদশ্রবণবাসনায় তোমায় অনুসন্ধান করিতে পাঠাই নাই। দুর্মুখ

অন্য অন্য দিন স্তুতিবাদমাত্র শুনিয়া আসিত, সুতরাং, যাহা শুনিত, তাহাই অকপটে রামের নিকটে জানাইত। সে দিবস সীতাসংক্রান্ত দোষকীর্তন শুনিয়া, অপ্রিয়সংবাদ-প্রদান অনুচিত, এই বিবেচনায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে, রাম দোষকীর্তন কথার উল্লেখ করিবামাত্র, সে চকিত ও হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল; পরে, কথঞ্চিৎ বুদ্ধি স্থির করিয়া, শুষ্ক মুখে বিকৃত স্বরে বলিল, না মহারাজ! আমি কোনও দোষকীর্তন শুনিতে পাই নাই। সে এইরূপে অপলাপ করিল বটে; কিন্তু তাহার আকারপ্রকার দর্শনে রামের অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সাতিশয় চলচিত্ত হইয়া আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, তুমি অবশ্যই দোষকীর্তন শুনিয়াছ, অপলাপ করিতেছ কেন? কি শুনিয়াছ বল, বিলম্ব করিও না; না বলিলে আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব, এবং এ জন্মে আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।

রামের নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া দুর্মুখ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি কি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম? কি রূপে রাজমহিষীসংক্রান্ত জনাপবাদ মহারাজের গোচর করিব? আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা এরূপ কার্যের ভারগ্রহণ করিব কেন? কিন্তু যখন, অগ্র অশ্চাৎ না ভাবিয়া, ভারগ্রহণ করিয়াহি, তখন প্রভুর নিকটে অকপটে প্রকৃত কথাই বলা উচিত। এই স্থির করিয়া সে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিল, মহারাজ! যদি আমায় সকল কথা যথার্থ বলিতে হয়, আপনি গাত্রোত্থান করিয়া গৃহান্তরে চলুন; আমি সে সকল কথা প্রাণান্তেও এখানে বলিতে পারিব না। রাম শুনিবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, সীতার জাগরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; আস্তে আস্তে আপন হস্ত হইতে তাঁহার মস্তক নামাইলেন, এবং দুর্মুখকে সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বর সন্নিহিত গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে গৃহান্তরে উপস্থিত হইয়া, রাম সাতিশয় ব্যগ্রতাপ্রদর্শনপূর্বক দুর্মুখকে বলিলেন, বিলম্ব করিও না, কি শুনিয়াছ, বিশেষ করিয়া বল; তোমার আকার প্রকার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে নানা সংশয় উপস্থিত হইতেছে। সে বলিল, মহারাজ! যে সর্বনাশের কথা শুনিয়াছি, তাহা মহারাজের নিকট বলিতে হইবেক এই মনে করিয়া আমার সর্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন, পূর্বাপর পর্যালোচনা না করিয়া, ওরূপ কার্যের ভার লইয়াছি, তখন অবশ্যই বলিতে হইবেক। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, নিবেদন করিতেছি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ! প্রায় সকলেই একবাক্য হইয়া অশেষ প্রকারে সুখ্যাতি করিয়া বলে, আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে বাস করিতেছি; কোনও রাজা কোশল দেশে শাসনের এরূপ সুপ্রণালী প্রবর্তিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু কেহ কেহ, রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়া কুৎসা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, আমাদের রাজার চিত্ত বড় নির্বিকার; একাকিনী সীতা এত কাল রাবণগৃহে রহিলেন; তিনি তাহাতে

কোনও দ্বৈধ বা দোষবোধ না করিয়া অনায়াসে তাঁহারে গৃহে আনিলেন। অতঃপর আমাদের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রে দোষ ঘটিলে তাহাদের শাসন করা সহজ হইবেক না; শাসন করিতে গেলে, তাহারা রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে নিরুত্তর করিবেক। অথবা, রাজা ধর্মাধর্মের কর্তা; তিনি যে ধর্ম অনুসারে চলিবেন, আমরা প্রজা, আমাদিগকেও সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। মহারাজ! যাহা শুনিয়াছিলাম, অবিকল নিবেদন করিলাম, আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। হা বিধাতঃ! এত দিনের পর তুমি আমার দুর্মুখনাম অন্বর্থ করিয়া দিলে। এই বলিয়া বিদায় লইয়া রোদন করিতে করিতে দুর্মুখ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দুর্মুখমুখে সীতাসংক্রান্ত অপবাদবৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া, রাম হা হতোঽস্মি বলিয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন, এবং গলদশ্রু লোচনে আকুল বচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়, কি সর্বনাশের কথা শুনিলাম! ইহা অপেক্ষা আমার বক্ষঃস্থলে বজ্রাঘাত হওয়া ভাল ছিল। কি জন্যে এখনও জীবিত রহিয়াছি? আমি নিতান্ত হতভাগ্য; নতুবা, কি নিমিত্তে উপস্থিত রাজ্যাধিকারে বিসর্জন দিয়া আমায় বনবাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল? কি নিমিত্তেই দুর্বৃত্ত দশানন পঞ্চবটীতে প্রবেশপূর্বক প্রাণপ্রিয়া জানকীরে লইয়া গিয়া, নির্মল রঘুকুল অভূতপূর্ব অপবাদে দূষিত করিয়াছিল? কি নিমিত্তেই বা সেই অপবাদ, অদ্ভুত উপায় দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে অপসারিত হইয়াও, দৈবদুর্বিপাকবশতঃ পুনর্বার নবীভূত হইয়া সর্বতঃ সঞ্চারিত হইবেক? সর্বথা, আমার জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ দুঃখভোগের নিমিত্তেই নিরূপিত হইয়াছিল। এখন কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোকাপবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে, অমূলক বলিয়া, এই অপবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করি; অথবা, এ জন্মের মত নিরপরাধা জানকীরে বিসর্জন দিয়া কুলের কলঙ্কবিমোচন করি; কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কেহ কখনও আমার মত উভয় সঙ্কটে পড়ে না।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া রাম কিয়ৎ ক্ষণ অধোদৃষ্টিতে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্বক বলিলেন, অথবা এ বিষয়ে আর কর্তব্যাকর্তব্য-বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যখন রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, সর্বোপায়ে লোকরঞ্জন করাই আমার কর্তব্য কর্ম ও প্রধান ধর্ম; সুতরাং, জানকীরেই বিসর্জন দিতে হইল। হা হত বিধে! তোমার মনে এই ছিল। এই বলিয়া রাম মূর্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে চেতনাসঞ্চার হইলে, রাম নিতান্ত করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, যদি আর আমার চেতনা না হইত, আমার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়স্কর হইত; নিরপরাধা জানকীরে বিসর্জন দিয়া দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইত না। এই মাত্র অষ্টাবক্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি লোকরঞ্জনের অনুরোধে জানকীরেও বিসর্জন দিতে হয়, তাহাও করিব। এরূপ ঘটিবেক বলিয়াই কি আমার মুখ হইতে

তাদৃশ বিষম প্রতিজ্ঞাবাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল। হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাসসহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরাধমের, এমন হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়াছিলে যে, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি চন্দনতরুবোধে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্র গুণে অধম; নতুবা বিনা অপরাধে তোমায় বিসর্জন দিতে উদ্যত হইব কেন? হায়! যদি এই মুহূর্তে আমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাই। আর বাঁচিয়া ফল কি; আমার জীবিতপ্রয়োজন পর্যবসিত হইয়াছে; জগৎ শূন্য ও জীর্ণ অরণ্যপ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে।

এইরূপ বলিতে বলিতে একান্ত আকুলহৃদয় ও কম্পমানকলেবর হইয়া রাম কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে, হায়! কি হইল বলিয়া, নিরতিশয় কাতর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হা মাতঃ! হা তাত জনক! হা দেবি বসুন্ধরে! হা ভগবতি অরুন্ধতি! হা কুলগুরো বশিষ্ঠ! হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র! হা প্রিয়বন্ধো বিভীষণ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব! হা বৎস অঞ্জনাহৃদয়নন্দন! তোমরা কোথায় রহিয়াছ, কিছুই জানিতে পারিতেছ না; এখানে দুরাত্মা রাম তোমাদের সর্বনাশে উদ্যত হইয়াছে। অথবা, আর আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের নাম-গ্রহণে অধিকারী নহি; আমার ন্যায় মহাপাতকী নামগ্রহণ করিলে, নিঃসন্দেহ তাঁহাদের পাপস্পর্শ হইবেক। আমি যখন সরলহৃদয়া, শুদ্ধচারিণী, পতিপ্রাণা কামিনীরে, নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও, অনায়াসে বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? হা রামময়জীবিতে! পাষাণময় নৃশংস রাম হইতে পরিণামে তোমার যে এরূপ দুর্গতি ঘটিবেক, তাহা তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই। নিঃসন্দেহ রামের হৃদয় বজ্রলেপময়, নতুবা এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? অথবা, বিধাতা জানিয়া শুনিয়াই আমায় ঈদৃশ কঠিনহৃদয় করিয়াছেন; তাহা না হইলে, অনায়াসে এরূপ নৃশংস কর্ম সম্পন্ন করিতে পারিব কেন?

এই বলিয়া গলদশ্রু নয়নে বিশ্রামভবনে প্রতিগমনপূর্বক রাম নিদ্রাভিভূতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক সাতিশয় করুণ স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! হতভাগ্য রাম এ জন্মের মত বিদায় লইতেছে। এই বলিয়া দুর্বিষহ শোকদহনে দগ্ধহৃদয় হইয়া রাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং, অনুজগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্য নিরূপণের নিমিত্তে মন্ত্রভবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাম মন্ত্রভবনে প্রবিষ্ট হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং সন্নিহিত পরিচারক দ্বারা ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, তিন জনকে, সত্বর উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইলেন। দিবাবসানসময়ে আর্য জনকতনয়াসহবাসে কালযাপন করেন, ঈদৃশ সময়ে মন্ত্রভবনে গমন করিয়া অকস্মাৎ আমাদিগের আহ্বান করিলেন কেন, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ভরতপ্রভৃতি সাতিশয় সন্দিহান ও আকুলহৃদয় হইলেন, এবং মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে করিতে সত্বরগমনে মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন, রাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, একাকী উপবিষ্ট আছেন, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন ; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতেছে। অগ্রজের তাদৃশী দশা দৃষ্টিগোচর করিয়া অনুজেরা বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং কি কারণে তিনি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতি বিষম অনিষ্টসঙ্ঘটনের আশঙ্কা করিয়া, তিন জনের মধ্যে, কাহারও এরূপ সাহস হইল না যে, কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে, তাঁহারাও তিন জনে, ঘোরতর বিপৎপাত স্থির করিয়া, এবং রামের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, রাম উচ্ছলিত শোকাবেগের কথঞ্চিৎ সংবরণ ও নয়নের অশ্রুধারা মার্জন করিয়া, সস্নেহ সম্ভাষণপূর্বক অনুজদিগকে সম্মুখদেশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবেশন করিয়া কাতর ভাবে রামচন্দ্রের নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্রে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রামের নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহারাও যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, লক্ষ্মণ, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিনয়পূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য ! আপনকার এই অবস্থা দেখিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছি। ভবদীয় ভাবদর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবশ্যই কোনও অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টসঙ্ঘটন হইয়াছে। গভীর জলধি কখনও অল্প কারণে আকুলিত হয় না ; সামান্য বায়ুবেগের প্রভাবে হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না। অতএব, কি কারণে আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দেশ করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনকার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না ; আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

লক্ষ্মণ এইরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে কারণজিজ্ঞাসু হইলে, রামচন্দ্র অতিদীর্ঘ-নিশ্বাসভার পরিত্যাগপূর্বক, দুর্বহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, নিতান্ত কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎস ভরত ! বৎস লক্ষ্মণ ! বৎস শত্রুঘ্ন ! তোমরা আমার জীবন,

তোমরা আমার সর্বস্ব ধন, তোমাদের নিমিত্তই আমি দুর্বহ রাজ্যভারের দুঃসহ বহন-ক্লেশ সহ্য করিতেছি। হিতসাধনে বা অহিতনিবারণে তোমরাই আমার প্রধান সহায়। আমি বিষম বিপদে পড়িয়াছি, এবং সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের অভিপ্রায়ে তোমাদিগকে অসময়ে সমবেত করিয়াছি। আপতিত অনিষ্টের নিবারণোপায় একমাত্র আছে। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সেই উপায় অবলম্বন করাই সর্বতোভাবে বিধেয় বোধ করিয়াছি। তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ; সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত তোমাদের গোচর করিয়া, সমুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা উপস্থিত বিপৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলেন, এবং পুনর্বার প্রবল বেগে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। অনুজেরা তদ্দর্শনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর্যের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, অবশ্যই অতি বিষম অনর্থপাত ঘটিয়াছে ; না জানি কি সর্বনাশের কথাই বলিবেন। কিন্তু, অনুভবশক্তি দ্বারা কিছুরই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, শ্রবণের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহারা একান্ত আকুল হৃদয়ে তদীয় বদনে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন।

রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ কর ; আমাদের পূর্বে ইক্ষাকুবংশে যে মহানুভব নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাপালন, ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্মসমুদয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পরম পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। আমার মত হতভাগ্য আর নাই ; আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সেই চিরপবিত্র ত্রিলোকবিখ্যাত বংশকে দুষ্পরিহর কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিয়াছি। লক্ষ্মণ! তোমার কিছুই অবিদিত নাই। যৎকালে আমরা তিন জনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করি, দুর্বৃত্ত দশানন আমাদের অনুপস্থিতিকালে, বলপূর্বক সীতারে আপন আলয়ে লইয়া যায় ; সীতা একাকিনী সেই দুর্বৃত্তের আলয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। অবশেষে আমরা সুগ্রীবের সহায়তায় দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করি। আমি সেই একাকিনী পরগৃহবাসিনী সীতারে লইয়া গৃহে রাখিয়াছি ; ইহাতে পৌরগণ ও জানপদবর্গ অসন্তোষপ্রদর্শন ও কলঙ্ককীর্তন করিতেছে। এজন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জানকীরে আর গৃহে রাখিব না। সর্ব প্রযত্নে প্রজারঞ্জন রাজার পরম ধর্ম। যদি তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারি, নিতান্ত অনার্যের ন্যায় বৃথা জীবনধারণের ফল কি বল। এক্ষণে তোমরা প্রশস্ত মনে অনুমোদন কর ; তাহা হইলে আমি উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাই।

অগ্রজের এই কথা শ্রবণগোচর করিয়া অনুজেরা যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন ; এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ অধোমুখে মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেন। পরিশেষে লক্ষ্মণ অতি কাতর স্বরে বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, আর্য! আপনি যখন যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা কখনও

তাহাতে দ্বিরুক্তি বা আপত্তি করি নাই; এক্ষণেও আমরা আপনকার আজ্ঞা প্রতিরোধে প্রবৃত্ত নহি। কিন্তু আপনকার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, আমাদের প্রাণপ্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে। আমরা যে আপনকার নিকটে আসিয়া এরূপ সর্বনাশের কথা শুনিব, একমুহূর্তের নিমিত্তে আমাদের অন্তঃকরণে সে আশঙ্কার উদয় হয় নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, যদি অনুমতিপ্রদান করেন, নিবেদন করি।

লক্ষ্মণের এই বিনয়পূর্ণ কাতর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রাম বলিলেন, বৎস! যা বলিতে ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে বল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যা জানকী একাকিনী রাবণগৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, যথার্থ বটে; এবং রাবণও অতি দুর্বৃত্ত, তাহার কোনও সংশয় নাই। কিন্তু দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধানের পর আর্যা আপনকার সম্মুখে আনীত হইলে, আপনি লোকাপবাদভয়ে প্রথমতঃ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; পরে, অলৌকিক পরীক্ষা দ্বারা তিনি শুদ্ধচারিণী বলিয়া নিঃসংশয়িত রূপে স্থিরীকৃত হইলে, তাঁহাকে গৃহে আনিয়াছেন। সে পরীক্ষাও সর্বজনসমক্ষে সমাহিত হইয়াছিল। আমরা উভয়ে, আমাদের সমস্ত সেনা ও সেনাপতিগণ, এবং যাবতীয় দেবগণ, দেবর্ষিগণ, ও মহর্ষিগণ পরীক্ষাকালে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সাধুবাদপ্রদানপূর্বক আর্যা একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহারে আর পরগৃহবাসনিবন্ধন অপবাদে দূষিত করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, আপনি কি কারণে এক্ষণে এরূপ বিষম প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অমূলক লোকাপবাদ শুনিয়া ভবাদৃশ মহানুভাবদিগের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সামান্য লোকের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অতি সামান্য; যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাই বলে; এবং যাহা শুনে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া তাহাতেই বিশ্বাস করে। তাহাদের কথায় আস্থা করিতে গেলে সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। আর্যা যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে, অন্ততঃ আমি যতদূর জানি, আপনকার অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় নাই; এবং, অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি আপন শুদ্ধচারিতার যে অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এমন স্থলে, আর্যাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলে লোকে আমাদিগকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিবেক; এবং ধর্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে আমাদিগকে দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবেক। অতএব, আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া কার্যাবধারণ করুন। আমরা আপনকার একান্ত আজ্ঞাবহ; যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই অসন্দিহান চিত্তে শিরোধার্য করিব।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিরত হইলেন। রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, বৎস! সীতা যে একান্ত শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই; সামান্য লোকে যে, কোনও বিষয়ের সবিশেষ অনুধাবন না করিয়া, যাহা শুনে, বা যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়,

তাহাতেই বিশ্বাস করে ও তাহারই আন্দোলন করে, তাহাও বিলক্ষণ জানি। কিন্তু, এ বিষয়ে প্রজাদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই ; আমাদের অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃশ্য-কারিতা দোষেই এই বিষম সর্বনাশ ঘটিতেছে। যদি আমরা অযোধ্যায় আসিয়া সমবেত পৌরগণ ও জানপদবর্গ সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে তৎসংক্রান্ত সকল সংশয় অপসারিত হইত। সীতা অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় শুদ্ধচারিতার অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বটে ; কিন্তু সেই পরীক্ষার যথার্থতা বিষয়ে প্রজালোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। বোধ করি, অনেকে পরীক্ষাব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ অবগত নহে। সুতরাং, সীতার চরিত্রবিষয়ে তাহাদের সংশয় দূর হয় নাই। বিশেষতঃ, রাবণের চরিত্র ও বহু কাল একাকিনী সীতার তদীয় আলয়ে অবস্থান, এ দুই বিষয়ে বিবেচনা করিলে, সীতার চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। অতএব, আমি প্রজা-দিগকে কোনও অংশে দোষ দিতে পারি না। আমারই অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, এই উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে। আমি যদি রাজ্যের ভারগ্রহণ না করিতাম ; এবং ধর্ম সাক্ষী করিয়া প্রজারঞ্জনপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে, অমূলক লোকাপ-বাদে অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতাম। যদি রাজা হইয়া প্রজারঞ্জন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে জীবনধারণের ফল কি ? দেখ, প্রজালোকে, সীতা অসতী বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে ; তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে সেই সিদ্ধান্ত অপসারিত করা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং, সীতাকে গৃহে রাখিলে, তাহারা আমারে অসতীসংসর্গী বলিয়া ঘৃণা করিবেক। যাবজ্জীবন ঘৃণাস্পদ হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রাণত্যাগে পরাঙ্মুখ নহি ; তোমরা আমার প্রাণাধিক ; যদি ঐ অনুরোধে তোমাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কাতর নহি ; সে বিবেচনায়, সীতাপরিত্যাগ তাদৃশ দুরূহ ব্যাপার নহে। অতএব, তোমরা যত বল না কেন, ও যত অন্যায় হউক না কেন, আমি সীতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কুলের কলঙ্ক-বিমোচন করিব, নিশ্চয় করিয়াছি। যদি তোমাদের আমার উপর দয়া ও স্নেহ থাকে, এ বিষয়ে আর আপত্তি উত্থাপিত করিও না। হয় সীতাপরিত্যাগ, নয় প্রাণপরিত্যাগ করিব, ইহার একতর পক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে।

এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর, লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস ! অন্তঃকরণ হইতে সকল ক্ষোভ দূর করিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন কর। ইতঃপূর্বেই, সীতা তপোবনদর্শনের অভিলাষ করিয়াছেন ; সেই ব্যপদেশে তুমি তাঁহারে লইয়া গিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আইস ; তাহা হইলে আমার প্রীতিসম্পাদন করা হয়। এ বিষয়ে আপত্তি করিলে আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব। তুমি কখনও আমার আজ্ঞালঙ্ঘন কর নাই। অতএব বৎস ! কল্য প্রভাতেই মদীয় আদেশের

অনুযায়ী কার্য করিবে, কোনও মতে অন্যথা করিবে না। আর আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, আমি যে তাঁহারে এ জন্মের মত বিসর্জন দিলাম, ভাগীরথী পার হইবার পূর্বে, জানকী যেন কোনও অংশে এ বিষয়ের কিছুমাত্র জানিতে না পারেন। তোমার হৃদয় কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম।

এই বলিয়া রামচন্দ্র অবনত বদনে অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তিন জনে, জানকীর পরিত্যাগবিষয়ে তাঁহাকে তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, আপত্তিকরণে বিরত হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক, বাষ্পবারিবিসর্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাম সকলকে বিদায় দিয়া বিশ্রামভবনে গমন করিলেন। চারি জনেরই যার পর নাই অসুখে রজনীযাপন হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পর দিন প্রভাত হইবামাত্র লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বলিলেন, সারথে! অবিলম্বে রথ প্রস্তুত করিয়া আন; আর্যা জানকী তপোবনদর্শনে গমন করিবেন। সুমন্ত্র, আদেশপ্রাপ্তিমাত্র রথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর, লক্ষ্মণ জানকীর বাসভবনে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি, তপোবনগমনের উপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া রথের প্রতীক্ষা করিতেছেন। লক্ষ্মণ সন্নিহিত হইয়া, আর্যে! অভিবাদন করি, এই বলিয়া প্রণাম করিলেন। সীতা, বৎস! চিরজীবী ও চিরসুখী হও; এই বলিয়া, অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে আশীর্বাদ করিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে! রথ প্রস্তুতপ্রায়, প্রস্থানের অধিক বিলম্ব নাই। সীতা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, বৎস! অদ্য প্রভাতে তপোবনদর্শনে যাইব, এই আনন্দে আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই; সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি; রথ উপস্থিত হইলেই আরোহণ করি। আমি মনে করিয়াছিলাম, আর্যপুত্র এমন সময়ে আমার তপোবনগমনে আপত্তি করিবেন; তাহা না করিয়া, প্রসন্নমনে অনুমোদন করাতে, আমি কত প্রীতিলাভ করিয়াছি, বলিতে পারি না। বোধ হয়, আমি জন্মান্তরে অনেক তপস্যা করিয়াছিলাম; সেই তপস্যার বলে এমন অনুকূল পতি পাইয়াছি; আর্যপুত্রের মত অনুকূল পতি কখনও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আর্যপুত্রের স্নেহ, দয়া, ও মমতার কথা মনে হইলে, আমার সৌভাগ্যগর্ব হইয়া থাকে। আমি দেবতাদের নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, যদি পুনরায় নারীজন্ম হয়, যেন আর্যপুত্রকে পতি পাই। এই বলিয়া সীতা প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে বলিলেন, বৎস! বনবাসকালে মুনিপত্নীদের সহিত আমার নিরতিশয় প্রণয় হইয়াছিল; তাঁহাদিগকে দিবার নিমিত্ত এই সমস্ত বিচিত্র বসন ও মহামূল্য আভরণ লইয়াছি।

এই বলিয়া সীতা সেই সমুদায় লক্ষ্মণকে দেখাইতেছেন; এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করিয়া দ্বারদেশে আনিয়াছেন। সীতা

তপোবনদর্শনে যাইবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিলেন। অনধিক সময়েই, রথ অযোধ্যা হইতে বিনির্গত হইয়া জনপদে প্রবিষ্ট হইল। সীতা নয়নের ও মনের প্রীতিপ্রদ প্রদেশ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রীত মনে বলিতে লাগিলেন, বৎস লক্ষ্মণ ! আমি যে এই সকল মনোহর প্রদেশ দেখিতেছি, ইহা কেবল আর্যপুত্রের প্রসাদের ফল ; তিনি প্রসন্ন মনে অনুমোদন না করিলে, আমার ভাগ্যে এ প্রীতিলাভ ঘটিয়া উঠিত না। আমি যেমন আহ্লাদ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও তেমনি অনুকূলতাপ্রদর্শন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ, মুগ্ধস্বভাবা সীতার এইরূপ হর্ষাতিশয় দেখিয়া, এবং, অবশেষে রামচন্দ্র কিরূপ অনুকূলতাপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া, মনে মনে ম্রিয়মাণ হইলেন ; অতি কষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিলেন, এবং অনেক যত্নে ভাবগোপন করিয়া সীতার ন্যায় হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎ দূর গমন করিলে পর, সীতা সহসা ম্লানবদনা হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস ! এত ক্ষণ আমি মনের আনন্দে আসিতেছিলাম ; কিন্তু সহসা আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দক্ষিণ নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে ; সর্ব শরীর কম্পিত হইতেছে ; অন্তঃকরণ যার পর নাই ব্যাকুল হইতেছে, পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছি। অকস্মাৎ এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখের আবির্ভাব হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি আর্যপুত্র কেমন আছেন ; হয় তাঁহার কোনও অশুভ ঘটনা হইয়াছে, নয় প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নের কোনও অনিষ্ট ঘটিয়াছে ; কিংবা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতেই কোনও অশুভ সংবাদ আসিয়াছে ; তথায় গুরুজন কে কেমন আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, কোনও প্রকার সর্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই ; নতুবা, এমন আনন্দের সময় এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখসঞ্চার উপস্থিত হইবেক কেন ? বৎস ! কি নিমিত্ত এরূপ হইতেছে বল ; আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আর আমার তপোবনদর্শনে অভিলাষ হইতেছে না ; আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাই। ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আর্যপুত্র সঙ্গে আসিবেন বলিয়াছিলেন ; তাঁহার আসা হইল না কেন ? রথে উঠিবার সময় আহ্লাদে তোমায় সে কথা জিজ্ঞাসিতে ভুলিয়াছিলাম। তাঁহার না আসাতে আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। বৎস ! কি করি বল ; আমার চিত্তচাঞ্চল্য ক্রমেই প্রবল হইতেছে। রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব ক্ষণে ঠিক এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল ; আবার কি সেইরূপ কোনও উৎপাত উপস্থিত হইবেক ? না জানি, কি সর্বনাশই ঘটিবেক। এক বার মনে হইতেছে, তপোবনদর্শনে না আসিলে ভাল হইত ; আর্যপুত্রের নিকটে থাকিলে কখনও এরূপ অসুখ উপস্থিত হইত না। এক এক বার মনে হইতেছে, আর আমি এ জন্মে আর্যপুত্রকে দেখিতে পাইব না।

সীতার এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া, লক্ষ্মণ যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও শোকাকুল হইলেন ; কিন্তু, অতি কষ্টে ভাবগোপন করিয়া শুষ্ক মুখে বিকৃত স্বরে বলিলেন, আর্যে! আপনি কাতর হইবেন না। রঘুকুলদেবতারা আমাদের মঙ্গল করিবেন। বোধ হয়, সকলকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কেহ নিকটে নাই, এজন্যই আপনকার এই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। আপনি অস্থির হইবেন না ; কিয়ৎ ক্ষণ পরেই উহার নিবৃত্তি হইবেক। মধ্যে মধ্যে সকলেরই চিত্তবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, সকল সময়ে এক ভাবে থাকে না। আপনি অত উৎকণ্ঠিত হইবেন না।

সীতা, লক্ষ্মণের মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য দর্শনে অধিকতর কাতর হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমার ভাব দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমি কখনও তোমার মুখ এরূপ ম্লান দেখি নাই। যদি কোনও অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, স্পষ্ট করিয়া বল। বলি, আর্যপুত্র ভাল আছেন ত? কল্য অপরাহ্নের পর আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। বোধ হয়, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে এতক্ষণ এত অসুখ থাকিত না। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না। আপনার উৎকণ্ঠা ও অসুখ দেখিয়া আমিও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম ও অসুখবোধ করিয়াছিলাম ; তাহাতেই আপনি আমার মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য লক্ষিত করিয়াছেন ; নতুবা বাস্তবিক তাহা নহে ; উহা মনে করিয়া, আপনি বিরুদ্ধ ভাবনা উপস্থিত করিবেন না। যত ভাবিবেন, যত আন্দোলন করিবেন, ততই উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবেক।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই তাঁহাদের রথ গোমতীতীরে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে, সকলভুবন-প্রকাশক ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তগিরিশিখরে অধিরোহণ করিলেন। সায়ংসময়ে গোমতীতীর পরম রমণীয় হইয়া উঠে। তৎকালে তথায় অতি অসুস্থচিত্ত ব্যক্তিও সুস্থচিত্ত ও অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে সীতারও উপস্থিত আন্তরিক অসুখের সম্পূর্ণ অপসারণ হইল। লক্ষ্মণ দেখিয়া সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহারা সে রাত্রি সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। জানকী পথশ্রমে, বিশেষতঃ মনের উৎকণ্ঠায়, সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন ; সুতরাং, ত্বরায় তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি যতক্ষণ জাগরিত ছিলেন, লক্ষ্মণ সতর্ক হইয়া তাঁহাকে নানা মনোহর কথায় এরূপ ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন যে, তিনি অন্য কোনও দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবকাশ পান নাই। ফলতঃ, দিবাভাগে জানকীর যেরূপ অসুখসঞ্চার হইয়াছিল, রজনীতে তাহার আর কোনও লক্ষণ ছিল না।

প্রভাত হইবামাত্র, তাঁহারা গোমতীতীর হইতে প্রস্থান করিলেন। সীতা, বামে ও দক্ষিণে, পরম রমণীয় প্রদেশ সকল নয়নগোচর করিয়া, যার পর নাই প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। পূর্ব দিন তাঁহার যেরূপ উৎকণ্ঠা ও অসুখসঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইল না।

অবশেষে রথ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইল। ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া গিয়া সীতাকে এ জন্মের মত বিসর্জন দিয়া আসিতে হইবেক, এই ভাবিয়া, লক্ষ্মণের শোকসাগর অনিবার্য বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আর তিনি ভাবগোপন বা অশ্রুবেগসংবরণ করিতে পারিলেন না। সীতা দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস ! কি কারণে তোমার এরূপ ভাব উপস্থিত হইল, বল। তখন লক্ষ্মণ নয়নের অশ্রুমার্জন করিয়া বলিলেন, আর্যে ! আপনি ব্যাকুল হইবেন না ; বহু কালের পর ভাগীরথীর দর্শনলাভ করিয়া আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাতেই অকস্মাৎ আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কপিলশাপে ভস্মাবশেষ হইয়াছিলেন ; ভগীরথ কত কষ্টে গঙ্গা দেবীকে ভূমণ্ডলে আনিয়া তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করেন। বোধ হয়, তাহাই ভাগীরথীদর্শনে স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, এরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সীতা একান্ত মুগ্ধস্বভাবা ও নিতান্ত সরলহৃদয়া ; লক্ষ্মণের এই তাৎপর্য-ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন ; এবং, গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার তাহার উদ্‌যোগ করিতে বলিতে লাগিলেন ; কিন্তু, গঙ্গা পার হইলেই যে, দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তখন পর্যন্ত কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই তরণীর সংযোগ হইল। লক্ষ্মণ, সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ রাখিতে বলিয়া, সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই তাঁহারে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন। সীতা, তপোবন দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে ! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন ; আমার কিছু বক্তব্য আছে, এই স্থানে নিবেদন করিব। এই বলিয়া তিনি অধোবদনে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। সীতা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! কিছু বলিবে বলিয়া, এত ব্যাকুল হইলে কেন ? কি বলিবে ত্বরায় বল ; তোমার ভাবান্তর দেখিয়া আমার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। তুমি কি আসিবার সময় আর্যপুত্রের কোনও অশুভঘটনা শুনিয়াছ, না অন্য কোনও সর্বনাশ ঘটিয়াছে ; কি হইয়াছে, শীঘ্র বল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, দেবি ! বলিব কি, আমার বাক্যনিঃসরণ হইতেছে না ; আর্যের আজ্ঞাবহ হইয়া আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবেক, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইতঃপূর্বে আমার মৃত্যু হইলে আমি সৌভাগ্য-জ্ঞান করিতাম। যদি মৃত্যু অপেক্ষা কোনও অধিকতর দুর্ঘটনা থাকে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল ; তাহা হইলে, আজ আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিতে হইত না। হা বিধাতঃ ! তোমার মনে কি এই ছিল। এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইয়া, লক্ষ্মণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।

সীতা, লক্ষ্মণের ঈদৃশ অভাবিত ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ; অনন্তর, হস্তধারণপূর্বক তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অঞ্চল দ্বারা তদীয় নয়নের অশ্রুমার্জন করিয়া দিলেন ; এবং, তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! কি কারণে তুমি এত ব্যাকুল হইলে ? কি জন্যেই বা তুমি মৃত্যুকামনা করিলে ? তোমায় একান্ত বিকলচিত্ত দেখিতেছি ; অল্প কারণে তুমি কখনই এত আকুল ও এত অস্থির হও নাই। বলি, আর্যপুত্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই ? তুমি তদ্গতপ্রাণ ; তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই জন্যেই কল্য অপরাহ্নে আমার তাদৃশ চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল। যাহা হয়, ত্বরায় বলিয়া আমার জীবনদান কর ; আমার যাতনার একশেষ হইতেছে। ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, আমারই সর্বনাশ ঘটিয়াছে ; না হইলে, এমন সময়ে তুমি এত ব্যাকুল হইতে না।

সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দর্শনে, লক্ষ্মণের শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল ; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল ; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্যনিঃসরণ রহিত হইয়া গেল। যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, অবশেষে অবশ্যই বলিতে হইবেক, এই ভাবিয়া, লক্ষ্মণ বলিবার নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু, কোনও ক্রমে, তাঁহার মুখ হইতে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য নির্গত হইল না। তাঁহাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, সীতা তাঁহার হস্তে ধরিয়া, ব্যাকুল চিত্তে কাতর বচনে বারংবার এই অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বৎস ! আর বিলম্ব করিও না ; আর্যপুত্র যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা, যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, ত্বরায় বল ; তুমি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না ; আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বল। তোমার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমারই কপাল ভাঙিয়াছে। কি হইয়াছে, ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না ; আমি আর এক মুহূর্ত এরূপ সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে পারিব না ; যাহা হয় বলিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। বলি, আর্যপুত্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই। যদি তিনি কুশলে থাকেন, আমার আর যে সর্বনাশ ঘটুক না কেন, আমি তাহাতে তত কাতর হইব না। আমার মাথা খাও, তোমায় আর্যপুত্রের দোহাই, শীঘ্র বল ; আর বিলম্ব করিলে তুমি অধিক ক্ষণ আমায় জীবিত দেখিতে পাইবে না। যদি যাতনা দিয়া আমার প্রাণবধ করা তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না।

সীতার এইরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া লক্ষ্মণ ভাবিলেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। তখন অনেক যত্নে চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্যসম্পাদন করিয়া, অতি কষ্টে বাক্যনিঃসরণ করিলেন ; বলিলেন, আর্যে ! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি একাকিনী রাবণগৃহে ছিলেন ; সেই কারণে, পৌরগণ ও জানপদবর্গ, আপনকার চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হইয়া, অপবাদকীর্তন করিয়া থাকে।

আর্য ইহা অবগত হইয়া, এক বারে স্নেহ, দয়া, ও মমতায় বিসর্জন দিয়া, অপবাদ-বিমোচনের নিমিত্ত, আপনকার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন ; আমায় এই আদেশ দিয়াছেন, তুমি তপোবনদর্শনের ছলে লইয়া গিয়া, বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিবে। এই সেই বাল্মীকির আশ্রম।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্ছিত হইলেন। সীতাও, শ্রবণমাত্র গতচেতনা হইয়া, বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি অনেক যত্নে জানকীর চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। জানকী চেতনালাভ করিয়া, উন্মত্তার ন্যায় স্থির নয়নে লক্ষ্মণের মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, হতবুদ্ধির ন্যায়, চিত্রার্পিতের প্রায়, অধোবদনে, গলদশ্রু নয়নে, দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল ; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল ; সর্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, সীতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু, কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, তাহার কিছু দেখিতে না পাইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কেবল অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে পর, সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্যসম্পাদন করিয়া বলিলেন, লক্ষ্মণ ! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ ; নতুবা, রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া, কে কখন আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে, বল ? বুঝিলাম, যাবজ্জীবন দুঃখভোগের নিমিত্তই আমার নারীজন্ম হইয়াছিল। বৎস ! অবশেষে আমার যে এ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা কাহার মনে ছিল। বহু কালের পর আর্যপুত্রের সহিত সমাগম হইলে, ভাবিয়াছিলাম, বুঝি এই অবধি দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু, বিধাতা যে আমার কপালে সহস্রগুণ অধিক দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। হায় রে বিধাতা ! তোর মনে কি এতই ছিল।

এই বলিতে বলিতে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিলেন না ; অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্বক বলিলেন, লক্ষ্মণ ! নিষ্ঠুর বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, বিধাতার অপরাধ কি ; সকলেই আপন আপন কর্মের ফলভোগ করে। আমি জন্মান্তরে যেরূপ কর্ম করিয়াছিলাম, এ জন্মে সেইরূপ ফলভোগ করিতেছি। বোধ করি, পূর্ব জন্মে কোনও পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিবিয়োজিতা করিয়াছিলাম ; সেই মহাপাপেই আজ আমার এই দুরবস্থা ঘটিল ; নতুবা আর্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া, ও মমতায় পরিপূর্ণ ; আমিও যে একান্ত পতিপ্রাণা ও শুদ্ধচারিণী, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন ; তথাপি যে এমন সময়ে আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, সে কেবল আমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মের ফলভোগ। বৎস ! আমি বনবাসে কাতর নহি।

আর্যপুত্রের সহবাসে, বহু কাল, বনবাসে ছিলাম ; তাহাতে এক দিন, এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার অন্তঃকরণে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। আর্যপুত্রসহবাসে যাবজ্জীবন বনবাসে থাকিলেও, আমার কিছুমাত্র দুঃখ হইত না। সে যাহা হউক, আমার অন্তঃকরণে এই দুঃখ হইতেছে, আর্যপুত্র কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুনিপত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব। তাঁহারা আর্যপুত্রকে করুণাসাগর বলিয়া জানেন ; আমি প্রকৃত কারণ বলিলে, তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা ভাবিবেন, আমি কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। বৎস! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, এই মুহূর্তে, তোমার সমক্ষে, জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আমার জীবনধারণের ফল কি বল? এমন অবস্থাতেও কি প্রাণ রাখিতে হয়? আমি আশ্চর্যবোধ করিতেছি, আর্যপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াও, আমার প্রাণবিয়োগ ঘটিতেছে না। বোধ করি, আমার মত কঠিন প্রাণ আর কাহারও নাই ; নতুবা, এখনও নির্গত হইতেছে না কেন? অথবা, বিধাতা আমায় চিরদুঃখিনী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ; প্রাণত্যাগ হইলে, তাঁহার সে সঙ্কল্প বিফল হইয়া যায় ; এজন্যই জীবিত রহিয়াছি।

এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে, সীতা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে, হায় কি হইল বলিয়া, পুনরায় মূর্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। সুশীল লক্ষ্মণ, দেখিয়া শুনিয়া নিতান্ত কাতর ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, অবিরল ধারায় বাষ্পবারি-বিমোচন করিতে লাগিলেন ; এবং রামচন্দ্রের অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব লোকানুরাগ-প্রিয়তাই এই অভূতপূর্ব ভয়ানক অনর্থের মূল, এই ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া বলিতে লাগিলেন, যদি ইতঃপূর্বে আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে এই লোকবিগর্হিত ধর্মবিবর্জিত বিষম কাণ্ড দেখিতে হইত না। আমি আর্যের আজ্ঞা-প্রতিপালনে সম্মত হইয়া, অতি অসৎ কর্মই করিয়াছি। আমার মত পাষণ্ড ও পাষাণহৃদয় আর নাই ; নতুবা, এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিব কেন? কেমন করিয়া, এমন সরলহৃদয়া, শুদ্ধচারিণী, পতিপ্রাণা কামিনীকে এরূপ সর্বনাশের কথা শুনাইলাম? যদি, আর্যের আদেশপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া, আমায় এ জন্মের মত তাঁহার বিরাগভাজন ও জন্মান্তরে নিরয়গামী হইতে হইত, তাহাও আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ছিল। সর্বথা আমি অতি অসৎ কর্ম করিয়াছি। হা বিধাতঃ! কেন তুমি আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণে প্রবৃত্তি দিয়াছিলে? হা কঠিন হৃদয়! তুমি এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন? হা কঠিন প্রাণ! তুমি এখনও প্রস্থান করিতেছ না কেন? হা দগ্ধ কলেবর! তুমি এখনও সর্ব অবয়বে বিশীর্ণ হইতেছ না কেন? আর আমি আর্যার এ অবস্থা দেখিতে পারি না। হা আর্য! তুমি যে এমন কঠিনহৃদয়, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। যদি তোমার মনে এতই ছিল, তবে আর্যার উদ্ধারসাধনে তত সচেষ্ট হইবার কি প্রয়োজন ছিল? দশানন হরণ করিয়া লইয়া গেলে পর, উন্মত্ত ও হতচেতন হইয়া, হাহাকার করিয়া বেড়াইবারই বা কি

আবশ্যকতা ছিল ? তুমি অবশেষে এই করিবে বলিয়া, কি আমরা লঙ্কাসমরের দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলাম ? যাহা হউক, তোমার মত নির্দয় ও নৃশংস ভূমণ্ডলে নাই।

কিয়ৎ ক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ ও রামচন্দ্রের ভর্ৎসনা করিয়া, লক্ষ্মণ উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণপূর্বক সীতার চৈতন্যসম্পাদনে সযত্ন হইলেন। চেতনাসঞ্চার হইলে, সীতা, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া, স্নেহভরে সম্ভাষণ করিয়া, লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস ! ধৈর্য অবলম্বন কর ; আর বিলাপ ও পরিতাপ করিও না। সকলই অদৃষ্টাধীন ; আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে ; তুমি আর সে জন্য কাতর হইও না ; শোকসংবরণ কর। আমার ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া ত্বরায় তুমি আর্যপুত্রের নিকটে যাও। তিনি আমায় বনবাস দিয়া কাতর ও অস্থির হইয়াছেন, সন্দেহ নাই ; যাহাতে তাঁহার শোকের নিবারণ ও চিত্তের স্থিরতা হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হইবে ; তাঁহাকে বলিবে, আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, ক্ষোভ করিবার আবশ্যকতা নাই ; তিনি সদ্বিবেচনার কার্যই করিয়াছেন। প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করা রাজার প্রধান ধর্ম ; আমায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি রাজধর্মপ্রতিপালন করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন জানি ; তিনি যে কেবল লোকাপবাদের ভয়ে এই কর্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তিনি যেন শোকশূন্য ও ক্ষোভশূন্য হইয়া প্রশস্ত মনে প্রজাপালনে নিয়ত ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, যদিও আমি লোকাপবাদভয়ে, অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইলাম, যেন তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে এক বারে অপসারিত না হই। আমি তপোবনে থাকিয়া এই উদ্দেশে ঐকান্তিক চিত্তে তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন। আর, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে, যদিও ভার্যাভাবে আমায় নির্বাসিত করিয়াছেন, কিন্তু যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য করেন। তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ; যেখানে থাকি, তাঁহার অধিকারবহির্ভূত নই।

এই বলিয়া, একান্ত শোকাকুল হইয়া সীতা কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর, নিতান্ত কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ ! আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, আমি সে জন্যে তত কাতর নহি ; পাছে আর্যপুত্রের মনে ক্লেশ হয়, সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইতেছি। তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিবে, তিনি যেন শোকসংবরণ করিয়া ত্বরায় সুস্থচিত্ত হন। আমার ক্লেশের একশেষ হইয়াছে, যথার্থ বটে ; কিন্তু, সে জন্যে, আমি তাঁহাকে অণুমাত্র দোষ দিব না ; আমার যেমন অদৃষ্ট, তেমনই ঘটিয়াছে ; তজ্জন্য তিনি যেন ক্ষোভ না করেন। বৎস ! তোমায় আমার অনুরোধ এই, তুমি সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে, ক্ষণ কালের নিমিত্তেও তাঁহারে একাকী থাকিতে দিবে না ; একাকী থাকিলেই তাঁহার উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবেক। তিনি ভাল থাকিলেই আমার ভাল। যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, সে বিষয়ে সর্বদা যত্ন করিবে। এই বলিয়া, লক্ষ্মণের হস্তে ধরিয়া, সীতা বাষ্পপরিপ্লুত লোচনে

করুণ বচনে বলিলেন, তুমি আমার নিকট শপথ করিয়া বল, এ বিষয়ে কদাচ ঔদাস্য করিবে না। তপোবনে থাকিয়া, যদি লোকমুখে শুনিতে পাই, আর্যপুত্র কুশলে আছেন, তাহা হইলেই আমার সকল দুঃখ দূর হইবেক।

এই বলিতে বলিতে সীতার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদীয় পতিপরায়ণতার সম্পূর্ণপ্রমাণপূর্ণ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া, লক্ষ্মণের শোকপ্রবাহ প্রবল বেগে প্রোচ্ছলিত হইয়া উঠিল ; নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সীতা সান্ত্বনাবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! শোকাবেগসংবরণ করিয়া, ত্বরায় তুমি আর্যপুত্রের নিকটে যাও, আর বিলম্ব করিও না। বারংবার এইরূপ বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে বিদায় দিবার নিমিত্ত নিরতিশয় ব্যস্ত হইলেন। লক্ষ্মণ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ; এবং গলদশ্রু লোচনে কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন, আর্যে! আপনি পূর্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন, আমি আর্যের একান্ত আজ্ঞাবহ ; যখন যে আদেশ করেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতিপালনে প্রবৃত্ত হই। প্রাণান্ত-স্বীকার করিয়াও অগ্রজের আজ্ঞাপ্রতিপালন করা অনুজের সর্বপ্রধান ধর্ম। আমি সেই অনুজধর্মের অনুবর্তী হইয়া আর্যের এই বিষম আজ্ঞার প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যে পাষাণহৃদয়ের কর্ম করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিলাম। প্রার্থনা এই, আমার উপর আপনকার যে অপরিসীম স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তাহার যেন বৈলক্ষণ্য না হয়। আর, আর্যের আদেশ অনুসারে, এরূপ নৃশংস আচরণ করিয়া, আমি যে বিষম অপরাধ করিলাম, কৃপা করিয়া, আমার সেই অপরাধ মার্জনা করিবেন।

লক্ষ্মণকে এইরূপ শোকাভিভূত দেখিয়া, সীতা বলিলেন, বৎস! তোমার অপরাধ কি? তুমি কেন অকারণে এত কাতর হইতেছ ও পরিতাপ করিতেছ? তোমার উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কথা দূরে থাকুক, আমি কায়মনোবাক্যে দেবতাদের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করিব, যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর পাই ; তুমি চিরজীবী হও। তুমি অযোধ্যায় গিয়া আর্যপুত্রের চরণে আমার প্রণাম জানাইবে। ভরত, শত্রুঘ্ন ও আমার ভগিনীদিগকে স্নেহসম্ভাষণ বলিবে ; শ্বশ্রূদেবীরা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহাদের চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণি-পাত নিবেদিত করিবে। বৎস! তোমায় আর একটি কথা বলিয়া দি। আমি চির-দুঃখিনী, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই ; সুতরাং, আমার যে সর্বনাশ ঘটিল, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু এই করিও, যেন আমার ভগিনীগুলি কষ্ট না পায়। তাহারা আমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইবেক ; যাহাতে ত্বরায় তাহাদের শোকনিবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে তোমরা তিন জনে সতত যত্ন করিও ; তাহারা সুখে থাকিলেও, অনেক অংশে আমার দুঃখনিবারণ হইবেক। তাহাদিগকে বলিবে, আমি আপন অদৃষ্টের ফলভোগ করিতেছি ; আমার জন্যে শোকাকুল হইবার ও ক্লেশভোগ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া, স্নেহভরে বারংবার আশীর্বাদ করিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে প্রস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ, বাষ্পাকুল লোচনে ও শোকাকুল বচনে, আর্যে! আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন, অঞ্জলিবন্ধপূর্বক এই কথা বলিয়া, পুনরায় প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, নৌকায় আরোহণ করিলেন। সীতা অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। নৌকা অল্প ক্ষণেই ভাগীরথীর অপর পারে সংলগ্ন হইল। লক্ষ্মণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন; এবং, কিয়ৎ ক্ষণ নিস্পন্দ নয়নে জানকীর নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যত ক্ষণ সীতাকে দেখিতে পাওয়া গেল, লক্ষ্মণ অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; সীতাও চিত্রার্পিতপ্রায় রথে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রথ ক্রমে ক্রমে দূরবর্তী হইল। তখন লক্ষ্মণ, আর সীতাকে লক্ষিত করিতে না পারিয়া, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। সীতাও, রথ নয়নপথবহির্ভূত হইবামাত্র, যূথবিরহিত কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সীতার ক্রন্দনশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, সন্নিহিত ঋষিকুমারেরা শব্দ অনুসারে ক্রন্দন-স্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক অসূর্যম্পশ্যরূপা কামিনী, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া, অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। দেখিয়া, তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে যার পর নাই কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তাঁহারা, ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিত হইয়া, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা, ফল কুসুম কুশ সমিধ আহরণের নিমিত্ত, ভাগীরথীসন্নিহিত অটবীবিভাগে পর্যটন করিতেছিলাম; অকস্মাৎ, স্ত্রীলোকের আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম, এবং, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, এক অলৌকিক রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণা কামিনী, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, একান্ত কাতরা হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কমলা দেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তিনি কে, কি কারণে রোদন করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না; কিন্তু, তাঁহার কাতরভাবের অবলোকন ও বিলাপবাক্যের আকর্ণন দ্বারা, আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমরা, সাহস করিয়া, তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। অবশেষে, আপনাকে সংবাদ দেওয়া উচিত বিবেচনায়, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, আপনকার নিকটে আসিয়াছি। এক্ষণে যাহা বিহিত বোধ হয়, করুন।

মহর্ষি, ঋষিকুমারদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন; এবং, সীতার সম্মুখবর্তী হইয়া, সস্নেহ সম্ভাষণ পুরঃসর, প্রশান্ত স্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎসে! বিলাপ করিও না; কি কারণে তুমি আমার তপোবনে আসিয়াছ, তোমার আসিবার পূর্বেই, আমি তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি মিথিলাধিপতি রাজা জনকের দুহিতা, কোশলাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ, এবং রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের মহিষী। রামচন্দ্র, অমূলক লোকাপবাদ শ্রবণে, চলচিত্ত

ও সদসৎপরিবেদনাবিহীন হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে, তোমায় নির্বাসিত করিয়াছেন। সীতা, সান্ত্বনাবাদ শ্রবণে, নয়নের অশ্রুমার্জন করিলেন ; এবং, সৌম্যমূর্তি মহর্ষিকে সম্মুখবর্তী দেখিয়া, গললগ্ন বসনে তদীয় চরণে প্রণাম করিলেন। বাল্মীকি, রঘুকুল-তিলক তনয় প্রসব কর, এই আশীর্বাদ করিয়া, বলিলেন, বৎসে ! আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, আমার আশ্রমে চল ; আমি আপন তনয়ার ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তথায় থাকিয়া তুমি কোনও বিষয়ে কোনও ক্লেশ পাইবে না। জনপদবাসীরা, বন, এই শব্দ শুনিলে ভয়াকুল হয় ; কিন্তু তপোবনে ভয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। ঋষিদের তপস্যার প্রভাবে, হিংস্র জন্তুরাও, স্বভাবসিদ্ধ হিংসাপ্রবৃত্তি দূরীভূত করিয়া পরস্পর সৌহৃদ্য ভাবে কালহরণ করে। তপোবনের এরূপ মহিমা যে, স্বল্প কাল অবস্থিতি করিলেই চিত্তের স্থৈর্যসম্পাদন হয়। তোমায় আসন্নপ্রসবা দেখিতেছি। প্রসবের পর, অপত্যসংস্কারবিধি যথাবিধি সমাহিত হইবেক, কোনও অংশে অঙ্গহীন হইবেক না। সমবয়স্কা মুনিকন্যারা তোমার সহচরী হইবেন ; তাঁহাদের সহবাসে তোমার বিলক্ষণ চিত্তবিনোদন হইবেক। বিশেষতঃ, তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু ; সুতরাং, আমার তপোবনে থাকিয়া তোমার পিতৃগৃহবাসের সকল সুখ সম্পন্ন হইবেক ; আমি অপত্যনির্বিশেষে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। অতএব, বৎসে ! আর বিলম্ব করিও না, আমার অনুগামিনী হও।

এই বলিয়া, সীতারে সমভিব্যাহারে লইয়া মহর্ষি তপোবনে প্রবেশ করিলেন ; এবং, সকল বিষয়ের সবিশেষ বলিয়া দিয়া, সমবয়স্কা মুনিকন্যাদের হস্তে সীতার ভারার্পণ করিলেন। মুনিকন্যারা তদীয়সমাগমলাভে পরম প্রীতি ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং, যাহাতে ত্বরায় তাঁহার চিত্তের স্থৈর্যসম্পাদন হয়, সে বিষয়ে অশেষবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সীতাকে বনবাস দিয়া রাম যার পর নাই অধৈর্য ও শোকাভিভূত হইলেন ; এবং, আহার, বিহার, রাজকার্যপর্যালোচনা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে একবারে বিসর্জন দিয়া, অন্যের প্রবেশপ্রতিষেধপূর্বক একাকী আপন বাসভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাকে নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া জানিতেন ; এবং, পৃথিবীতে যত প্রিয় পদার্থ আছে, সর্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতেন। বস্তুতঃ, উভয়ের এক মন, এক প্রাণ ; কেবল শরীর মাত্র বিভিন্ন ছিল। সীতা যেরূপ সাধুশীলা ও সরলান্তঃকরণা, রামও সর্বাংশে তদনুরূপ ছিলেন ; সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা, পতিহিতৈষিণী, ও পতিসুখে সুখিনী ; রামও সেইরূপ সীতাগতপ্রাণ, সীতাহিতাকাঙ্ক্ষী ও সীতাসুখে সুখী ছিলেন। গৃহে রাজভোগে থাকিলে, তাঁহাদের যেরূপ সুখে সময় অতিবাহিত হইত, বনবাসে পরস্পর সন্নিধানবশতঃ বরং তদপেক্ষা অধিক সুখে কালযাপন হইয়াছিল। বনবাস হইতে বিনিবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের পরস্পর

প্রণয় ও অনুরাগ শত গুণে প্রগাঢ় হইয়া উঠে। উভয়েই উভয়কে এক মুহূর্তের নিমিত্তে নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। রাম, কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে, সীতাকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন ; সুতরাং, সীতানির্বাসনশোক তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

রামের আন্তরিক অসুখের সীমা ছিল না। কেনই আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ; কেনই আমি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম ; কেনই আমি পুনরায় রাজ্যের ভারগ্রহণ করিলাম ; কেনই আমি দুর্মুখকে পৌরগণের ও জানপদবর্গের অভিপ্রায়পরিজ্ঞানের নিমিত্ত নিয়োজিত করিলাম ; কেনই আমি লক্ষ্মণের উপদেশ অনুসারে না চলিলাম ; কেনই আমি নিতান্ত নৃশংস হইয়া সীতারে বনবাস দিলাম ; কেনই আমি নিরতিশয় ক্লেশকর অকিঞ্চিৎকর রাজ্যভারে বিসর্জন দিয়া সীতার সমভিব্যাহারী না হইলাম ; কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব ; কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব ; প্রিয়ারে বনবাস দেওয়া অপেক্ষা আমার আত্মঘাতী হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃকল্প ছিল ; ইত্যাদি প্রকারে তিনি অহোরাত্র বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দুঃসহ শোকানলে নিরন্তর জ্বলিত হইয়া তাঁহার শরীর অল্প দিনের মধ্যেই অর্ধাবশিষ্ট হইল।

তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নসময়ে, লক্ষ্মণ, নিতান্ত দীনভাবাপন্ন মনে, অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন ; এবং, সর্বাগ্রে রামচন্দ্রের বাসভবনে গমন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, গদ্গদ বচনে নিবেদন করিলেন, আর্য ! দুরাত্মা লক্ষ্মণ আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন করিয়া আসিল। রাম, অবলোকন ও আকর্ণনমাত্র, হা প্রেয়সি ! বলিয়া, মূর্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণ, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়াও, বহু যত্নে, তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ শূন্য নয়নে লক্ষ্মণের মুখনিরীক্ষণ করিয়া, হাহাকার ও অতিদীর্ঘনিশ্বাসভারপরিত্যাগপূর্বক, ভাই লক্ষ্মণ ! তুমি জানকীরে কোথায় রাখিয়া আসিলে ; আমি তাঁহার বিরহে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব ; আর যে যাতনা সহ্য হয় না ; এই বলিয়া, লক্ষ্মণের গলায় ধরিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়েই অধৈর্য হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ বাষ্পবিসর্জন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ, অতি কষ্টে, স্বীয় শোকাবেগের সংবরণ করিয়া, রামের সান্ত্বনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাম কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া লক্ষ্মণের মুখে সীতাবিলাপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল ; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল ; কণ্ঠরোধ হইয়া তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া রহিলেন ; এবং, পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপারের আলোচনা করিতে করিতে, দুঃসহ শোকভার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, পুনরায় মূর্ছিত হইলেন।

লক্ষ্মণ পুনরায় পরম যত্নে রামচন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদন করিলেন, এবং তাঁহার তাদৃশী দশা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর্য যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহাতে এ জন্মে আর সুস্থচিত্ত হইতে পারিবেন না। শোকাপনো-

দনের কোনও উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, সান্ত্বনার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি এইরূপ আলোচনা করিয়া বিনয়পূর্ণ প্রণয়গর্ভ বচনে বলিলেন, আর্য! শোকে ও মোহে এরূপ অভিভূত হওয়া ভবাদৃশ মহানুভাবের পক্ষে কদাচ উচিত নহে। আপনি সকলই বুঝিতে পারেন। যাদৃশ বিধিনির্বন্ধ ছিল, ঘটিয়াছে; নতুবা আপনি অকারণে, অথবা সামান্য কারণে, আর্যাকে বিসর্জন দিবেন, ইহা কাহার মনে ছিল। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্যে নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে; উন্নতি হইলেই পতন হয়; সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে; জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে। এই চিরপরিচিত সাংসারিক নিয়মের কোনও কালে অন্যথাভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমুদয়ের আলোচনা করিয়া, আপনকার শোক-সংবরণ করা উচিত। বিশেষতঃ, আপনি সকল লোকের হিতানুশাসন কার্যের ভারগ্রহণ করিয়াছেন; সে জন্যেও আপনকার শোকাভিভূত হওয়া বিধেয় নহে। প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ শোকের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ভবাদৃশ মহানুভাবদিগের একান্ত শোকাভিভূত হওয়া কদাচ উচিত হয় না। প্রাকৃত লোকেই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করুন; এবং, অন্তঃকরণ হইতে অকিঞ্চিৎকর শোককে নিষ্কাশিত করিয়া রাজকার্যে মনোনিবেশ করুন। আর, আপনকার ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি কেবল লোক-বিরাগসংগ্রহের ভয়ে আর্যারে নির্বাসিত করিয়াছেন। আর্যাকে গৃহে রাখিলে, প্রজালোকে বিরাগপ্রদর্শন করিবেক, কেবল এই আশঙ্কায় আপনি তাঁহাকে বনবাস দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত শোকাকুল হইলে সে আশঙ্কার নিরাস হইতেছে না। সুতরাং, যে দোষের পরিহারমানসে আপনি ঈদৃশ দুষ্কর কর্ম করিলেন, সেই দোষ পূর্ববৎ প্রবল রহিতেছে; আর্যার পরিত্যাগে কোনও ফলোদয় হইতেছে না। আর, ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি যত দিন শোকাভিভূত থাকিবেন, রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না। প্রজাপালনকার্য উপেক্ষিত হইলে, রাজধর্মপ্রতিপালন হয় না। অতএব, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া, ধৈর্য অবলম্বন করুন; আর অধিক শোক ও মনস্তাপ করা কোনও ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। অতীত বিষয়ের অনুশোচনায় কালহরণ করা সদ্বিবেচনার কার্য নয়।

লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে, রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, সস্নেহ সম্ভাষণপূর্বক বলিলেন, বৎস! তোমার উপদেশবাক্য শুনিয়া আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যথার্থ বলিয়াছ, আমি যে উদ্দেশে জানকীরে বনবাস দিয়া রাক্ষসের ন্যায় নিরতিশয় নৃশংস আচরণ করিলাম; এক্ষণে তাঁহার জন্যে শোকাকুল হইলে তাহা বিফল হইয়া যায়। বিশেষতঃ, শোকের ধর্মই এই, তাহাতে অভিভূত হইলে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতে থাকে। শোকাভিভূত ব্যক্তি অভীষ্টলাভ করিতে পারে না, কেবল কর্তব্য কর্মে উপেক্ষাবশতঃ প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়। অতএব, এই মুহূর্ত অবধি আমি শোকসংবরণে যত্নবান্ হইলাম। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর আমি

শোকে অভিভূত হইব না। প্রজালোকে, কোনও ক্রমে, আমায় শোকাভিভূত বোধ করিতে পারিবেক না। অমাত্যদিগকে বল, কল্য অবধি রীতিমত রাজকার্য-পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব; তাঁহারা যেন যথাকালে সমস্ত আয়োজন করিয়া কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন। এই বলিয়া রামচন্দ্র অবনত বদনে কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, হায়! রাজত্ব কি বিষম অসুখের ও বিপদের আস্পদ। লোকে কি সুখ-ভোগের লোভে রাজ্যাধিকারলাভের কামনা করে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রাজ্যের ভারগ্রহণ করিয়া আমায় এ জন্মের মত সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল। যার পর নাই নৃশংস হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাস দিলাম। এক্ষণে তাঁহার জন্যে যে অশ্রুপাত করিব, তাহারও পথ নাই। রাজত্বলাভে এই ফল দর্শিয়াছে যে, আমাকে স্নেহ, দয়া, মমতা, ও ভদ্রতায় বিসর্জন দিতে হইল। উত্তর-কালীন লোকেরা, নিতান্ত নৃশংস অথবা নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া, আমার গণনা ও কলঙ্কঘোষণা করিবেক।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ পরে লক্ষ্মণকে বিদায় দিলেন; এবং, ধৈর্যা-বলম্বন ও শোকাবেগসংবরণ পূর্বক, পর দিন প্রভাত অবধি, যথানিয়মে রাজকার্য-পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে, তিনি রাজকার্যপর্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন বটে; এবং লোকেও, বাহ্য আকার দর্শনে, বোধ করিতে লাগিল, রামচন্দ্র বড় ধৈর্যশীল, অনায়াসেই দুঃসহ শোকের সংবরণ করিলেন। কিন্তু, তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ নিরন্তর দুর্বিষহ শোকদহনে দগ্ধ হইতে লাগিল। নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, এই শোক ও ক্ষোভ, বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, তাঁহাকে সতত মর্মবেদনাপ্রদান করিতে লাগিল। কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে, তিনি জানকীরে নির্বাসিত করেন; এক্ষণেও, কেবল সেই লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়েই, বাহ্য আকারে শোকসংবরণ করিলেন। যৎকালে তিনি নৃপাসনে আসীন হইয়া, মূর্তিমান্ ধর্মের ন্যায়, স্থির চিত্তে রাজকার্যপর্যালোচনা করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বোধ করিত, ভূমণ্ডলে তাঁহার তুল্য ধৈর্যশালী পুরুষ আর নাই। কিন্তু, রাজকার্য হইতে অবসৃত হইয়া, বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেই, তিনি যৎপরোনাস্তি বিকলচিত্ত হইতেন। লক্ষ্মণ সদা সন্নিহিত থাকিতেন, এবং সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু, লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্যে, তাঁহার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। ফলতঃ, তিনি, কেবল হাহাকার, বাষ্পমোচন, আত্মভর্ৎসন, ও সীতার গুণকীর্তন করিয়া, বিশ্রামসময় অতিবাহিত করিতেন। এইরূপে দুর্নিবার সীতাবিবাসনশোকে একান্ত আক্রান্ত হইয়া, তিনি দিন দিন কৃশ, মলিন, দুর্বল, ও সর্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, রাজকার্য ব্যতীত, আর কোনও বিষয়েই তাঁহার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ রহিল না।

এ দিকে, কিয়ৎ দিন পরে, জানকী দুই যমল কুমার প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি,

যথাবিধানে জাতকর্মপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া, জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। মুনিতনয়ারা, সীতার সন্তানপ্রসবদর্শনে, যার পর নাই হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত আশ্রমে অতি মহান্ আনন্দকোলাহল হইতে লাগিল। সীতা দুঃসহ প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ অচেতনপ্রায় ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সাচ্ছন্দ্যলাভ করিলে, মুনিতনয়ারা উল্লসিত মনে প্রীতিপূর্ণ বচনে বলিলেন, জানকি! আজ বড় আনন্দের দিন ; সৌভাগ্যক্রমে তুমি পরম সুন্দর কুমারযুগল প্রসব করিয়াছ। সীতা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র প্রফুল্ল ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন ; কিন্তু, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শোকভরে নিতান্ত অভিভূত হইয়া, অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মুনিকন্যারা সস্নেহ সম্ভাষণ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি জানকি! এমন আনন্দের সময় শোকাকুল হইলে কেন? বাষ্পভরে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, এজন্য তিনি কিয়ৎ ক্ষণ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না ; অনন্তর, উচ্ছলিত শোকাবেগের কিঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া বলিলেন, অয়ি প্রিয়সখীগণ! তোমরা কি কিছুই জান না যে, আমি এমন আনন্দের সময় কি জন্যে শোকাকুল হইলাম, জিজ্ঞাসা করিতেছ? পুত্রপ্রসব করিলে স্ত্রীলোকের আহ্লাদের একশেষ হয়, যথার্থ বটে ; কিন্তু কেমন অবস্থায়, আমার সেই আহ্লাদের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার যে এ জন্মের মত, সকল সুখ, সকল সাধ, সকল আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি এই হতভাগ্যেরা আমার গর্ভে না থাকিত, তাহা হইলে, যে মুহূর্তে লক্ষ্মণ পরিত্যাগবাক্য শুনাইলেন, সেই মুহূর্তে আমি জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম ; অথবা, অন্য কোনও প্রকারে, আত্মঘাতিনী হইতাম। আমায় কি আবার প্রাণ রাখিতে হয়, না লোকালয়ে মুখ দেখাইতে হয়।

এই বলিয়া, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়া, জানকী অনিবার্য বেগে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। মুনিকন্যারা, সীতার ঈদৃশ হৃদয়বিদারণ বিলাপবাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া, নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং প্রণয়পূর্ণ বচনে বলিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি! শোকাবেগের সংবরণ কর ; যাহা বলিতেছ, যথার্থ বটে ; কিন্তু, অধিক দিন তোমায় এ অবস্থায় কালযাপন করিতে হইবেক না। রাজা রামচন্দ্রের বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটিয়াছিল ; তাহাতেই তিনি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, ঈদৃশ অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব নৃশংস আচরণ করিয়াছেন। আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি, তুমি অচিরে পরিগৃহীতা হইবে ; অতএব শোকসংবরণ কর। মুনিতনয়াদিগের সান্ত্বনাবাদ শ্রবণে, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিতনয়া-দিগের কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইল ; তাঁহারাও শোকাভিভূত হইয়া প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সদ্যঃপ্রসূত বালকেরা রোদন করিয়া উঠিল। স্নেহের এমনই মহিমা ও মোহিনী শক্তি যে, তাহাদের ক্রন্দনশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, জানকী

এক কালে সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এবং স্নেহভরে তাহাদের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কুমারেরা, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায়, দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, জননীর নয়নের ও মনের অনির্বচনীয় আনন্দসম্পাদন করিতে লাগিল। যখন তাহারা আধ আধ কথায় মা মা বলিয়া আহ্বান করিত; যখন তাহাদের সন্নিবেশিতমুক্তাকলাপসদৃশ দন্তগুলি দৃষ্টিগোচর হইত; যখন তাহাদের অর্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত; যখন তিনি তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে তাহাদের মুখচুম্বন করিতেন: তখন তিনি সকল শোক বিস্মৃত হইতেন; তাঁহার সর্ব শরীর অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় শীতল, ও নয়নযুগল আনন্দাশ্রুসলিলে পরিপ্লুত হইত।

কুশ ও লব পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি, তাহাদের চূড়াকর্ম সম্পাদন করিয়া বিদ্যারম্ভ করাইলেন। বালকেরা, অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা, ও প্রতিভার প্রভাবে অল্পকালমধ্যেই বিবিধ বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্বে বাল্মীকি, রাবণবধ পর্যন্ত লোকোত্তর রামচরিত অবলম্বন করিয়া, রামায়ণ নামে বহুবিস্তৃত মহাকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথম, তিনি সেই অমৃতরসবর্ষী অপূর্ব মহাকাব্য রামচন্দ্রের পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। তাহারা স্বল্প সময়েই সেই বিচিত্র গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিল; এবং সীতার সমক্ষে মধুর স্বরে আবৃত্তি করিয়া তাঁহার শোক-নিবৃত্তি করিতে লাগিল। একাদশ বর্ষে মহর্ষি তাহাদের উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন করিয়া বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বালকেরা, সংবৎসরকালেই, সমগ্র বেদশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকারলাভ করিল।

কুশ ও লবের বয়ঃক্রম পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর হইল; কিন্তু তাহারা কে, এ পর্যন্ত তাহারা তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। তাহারা ঋষিকুমার ও তাহাদের জননী ঋষিপত্নী, তাহাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল। ফলতঃ, জানকী যে ভাবে তপোবনে কালযাপন করিতেন; তাঁহাকে দেখিলে, কেহ ঋষিপত্নী ব্যতীত আর কিছুই বোধ করিতে পারিত না; এবং তাহাদেরও দুই সহোদরের আচার ও অনুষ্ঠান নয়নগোচর করিলে, ঋষিকুমার ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা জানকীকে জননী বলিয়া জানিত; কিন্তু তিনি যে মিথিলাধিপতির তনয়া, অথবা কোশলাধিপতির মহিষী, তাহা জানিতে পারে নাই। বাল্মীকি, যত্নপূর্বক, এই বিষয় তাহাদের বোধবিষয় হইতে সঙ্গোপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; এবং তপোবনবাসী-দিগকে এরূপ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ ভ্রমক্রমেও তাহাদের সমক্ষে, এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিত না; আর, সীতাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনিও যেন, কোনও ক্রমে, তনয়দিগের নিকট আত্মপরিচয়প্রদান না করেন; তদনু-সারে সীতাও তাহাদের নিকট কখনও স্বসংক্রান্ত কোনও কথার উল্লেখ করেন নাই। তাহারা রামায়ণে রামের ও সীতার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের জননী যে জনকনন্দিনী, অথবা রামের সহধর্মিণী, তাহা জানিতে পারে

নাই ; সুতরাং, ঐ মহাকাব্যে নিজ জনক-জননীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। এইরূপে এতাবৎ কাল পর্যন্ত কুশ ও লব আত্মস্বরূপপরিজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপ অনধিকারী ছিল।

জননীর অনির্বচনীয়স্নেহসহকৃত প্রযত্ন ব্যতিরেকে যত দিন পর্যন্ত সন্তানের জীবন-রক্ষা সম্ভাবিত নয় ; তাবৎ কাল জানকী, সর্বশোকবিস্মরণপূর্বক, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, কুশ ও লবের লালন পালনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহাদের শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইলে, মাতৃযত্নের তাদৃশী অপেক্ষা রহিল না। তখন তিনি, তাহাদের বিষয়ে এক প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া, ঋষিপত্নীদিগের ন্যায় তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। রামচন্দ্রের সর্বাঙ্গীণমঙ্গলকামনাই তদীয় তপস্যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যদিও রাম নিতান্ত নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; তথাপি, এক ক্ষণের জন্যে সীতার অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি রোষ বা বিরাগের উদয় হয় নাই। তিনি যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার নিজের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে, এই বিবেচনা করিতেন ; ভ্রমক্রমেও ভাবিতেন না যে, সে বিষয়ে রামচন্দ্রের কোনও অংশে কিছুমাত্র দোষ আছে। বস্তুতঃ, রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত ভক্তি ও ঐকান্তিক অনুরক্তি ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি দেবতাদিগের নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেন, যেন রামচন্দ্র কুশলে থাকেন, এবং জন্মান্তরে, তিনি যেন রামচন্দ্রেরই সহধর্মিণী হয়েন। তিনি দিবাভাগে তপস্যাকার্যে ব্যাপৃত ও সখীভাবাপন্ন ঋষিকন্যাগণে পরিবৃত থাকিয়া কথঞ্চিৎ কালযাপন করিতেন। কিন্তু যামিনীযোগে একাকিনী হইলেই তাঁহার দুর্নিবার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিত। তিনি কেবল রামচন্দ্রের চিন্তায় মগ্ন হইয়া ও অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া যামিনীযাপন করিতেন। ফলকথা এই, সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহাতে অকাতরে বিরহযাতনা সহ্য করিতে পারিবেন, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভাবিত নহে। কালসহকারে, সকলেরই শোক শিথিল হইয়া যায় ; কিন্তু জানকীর শোক সর্বক্ষণ নবীভাবাপন্ন ছিল। এইরূপে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর দুর্বিষহ শোকদহনে নিরন্তর অন্তর্দাহ হওয়াতে, জানকীর অলৌকিক রূপ ও লাবণ্য এককালে অন্তর্হিত, এবং কলেবর চর্মাবৃত কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব শ্রবণমাত্র সাধুবাদপ্রদানপূর্বক বলিলেন, মহারাজ! উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি ; অখণ্ড ভূমণ্ডলে যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পূর্বতন কোনও নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। রামরাজ্যে প্রজালোকে যেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব। রাজ্যভারগ্রহণ করিয়া যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়,

আপনি তাহার কিছুই অসম্পাদিত রাখেন নাই ; রাজকর্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধ মাত্র অবশিষ্ট আছে ; তাহা সম্পাদিত হইলেই আপনকার রাজ্যাধিকার আর কোনও অংশে অঙ্গহীন থাকে না। আমরা ইতঃপূর্বে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিব। যাহা হউক, যখন মহারাজ স্বয়ং সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে ; অবিলম্বে তদুপযোগী আয়োজনের আদেশপ্রদান করুন।

বশিষ্ঠদেব বিরত হইবামাত্র রামচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্ট অনুজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ! ইনি যাহা বলিলেন, শ্রবণ করিলে ; এক্ষণে তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেই কর্তব্যনিরূপণ করি। আজ্ঞানুবর্তী অনুজেরা তৎক্ষণাৎ আন্তরিক অনুমোদনপ্রদর্শন করিলেন। তখন রাম বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, ভগবন্! যখন আমার অভিলাষ আপনাদের অভিমত ও অনুজদিগের অনুমোদিত হইতেছে, তখন আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্তব্যতাবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিষারণ্যে অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিষারণ্য পরম পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র। এ বিষয়ে আপনকার কি অনুমতি হয়। বশিষ্ঠদেব তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন।

অনন্তর, রামচন্দ্র অনুজদিগকে বলিলেন, দেখ, যখন কর্তব্য স্থির হইল, তখন আর অনর্থক কালহরণ করা বিধেয় নহে। তোমরা সত্বর সমস্ত আয়োজন কর। অনুগত, শরণাগত, ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগের নিমন্ত্রণ কর। সময়নির্দেশপূর্বক সমস্ত নগরে ও জনপদে এ বিষয়ের ঘোষণা করিয়া দাও। লঙ্কাসমরসহায় সুহৃদ্বর্গের পরম সমাদরে আহ্বান কর ; তাঁহারা আমাদের যথার্থ বন্ধু, আমাদের জন্যে অকাতরে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন ; তাঁহারা আসিলে আমি পরম সুখী হইব। এতদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় ঋষিদিগের নিমন্ত্রণ কর ; তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিলে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত ! তুমি, অবিলম্বে নৈমিষক্ষেত্রে গিয়া যজ্ঞভূমি-নির্মাণের উদ্যোগ কর। লক্ষ্মণ ! তুমি আবশ্যক সমস্ত দ্রব্যের যথোচিত আয়োজন করিয়া তৎসমুদয় সত্বর তথায় পাঠাইয়া দাও। দেখ, যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্তে নৈমিষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবেক ; অতএব, যত্নপূর্বক সমস্ত বিষয়ের এরূপ আয়োজন করিবে, যেন কোনও বিষয়ের অসঙ্গতিনিবন্ধন কাঁহারও কোনও অংশে ক্লেশ বা অসুবিধা না ঘটে। তুমি সকল বিষয়ে পারদর্শী ; তোমায় অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, বশিষ্ঠদেব বলিলেন, মহারাজ। সকল বিষয়েরই উচিতাধিক আয়োজন হইবেক, সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমি এক বিষয়ের একান্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি। তখন রাম বলিলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে অসঙ্গতির আশঙ্কা করিতেছেন, বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ ! শাস্ত্রকারেরা বলেন, সস্ত্রীক হইয়া ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব, জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি ব্যবস্থা

হইবেক। শ্রবণমাত্র রামের মুখকমল ম্লান ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্বক নয়নের অশ্রুমার্জন ও উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিয়া বলিলেন, ভগবন্! ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধমাত্র হয় নাই; এক্ষণে কি কর্তব্য, উপদেশ করুন। বশিষ্ঠদেব, অনেক ক্ষণ একাগ্র চিত্তে চিন্তা করিয়া, বলিলেন, মহারাজ! পুনরায় দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সকলেই এককালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ; কেবল লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে সীতাকে বনবাস দিয়া জীবন্মৃত হইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রতি রামের যে অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, এ পর্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। সীতার মোহিনী মূর্তি অহোরাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি যে উপস্থিত কার্যের অনুরোধে পুনরায় দারপরিগ্রহে সম্মত হইবেন, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব দারপরিগ্রহবিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র, সে বিষয়ে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শিত করিয়া, মৌন ভাবে অবনত বদনে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, বহুবিধ বাদানুবাদের পর, সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সমভি-ব্যাহারে যজ্ঞ সম্পন্ন করাই সর্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।

এইরূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ভরত সর্বাগ্রে নৈমিষক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন; এবং, সমুচিত স্থানে যজ্ঞভূমির নিরূপণ করিয়া, অনুরূপ অন্তরে, পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশে, এক এক শ্রেণীর লোকের জন্যে, তাহাদের অবস্থোচিত অবস্থিতিস্থান নির্মিত করাইলেন। লক্ষ্মণও, অনতিবিলম্বে, অশেষবিধ অপর্যাপ্ত আহারসামগ্রী ও শয্যা যান প্রভৃতির সমবধান করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া যথাবিধানে যজ্ঞীয় অশ্বের মোচনপূর্বক, মাতৃগণ ও অপরাপর পরিবার-বর্গ সমভিব্যাহারে সসৈন্য নৈমিষারণ্যপ্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরেই, নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইতে লাগিল। শত শত নৃপতি, বহুবিধ মহামূল্য উপহার লইয়া, অনুচরগণ ও পরিচারকবর্গ সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন; সহস্র সহস্র ঋষি, যজ্ঞদর্শনমানসে, ক্রমে ক্রমে নৈমিষে আগমন করিতে লাগিলেন; অসংখ্য নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও সমাগত হইলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন নরপতিগণের পরিচর্যার ভারগ্রহণ করিলেন; বিভীষণ ঋষিগণের কিঙ্করকার্যে নিযুক্ত হইলেন। সুগ্রীব অপরাপর নিমন্ত্রিতবর্গের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

এ দিকে, মহর্ষি বাল্মীকি, সীতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশবৎসর পূর্ণ দেখিয়া, মনে মনে সর্বদা এই আন্দোলন করেন যে, সীতার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না; আর, কুশ ও লব রাজাধিরাজতনয় হইয়া যাবজ্জীবন তপোবনে কালযাপন করিবেক,

ইহাও কোনও মতে উচিত নহে ; তাহাদের ধনুর্বেদ ও রাজধর্ম, এ উভয়ের শিক্ষার সময় বহিয়া যাইতেছে। অতএব, যাহাতে সপুত্রা সীতা পুনরায় পরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোনও উপায় উদ্ভাবিত করা করা আবশ্যক। অথবা, অন্য উপায় উদ্ভাবিত করিবার প্রয়োজন কি? শিষ্য দ্বারা সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রকে আমার আশ্রমে আনাইয়া, অথবা স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সপুত্রা সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করি। রামচন্দ্র অবশ্যই আমার অনুরোধরক্ষা করিবেন। এই স্থির করিয়া ক্ষণকাল মৌন ভাবে থাকিয়া, মহর্ষি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগপ্রিয় ; কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে পূর্ণগর্ভা অবস্থায় নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে নির্বাসিত করিয়াছেন ; এখন আমার কথায় তাঁহারে সহজে গৃহে লইবেন, তাহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। যাহা হউক, কোনও সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনও মতে উচিত কল্প হইতেছে না। এই দুই বালক উত্তর কালে অবশ্যই কোশলসিংহাসনে অধিরোহণ করিবেক ; এই সময়ে, পিতৃসমীপে নীত হইয়া রাজনীতিবিষয়ে বিধিপূর্বক উপদিষ্ট না হইলে, রাজকার্যনির্বাহে একান্ত অপটু ও রাজমর্যাদারক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হইবেক। বিশেষতঃ, রাজা রামচন্দ্র, আমি কোশল-রাজ্যের হিতসাধনে যত্নবিহীন বলিয়া, অনুযোগ করিতে পারেন। অতএব, এ বিষয়ে আর উপেক্ষা বা কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে। রামচন্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ পাঠান উচিত। অথবা, এক বারেই তাঁহার নিকটে সংবাদ না পাঠাইয়া, বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য ; তাঁহারাই বা কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক।

এক দিন, মহর্ষি, সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন হোমবিধির সমাধান করিয়া, আসনে উপবেশনপূর্বক, একাকী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে এক রাজভৃত্য আসিয়া রামনামাঙ্কিত নিমন্ত্রণপত্র তদীয় হস্তে সমর্পিত করিল। মহর্ষি পত্রপাঠ করিয়া পরম-প্রীতিপ্রদর্শনপূর্বক সেই লোককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্তে বিদায় দিলেন, এবং এক শিষ্যের উপর তাহার আহারাদিসমাধানের ভারপ্রদান করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, দৈব অনুকূল হইয়া তাহার সিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া দিলেন। এক্ষণে বিনা প্রার্থনায় কার্যসাধন করিতে পারিব। কুশ ও লবকে শিষ্যভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া যাই। রামের ও উহাদের দুই সহোদরের আকৃতিগত যেরূপ সৌসাদৃশ্য, দেখিলেই সকলে উহাদিগকে তাঁহার তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক ; আর, অবলোকনমাত্র, রামেরও হৃদয় নিঃসন্দেহ দ্রবীভূত হইবেক ; এবং, তাহা হইলেই, আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির পথ স্বতঃ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবেক।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মহর্ষি জানকীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন ; এবং বলিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন ; কল্য প্রত্যূষে প্রস্থান করিব ; মানস করিয়াছি, অপরাপর শিষ্যের

ছ্যায়, তোমার পুত্রদিগকেও যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। সীতা তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন। মহর্ষি, স্বীয় কুটীরে প্রতিগমন করিয়া, শিষ্যদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিয়া দিলেন; এবং কুশ ও লবকে বলিলেন, দেখ, এ পর্যন্ত জনপদের কোনও ব্যাপার তোমাদের নয়নগোচর হয় নাই। রামায়ণনায়ক রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদিগকে যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আনুষঙ্গিক রাজদর্শন সম্পন্ন হইবেক; এবং, তথায় যে অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত হইবেক, তাহাদিগকে দেখিয়া, তোমরা অনেক অংশে লৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। তাহারা দুই সহোদরে, রামায়ণে রামের অলৌকিক গুণপরম্পরার প্রকৃষ্ট ও প্রচুর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সর্বাংশে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া, তাহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। এতদ্ব্যতিরিক্ত, যজ্ঞসংক্রান্ত মহাসমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্নপ্রকার অসংখ্য লোকের একত্র সমাগম নয়ন-গোচর করিব, এই কৌতূহলও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

বাল্মীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া, সীতার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এ পর্যন্ত, রাম সীতাগতপ্রাণ বলিয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; আর, তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই, রাম তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবার্তা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, রাম আবার বিবাহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া, তিনি এক বারে ম্রিয়মাণ হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন; রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ক্ষোভ, সেই সীতার পক্ষে, একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার উপর তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, কোনও অংশে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই স্নেহের ও অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।

সীতা, নিতান্ত আকুলচিত্তে, এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কুশ ও লব তদীয় কুটীরে উপবিষ্ট হইয়া বলিল, মা! মহর্ষি বলিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞদর্শনার্থে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়াছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া, রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড। কিন্তু মা! এক বিষয়ে আমরা যার পর নাই মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজারঞ্জনের অনুরোধে নিজ

প্রেয়সী মহিষীকে নির্বাসিত করিয়াছেন। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে সহধর্মিণী কে হইবেক ? সে বলিল, যজ্ঞসমাধানের জন্যে বশিষ্ঠদেব পুনরায় দারপরিগ্রহের নিমিত্তে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে কোনও ক্রমে সম্মত হন নাই ; সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্মিত হইয়াছে ; সেই প্রতিকৃতি সহধর্মিণীর কার্যনির্বাহ করিবেক। দেখ মা ! এমন মহাপুরুষ কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামচন্দ্র রাজধর্ম প্রতিপালনে যেমন যত্নশীল, দাম্পত্যধর্মপ্রতিপালনেও তদনুরূপ যত্নশীল। আমরা, ইতিহাসগ্রন্থে, অনেক অনেক রাজার ও অনেক অনেক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি ; কিন্তু কেহই, কোনও অংশে, রাজা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রেয়সীর পরিত্যাগ, ও সেই প্রেয়সীর স্নেহের অনুরোধে, যাবজ্জীবন, দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ উভয়ই অভূতপূর্ব ব্যাপার। যাহা হউক, মা ! রামায়ণ পড়িয়া অবধি, আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল, একবার রাজা রামচন্দ্রের মূর্তি প্রত্যক্ষ করিব ; এক্ষণে সেই বাসনা পূর্ণ হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে ; অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত রামদর্শনে যাই। সীতা অনুমতিপ্রদান করিলেন ; তাহারাও দুই সহোদরে, সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, মহর্ষিসমীপে গমন করিল।

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা জন্মিয়া, যে অতিবিষম বিষাদ-বিষে সীতার সর্ব শরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শ্রবণগোচর করিয়া, তাহা সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত, এবং তদীয় চিরপ্রদীপ্ত শোকানল অনেক অংশে নির্বাপিত হইল। তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দবাষ্প বিগলিত হইতে লাগিল ; এবং, নির্বাসনের ক্ষোভ তিরোহিত হইয়া, তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব সৌভাগ্যগর্ব আবির্ভূত হইল।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, মহর্ষি বাল্মীকি, কুশ, লব, ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে নৈমিষপ্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিবস, অপরাহ্নসময়ে, তথায় উপস্থিত হইলে, বশিষ্ঠদেব, সাতিশয় সমাদরপ্রদর্শনপূর্বক, তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। কুশ ও লব, দূর হইতে রামচন্দ্রকে লোচনগোচর করিয়া, চমৎকৃত ও পুলকিত হইল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, দেখ ভাই ! রামায়ণে রাজা রামচন্দ্রের যে সমস্ত অলৌকিক গুণ কীর্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ইঁহার আকারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে ; দেখিলেই অলৌকিক গুণসমুদয়ের অসাধারণ আধার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ইনি যেমন সৌম্যমূর্তি, তেমনই গম্ভীরাকৃতি। আমাদের গুরুদেব যেমন অলৌকিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, রাজা রামচন্দ্র তেমনই অলৌকিকগুণ-সমুদয়ে পূর্ণ। বলিতে কি, এরূপ মহাপুরুষ নায়কস্থলে পরিগৃহীত না হইলে, মহর্ষির প্রণীত মহাকাব্যের এত গৌরব হইত না। রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিক গুণের

পরিকীর্তনে নিয়োজিত হওয়াতে, তদীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা জন্মিয়াছে। যাহা হউক, এত দিনে আমরা নয়নের চরিতার্থতালাভ করিলাম !

ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে, নিরূপিত দিবসে, মহাসমারোহে সঙ্কল্পিত মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইল। অসংখ্য দীন, দরিদ্র, ও অনাথ, পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনায় যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্নার্থী অপর্যাপ্ত অন্ন, অর্থাভিলাষী প্রার্থনাধিক অর্থ, ভূমিকাঙ্ক্ষী আকাঙ্ক্ষাতিরিক্ত ভূমি, প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফলতঃ, যে ব্যক্তি যে অভিলাষে আগমন করিতে লাগিল, আগমনমাত্র তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে লাগিল। অনবরত চতুর্দিকে নৃত্য গীত বাদ্য হইতে লাগিল। সকলেই মনোহর বেশভূষায় সুশোভিত। সকলেরই মুখে আমোদের ও আহ্লাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল ; কাহারও অন্তঃকরণে দুঃখের বা ক্ষোভের সঞ্চার আছে এরূপ বোধ হইল না। যে সকল দীর্ঘজীবী রাজা, ঋষি, বা অন্যাদৃশ লোক যজ্ঞদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমরা কখনও এরূপ যজ্ঞ দেখি নাই। অতীতবেদী ব্যক্তিরাও বলিতে লাগিলেন, কোনও কালে, কোনও রাজা, ঈদৃশ সমৃদ্ধি ও সমারোহ সহকারে, যজ্ঞ করিতে পারেন নাই ; রাজা রামচন্দ্রের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড।

এইরূপে, প্রত্যহ, মহাসমারোহে, যজ্ঞক্রিয়া হইতে লাগিল ; এবং যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ, সভায় সমবেত হইয়া, যজ্ঞসংক্রান্ত সমৃদ্ধি ও সমারোহের আতিশয্যদর্শনে, নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক দিন, মহর্ষি বাল্মীকি, বিরলে বসিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি যজ্ঞ-দর্শনে আসক্ত হইয়া, এত দিন বৃথা অতিবাহিত করিলাম ; এ পর্যন্ত, অভিপ্রেতসাধনের কোনও উপায় অবলম্বন করিলাম না। যাহা হউক, এক্ষণে কি প্রণালীতে কুশ ও লবকে রামচন্দ্রের দর্শনপথে পাতিত করি। উহাদের দুই সহোদরকে, সমভিব্যাহারে করিয়া, রাজসভায় লইয়া যাই ; অথবা, রামচন্দ্রকে কৌশলক্রমে এখানে আনাই ; এবং, বিরলে সকল বিষয়ের সবিশেষ নির্দেশ করিয়া, এবং কুশ ও লবের পরিচয় দিয়া, সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করি। মহর্ষি মনে মনে এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন, কুশ ও লবকে রামায়ণগান করিতে আদেশ করি। তাহারা স্থানে স্থানে গান করিয়া বেড়াইলে, ক্রমে রাজার গোচর হইবেক ; তখন তিনি অবশ্যই স্বীয় চরিতের শ্রবণমানসে উহাদিগকে স্বসমীপে নীত করিবেন, এবং তাহা হইলেই, বিনা প্রার্থনায়, আমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবেক।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি কুশ ও লবকে বলিলেন, বৎস কুশ ! বৎস লব ! তোমরা প্রতিদিন, সময়ে সময়ে, সমাহিত হইয়া, ঋষিগণের বাসকুটীরের সম্মুখে, নরপতিগণের পটমণ্ডপমণ্ডলীর পুরোভাগে, পৌরগণ ও জানপদবর্গের আবাসশ্রেণীর সমীপদেশে,

এবং সভাভবনের অভিমুখভাগে, মনের অনুরাগে, বীণাসংযোগে রামায়ণ গান করিবে। যদি রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তোমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তৎক্ষণাৎ গান করিতে আরম্ভ করিবে। আর, যত ক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিবে, কোনও প্রকারে ধৃষ্টতাপ্রদর্শন বা অশিষ্ট ব্যবহার করিবে না। রাজা সকলের পিতৃস্থানীয়; অতএব, তোমরা তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ পিতৃভক্তিপ্রদর্শন করিবে। যদি, সঙ্গীতশ্রবণে প্রীত হইয়া রাজা পুরস্কারস্বরূপ অর্থপ্রদানে উদ্যত হন, লোভবশ হইয়া কদাচ অর্থগ্রহণ করিবে না; বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে নিস্পৃহতা দেখাইয়া অর্থগ্রহণে অসম্মতিপ্রদর্শন করিবে; বলিবে, মহারাজ! আমরা বনবাসী, তপোবনে থাকিয়া ফল মূল দ্বারা প্রাণধারণ করি, আমাদের অর্থের প্রয়োজন নাই। আর, যদি রাজা তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, বলিবে আমরা বাল্মীকির শিষ্য।

এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া মহর্ষি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর, তাহারা দুই সহোদরে তদীয় আদেশ ও উপদেশের অনুবর্তী হইয়া, বীণাসহযোগে মধুর স্বরে স্থানে স্থানে রামায়ণগান করিতে আরম্ভ করিল। যে শুনিল, সেই মোহিত ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। না হইবেই বা কেন? প্রথমতঃ, রামের চরিত্র অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র; দ্বিতীয়তঃ, বাল্মীকির রচনা অতি চমৎকারিণী ও যার পর নাই চিত্তহারিণী; তৃতীয়তঃ, কুশ ও লবের রূপমাধুরী দৃষ্টিগোচর হইলে সকলকেই মোহিত হইতে হয়; তাহাতে আবার তাহাদের স্বর এমন মধুর যে, উহার সহিত তুলনা করিলে, কোকিলের কলরব কর্কশ বোধ হয়; চতুর্থতঃ, বীণাযন্ত্রে তাহাদের যেরূপ অলৌকিক নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব। যে সঙ্গীতে এ সমুদয়ের সমবায় থাকে, তাহা শুনিয়া কাহার চিত্ত অনির্বচনীয় প্রীতিরসে পূর্ণ না হয়।

কিঞ্চিৎ কাল পরেই অনেকেই রামের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! দুই সুকুমার ঋষিকুমার বীণাযন্ত্রসহযোগে আপনকার চরিত্রগান করিতেছে; যে শুনিতেছে, সেই মোহিত হইতেছে। আমরা, জন্মাবচ্ছিন্নে, কখনও এমন মধুর সঙ্গীত শুনি নাই। তাহারা যমজ সহোদর। মহারাজ! মানবকলেবরে কেহ কখনও এমন রূপের মাধুরী দেখে নাই। স্বরের মাধুরীর কথা অধিক আর কি বলিব, কিন্নরেরাও শুনিলে পরাভবস্বীকার করিবেক। আর তাহারা যে কাব্যের গান করিতেছে, তাহা কাহার রচিত বলিতে পারি না; কিন্তু এমন অভূতপূর্ব ললিত রচনা কখনও শ্রবণগোচর করেন নাই। মহারাজ! আমাদের প্রার্থনা এই, তাহাদিগকে রাজসভায় আনাইয়া আপনকার সমক্ষে গান করিতে আদেশ করেন। আপনি তাহাদিগকে দেখিলে, ও তাহাদের গান শুনিলে, নিঃসন্দেহ, মোহিত হইবেন।

শ্রবণমাত্র, রামের অন্তঃকরণে অতিপ্রভূত কৌতূহলরস সঞ্চারিত হইল। তখন তিনি, এক সভাসদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা, তাহাদের দুই সহোদরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা,

রাজা আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে, অতি বিনীত ভাবে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র, রামের হৃদয়ে কেমন এক অনির্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল। প্রীতিরস, অথবা বিষাদবিষ, সহসা সর্ব শরীরে সঞ্চারিত হইল, ইহার অবধারণ করিতে পারিলেন না; কিয়ৎ ক্ষণ, বিভ্রান্তচিত্তের ন্যায়, সেই দুই কুমারের উপর দৃষ্টিবিন্যাস করিয়া রহিলেন; এবং অকস্মাৎ এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন, তাহার অনুধাবন করিতে না পারিয়া, চিত্রার্পিতের প্রায়, উপবিষ্ট রহিলেন।

কুমারেরা, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, রামচন্দ্রের সংবর্ধনা করিল; এবং, তদীয় আদেশ অনুসারে, সমুচিত প্রদেশে উপবেশন করিয়া, যথোচিত বিনয় ও নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে, জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! কি জন্যে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন? তাহারা সন্নিহিত হইলে, তদীয় কলেবরে নিজের ও জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া, রাম একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন; কিন্তু, তৎকালে রাজসভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল; এ জন্যে, অতি কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল্যসংবরণ করিয়া, সম্পূর্ণ সপ্রতিভের ন্যায়, তাহাদিগকে বলিলেন, শুনিলাম, তোমরা অপূর্ব গান করিতে পার; যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তোমাদের প্রশংসা করিতেছেন। এ জন্যে আমিও তোমাদের সঙ্গীত শুনিবার মানস করিয়াছি। যদি তোমাদের অভিমত হয়, কিয়ৎ ক্ষণ গান করিয়া, আমায় প্রীতিপ্রদান কর। তাহারা বলিল, মহারাজ! আমরা যে কাব্যের গান করিয়া থাকি, তাহা বহুবিস্তৃত; তাহাতে মহারাজের পবিত্র চরিত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা, আপনকার সমক্ষে, ঐ কাব্যের কোন্ অংশের গান করিব, আদেশ করুন।

সেই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি, রামের চিত্ত এত চঞ্চল এবং সীতানির্বাসনশোক এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকলজ্জার ভয়ে আর ধৈর্য অবলম্বন করা অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি সহসা সভাভঙ্গ করিয়া, বিজনপ্রদেশসেবনের নিমিত্ত, নিরতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন; এ জন্যে বলিলেন, অদ্য তোমরা ইচ্ছামত যে কোনও অংশের গান কর; কল্য প্রভাত অবধি, প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া, তোমাদের মুখে সমস্ত কাব্যের গান শুনিব। তাহারা, যে আজ্ঞা, মহারাজ! বলিয়া, সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক, মোহিত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদপ্রদান করিতে লাগিলেন। রাম, কবির পাণ্ডিত্য ও রচনার লালিত্য দর্শনে নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কাব্য কাহার রচিত, কাহার নিকটেই বা তোমরা সঙ্গীতশিক্ষা করিয়াছ? তাহারা বলিল, মহারাজ! এই কাব্য ভগবান্ বাল্মীকির রচিত; আমরা তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি এবং তাঁহার নিকটেই সমস্ত শিক্ষা করিয়াছি। তখন রাম বলিলেন, ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত করিয়াছেন। অল্প শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায় না। আজ

তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে; তোমাদিগকে আর অধিক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; এখন তোমরা আবাসে গমন কর।

এই বলিয়া, তাহাদের দুই সহোদরকে বিদায় দিয়া, রাম সে দিবস সত্বর সভাভঙ্গ করিলেন; এবং বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া, একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া আমার অন্তঃকরণ এত আকুল হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপন সন্তান দেখিলে, লোকের চিত্তে যেরূপ স্নেহের ও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হয় বলিয়া শুনিতে পাই; আমারও, ইহাদিগকে দেখিয়া ঠিক সেইরূপ হইতেছে। কিন্তু এইরূপ হইবার কোনও কারণই দেখিতেছি না। ইহারা ঋষিকুমার; আর, যদিই বা ঋষিকুমার না হয়, তাহা হইলেই বা আমার সে আশা করিবার সম্ভাবনা কি। আমি যে অবস্থায় যেরূপে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, তাহাতে তিনি দুঃসহ শোকে ও অসহনীয় অপমানভরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, হয় তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, নয় কোনও দুরন্ত হিংস্র জন্তু তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। তিনি যে তেমন অবস্থায়, প্রাণধারণে সমর্থ হইয়া, নির্বিঘ্নে সন্তানপ্রসব করিয়াছেন, এবং তাহাদের লালন পালন করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আশা নিতান্ত দুরাশামাত্র। আমি যেরূপ হতভাগ্য, তাহাতে এত সৌভাগ্য কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না।

এই বলিয়া, একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া রাম কিয়ৎ ক্ষণ অশ্রুবিসর্জন করিলেন; অনন্তর, শোকাবেগসংবরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু উহাদের আকার প্রকার দেখিলে ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। অধিকন্তু, উহাদের কলেবরে আমার অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আর, অভিনিবেশপূর্বক অবলোকন করিলে, সীতার অবয়বসৌসাদৃশ্য নিঃসংশয়িত রূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে; ভ্রূ, নয়ন, নাসিকা, কর, চিবুক, ওষ্ঠ, ও দন্তপংক্তিতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এত সৌসাদৃশ্য কি আকস্মিক ঘটনামাত্রে পর্যবসিত হইবেক? আর, ইহারা বলিল, বাল্মীকির তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছে; আমিও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলাম, সীতারে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিবে। হয় ত, মহর্ষি কারুণ্যবশতঃ সীতাকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন; তথায় তিনি এই যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। লক্ষণ দেখিয়া, সকলে এরূপ বোধ করিতেন, জানকী গর্ভযুগলধারণ করিয়াছেন। এ সকলের আলোচনা করিলে আমার আশা নিতান্ত দুরাশা বলিয়াও বোধ হয় না। অথবা, আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া অনর্থক আপনাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছি। যখন আমি, নৃশংস রাক্ষসের ন্যায়, নিতান্ত নির্দয় ও নিতান্ত নির্মম হইয়া, তাদৃশী পতিপ্রাণা কামিনীরে, সম্পূর্ণ নিরপরাধে, বনবাস দিয়াছি, তখন আর সে সব আশা করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম। হা প্রিয়ে! তুমি তেমন সুশীলা ও সরলহৃদয়া হইয়া কেন এমন দুঃশীলের ও কুটিলহৃদয়ের হস্তে পড়িয়াছিলে। আমি যখন তোমায় নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী জানিয়াও অনায়াসে বনবাস দিতে, এবং বনবাস দিয়া

এ পর্যন্ত প্রাণধারণ করিতে পারিয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা নৃশংস ও পাষাণহৃদয় আর কে আছে ?

এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে দুর্ধর শোকভরে অভিভূত হইয়া রাম বিচেতনপ্রায় হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারিবিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, বাল্মীকি সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সীতা তথায় এই দুই যমল তনয় প্রসব করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা যে প্রকৃত ঋষিকুমার নহে, তাহার এক দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহারা অল্প দিন মাত্র উপনীত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন নহে। বোধ হয়, একাদশ বর্ষে উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়কুমার না হইলে, এ বয়সে উপনয়ন হইবেক কেন ? প্রকৃত ঋষিকুমার হইলে, মহর্ষি অবশ্যই অষ্টম বর্ষে ইহাদের সংস্কারসম্পাদন করিতেন। ইহা ভিন্ন, উপনীত ঋষিকুমারদিগের যেরূপ বেশ হয়, ইহাদের বেশ সর্বাংশে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। যদি ইহারা ক্ষত্রিয়কুমার হয়, তাহা হইলে, ইহাদের সীতার সন্তান হওয়া যত সম্ভব, অন্যের সন্তান হওয়া তত সম্ভব বোধ হয় না ; কারণ, অন্য ক্ষত্রিয়সন্তানের তপোবনে প্রতিপালিত ও উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা কি ? আমার মত হতভাগ্য লোকের সন্তান না হইলে, ইহাদের কদাচ এ অবস্থা ঘটিত না।

মনে মনে এইরূপ বিতর্ক ও আক্ষেপ করিয়া, রাম বলিতে লাগিলেন, যদি প্রিয়া এ পর্যন্ত জীবিত থাকেন, এবং এই দুই কুমার আমার তনয় হয়, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হয়। প্রিয়া পুনরায় আমার নয়নের ও হৃদয়ের আনন্দদায়িনী হইবেন, ইহা ভাবিলেও, আমার সর্ব শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। এই বলিয়া, যেন সীতার সহিত সমাগম অবধারিত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া, রাম বলিতে লাগিলেন, এই দীর্ঘ বিয়োগের পর যখন প্রথম সমাগম হইবেক, তখন, বোধ হয়, আমি আহ্লাদে অধৈর্য হইব ; প্রিয়ারও আহ্লাদের একশেষ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। প্রথমসমাগমসময়ে, উভয়েরই আনন্দাশ্রুপ্রবাহ প্রবল বেগে বাহিত হইতে থাকিবেক। কিয়ৎ ক্ষণ এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া তিনি হর্ষবাষ্পবিসর্জন করিলেন। পর ক্ষণেই এই চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে প্রিয়ার সহিত সমাগম হইলে, কেমন করিয়া তাঁহারে এ মুখ দেখাইব। অথবা, তিনি যেরূপ সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া, তাহাতে অনায়াসেই আমার অপরাধমার্জনা করিবেন। আমি দেখিবামাত্র, তাঁহার চরণে ধরিয়া বিনীত বচনে ক্ষমাপ্রার্থনা করিব। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই আবার এই চিন্তা উপস্থিত হইল, পাছে প্রজালোকে বিরাগপ্রদর্শন করে, এই আশঙ্কায় আমি প্রিয়ারে বনবাসে পাঠাইয়াছি ; এক্ষণে যদি তাঁহারে গৃহে লই, তাহা হইলে, পুনরায় সেই আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। এত কাল আপনাকে ও প্রিয়াকে দুঃসহ বিরহযাতনায় যে দগ্ধ করিলাম, সে সকলই বিফল হইয়া যায়।

এই বলিয়া, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া রাম কিয়ৎ ক্ষণ অপ্রসন্ন মনে অবস্থিত রহিলেন ; অনন্তর, সহসা উদ্ভূত রোষাবেশ সহকারে বলিতে লাগিলেন, আর আমি অমূলক লোকাপবাদে আস্থাপ্রদর্শন করিব না। অতঃপর প্রিয়ারে গৃহে লইলে যদি প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক ; আর আমি তাহাদের ছন্দানুবৃত্তি করিতে পারিব না। আমি যথেষ্ট করিয়াছি। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কে কখন আমার ন্যায় আত্মবঞ্চন করিয়াছে। প্রথমেই প্রিয়ারে বনবাস দেওয়া নিতান্ত নির্বোধের কর্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমি অবশ্যই তাঁহারে গৃহে লইব। নিতান্ত না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত করিয়া প্রিয়াসমভিব্যাহারে বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বন করিব। প্রিয়াবিরহিত হইয়া রাজ্যভোগ অপেক্ষা, তাঁহার সমভিব্যাহারে বনবাস, আমার পক্ষে, সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর, তাহার সন্দেহ নাই।

রাম, আহার ও নিদ্রার পরিহারপূর্বক, এইরূপ বহুবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, রজনীযাপন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহর্ষি বাল্মীকি, রামচরিত অবলম্বন করিয়া, অতি অদ্ভুত কাব্যের রচনা করিয়াছেন ; তাঁহার দুই কোকিলকণ্ঠ তরুণবয়স্ক শিষ্য অতি মধুর স্বরে সেই কাব্যের গান করে ; কল্য প্রভাতে তাহারা রাজসভায় গান করিবেক ; এই সংবাদ নৈমিষাগত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত হইয়াছিলেন। রজনী অবসন্না হইবামাত্র, কি ঋষিগণ, কি নৃপতিগণ, কি অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ, সকলেই, সঙ্গীতশ্রবণলালসার বশবর্তী হইয়া সাতিশয় ব্যগ্রচিত্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সে দিবসের সভায় সমারোহের সীমা ছিল না। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, এবং সুগ্রীব, বিভীষণ আদি সুহৃদ্বর্গ তাঁহার বামে ও দক্ষিণে, যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, উর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি প্রভৃতি রাজপরিবার, অরুন্ধতী প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ সমভিব্যাহারে, পৃথক্ স্থানে অবস্থিত হইলেন।

এইরূপে রাজসভায় সমবেত হইয়া, সমস্ত লোক অভিনব কাব্যের ও সুকুমার গায়কযুগলের কথা লইয়া আন্দোলন ও নিতান্ত উৎসুক চিত্তে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে, মহর্ষি বাল্মীকি, কুশ ও লব সমভিব্যাহারে, সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র সভামণ্ডলে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। যাঁহারা পূর্ব দিন কুশ ও লবকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া স্বসমীপে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে তাহাদের দুই সহোদরকে দেখাইতে লাগিলেন। বাল্মীকি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সভাস্থ সমস্ত লোকে এককালে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সংবর্ধনা করিলেন। মহর্ষি ও তাঁহার দুই শিষ্যের নিমিত্তে পৃথক্ স্থান স্থিরীকৃত ছিল ; তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলেন। সকলেই, সঙ্গীতশ্রবণের নিমিত্তে নিতান্ত

অধৈর্য হইয়া, একান্ত উৎসুক চিত্তে, কখন আরম্ভ হয়, এই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাল্মীকি সভার সর্বাংশে নয়নসঞ্চারণ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহারাজ! সকলেই শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; অতএব অনুমতি করুন, সঙ্গীতের আরম্ভ হউক। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে, কুশ ও লব বীণাযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। বাল্মীকি পূর্বেই কুশ ও লবকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, রামায়ণের যে সকল অংশে রামের ও সীতার পরস্পর স্নেহ ও অনুরাগ বর্ণিত আছে, তোমরা অদ্য ঐ সকল অংশেরই গান করিবে। তদনুসারে তাহারা কিয়ৎ ক্ষণ গান করিবামাত্র, রামের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তদীয় নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের দুই সহোদরকে যত দেখিতে লাগিলেন, ততই তাহারা সীতার তনয় বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, ইঁহারাও, তাহাদের কলেবরে রামের ও সীতার সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া, মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতিরিক্ত, সভাস্থ সমস্ত লোক একবাক্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য! এই দুই ঋষিকুমার যেন রামচন্দ্রের প্রতিকৃতিস্বরূপ; যদি বেশে ও বয়সে বৈষম্য না থাকিত, তাহা হইলে, রামে ও এই দুই ঋষিকুমারে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বোধ হয়, যেন রাম, কুমারবয়স অবলম্বনপূর্বক দুই মূর্তি ধরিয়া, ঋষিকুমারের বেশপরিগ্রহ করিয়াছেন। এই বয়সে রামের যেরূপ আকৃতি ও রূপলাবণ্যের যেরূপ মাধুরী ছিল, ইহাদের অবিকল সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া একতান মনে সঙ্গীতশ্রবণ, ও অনিমিষ নয়নে তাহাদের রূপনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! ইহাদিগকে সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার দাও। তাহারা, শ্রবণমাত্র, বিনয়নম্র বচনে বলিল, মহারাজ! আমরা বনবাসী, বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি; যদৃচ্ছালব্ধফলমূলমাত্র আহার ও বল্কলমাত্র পরিধান করিয়া কালযাপন করি; আমাদের সুবর্ণে প্রয়োজন কি। আমরা, অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, আপনকার চরিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম; আজ আপনকার সমক্ষে তাহার পরিচয় দিয়া, আমাদের সেই যত্ন ও সেই পরিশ্রম সর্বতোভাবে সার্থক হইল। আপনি শ্রবণ করিয়া যে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি। বালকদিগের এইরূপ প্রবীণতা ও বীতস্পৃহতা দর্শনে, সকলে এককালে চমৎকৃত হইলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, কুশ ও লব সীতার তনয় বলিয়া, কৌশল্যার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি, নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে, হা বৎসে জানকি! ইহা বলিয়া, ভূতলে পতিত ও মূর্ছিত হইলেন। সকলে, একান্ত বিকলান্তঃকরণ হইয়া, অশেষ যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন

করিলেন। কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীতশ্রবণ করিয়া সকলেরই হৃদয়ে সীতার শোক এত প্রবল ভাবে উদ্ভূত হইয়া উঠিল যে, সকলেই নিতান্ত অস্থির হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারিবিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা নিরতিশয় অধীরা হইয়া উন্মত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন, ঐ দুই কুমারকে কেহ আমার নিকটে আনিয়া দাও; ক্রোড়ে লইয়া এক বার আমি উহাদের মুখচুম্বন করিব; উহারা আমার জানকীর তনয়; উহাদিগকে দেখিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; হয় তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দাও, নয় আমি উহাদের নিকটে যাই; ক্রোড়ে লইয়া এক বার উহাদের মুখচুম্বন করিলে, আমার জানকী-শোকের অনেক নিবারণ হইবেক। ঐ দেখ না, উহাদের অবয়বে আমার রামের ও জানকীর সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। উহারা সভায় প্রবেশ করিবামাত্র যেন কেহ আমায় বলিয়া দিল, ঐ তোমার রামের দুই বংশধর আসিতেছে; সেই অবধি উহাদের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। আমি বার বৎসরে সীতাকে একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু, উহাদিগকে দেখিয়া, আমার সীতাশোক পুনরায় নূতন হইয়া উঠিয়াছে। হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ, তোমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, অদ্যাপি জীবিত আছ, কি এই পাপিষ্ঠ নরলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছ, কিছুই জানি না। এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া কৌশল্যা পুনরায় মূর্ছিত হইলেন। সকলে, সযত্ন হইয়া, পুনরায় তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন কৌশল্যা নিরতিশয় অধৈর্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, এখনও তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দিলে না; না হয় কেহ এক বার, লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া, আমার নাম করিয়া বলুক; লক্ষ্মণ এখনই উহাদিগকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে দিবেক।

কৌশল্যার এইরূপ অস্থিরতা ও কাতরতা দেখিয়া অরুন্ধতীর আদেশ অনুসারে সমীপবর্তিনী প্রতীহারী লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া সবিশেষ সমস্ত বলিয়া, কৌশল্যার অভিপ্রায় তাঁহার গোচর করিল। লক্ষ্মণ, কৌশলক্রমে, সে দিবস সেই পর্যন্ত সঙ্গীত-ক্রিয়া রহিত করিয়া, সভাভঙ্গ করিলেন; এবং কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা তাহাদের দুই সহোদরকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে বারংবার উভয়ের মুখচুম্বন করিলেন, এবং হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ; এই বলিয়া, নিতান্ত কাতর হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে, সুমিত্রা, উর্মিলা প্রভৃতি সকলেই, সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত, বিলাপ, ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুশ ও লব, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, অবাক্ হইয়া রহিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে কৌশল্যা কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া, সন্দেহভঞ্জনমানসে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ও তোমাদের জনক-জননীর নাম কি? তাহারা, অতি বিনীত ভাবে, স্বস্বনামকীর্তন করিয়া বলিল, আমাদের পিতা কে, তাহা আমরা জানি না; এ পর্যন্ত আমরা তাঁহাকে দেখি নাই; আমাদের জননী

আছেন, তিনি তপস্বিনী ; কিন্তু এক দিনও আমরা তাঁহার নাম শুনি নাই, কেহ আমাদিগকে বলিয়া দেয় নাই ; আমরাও তাঁহাকে বা অন্য কাহাকেও কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য ; তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তাঁহারই নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি। আকুল চিত্তে এই সকল কথা শুনিয়া অনেক অংশে কৌশল্যার সংশয়াপনোদন হইল। কিন্তু, সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইয়া, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের জননীর আকৃতি কিরূপ ? কুশ ও লব তদীয় আকৃতির যথাযথ বর্ণনা করিল। তখন তাহারা সীতার তনয় বলিয়া, এককালে সকলের দৃঢ় নিশ্চয় হইল, এবং কৌশল্যা প্রভৃতি সমস্ত রাজপরিবারের শোকসিন্ধু, অনিবার্য বেগে, উথলিয়া উঠিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কৌশল্যা কুশ ও লবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের জননী কেমন আছেন ? তাহারা বলিল, তাঁহাকে সর্বদাই জীবন্মৃতপ্রায় দেখিতে পাই ; বিশেষতঃ তিনি দিন দিন যেরূপ ক্ষীণ হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, অধিক দিন বাঁচিবেন না। এই কথা বলিতে বলিতে তাহাদের দুই সহোদরের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কুশ ও লবের এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, কিঞ্চিৎ ধৈর্য অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণ রূপে সন্দেহভঞ্জন করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! তুমি একবার মহর্ষি বাল্মীকিকে এই স্থানে আন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে মহর্ষি বাল্মীকি লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলে, সকলে যথোচিত ভক্তিযোগসহকারে প্রণাম করিয়া, পরম সমাদরে আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর, কৌশল্যা কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনকার এই দুই শিষ্য কে, কৃপা করিয়া সবিশেষ বলুন। বাল্মীকি, যে দিন লক্ষ্মণ সীতাকে বিসর্জন দিয়া আইসেন, সেই অবধি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নির্দিষ্ট করিয়া, রামের বিরহে সীতার যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিলেন। সমুদয় শ্রবণগোচর করিয়া সকলেরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কৌশল্যা, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, হা বৎসে জানকি! বিধাতা তোমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সীতা অদ্যাপি জীবিত আছেন, এবং কুশ ও লব তাঁহার তনয়, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

এত দিনের পর আত্মপরিচয় পাইয়া, কুশ ও লবের অন্তঃকরণে নানা অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে বলিলেন, বৎস কুশ! বৎস লব! পিতামহীদের ও পিতৃব্যপত্নীদিগের চরণবন্দনা কর। তাহারা তৎক্ষণাৎ কৌশল্যা, কেকয়ী, ও সুমিত্রার, এবং উর্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। অনন্তর মহর্ষি বলিলেন, তোমরা রামায়ণে লক্ষ্মণ নামে যে মহাপুরুষের গুণকীর্তনপাঠ করিয়াছ, তিনি এই ; ইনি তোমাদের তৃতীয় পিতৃব্য ; এই বলিয়া, লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। তাহারা, লক্ষ্মণ এই শব্দ কর্ণগোচর হইবামাত্র, বিস্ময়-

বিস্ফারিত নয়নে পদ অবধি মস্তক পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিল।

এইরূপে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে, কৌশল্যা লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! তুমি ত্বরায় রামকে ও বশিষ্ঠদেবকে এখানে আন। তদনুসারে লক্ষ্মণ, অল্পক্ষণমধ্যে, রাম ও বশিষ্ঠদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা, বাষ্পাকুল লোচনে, শোকাকুল বচনে, তাঁহাদের নিকট কুশ ও লবের প্রকৃত পরিচয় দিলেন, এবং সীতা যে তৎকাল পর্যন্ত জীবিত আছেন, তাহাও বলিলেন। কুশ ও লবের বিষয়ে রামচন্দ্রের অন্তঃকরণে যে সংশয় ছিল, তাহা সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত হইল। চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তিনি অপ্রমেয় বাৎসল্যভরে নিস্পন্দ নয়নে কুশ ও লবের মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, কৌশল্যা সপুত্রা সীতার পরিগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। রামচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌশল্যা তদীয় মৌনাবস্থানকে সম্মতিদান স্থির করিয়া সীতার আনয়নের নিমিত্তে বাল্মীকির নিকট প্রার্থনা করিলেন। বাল্মীকি অবিলম্বে বাসকুটীরে গমন করিয়া কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকাযান সমভিব্যাহারে আপন এক শিষ্যকে পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, তুমি জানকীরে এই যানে আরোহণ করাইয়া, আমার বাসকুটীরে লইয়া আসিবে।

ক্রমে ক্রমে, সমবেত নিমন্ত্রিতগণ অবগত হইলেন, রামায়ণগায়ক বাল্মীকিশিষ্যেরা রাজতনয়; সীতা, পরিত্যাগের পর, বাল্মীকির আশ্রমে তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছেন; তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন; রাজা তাঁহারে গৃহে লইবেন; তাঁহার আনয়নের নিমিত্তে লোক প্রেরিত হইয়াছে। এই সংবাদে অনেকেই প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, আমাদের রাজা অতি অব্যবস্থিতচিত্ত; যদি জানকীরে পুনরায় গৃহে লইবেন, তবে পরিত্যাগ করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? তখনও যে জানকী, এখনও সেই জানকী; তখনও যে কারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখনও সে কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; বড় লোকের রীতি চরিত্র বুঝা ভার।

সীতার পরিগ্রহবিষয়ে রাম একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন; কিন্তু, এই সকল কথা কর্ণপরম্পরায় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, পুনরায় চলচিত্ত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে জানকীরে গৃহে লইলে, প্রজালোকে আর আপত্তির উত্থাপন করিবেক না। কিন্তু, অদ্যাপি তাহাদের হৃদয় হইতে সীতার চরিত্রসংক্রান্ত সংশয় অপনীত হয় নাই দেখিয়া, তিনি বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর, ইহাই নির্ধারিত হইল যে, সমবেত সমস্ত লোকের সমক্ষে, সীতা স্বীয় শুদ্ধচারিতা প্রমাণসিদ্ধ করিলে রাম তাঁহাকে গৃহে লইবেন। রামের আদেশ অনুসারে, লক্ষ্মণ এই কথা বাল্মীকির গোচর করিলেন।

লক্ষ্মণের মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, বাল্মীকি অবিলম্বে রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন; এবং, সীতা যে সম্যক্ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে তাঁহাকে অশেষ

প্রকারে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! সীতার শুদ্ধচারিতা-বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমি রাজ্যের ভারগ্রহণ করিয়া নিতান্ত পরায়ত্ত হইয়াছি। আপনারাই উপদেশ দিয়া থাকেন, প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করাই রাজার পরম ধর্ম; কোনও কারণে তাহাতে অণুমাত্র উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে ইহ-লোকে অকীর্তিভাজন ও পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। প্রজালোকের অন্তঃকরণে সীতার চরিত্রবিষয়ে বিষম সংশয় জন্মিয়া আছে; সে সংশয় অপসারিত না হইলে, আমি কিরূপে গ্রহণ করি, বলুন। আমি সীতার পরিত্যাগদিবস অবধি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি; কি রূপে এত দিন জীবিত রহিয়াছি, বলিতে পারি না। নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই আমায় সীতারে নির্বাসিত করিতে হইয়াছে! এক বার মনে করিয়াছিলাম, প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক, আমি আর তাহাদের অনুরোধে সীতাগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু তাহাতে রাজধর্মের প্রতিপালন হয় না; সুতরাং, সে বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না। আর বার ভাবিয়াছিলাম, না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত করিয়া কাজকার্য হইতে অবসৃত হইব; তাহা হইলে, আর আমার জানকীপরিগ্রহের কোনও প্রতিবন্ধক থাকিবেক না। অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সে উপায় অবলম্বন করাও শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বোধ হইল না। আমি জানকীর প্রতি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহ ঘোরতর অধর্ম-গ্রস্ত হইয়াছি; এ যাত্রা, আমি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগে জীবনযাপন করিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি এক্ষণে যে বিষম মানসিক কষ্টে কালহরণ করিতেছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যদি এই মুহূর্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে, আমি পরিত্রাণ বোধ করি।

এই বলিয়া একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া রাম অনিবার্য বেগে বাষ্পবারিবিসর্জন করিতে লাগিলেন; কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া অঞ্জলিবন্ধপূর্বক, বিনয়বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া বাল্মীকিকে বলিলেন, ভগবন্! আপনকার নিকটে আমার প্রার্থনা এই, সীতা উপস্থিত হইলে, আপনি তাঁহারে আপন সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে লইয়া যাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার পরিগ্রহবিষয়ে সকলের সম্মতি জিজ্ঞাসিবেন। যদি তাঁহার পরিগ্রহ সর্বসম্মত হয়, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিব। সর্বসম্মত না হইলে তাঁহাকে কোনও অসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা প্রজাবর্গের সন্দেহনিরাকরণ করিতে হইবেক। বাল্মীকি, অগত্যা সম্মত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে বাসসদনে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে সীতা, কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকাযান উপস্থিত দেখিয়া, এবং মহর্ষির প্রেরিত শিষ্যের মুখে তদীয় আদেশ শুনিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, বুঝি বিধি সদয় হইয়া, এত দিনের পর, আমার দুঃখের অবসান করিলেন। যখন ঠাকুরাণী শিবিকা পাঠাইয়াছেন, তখন আমি পুনরায় পরিগৃহীতা হইব, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এই জন্যেই আজ আমার বাম নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে। আমি আর্য-পুত্রের স্নেহ, দয়া, ও মমতা জানি; নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই তিনি আমায়

নির্বাসিত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বিরহে যেমন কাতর, তিনিও আমার বিরহে সেইরূপ কাতর, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যদি আমার প্রতি স্নেহের কোনও অংশে খর্বতা ঘটিত, তাহা হইলে তিনি কখনই পুনরায় দারপরিগ্রহে বিমুখ হইতেন না। তিনি সহধর্মিণীস্থলে আমার প্রতিকৃতি স্থাপিত করিয়া, স্নেহের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, এবং আমার সকল শোকের ও সকল ক্ষোভের নিবারণ করিয়াছেন। পুনরায় যে আমার অদৃষ্টে আর্যপুত্রের সহবাসসুখ ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

এইরূপ বলিতে বলিতে, আহ্লাদভরে জানকীর নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরে শতগুণ বলাধান ও চিত্তে অপরিমিত স্ফূর্তির ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। পুনরায় পরিগৃহীতা হইলাম ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয়কন্দর অভূতপূর্ব আনন্দপ্রবাহে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আশার আশ্বাসনী শক্তির ইয়ত্তা নাই। তিনি আশার উপর নির্ভর করিয়া মনে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন। রামের সহিত সমাগম হইলে যে সকল ব্যাপার ঘটিতে পারে, তিনি তৎসমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক বার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন, রাম লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন রাম অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্নেহভরে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেছেন, তিনি কথা কহিতেছেন না, অভিমানভরে বদন বিরস করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; এক বার বোধ করিলেন, যেন প্রথমসমাগমক্ষণে উভয়েই জড়প্রায় হইয়া স্থির নয়নে উভয়ের বদননিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং উভয়েরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ে একাসনে উপবেশন করিয়া, পরস্পর দীর্ঘবিরহকালীন দুঃখের বর্ণনা করিতে করিতে, অপরিজ্ঞাত রূপে রজনীর অবসান হইয়া গেল; এক বার বোধ করিলেন, যেন তিনি শ্বশ্রূদিগের সম্মুখে নীত হইয়া তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলে তাঁহারা বাষ্পপূর্ণ নয়নে তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, এবং তাঁহাকে কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট দেখিয়া শোকভরে কতই পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি শ্বশ্রূদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দেবরেরা তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে, আর্যে। প্রণাম করি, ইহা বলিয়া অভিবাদন করিলেন; এক বার বোধ করিলেন, যেন তাঁহার ভগিনীরা আসিয়া প্রণাম করিলেন, এবং, দীর্ঘবিয়োগের পর পরস্পরসন্দর্শনে শোকপ্রবাহ উচ্ছলিত হওয়াতে, সকলে মিলিয়া গলদশ্রু লোচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত হইয়াছে; তিনি রামের বামে বসিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে সহধর্মিণীকার্য সম্পন্ন করিতেছেন।

এইরূপ অনেকরূপ অনুভব করিতে করিতে আহ্লাদভরে পুলকিতকলেবরা হইয়া জানকী শিবিকায় আরোহণ করিলেন; এবং, পর দিবস সায়ং সময়ে, নৈমিষে

উপনীতা হইলেন। বাল্মীকি বলিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র তোমার পুনর্গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। কল্য, যৎকালে, তিনি সভামণ্ডপে অবস্থিতি করিবেন, সেই সময়ে, সর্বসমক্ষে, আমি তোমায় তাঁহার হস্তে সমর্পিত করিব। বাল্মীকির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করিলে, কোনও ব্যক্তি সাহস করিয়া সভামধ্যে অসম্মতিপ্রদর্শন করিতে পারিবেক না। এজন্য, তিনি, শুদ্ধচারিতার প্রমাণপ্রদর্শন আবশ্যক হইলেও হইতে পারে, এ কথার উল্লেখমাত্র করিলেন না। অনন্তর জানকী বিরলে বসিয়া কুশ ও লবের মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, স্বীয় পরিগ্রহবিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে মুক্তসংশয়া হইলেন, এবং আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া প্রতি ক্ষণে প্রভাত-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; সমস্ত রাত্রি একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না।

রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি স্নান, আহ্নিক সমাপিত করিয়া, সীতা, কুশ, লব, ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে, সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত দেখিয়া রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণে সমর্থ হইলেন; এবং, না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে, এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, একান্ত আকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থা দর্শনে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। বাল্মীকি, আসনপরিগ্রহ না করিয়াই, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, এই সভায় নানাদেশীয় নরপতিগণ, কোশল রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ, এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌরবর্গ ও জানপদগণ সমবেত হইয়াছ; তোমরা সকলেই অবগত আছ, রাজা রামচন্দ্র, অমূলক লোকাপবাদশ্রবণে চলচিত্ত হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে নির্বাসিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমাদের সকলের নিকট আমার অনুরোধ এই, তাঁহার পরিগ্রহবিষয়ে তোমরা প্রশস্ত মনে অনুমোদনপ্রদর্শন কর; জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

ইহা বলিয়া, বাল্মীকি বিরত হইলে, সভামণ্ডপে অতিমহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, নরপতিগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ, দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিলেন, আমরা অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, রাজা রামচন্দ্র সীতা দেবীর পুনরায় গ্রহণ করিলে, আমরা যার পর নাই পরিতোষলাভ করিব। কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত লোক অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাম এতক্ষণ বিষম সংশয়ে কালযাপন করিতেছিলেন; এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সীতার পরিগ্রহবিষয়ে সর্বসাধারণের সম্মতি নাই। এ জন্যে তিনি নিতান্ত ম্লানবদন ও ম্রিয়মাণপ্রায় হইয়া, হতবুদ্ধির ন্যায়, স্থির নয়নে বাল্মীকির মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি অতিমাত্র হতোৎসাহ হইয়া উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, সীতাকে বলিলেন, বৎসে জানকি! তোমার চরিত্রবিষয়ে প্রজালোকের মনে যে

সংশয় জন্মিয়াছে, অদ্যাপি তাহা অপনীত হয় নাই ; অতএব তুমি কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া সকলের অন্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপসারণ কর। সীতা, বাল্মীকির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয়ে, প্রতি ক্ষণেই পরিগ্রহপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণমাত্র বজ্রাহতার প্রায় গতচেতনা হইয়া বাতাহতা লতার ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।

জননীর তাদৃশী দশা দেখিয়া অতিমাত্র কাতর হইয়া কুশ ও লব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রাম অতিমহতী লোকানুরাগপ্রিয়তার সহায়তায়, এ পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন ; কিন্তু সীতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া, এবং কুশ ও লবের আর্তনাদ শ্রবণগোচর করিয়া, অতিদীর্ঘনিশ্বাসভারপরিত্যাগপূর্বক, হা প্রেয়সি! বলিয়া, মূর্ছিত ও সিংহাসন হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, হা বৎসে জানকি! এই বলিয়া মূর্ছিত হইলেন। সীতার ভগিনীরাও দুঃসহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, হায়! কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোক, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, ও শত্রুঘ্ন, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়াও, ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক, রামচন্দ্রের চৈতন্য-সম্পাদনে তৎপর হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তাঁহার চৈতন্যলাভ হইল। বাল্মীকিও, সীতার চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত, অশেষপ্রকারে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানবলীলার সংবরণ করিয়াছেন।

সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন ; তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতাগুণের এরূপ পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্মে উপদেশ দিবার নিমিত্তে, সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পতি পাইয়া, কখনও কোনও কামিনী তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।

ভ্রান্তিবিলাস

বিজ্ঞাপন

কিছু দিন পূর্ব্বে, ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীরের প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। তদনুসারে ঐ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালা-ভাষায় সঙ্কলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারিত হইল।

শেক্সপীর পঁয়ত্রিশখানি নাটকের রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত নাটকসমূহে কবিত্বশক্তির ও রচনাকৌশলের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, তিনি চারিখানি খণ্ড কাব্যের ও কতকগুলি ক্ষুদ্র কাব্যের রচনা করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, এরূপ নহে; এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা পক্ষপাতবিবর্জ্জিত কি না মাদৃশ ব্যক্তির তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতাপ্রদর্শন মাত্র।

ভ্রান্তিপ্রহসন, কাব্যাংশে, শেক্সপীরপ্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট; কিন্তু উহার উপাখ্যানটি যার পর নাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরসোদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবিলাসে শেক্সপীরের সেই অপ্রতিম কৌশল নাই, সুতরাং, ইহা দ্বারা লোকের তাদৃশ চিত্তরঞ্জন হইবেক, তাহার সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গালাপুস্তকে ইয়ুরোপীয় নাম সুশ্রাব্য হয় না; বিশেষতঃ যাঁহারা ইঙ্গরেজী জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। এই দোষের পরিহার-বাসনায়, ভ্রান্তিবিলাসে সেই সেই নামের স্থলে এতদ্দেশীয় নাম নিবেশিত হইয়াছে। উপাখ্যানে এবংবিধ প্রণালী অবলম্বন করা কোনও অংশে হানিকর বা দোষাবহ হইতে পারে না। ইতিহাসে বা জীবনচরিতে নামের যেরূপ উপযোগিতা আছে, উপাখ্যানে সেরূপ নহে।

যদি ভ্রান্তিবিলাস পড়িয়া এক ব্যক্তিরও চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতিসঞ্চার হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

বৰ্দ্ধমান।

৩০এ আশ্বিন। সংবৎ ১৯২৬। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হেমকূট ও জয়স্থল নামে দুই প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য ছিল। দুই রাজ্যের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে জয়স্থলে এই নৃশংস নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, হেমকূটের কোনও প্রজা বাণিজ্য বা অন্যবিধ কার্যের অনুরোধে জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিলে, তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড, অর্থদণ্ডপ্রদানে অসমর্থ হইলে প্রাণদণ্ড, হইবেক। হেমকূট রাজ্যেও জয়স্থলবাসী লোকদিগের পক্ষে অবিকল তদ্রূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় রাজ্যই বাণিজ্যের প্রধান স্থান। উভয় রাজ্যের প্রজারাই উভয়ত্র বিস্তারিত রূপে বাণিজ্য করিত। এক্ষণে, উভয় রাজ্যেই উল্লিখিত নৃশংস নিয়ম ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, সেই বহুবিস্তৃত বাণিজ্য এক কালে রহিত হইয়া গেল।

এই নিয়ম প্রচারিত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরে, সোমদত্ত নামে এক বৃদ্ধ বণিক্ ঘটনাক্রমে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়া হেমকূটবাসী বলিয়া পরিজ্ঞাত ও বিচারালয়ে নীত হইলেন। জয়স্থলে অধিরাজ বিজয়বল্লভ স্বয়ং রাজকার্যের পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি সবিশেষ অবগত হইয়া সোমদত্তের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্বক বলিলেন, অহে হেমকূটবাসী বণিক্! তুমি প্রতিষ্ঠিত বিধির লঙ্ঘনপূর্বক জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছ; এই অপরাধে আমি তোমার পাঁচ সহস্র মুদ্রা দণ্ড করিলাম; যদি অবিলম্বে এই দণ্ড দিতে না পার, সায়ংকালে তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক।

অধিরাজের আদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে আমার প্রাণদণ্ড করুন, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র কাতর নহি। আমি অহর্নিশ দুর্বিষহ যাতনাভোগ করিতেছি; মৃত্যু হইলে পরিত্রাণ বোধ করিব। কিন্তু, মহারাজ! যথার্থ বিচার করিলে আমার দণ্ড হইতে পারে না। সাত বৎসর অতীত হইল, আমি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশপর্যটন করিতেছি। যৎকালে হেমকূট হইতে প্রস্থান করি, উভয় রাজ্যের পরস্পর বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। এক্ষণে পরস্পর যে বিরোধ ঘটিয়াছে, এবং ঐ উপলক্ষে উভয় রাজ্যে যে এরূপ কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি। যদি প্রচারিত নিয়মের বিশেষজ্ঞ হইয়া আপনকার অধিকারে প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে আমি অবশ্য অপরাধী হইতাম।

এই সকল কথা শ্রবণগোচর করিয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, শুন, সোমদত্ত! জয়স্থলের প্রচলিত বিধির সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়া চলিব, কদাচ অন্যথাচরণ করিব না, ধর্মপ্রমাণ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি অধিরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। সুতরাং, জয়স্থলে হেমকূটবাসী লোকদিগের পক্ষে যে সমস্ত বিধি প্রচলিত আছে, আমি প্রাণান্তেও তাহার বিপরীত আচরণ করিতে পারিব না। জয়স্থলের কতিপয় পোতবণিক্ দুই রাজ্যের বিরোধ ও অভিনব বিধিপ্রচলনের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না। তাহারাও তোমার মত না জানিয়া হেমকূটের অধিকারে প্রবেশ

করিয়াছিল। তোমাদের অধিরাজ নবপ্রবর্তিত বিধির অনুবর্তী হইয়া প্রথমতঃ তাহাদের অর্থদণ্ডবিধান করেন। অর্থদণ্ডপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতে অবশেষে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। এই নৃশংস ঘটনা জয়স্থলবাসীদিগের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ জাগরূক রহিয়াছে। এ অবস্থায় আমি প্রচলিত বিধির লঙ্ঘনপূর্বক তোমার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতে পারিব না। অবিলম্বে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিতে পারিলে তুমি অক্ষত শরীরে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পার। কিন্তু আমি তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতেছি না; কারণ তোমার সমভিব্যাহারে যাহা কিছু আছে, সমুদয়ের মূল্য ঊর্ধ্বসংখ্যায় দুই শত মুদ্রার অধিক হইবেক না। সুতরাং সায়ংকালে তোমার প্রাণদণ্ড একপ্রকার অবধারিত বলিতে হইবেক।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া সোমদত্ত অক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন, মহারাজ! আমি যে দুঃসহ দুঃখপরম্পরার ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার অণুমাত্রও প্রাণের মায়া নাই। আপনকার নিকট অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, একক্ষণের জন্যেও আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। আপনি সায়ংকালের কথা কি বলিতেছেন, এই মুহূর্তে প্রাণবিয়োগ হইলে আমার নিস্তার হয়।

ঈদৃশ আক্ষেপবাক্যের শ্রবণে অধিরাজের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ অনুকম্পা ও কৌতূহল উদ্ভূত হইল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সোমদত্ত! কি কারণে তুমি মরণকামনা করিতেছ; কি হেতুতেই বা তুমি জন্মভূমিপরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত সাত বৎসর কাল দেশপর্যটন করিতেছ; কি উপলক্ষেই বা তুমি অবশেষে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়াছ, বল। সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! আমার অন্তর নিরন্তর দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইতেছে; জন্মভূমিপরিত্যাগের ও দেশপর্যটনের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে আমার শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিবেক। সুতরাং আপনার আদেশ প্রতিপালন অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিকতর আন্তরিক ক্লেশকর ব্যাপার আর কিছুই ঘটিতে পারে না। তথাপি আপনার সন্তোষার্থে সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্তবর্ণন করিতেছি। তাহাতে আমার এক মহৎ লাভ হইবেক। সকল লোকে জানিতে পারিবেক, আমি কেবল পরিবারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া এই অবান্ধব দেশে রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতেছি; আমার এই প্রাণদণ্ড কোনও গুরুতর অপরাধ-নিবন্ধন নহে।

মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমি হেমকূটনগরে জন্মগ্রহণ করি। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে লাবণ্যময়ীনাম্নী এক সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিলাম। লাবণ্যময়ী যেমন সৎকুলোৎপন্না, তেমনিই সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। উভয়ের সহবাসে উভয়েই পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলাম। মলয়পুরে আমার বহুবিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তদ্দ্বারা প্রভূত অর্থাগম হইতে লাগিল। যদি অদৃষ্ট মন্দ না হইত, অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিতাম। মলয়পুরে আমার যিনি কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তত্রত্য কার্য সকল সাতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া

উঠিল। শুনিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলাম, এবং সহধর্মিণীকে গৃহে রাখিয়া মলয়পুর প্রস্থান করিলাম। ছয়মাস অতীত না হইতেই, লাবণ্যময়ী বিরহবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অনধিক কালের মধ্যেই অন্তর্বত্নী হইয়া যথাকালে দুই সুকুমার যমজ কুমার প্রসব করিলেন। কুমারযুগলে অবয়বগত অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল না। উভয়েই সর্বাংশে এরূপ একাকৃতি যে, উভয়ের ভেদগ্রহ কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। আমরা যে পান্থনিবাসে অবস্থিতি করিতাম, তথায় সেই দিনে সেই সময়ে এক দুঃখিনী নারীও সর্বাংশে একাকৃতি দুই যমজ তনয় প্রসব করে। উহাদের প্রতিপালন করা অসাধ্য ভাবিয়া সে আমার নিকটে আসিয়া ঐ দুই যমজ সন্তানের বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল। উত্তরকালে উহারা দুই সহোদরে আমার পুত্রদ্বয়ের পরিচর্যা করিবেক, এই অভিপ্রায়ে আমি ক্রয় করিয়া পুত্রনির্বিশেষে উহাদের প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। যমজেরা সর্বাংশে একাকৃতি বলিয়া এক নামে এক এক যমলের নামকরণ করিলাম ; পুত্রযুগলের নাম চিরঞ্জীব, ক্রীত শিশু-যুগলের নাম কিঙ্কর রাখিলাম।

কিছু কাল গত হইলে আমার সহধর্মিণী হেমকূটপ্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য হইয়া সর্বদা উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। আমি অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক সম্মত হইলাম। অল্প দিনের মধ্যেই চারি শিশু সমভিব্যাহারে আমরা অর্ণবপোতে আরোহণ করিলাম। মলয়পুর হইতে যোজনমাত্র গমন করিয়াছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ গগনমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল ; প্রবল বেগে প্রচণ্ড বাত্যা বহিতে লাগিল; সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। আমরা জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়া প্রতি ক্ষণেই মৃত্যুপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার সহধর্মিণী সাতিশয় আর্ত স্বরে হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া দুই তনয় ও দুই ক্রীত বালক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। গৃহিণী বাষ্পাকুললোচনে অতি কাতর বচনে মুহুর্মুহুঃ বলিতে লাগিলেন, নাথ! আমরা মরি, তাহাতে কিছুমাত্র খেদ নাই ; যাহাতে দুটি সন্তানের প্রাণরক্ষা হয়, তাহার কোনও উপায় কর। কিয়ৎ ক্ষণ পরে অর্ণবপোত মগ্নপ্রায় হইল। নাবিকেরা পোতরক্ষাবিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ্বাস হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে লাগিল, এবং অর্ণবপোতে যে কয়খানি ক্ষুদ্র তরী ছিল, তাহাতে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিল। তখন আমি নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিলাম। অর্ণবপোতে দুটি অতিরিক্ত গুণবৃক্ষ ছিল ; একের প্রান্তভাগে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠ ক্রীত শিশুর, অপরটির প্রান্তভাগে কনিষ্ঠ পুত্রের ও কনিষ্ঠ ক্রীত শিশুর বন্ধনপূর্বক, আমরা স্ত্রীপুরুষে একৈকের অপর প্রান্তভাগে এক এক জন করিয়া আপনাদিগকে বদ্ধ করিলাম। দুই গুণবৃক্ষ স্রোতের অনুবর্তী হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। বোধ হইল, আমরা কর্ণপুর অভিমুখে নীত হইতেছি। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সূর্যদেবের আবির্ভাব ও বাত্যার তিরোভাব হইল। তখন দেখিতে পাইলাম, দুই

অর্ণবপোত অতি বেগে আমাদের দিকে আসিতেছে। বোধ হইল, আমাদের উদ্ধরণের জন্যই উহারা ঐ রূপে আসিতেছিল। তন্মধ্যে, একখানি কর্ণপুরের, অপরখানি উদয়নগরের। এ পর্যন্ত দুই গুণবৃক্ষ পরস্পর অতি সন্নিহিত ছিল; কিন্তু, উল্লিখিত পোতদ্বয় আমাদের নিকটে আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে, আকস্মিক বায়ুবেগবশে পরস্পর অতিশয় দূরবর্তী হইয়া পড়িল। আমি এক দৃষ্টিতে অপর গুণবৃক্ষের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে পাইলাম, কর্ণপুরের পোতস্থিত লোকেরা বন্ধনমোচন-পূর্বক আমার গৃহিণী, পুত্র, ও ক্রীত শিশুকে অর্ণবগর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিল। কিঞ্চিৎ পরেই অপর পোত আসিয়া আমাদের তিন জনের উদ্ধরণ করিল। এই পোতের লোকেরা যেরূপ সুহৃদ্ভাবে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, অপর পোতের লোকেরা সেরূপ নহেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাদের উদ্ধারকেরা আমার গৃহিণী ও শিশুদ্বয়ের উদ্ধারার্থে উদ্যুক্ত হইলেন; কিন্তু অপর পোত অধিকতর বেগে যাইতেছিল, সুতরাং ধরিতে পারিলেন না। তদবধি আমি পুত্র ও প্রেয়সীর সহিত বিযোজিত হইয়াছি। মহারাজ! আমার মত হতভাগ্য আর কেহ নাই—

এই কথা বলিতে বলিতে সোমদত্তের নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন বিজয়বল্লভ বলিলেন, সোমদত্ত! দৈববিড়ম্বনায় তোমার যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় অতিশয় শোকাকুল হইতেছে; ক্ষমতা থাকিলে, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করিতাম। সে যাহা হউক, তৎপরে কি কি ঘটনা হইল, সমুদয় শুনিবার নিমিত্তে আমার চিত্তে নিরতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতেছে: সবিস্তর বর্ণন করিলে আমি অনুগৃহীত বোধ করিব।

সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ। তৎপরে কিছু দিনের মধ্যেই, কনিষ্ঠ তনয় ও কনিষ্ঠ ক্রীত শিশু সমভিব্যাহারে নিজ আগারে প্রতিগমনপূর্বক কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া, শিশুযুগলের লালন পালন করিতে লাগিলাম; বহু কাল অতীত হইয়া গেল, কিন্তু গৃহিণী ও অপর শিশুযুগলের কোনও সংবাদ পাইলাম না। কনিষ্ঠ পুত্রটির যত জ্ঞান হইতে লাগিল, ততই সে জননী ও সহোদরের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। আমার নিকটে স্বকৃত জিজ্ঞাসার যে উত্তর পাইত, তাহাতে তাহার সন্তোষ জন্মিত না। অবশেষে, অষ্টাদশবর্ষ বয়সে নিতান্ত অধৈর্য হইয়া আমার অনুমতিগ্রহণ পূর্বক স্বীয় পরিচারক সমভিব্যাহারে সে তাহাদের উদ্দেশার্থে প্রস্থান করিল। পুত্রটি অন্ধের যষ্টিস্বরূপ আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল, এজন্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে কোনও মতে ইচ্ছা ছিল না। তৎকালে এই আশঙ্কা হইতে লাগিল, এ জন্মে যে গৃহিণী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সমাগম হইবেক, তাহার আর প্রত্যাশা নাই; আমার যেরূপ অদৃষ্ট, হয় ত এই অবধি ইহাকেও হারাইলাম। মহারাজ! ভাগ্যক্রমে আমার তাহাই ঘটিয়া উঠিল। দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি কনিষ্ঠ পুত্র প্রত্যাগমন করিল না। আমি তাহার অন্বেষণে নির্গত হইলাম; পাঁচ বৎসর কাল

অবিশ্রান্ত পর্যটন করিলাম; কিন্তু কোনও স্থানেই কিছুমাত্র সন্ধান পাইলাম না। পরিশেষে নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া হেমকূট অভিমুখে গমন করিতেছিলাম; জয়স্থলের উপকূল দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতে মনে ভাবিলাম, এত দেশে পর্যটন করিলাম, এই স্থানটি অবশিষ্ট থাকে কেন। এখানে যে তাহাকে দেখিতে পাইব, তাহার কিছুমাত্র আশা ছিল না; কিন্তু না দেখিয়া চলিয়া যাইতেও কোনও মতে ইচ্ছা হইল না। এইরূপে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরেই ধৃত ও মহারাজের সম্মুখে আনীত হইয়াছি। মহারাজ! আজ সায়ংকালে আমার সকল ক্লেশের অবসান হইবেক। যদি, প্রেয়সী ও তনয়েরা জীবিত আছে, ইহা শুনিয়া মরিতে পারি, তাহা হইলে আর আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না।

সোমদত্তের আখ্যানশ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, সোমদত্ত! আমার বোধ হয়, তোমার মত হতভাগ্য ভূমণ্ডলে আর নাই। অবিচ্ছিন্ন ক্লেশভোগে কালহরণ করিবার নিমিত্তই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণগোচর করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যদি ব্যবস্থাপিত বিধির উলঙ্ঘন না হইত, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতাম। জয়স্থলের প্রচলিত বিধি অনুসারে তোমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে; যদি অনুকম্পার বশবর্তী হইয়া ঐ ব্যবস্থা রহিত করি, তাহা হইলে আমি চিরকালের জন্য জয়স্থলসমাজে যার পর নাই হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইব। তবে, আমার যে পর্যন্ত ক্ষমতা আছে তাহা করিতেছি। তোমাকে সায়ংকাল পর্যন্ত সময় দিতেছি; এই সময়ের মধ্যে যদি কোনও রূপে পাঁচ সহস্র মুদ্রার সংগ্রহ করিতে পার, তোমার প্রাণরক্ষা হইবেক, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ড অপরিহার্য। অনন্তর তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, তুমি সোমদত্তকে যথাস্থানে সাবধানে রাখ। কারাধ্যক্ষ, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, সোমদত্ত সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল।

কর্ণপুরের লোকেরা, কুবলয়পুরের অধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত বিখ্যাত বীর বিজয়বর্মার নিকট, চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে বেচিয়াছিল। তৎপরে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে, বিজয়বর্মা নিজ ভ্রাতৃপুত্র বিজয়বল্লভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে এত ভাল বাসিতেন যে, ক্ষণকালের জন্যেও তাহাদিগকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না। সুতরাং, জয়স্থলপ্রস্থানকালে তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান। ঐ দুই বালককে দেখিয়া ও তাহাদের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত শুনিয়া বিজয়বল্লভের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়া উপস্থিত হয়, এবং দিন দিন তাহাদের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহসঞ্চার হইতে থাকে। পিতৃব্যের প্রস্থানসময় সমাগত হইলে, ভ্রাতৃব্য সবিশেষ আগ্রহপ্রদর্শনপূর্বক তাঁহার নিকট বালকদ্বয়ের প্রাপ্তিবাসনা জানাইয়াছিলেন। তদনুসারে বিজয়বর্মা তদীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করেন। অভিপ্রেতলাভে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বিজয়বল্লভ পরম যত্নে চিরঞ্জীবের লালন পালন করিতে লাগিলেন; এবং, সে বিষয়কার্যের উপযোগী বয়স প্রাপ্ত হইলে,

তাহাকে এক কালে সেনাসংক্রান্ত উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চিরঞ্জীব প্রত্যেক যুদ্ধেই বুদ্ধিমত্তা, কার্যদক্ষতা, অকুতোভয়তা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয়প্রদান করিতে লাগিলেন। একদা বিজয়বল্লভ একাকী বিপক্ষমণ্ডলে এরূপে বেষ্টিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাণবিনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল; সে দিন কেবল চিরঞ্জীবের বুদ্ধিকৌশলে ও সাহসগুণে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। বিজয়বল্লভ যার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তদবধি তাঁহার প্রতি পুত্রবাৎসল্যপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বে, জয়স্থলবাসী এক শ্রেষ্ঠী, অতুল ঐশ্বর্য এবং চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী নামে দুই পরম সুন্দরী কন্যা রাখিয়া, পরলোক যাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তিনি অধিরাজ বিজয়বল্লভের হস্তে স্বীয় সমস্ত বিষয়ের ও কন্যাদ্বিতয়ের রক্ষণাবেক্ষণ-সংক্রান্ত ভারপ্রদান করিয়া যান। বিজয়বল্লভ শ্রেষ্ঠীর জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রপ্রভার সহিত চিরঞ্জীবের বিবাহ দিলেন। চিরঞ্জীব এই অসম্ভাবিত পরিণয়সংঘটন দ্বারা এক কালে এক সুরূপা কামিনীর পতি ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইলেন। এইরূপে তিনি বিজয়বল্লভের স্নেহগুণে ও অনুগ্রহবলে জয়স্থলে গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন, এবং স্বভাবসিদ্ধ দয়া, সৌজন্য, ন্যায়পরতা, ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা সর্বসাধারণের স্নেহপাত্র ও সম্মানভাজন হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

চিরঞ্জীব অতি শৈশবকালে পিতা, মাতা, ও ভ্রাতার সহিত বিযোজিত হইয়াছিলেন; তৎপরে আর কখনও তাঁহাদের কোনও সংবাদ পান নাই। সুতরাং, জগতে তাঁহার আপনকার কেহ আছে বলিয়া কিছুমাত্র বোধ ছিল না। তিনি শৈশবকালের সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিলেন, কোনও রূপে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, কেবল এই বিষয়টির অনতিপরিস্ফুট স্মরণ ছিল। জয়স্থলে তাঁহার আধি-পত্যের সীমা ছিল না। যদি তিনি জানিতে পারিতেন, সোমদত্ত তাঁহার জন্মদাতা, তাহা হইলে সোমদত্তকে এক ক্ষণের জন্যেও রাজদণ্ডে নিগ্রহভোগ করিতে হইত না।

যে দিবস সোমদত্ত জয়স্থলে উপস্থিত হন, কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবও সেই দিবস স্বকীয় পরি-চারক কনিষ্ঠ কিঙ্কর সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনিও, স্বীয় পিতার ন্যায়, ধৃত, বিচারালয়ে নীত, ও রাজদণ্ডে নিগৃহীত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। দৈবযোগে এক বিদেশীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি বলিলেন, বয়স্য! তুমি এ দেশে আসিয়াছ কেন? কিছু দিন হইল, জয়স্থলে হেমকূটবাসীদিগের পক্ষে ভয়ানক নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে। তুমি হেমকূটবাসী বলিয়া কোনও ক্রমে কাহারও নিকট পরিচয় দিও না। মলয়পুর তোমার জন্মস্থান এবং সে স্থানে তোমাদের বহুবিস্তৃত বাণিজ্য আছে; কেহ তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে মলয়পুরবাসী বলিয়া পরিচয় দিবে। অত্রত্য লোকে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইলে নিঃসন্দেহ তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক। হেমকূটবাসী এক বৃদ্ধ বণিক্ আজ জয়স্থলে আসিয়া-ছিলেন। অধিরাজের আদেশক্রমে, সূর্যদেবের অস্তাচলচূড়ায় অধিরোহণ করিবার

পূর্বেই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবেক। অতএব, যতক্ষণ এখানে থাকিবে, সাবধানে চলিবে। আর আমার নিকট যাহা রাখিতে দিয়াছিলে, লও।

এই বলিয়া তিনি স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি চিরঞ্জীবের হস্তে প্রত্যর্পিত করিলেন। তিনি তাহা স্বকীয় পরিচারকের হস্তে দিয়া বলিলেন, কিঙ্কর! তুমি এই স্বর্ণমুদ্রা লইয়া পান্থনিবাসে প্রতিগমন কর, অতি সাবধানে রাখিবে, কোনও ক্রমে কাহারও হস্তে দিবে না। এখনও আমাদের আহারের সময় হয় নাই, প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে; এই সময় মধ্যে নগরদর্শন করিয়া আমিও পান্থনিবাসে প্রতিগমন করিতেছি। তুমি যাও, আর দেরি করিও না। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব সেই বৈদেশিক বন্ধুকে বলিলেন, বয়স্য! কিঙ্কর আমার চিরসহচর ও যার পর নাই বিশ্বাসভাজন। উহার বিশেষ এক গুণ আছে; আমি যখন দুর্ভাবনায় অভিভূত হই, তখন ও পরিহাস করিয়া আমার চিত্তের অপেক্ষাকৃত সাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করে। এক্ষণে চল, দুই বন্ধুতে নগর দেখিতে যাই; তৎপরে উভয়ে পান্থনিবাসে এক সঙ্গে আহারাদি করিব। তিনি বলিলেন, আজ এক বণিক্ আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; অবিলম্বে তদীয় আলয়ে যাইতে হইবেক। তাঁহার নিকট আমার উপকারের প্রত্যাশা আছে। অতএব আমায় মাপ কর, এখন আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিব না; অপরাহ্ণে নিঃসন্দেহ সাক্ষাৎ করিব এবং শয়নের সময় পর্যন্ত তোমার নিকটে থাকিব। এই বলিয়া সে ব্যক্তি বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব একাকী নগরদর্শনে নির্গত হইলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব অতি প্রত্যূষে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন; আহারের সময় উপস্থিত হইল, তথাপি প্রতিগমন করিলেন না। তাঁহার গৃহিণী চন্দ্রপ্রভা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া কিঙ্করকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দেখ, কিঙ্কর! এত বেলা হইল, তথাপি তিনি গৃহে আসিতেছেন না। বোধ করি, কোনও গুরুতর কার্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতেই আহারের সময় পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। তুমি যাও, সত্বর তাঁহাকে ডাকিয়া আন; দেখিও, যেন কোনও মতে বিলম্ব না হয়; তাঁহার জন্যে সকলকার আহারবন্ধ। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরেই নগরদর্শনে ব্যাপৃত হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া স্বপ্রভুজ্ঞানে সত্বর গমনে তাঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল।

চিরঞ্জীবযুগল ও কিঙ্করযুগল জন্মকালে যেরূপ সর্বাংশে একাকৃতি হইয়াছিলেন, এখনও তাঁহারা অবিকল সেইরূপ ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি বা অবস্থাভেদ নিবন্ধন কোনও অংশে আকৃতির কিছুমাত্র বিভিন্নতা ঘটে নাই। সুতরাং, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্করের যেমন স্বীয় প্রভু বলিয়া বোধ জন্মিয়াছিল, জয়স্থলবাসী কিঙ্কর সন্নিহিত হইবামাত্র তাহাকে দেখিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবেরও তেমনই স্বীয় পরিচারক বলিয়া বোধ জন্মিল; সে যে তাঁহার সহচর কিঙ্কর নয়, তিনি তাহার কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তদনুসারে তিনি কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন,

কি হে, তুমি এত সত্বর আসিলে কেন ? সে বলিল, এত সত্বর আসিলে, কেমন ; বরং এত বিলম্বে আসিলে কেন, বলুন। বেলা প্রায় দুই প্রহর হইল, আপনি এ পর্যন্ত গৃহে না যাওয়াতে কর্ত্রী ঠাকুরাণী অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। অনেক ক্ষণ আহার-সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং ক্রমে শীতল হইয়া যাইতেছে। আহারসামগ্রী যত শীতল হইতেছে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী তত উষ্ণ হইতেছেন। আহারসামগ্রী শীতল হইতেছে, কারণ আপনি গৃহে যান নাই ; আপনি গৃহে যান নাই, কারণ আপনকার ক্ষুধা নাই ; আপনকার ক্ষুধা নাই, কারণ আপনি বিলক্ষণ জলযোগ করিয়াছেন ; কিন্তু আপনকার অনুপস্থিতিজন্য আমরা অনাহারে মারা পড়িতেছি।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ভাবিলেন, পরিহাসরসিক কিঙ্কর কৌতুক করিতেছে। তখন তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, কিঙ্কর ! আমি এখন তোমার পরিহাসরসের অভিলাষী নহি ; তোমার হস্তে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি, কাহার নিকট রাখিয়া আসিলে, বল। সে চকিত হইয়া বলিল, সে কি, আপনি স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তে কখন দিলেন ? কেবল বুধবার দিন চর্মকারকে দিবার জন্য চারি আনা দিয়াছিলেন, সেই দিনই তাহাকে দিয়াছি, আমার নিকটে রাখি নাই ; চর্মকার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ঘোড়ার সাজ মেরামত করিয়াছিল। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর ! এ পরিহাসের সময় নয় ; যদি ভাল চাও, স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিলে, বল। আমরা ঘটনাক্রমে এই নিতান্ত অপরিচিত অবান্ধব দেশে আসিয়াছি ; কি সাহসে কোন্ বিবেচনায় তত স্বর্ণমুদ্রা অপরের হস্তে দিলে ? কিঙ্কর বলিল, মহাশয় ! আপনি আহারে বসিয়া পরিহাস করিবেন, আমরা আহ্লাদিত চিত্তে শুনিব। এখন আপনি গৃহে চলুন ; কর্ত্রী ঠাকুরাণী সত্বর আপনারে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন ; বিলম্ব হইলে কিংবা আপনারে না লইয়া গেলে, আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবেক না ; হয় ত প্রহার পর্যন্ত হইয়া যাইবেক।

চিরঞ্জীব নিতান্ত অধৈর্য হইয়া বলিলেন, কিঙ্কর ! তুমি বড় নির্বোধ, যত আমার ভাল লাগিতেছে না, ততই তুমি পরিহাস করিতেছ ; বারংবার বারণ করিতেছি, তথাপি ক্ষান্ত হইতেছ না ; দেখ, সময়ে সকলই ভাল লাগে ; অসময়ে অমৃতও বিস্বাদ ও বিষতুল্য বোধ হয়। যাহা হউক, আমি তোমার হস্তে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি, তাহা কোথায় রাখিলে, বল। কিঙ্কর বলিল, না মহাশয় ! আপনি আমার হস্তে কখনই স্বর্ণমুদ্রা দেন নাই। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর ! আজ তোমার কি হইয়াছে বলিতে পারি না। পাগলামির চূড়ান্ত হইয়াছে, আর নয়, ক্ষান্ত হও। বল, স্বর্ণমুদ্রা কোথায় কাহার নিকটে রাখিয়া আসিলে। সে বলিল, মহাশয় ! এখন স্বর্ণমুদ্রার কথা রাখুন। আমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া থাকেন, পরে বুঝিয়া লইবেন ; সে জন্যে আমার তত ভাবনা নাই। কিন্তু, কর্ত্রী ঠাকুরাণী আজ কাল অতিশয় উগ্রচণ্ডা হইয়াছেন. তাঁহার ভয়েই আমি অস্থির হইতেছি। তিনি সত্বর আপনাকে বাটীতে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনারে লইয়া না গেলে আমার লাঞ্ছনার

একশেষ ঘটিবেক। অতএব, বিনয় করিয়া বলিতেছি, সত্বর গৃহে চলুন। তিনি ও তাঁহার ভগিনী নিতান্ত আকুল চিত্তে আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে দুরাত্মন্! তুমি পুনঃ পুনঃ কর্ত্রী ঠাকুরাণীর উল্লেখ করিতেছ; তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী কে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কিঙ্কর বলিল, কেন মহাশয়! আপনি কি জানেন না, আপনকার সহধর্ম্মিণীকে আমরা সকলেই কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিয়া থাকি; তিনি ভিন্ন আর কাহাকে কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিব? তিনিই আমায় আপনাকে গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আহারের সময় বহিয়া যাইতেছে। চিরঞ্জীব বলিলেন, নিঃসন্দেহ তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, নতুবা উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় কথা কহিতে না। আমি কবে কোন্ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি যে, তুমি বারংবার আমার সহধর্ম্মিণীর উল্লেখ করিতেছ। এখানে আমার বাটী কোথায় যে, আমায় বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ। কিঙ্কর শুনিয়া হাস্যমুখে বলিল, মহাশয়! যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আপনারই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; আপনিই উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় কথা কহিতেছেন; এ সকল কথা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কর্ণগোচর হইলে তিনি আপনাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিবেন; তখন, এখানে আপনকার বাটী আছে কি না, এবং কখনও কোনও কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন কি না, অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, আপনি হঠাৎ কেমন করিয়া এমন রসিক হইয়া উঠিলেন, বলুন। চিরঞ্জীব, আর সহ্য করিতে না পারিয়া, এই তোমার পাগলামির ফলভোগ কর এই বলিয়া, তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিঙ্কর হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, মহাশয়! অকারণে প্রহার করেন কেন; আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আপনকার ইচ্ছা হয়, বাটীতে যাইবেন, ইচ্ছা না হয়, না যাইবেন; যাঁহার কথায় আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলাম, তাঁহার নিকটেই চলিলাম।

ইহা বলিয়া কিঙ্কর প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, কোনও ধূর্ত্ত কৌশল করিয়া কিঙ্করের নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি হস্তগত করিয়াছে, তাহাতেই ভয়ে উহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; নতুবা পূর্ব্বাপর এত প্রলাপবাক্যের উচ্চারণ করিবেক কেন? প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কখনও এরূপ অসংবদ্ধ কথা বলে না; হয় ত হতভাগ্য উন্মাদগ্রস্ত হইল। সকলে বলে, জয়স্থলে ইন্দ্রজালিকবিদ্যা বিলক্ষণ প্রচলিত; এখানকার লোকে এরূপ প্রচ্ছন্ন বেশে চলে যে, উহাদিগকে কোনও মতে চিনিতে পারা যায় না; উহারা দুর্ব্বিগাহ মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া বৈদেশিক লোকের ধনে প্রাণে উচ্ছেদসাধন করে। শুনিতে পাই, এখানকার কামিনীরা নিতান্ত মায়াবিনী, বৈদেশিক পুরুষদিগকে অনায়াসে মুগ্ধ করিয়া ফেলে; এক বার মোহজালে বদ্ধ হইলে আর নিস্তার নাই। আমি এখানে আসিয়া ভাল করি নাই; শীঘ্র পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। আর আমার নগরদর্শনের আমোদে কাজ নাই;

পান্থনিবাসে যাই, এবং যাহাতে অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারি, তাহার উদ্যোগ করি। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নহে।

চিরঞ্জীব, এই বলিয়া নগরদর্শনকৌতুকে বিসর্জন দিয়া, আকুল মনে সত্বর গমনে পান্থনিবাসের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিঙ্করকে চিরঞ্জীবের অন্বেষণে প্রেরণ করিয়া চন্দ্রপ্রভা স্বীয় সহোদরাকে বলিতে লাগিলেন, বিলাসিনী! দেখ, প্রায় চারি দণ্ড হইল কিঙ্করকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছি; না এ পর্যন্ত তিনিই আসিলেন, না কিঙ্করই ফিরিয়া আসিল, ইহার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিলাসিনী বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, কোনও স্থানে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তথায় আহার করিয়াছেন। অতএব আর তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিবার প্রয়োজন নাই; চল, আমরা আহার করি। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আর, তোমায় একটি কথা বলি, তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইলে তুমি এত বিষণ্ণ হও কেন, এবং কি জন্যই বা এত আক্ষেপ কর? পুরুষেরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ; স্ত্রীজাতিকে তাঁহাদের অনুবর্তিনী হইয়া চলিতে হয়। পুরুষজাতির রোষের বা অসন্তোষের ভয়ে স্ত্রীজাতিকে যত সঙ্কুচিত ও যত সাবধান হইয়া সংসারধর্ম করিতে হয়; পুরুষজাতিকে যদি সে রূপে চলিতে হইত, তাহা হইলে স্ত্রীজাতির সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। স্ত্রীজাতি নিতান্ত পরাধীন; সুতরাং তাহাদিগকে অনেক সহ্য করিয়া কালহরণ করিতে হয়। তাহাদের অভিমান করা বৃথা।

শুনিয়া সাতিশয় রোষবশা হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতির স্বাতন্ত্র্য অধিক হইবেক কেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই সমান স্বাতন্ত্র্য আছে; সে বিষয়ে ইতরবিশেষ হইবার কোনও কারণ নাই। তিনি আপন ইচ্ছামতে চলিবেন, আমি আপন ইচ্ছামতে চলিতে পারিব না কেন। বিলাসিনী বলিলেন, কারণ, তাঁহার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার বন্ধনশৃঙ্খলাস্বরূপ। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, গো গর্দভ ব্যতিরিক্ত কে ওরূপ শৃঙ্খলাবন্ধন সহ্য করিবেক? বিলাসিনী বলিলেন, দিদি! তুমি না বুঝিয়া এরূপ উদ্ধত ভাবে কথা কহিতেছ। স্ত্রীজাতির অসদৃশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পরিণামে নিরতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে। জলে, স্থলে, নভোমণ্ডলে, যেখানে দৃষ্টিপাত কর, স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাইবে না; কি জলচর, কি স্থলচর, কি নভশ্চর, জীবমাত্রেই এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকে।

এই সকল কথা শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর সস্মিত বদনে পরিহাসবচনে বলিলেন, এই পরাধীনতার ভয়েই বুঝি তুমি বিবাহ করিতে চাও না। বিলাসিনীও হাস্যমুখে উত্তর দিলেন, হাঁ, ও এক কারণ বটে;

তদ্ভিন্ন, বিবাহিত অবস্থায় অন্যবিধ নানা অসুবিধা আছে। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার বোধ হয়, তুমি বিবাহিতা হইলে পুরুষের আধিপত্য ও অত্যাচার অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবে। বিলাসিনী বলিলেন, পুরুষের অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিতে বিলক্ষণ রূপে অভ্যাস না করিয়া আমি বিবাহ করিব না। চন্দ্রপ্রভা শুনিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, ভগিনি! যত অভ্যাস কর না কেন, কখনই অবিরক্ত চিত্তে সংসারধর্ম সম্পন্ন করিতে পারিবে না। পুরুষের পদে পদে অত্যাচার ; কত সহ্য করিবে, বল। তুমি পুরুষের আচরণের বিষয় সবিশেষ জান না এজন্য ওরূপ বলিতেছ ; যখন ঠেকিবে, তখন শিখিবে ; এখন মুখে ওরূপ বলিলে কি হইবেক। বিশেষতঃ, পরের বেলায় আমরা উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু ; আপনার বেলায় বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে ; তখন বিবেচনাও থাকে না, সহিষ্ণুতাও থাকে না। তুমি এখন আমায় ধৈর্য অবলম্বন করিতে বলিতেছ ; কিন্তু যদি কখনও বিবাহ কর, আমার মত অবস্থায় কত ধৈর্য অবলম্বন করিয়া চল, দেখিব।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কিঙ্কর বিষণ্ণ বদনে তাঁহাদের সম্মুখবর্তী হইল। চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঙ্কর! তুমি যে একাকী আসিলে ; তোমার প্রভু কোথায়। তাঁহার দেখা পাইয়াছ কি না ; কত ক্ষণে গৃহে আসিবেন, বলিলেন। কিঙ্কর বলিল, মা ঠাকুরাণি! আমার বলিতে শঙ্কা হইতেছে, কিন্তু না বলিলে নয়, এজন্য বলিতেছি। আমি তাঁহাকে যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইল, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে ; তাঁহাতে উন্মাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আমি বলিলাম, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আদেশে আমি আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, ত্বরায় গৃহে চলুন, আহারের সময় বহিয়া যাইতেছে। তিনি আমায় দেখিয়া বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিয়া আসিলে। পরে, আমি যত গৃহে আসিতে বলি, তিনি ততই বিরক্ত হইতে লাগিলেন, এবং, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায়, বারংবার কেবল এই কথা বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আপনি এ পর্যন্ত গৃহে না যাওয়াতে কর্ত্রী ঠাকুরাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া বলিলেন, তুই কর্ত্রী ঠাকুরাণী কোথায় পাইলি ? আমি তোর কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে চিনি না ; আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিলি, বল্।

এই কথা শুনিয়া, চকিত হইয়া, বিলাসিনী জিজ্ঞাসিলেন, কিঙ্কর! এ কথা কে বলিল ? কিঙ্কর বলিল, কেন, আমার প্রভু বলিলেন ; তিনি আরও বলিলেন, আমার বাটী কোথায়, আমার স্ত্রী কোথায়, আমি কবে বিবাহ করিয়াছি যে, কথায় কথায় আমার স্ত্রীর উল্লেখ করিতেছিস্। অবশেষে, কি কারণে বলিতে পারি না, ক্রোধে অন্ধ হইয়া আমায় প্রহার করিলেন। এই বলিয়া সে স্বীয় কর্ণমূলে মুষ্টিপ্রহারের চিহ্ন দেখাইতে লাগিল। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি পুনরায় যাও, এবং যেরূপে পার তাঁহারে অবিলম্বে গৃহে লইয়া আইস। সে বলিল, আমি পুনরায় যাইব এবং পুনরায় মার খাইয়া গৃহে আসিব। বলিতে কি, আমি আর মার খাইতে পারিব না ;

আপনি আর কাহাকেও পাঠাইয়া দেন। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, যদি তুমি না যাও, আমি তোমায় বিলক্ষণ শিক্ষা দিব ; যদি ভাল চাও, এখনই চলিয়া যাও। কিঙ্কর বলিল, আপনি প্রহার করিয়া এখান হইতে তাড়াইবেন ; তিনি প্রহার করিয়া সেখান হইতে তাড়াইবেন ; আমার উভয় সঙ্কট, কোনও দিকেই নিস্তার নাই।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেলে পর, চন্দ্রপ্রভা ঈর্ষাকষায়িত লোচনে সরোষ বচনে বলিতে লাগিলেন, বিলাসিনি! তোমার ভগিনীপতির কথা শুনিলে। এত ক্ষণ আমায় কত বুঝাইতেছিলে, এখন কি বল। শুনিলে ত, তাঁহার বাটী নাই, তাঁহার স্ত্রী নাই, তিনি বিবাহ করেন নাই। আমি কিঙ্করকে পাঠাইয়াছিলাম, অকারণে তাহাকে প্রহার করা আমার উপর অবজ্ঞাপ্রদর্শনমাত্র। আমি ইদানীং তাঁহার চক্ষের শূল হইয়াছি। আমরা তাঁহার প্রতীক্ষায় এত বেলা পর্যন্ত অনাহারে রহিয়াছি ; তিনি অন্যত্র আমোদে কাল কাটাইতেছেন। তুমি যা বল, এখন তাঁহার উপর আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হয়। আমি তাঁহার নিকট কি অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমি কিছু তত রূপহীন বা গুণহীন নই যে, তিনি আমার প্রতি এত ঘৃণাপ্রদর্শন করিতে পারেন। অথবা কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।

ভগিনীর ভাবদর্শন করিয়া বিলাসিনী বলিলেন, দিদি! ঈর্ষা স্ত্রীলোকের অতি বিষম শত্রু। ঈর্ষার বশবর্তিনী হইলে স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন দুঃখভাগিনী হইতে হয় ; অতএব এরূপ শত্রুকে অন্তঃকরণ হইতে এক বারে অপসারিত কর। এই কথা শুনিয়া যার পর নাই বিরক্ত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, বিলাসিনি! ক্ষমা কর, আর তোমার আমায় বুঝাইতে হইবেক না ; এত অত্যাচার সহ্য করা আমার কর্ম নয়। আমি তত নিরভিমান হইতে পারিব না যে, তাঁহার এরূপ আচরণ দেখিয়াও আমার মনে অসুখ জন্মিবেক না। ভাল, বল দেখি, যদি আমার প্রতি পূর্বের মত অনুরাগ থাকিত, তিনি কি এত ক্ষণ গৃহে আসিতেন না ; অকারণে কিঙ্করকে প্রহার করিয়া বিদায় করিতেন ? তুমি ত জান, আজ কত দিন হইল এক ছড়া হার গড়াইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। সেই অবধি আর কখনও তাঁহার মুখে হারের কথা শুনিয়াছ ? বলিতে কি, এত হতাদর হইয়া বাঁচা অপেক্ষা মরা ভাল। যেরূপ হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর যেরূপ হইবেক, তাহাতে আমার অদৃষ্টে কত কষ্টভোগ আছে বলিতে পারি না।

হেমকূটের চিরঞ্জীব, আকুল হৃদয়ে পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া, তথাকার অধ্যক্ষকে কিঙ্করের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রায় চারি দণ্ড হইল, সে এখানে আসিয়াছে, এবং, আপনি তাহার হস্তে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, তাহা সিন্ধুকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পরে অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বিলম্ব দেখিয়া সে এইমাত্র আপনকার অন্বেষণে গেল। এই কথা শুনিয়া সংশয়ারূঢ় হইয়া চিরঞ্জীব মনে মনে

বলিতে লাগিলেন, অধ্যক্ষ যেরূপ বলিলেন, তাহাতে আমি স্বর্ণমুদ্রা সহিত কিঙ্করকে আপণ হইতে বিদায় করিলে পর, তাহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ বা কথোপকথন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু আমি তাহার সহিত কথোপকথন করিয়াছি, এবং অবশেষে প্রহার পর্যন্ত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। অধ্যক্ষ বলিতেছেন, সে এইমাত্র পান্থনিবাস হইতে নির্গত হইয়াছে; এ কিরূপ হইল বুঝিতে পারিতেছি না। মনো-মধ্যে তিনি এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে হেমকূটের কিঙ্কর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন কিঙ্কর! তোমার পরিহাসপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি পাইয়াছে, অথবা সেইরূপই রহিয়াছে। তুমি মার খাইতে বড় ভাল বাস; অতএব আমার ইচ্ছা, তুমি আর খানিক আমার সঙ্গে পরিহাস কর। কেমন, আজ আমি তোমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দি নাই, তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী আমায় লইয়া যাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন, জয়স্থলে আমার বাস। তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, নতুবা পাগলের মত আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে না। কিঙ্কর শুনিয়া চকিত হইয়া বলিল, সে কি মহাশয়! আমি কখন আপনকার নিকট ও সকল কথা বলিলাম? চিরঞ্জীব বলিলেন, কিছু পূর্বে, বোধ হয় এখনও আধ ঘণ্টা হয় নাই। কিঙ্কর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, আপনি স্বর্ণমুদ্রার থলি আমার হস্তে দিয়া এখানে পাঠাইলে পর, কই আপনকার সঙ্গে ত আর আমার দেখা হয় নাই। চিরঞ্জীব অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন, দুরাত্মন্! আর আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, বটে; তুমি বারংবার বলিতে লাগিলে, আপনি আমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দেন নাই, কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়াছেন, তিনি ও তাঁহার ভগিনী আপনকার অপেক্ষায় রহিয়াছেন, আহার করিতে পারিতেছেন না। পরিশেষে, সাতিশয় রোষাক্রান্ত হইয়া আমি তোমাকে প্রহার করিলাম।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কিঙ্কর কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অবশেষে চিরঞ্জীব কৌতুক করিতেছেন বিবেচনা করিয়া বলিল, মহাশয়! এত দিনের পর আপনকার যে পরিহাসে প্রবৃত্তি হইয়াছে, ইহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু এ সময়ে এরূপ পরিহাস করিতেছেন কেন তাহার মর্ম বুঝিতে পারিতেছি না; অনুগ্রহ করিয়া তাহার কারণ বলিলে আমার সন্দেহ দূর হয়। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি পরিহাস করিতেছি, না তুমি পরিহাস করিতেছ; আজ তোমার দুর্মতি ঘটিয়াছে; তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত করিয়াছ, এখন আবার বলিতেছ, আমি পরিহাস করিতেছি। এই তোমার দুর্মতির ফলভোগ কর। এই বলিয়া তিনি ক্রোধভরে বারংবার বিলক্ষণ প্রহার করিলেন।

এইরূপে প্রহার প্রাপ্ত হইয়া কিঙ্কর বলিল, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি আমায় এত প্রহার করিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার কোনও অপরাধ নাই; সকল অপরাধ আমার। ভৃত্যের সহিত প্রভুর যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা না

করিয়া আমি যে তোমার সঙ্গে সৌহৃদ্যভাবে কথা কই, এবং সময়ে সময়ে তোমার পরিহাস শুনিতে ভাল বাসি, তাহাতেই তোমার এত আস্পর্ধা বাড়িয়াছে। তোমার সময় অসময় বিবেচনা নাই। যদি আমার নিকট পরিহাস করিবার ইচ্ছা থাকে, আমি কখন কি ভাবে থাকি তাহা জান ও তদনুসারে চলিতে আরম্ভ কর, নতুবা প্রহার দ্বারা তোমার পরিহাসরোগের শান্তি করিব। কিঙ্কর বলিল, আপনি প্রভু, প্রহার করিলেন, করুন, আমি দাস, অনায়াসে সহ্য করিলাম; কিন্তু কি কারণে প্রহার করিলেন তাহা না বলিলে কিছুতেই ছাড়িব না। চিরঞ্জীব এই সময়ে দুটি ভদ্র স্ত্রীলোককে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, অরে নির্বোধ! স্থির হও, এখন আর ও সকল কথা কহিও না; দুটি ভদ্রবংশের স্ত্রীলোক বোধ হয় আমার নিকটেই আসিতেছেন।

জয়স্থলের কিঙ্কর সত্বর প্রতিগমন না করাতে, চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত অধৈর্য হইয়া ভগিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় পতি চিরঞ্জীবের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন। ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া তিনি হেমকূটের চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে জয়স্থলের চিরঞ্জীব ও কিঙ্কর স্থির করিয়া নিকটবর্তিনী হইলেন। হেমকূটের চিরঞ্জীব ইতঃপূর্বেই স্বীয় ভৃত্য কিঙ্করের উপর অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে বিলক্ষণ যত্ন পাইলেন, তথাপি তদীয় উগ্রভাবের এক বারে তিরোভাব হইল না। চন্দ্রপ্রভা তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, নাথ! আমায় দেখিলেই তোমার ভাবান্তর উপস্থিত হয়; তোমার বদনে রোষ ও অসন্তোষ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যাহারে দেখিলে সুখোদয় হয়, তাহার নিকটে কিছু এ ভাব অবলম্বন কর না। আমি এখন আর সে চন্দ্রপ্রভা নই, তোমার পরিণীতা বনিতাও নই। পূর্বে, আমি কথা কহিলে তোমার কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইত; আমি দৃষ্টিপাত করিলে তোমার নয়নযুগল প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইত; আমি স্পর্শ করিলে তোমার সর্ব শরীর পুলকিত হইত; আমি হস্তে করিয়া না দিলে উপাদেয় আহারসামগ্রীও তোমার সুস্বাদ বোধ হইত না। তখন আমা বই আর জানিতে না। আমি ক্ষণ কাল নয়নের অন্তরাল হইলে দশ দিক শূন্য দেখিতে। এখন সে সব দিন গত হইয়াছে। কি কারণে এ বিসদৃশ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, বল। আমার নিতান্ত তোমাগত প্রাণ; তুমি বই এ সংসারে আমার আর কে আছে। তুমি এত নিদয় হইলে আমি কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। বিলাসিনীকে জিজ্ঞাসা কর, ইদানীং আমি কেমন মনের সুখে আছি। দুর্ভাবনায় শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, আমার উপর তোমার আর সে অনুরাগ নাই। যাহার ভাগ্য ভাল, এখন সে তোমার অনুরাগভাজন হইয়াছে। আমি দেখিয়া শুনিয়া জীবন্মৃত হইয়া আছি। দেখ, আর নিদয় হইও না; আর আমায় মর্মান্তিক যাতনা দিও না। বিবেচনা কর, কেবল আমিই যে যন্ত্রণাভোগ করিব, এরূপ নহে; এ সকল কথা ব্যক্ত হইলে তুমিও ভদ্রসমাজে হেয় হইবে।

চন্দ্রপ্রভার আক্ষেপ ও অনুযোগ শ্রবণগোচর করিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব হতবুদ্ধি হইলেন, এবং, কি কারণে অপরিচিত ব্যক্তিকে পতিসম্ভাষণ ও পতিকৃত অনুচিত আচরণের আরোপণপূর্বক, ভর্ৎসনা করিতেছে, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিছু বলা আবশ্যক, নিতান্ত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা বিধেয় নহে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি বিস্ময়াকুল লোচনে মৃদু বচনে বলিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি। আমি বৈদেশিক ব্যক্তি, জয়স্থলে আমার বাস নয়; এই সর্বপ্রথম এ স্থানে আসিয়াছি, তাহাও চারি পাঁচ দণ্ডের অধিক নহে; ইহার পূর্বে আমি আর কখনও তোমায় দেখি নাই; তুমি আমায় লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা বলিলে, তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। বিলাসিনী শুনিয়া আশ্চর্যজ্ঞান করিয়া বলিলেন, ও কি হে, তুমি যে আমায় এক বারে অবাক্ করিয়া দিলে। হঠাৎ তোমার মনের ভাব এত বিপরীত হইল কেন? যা হউক ভাই। ইতঃপূর্বে আর কখনও দিদির উপর তোমার এ ভাব দেখি নাই। দিদির অপরাধ কি? আহারের সময় বহিয়া যায়, এজন্য কিঙ্করকে তোমায় ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন।

এই কথা বলিবামাত্র চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্করকে! কিঙ্করও চকিত হইয়া বলিল, কি আমাকে! তখন চন্দ্রপ্রভা কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ তোমাকে। তুমি উঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া বলিলে, তিনি প্রহার করিলেন; বলিলেন, আমার বাটী নাই, আমার স্ত্রী নাই; এখন আবার, যেন কিছুই জান না, এইরূপ ভান করিতেছ। চিরঞ্জীব শুনিয়া ঈষৎ কুপিত হইয়া কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি এই স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলে? সে বলিল, না মহাশয়। আমি উঁহার সঙ্গে কখন কথা কহিলাম? কথা কহা দূরে থাকুক, ইহার পূর্বে আমি উঁহারে কখনও দেখি নাই। চিরঞ্জীব বলিলেন, দুরাত্মন্। তুমি মিথ্যা বলিতেছ; উনি যে সকল কথা বলিতেছেন, তুমি আপণে গিয়া আমার নিকট অবিকল ঐ সকল কথা বলিয়াছিলে। সে বলিল, না মহাশয়! আমি কখনও বলি নাই; জন্মাবচ্ছিন্নে আমি উঁহার সহিত কথা কই নাই। চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার সঙ্গে যদি দেখা ও কথা না হইবেক, উনি কেমন করিয়া আমাদের নাম জানিলেন।

চন্দ্রপ্রভা, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের ও কিঙ্করের কথোপকথনশ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া, আক্ষেপবচনে বলিতে লাগিলেন, নাথ। যদিই আমার উপর বিরাগ জন্মিয়া থাকে, চাকরের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এরূপে অপমান করা উচিত নহে। আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, এরূপ ছল করিয়া আমার এত লাঞ্ছনা করিতেছ। তুমি কখনই আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তুমি যা ভাব না কেন, আমি তোমা বই আর জানি না; যাবৎ এ দেহে প্রাণ থাকিবেক, তাবৎ আমি তোমার বই আর কারও নই। আমি জীবিত থাকিতে তুমি কখনও অন্যের হইতে পারিবে না। তুমি দিবাকর, আমি কমলিনী; তুমি শশধর, আমি কুমুদিনী; তুমি জলধর, আমি সৌদামনী।

তুমি পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও আমি তোমায় ছাড়িব না। অতএব, আর কেন, গৃহে চল ; কেন অনর্থক লোক হাসাইবে, বল।

এই সকল কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ কি বিপদ্ উপস্থিত ! কেহ কখনও এমন বিপদে পড়ে না। এ ত পতিজ্ঞানে আমায় সম্ভাষণ করিতেছে। যেরূপ ভাবভঙ্গী দেখিতেছি, তাহাতে বৈদেশিক লোক পাইয়া পরিহাস করিতেছে, সেরূপও প্রতীতি হইতেছে না। আকার প্রকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এ সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা, সামান্যা কামিনী নহে। আমি নিতান্ত অপরিচিত বৈদেশিক ব্যক্তি, আমায় পতিজ্ঞানে সম্ভাষণ করে কেন ? আমি কি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি, অথবা ভূতাবেশবশতঃ আমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই এরূপ দেখিতেছি ও শুনিতেছি। যাহা হউক, কোনও অনির্ণীত হেতুবশতঃ আমার দর্শন-শক্তির ও শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। এখন কি উপায়ে এ বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাই ?

এই সময়ে বিলাসিনী কিঙ্করকে বলিলেন, তুমি সত্বর বাটীতে গিয়া ভৃত্যদিগকে সমস্ত প্রস্তুত করিতে বল, আমরা বাটীতে গিয়াই আহার করিতে বসিব। তখন কিঙ্কর চিরঞ্জীবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্থির লোচনে আকুল বচনে বলিতে লাগিল, মহাশয় ! আপনি সবিশেষ না জানিয়া কোথায় আসিয়াছেন ? এ বড় সহজ স্থান নহে। এখানকার সকলই মায়া, সকলই ইন্দ্রজাল। আমরা সহজে নিষ্কৃতি পাইব বোধ হয় না। যে রঙ্গ দেখিতেছি, প্রাণ বাঁচাইয়া দেশে যাইব, আমার আর সে আশা নাই। এই মানবরূপিণী ঠাকুরাণীরা যেরূপ মায়াবিনা, তাহাতে ইঁহাদের হস্ত হইতে সহজে নিস্তার পাইবেন, মনে করিবেন না। কি অশুভ ক্ষণেই এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যেরূপ দেখিতেছি, ইঁহাদের মতের অনুবর্তী হইয়া না চলিলে নিঃসংশয় প্রাণসংশয় ঘটিবেক। অতএব এমন স্থলে কি কর্তব্য, স্থির করুন। কিঙ্করের এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিলাসিনী বলিলেন, অহে কিঙ্কর ! তোমার পরিহাসের অনেক কৌশল আইসে, তাহা আমরা বহু দিন অবধি জানি, আর তোমার সে বিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইতে হইবেক না ; আমরা বড় আপ্যায়িত হইয়াছি। এক্ষণে ক্ষান্ত হও, যা বলি, তা শুন। শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কিঙ্কর চিরঞ্জীবকে বলিল, মহাশয় ! আমার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে ; এখন কি করিবেন, করুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, কেবল তোমার নয়, আমিও দেখিয়া শুনিয়া তোমার মত হতবুদ্ধি হইয়াছি। তখন চন্দ্রপ্রভা, চিরঞ্জীবের হস্তে ধরিয়া, আর কেন, গৃহে চল ; চাকর মনিবে মন্ত্রণা করিয়া আজ আমার যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিলে। সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, আর বিলম্বে কাজ নাই। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলপূর্বক গৃহে লইয়া চলিলেন। চিরঞ্জীব, অয়স্কান্তে আকৃষ্ট লোহের ন্যায় নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, আপত্তি বা অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিতে পারিলেন না। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাটীতে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা কিঙ্করকে বলিলেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখ ; যদি কেহ তোমার প্রভুর

অনুসন্ধান করে, বলিবে. আজ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেক না ; এবং যে কেহ হউক না, কাহাকেও কোনও কারণে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। অনন্তর চিরঞ্জীবকে বলিলেন, নাথ ! আজ আমি তোমায় আর বাড়ীর বাহির হইতে দিব না ; তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। চিরঞ্জীব দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আজ আমার অদৃষ্টে এ কি ঘটিল। আমি পৃথিবীতে আছি, কি স্বর্গে রহিয়াছি ; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত রহিয়াছি ; প্রকৃতিস্থ আছি, কি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি ; কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে কি করি ; অথবা ইহাদের অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলি, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবেক। তাঁহাকে বাটীর অভ্যন্তরে যাইতে দেখিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয় ! আমি কি দ্বারদেশে বসিয়া থাকিব ? চিরঞ্জীব কোনও উত্তর দিলেন না। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, দেখিও যেন কেহ বাটীতে প্রবেশ করিতে না পায় ; ইহার অন্যথা হইলে আমি তোমার যৎপরোনাস্তি শাস্তি করিব। এই বলিয়া চিরঞ্জীবকে লইয়া তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জয়স্থলবাসী কিঙ্কর. চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে দ্বিতীয় বার স্বীয় প্রভুর অন্বেষণে নির্গত হইয়া, বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের বিপণিতে তাঁহার দর্শন পাইল এবং বলিল, মহাশয় ! এখনও কি আপনকার ক্ষুধাবোধ হয় নাই ; সত্বর বাটীতে চলুন ; কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনকার জন্য অস্থির হইয়াছেন। আপনি ইতঃপূর্বে সাক্ষাৎকালে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, এবং অকারণে আমায় যে প্রহার করিয়াছিলেন, আমি সে সমস্ত তাঁহার নিকটে বলিয়াছি। শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, আজ কখন তোমার সঙ্গে দেখা হইল, কখন বা তোমায় কি কথা বলিলাম, এবং কখনই বা তোমায় প্রহার করিলাম ? সে যাহা হউক, গৃহিণীর নিকট কি কথা বলিয়াছ, বল। সে বলিল, কেন, আপনি বলিয়াছিলেন, আমি কোথায় যাইব, আমার বাটী নাই, আমি বিবাহ করি নাই, আমার স্ত্রী নাই। এই সকল কথা আমি তাঁহার নিকটে বলিয়াছি। তৎপরে তিনি পুনরায় আমায় আপনকার নিকটে পাঠাইলেন ; বলিয়া দিলেন, যেরূপে পার তাঁহাকে সত্বর বাটীতে লইয়া আইস।

শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ ! তুমি কোথায় এমন মাতলামি শিখিয়াছ ? কতকগুলি কল্পিত কথা শুনাইয়া অকারণে তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছ। তোমার এরূপ করিবার তাৎপর্য কি, বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সঙ্গে দেখা নাই, অথচ আমার নাম করিয়া তুমি তাঁহার নিকট এই সকল কথা বলিয়াছ। কিঙ্কর বলিল, আমি তাঁহাকে একটিও অলীক কথা শুনাই নাই, আপনি সাক্ষাৎকালে যাহা বলিয়াছেন ও যাহা করিয়াছেন, আমি তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলি নাই। আপনি যখন যাহাতে সুবিধা দেখেন, তাহাই বলেন, তাহাই করেন। আপনি আমায় যে প্রহার করিয়াছেন, কর্ণমূলে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। এখন কি

প্রহার পর্যন্ত অপলাপ করিতে চাহেন ? চিরঞ্জীব ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, তোমায় আর কি বলিব, তুমি গর্দভ। কিঙ্কর বলিল, তাহার সন্দেহ কি ? গর্দভ না হইলে এত প্রহার সহ্য করিতে পারিব কেন? গর্দভ প্রহৃত হইলে নিরুপায় হইয়া পদপ্রহার করে ; অতঃপর আমিও সেই পথ অবলম্বন করিব ; তাহা হইলে আপনি সতর্ক হইবেন, আর কথায় কথায় আমায় প্রহার করিতে চাহিবেন না।

চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া তাহার কথার আর উত্তর না দিয়া বসুপ্রিয় স্বর্ণকারকে বলিলেন, দেখ, আমার গৃহপ্রতিগমনে বিলম্ব হইলে গৃহিণী অত্যন্ত আক্ষেপ ও বিরক্তিপ্রকাশ করেন, এবং নানাবিধ সন্দেহ করিয়া আমার সহিত বিবাদ ও বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। অতএব, তুমি সঙ্গে চল ; তাঁহার নিকটে বলিবে, তাঁহার জন্যে যে হার গড়িতেছ, তাহা এই সময়ে প্রস্তুত হইবার কথা ছিল ; প্রস্তুত হইলেই লইয়া যাইব এই আশায় আমি তোমার বিপণিতে বসিয়া ছিলাম ; কিন্তু এ বেলা প্রস্তুত হইয়া উঠিল না ; সায়ংকালে নিঃসন্দেহ প্রস্তুত হইবেক, এবং কল্য প্রাতে তুমি তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবে। তাঁহাকে এই কথা বলিয়া সন্নিহিত রত্নদত্ত শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, আপনিও চলুন, আজ সকলে এক সঙ্গে আহার করিব ; অনেক দিন আপনি আমার বাটীতে আহার করেন নাই। রত্নদত্ত ও বসুপ্রিয় সম্মত হইলেন ; চিরঞ্জীব উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় ভবনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাটীর সন্নিকৃষ্ট হইয়া চিরঞ্জীব দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে ; তখন কিঙ্করকে বলিলেন, তুমি অগ্রসর হইয়া আমাদের পঁহুছিবার পূর্বে দ্বার খুলাইয়া রাখ। কিঙ্কর সত্বর গমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া অপরাপর ভৃত্যদিগের নামগ্রহণপূর্বক দ্বার খুলিয়া দিতে বলিল। চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে হেমকূটবাসী কিঙ্কর ঐ সময়ে দ্বারবানের কার্যসম্পাদন করিতেছিল ; সে বলিল, তুমি কে, কি জন্যে দ্বার খুলিতে বলিতেছ ; গৃহস্বামিনী যেরূপ অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে আমি কখনই দ্বার খুলিব না, এবং কাহাকেও বাটীতে প্রবেশ করিতে দিব না। অতএব তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও ; আর ইচ্ছা হয়, রাস্তায় বসিয়া রোদন কর। এইরূপ উদ্ধত ও অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, তুই কে, কোথাকার লোক, তোর কেমন আচরণ ? প্রভু, পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তুই দ্বার খুলিয়া দিবি না। হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, তোমার প্রভুকে বল, তিনি যেখান হইতে আসিয়াছেন, সেইখানে ফিরিয়া যান। আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে এ বাটীতে প্রবেশ করিতে দিব না।

কিঙ্করের কথায় দ্বার খুলিল না দেখিয়া, চিরঞ্জীব বলিলেন, কে ও বাটীর ভিতরে কথা কও হে, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও। পরিহাসপ্রিয় হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, আমি কখন দ্বার খুলিয়া দিব, তাহা আমি আপনাকে পরে বলিব ; আপনি কি জন্যে দ্বার খুলিতে বলিতেছেন, তাহা আমায় আগে বলুন। চিরঞ্জীব

বলিলেন, আহারের জন্যে ; আজ এ পর্যন্ত আমার আহার হয় নাই। কিঙ্কর বলিল, এখন এখানে আপনকার আহারের কোনও সুবিধা নাই ; ইচ্ছা হয় পরে কোনও সময়ে আসিবেন। তখন চিরঞ্জীব কোপান্বিত হইয়া বলিলেন, তুমি কে হে, যে আমায় আমার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছ না। কিঙ্কর বলিল, আমি এই সময়ের জন্য দ্বাররক্ষার ভার পাইয়াছি, আমার নাম কিঙ্কর। এই কথা শুনিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, অরে দুরাত্মন্! তুই আমার নাম ও পদ উভয়েরই অপহরণ করিয়াছিস, যদি ভাল চাহিস, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দে, প্রভু কত ক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া থাকিবেন ? হেমকূটবাসী কিঙ্কর তথাপি দ্বার খুলিয়া দিল না। তখন জয়স্থলবাসী কিঙ্কর স্বীয় প্রভুকে বলিল, মহাশয়! আজ ভাল লক্ষণ দেখিতেছি না ; সহজে দ্বার খুলিয়া দেয় এরূপ বোধ হয় না। ধাক্কা মারিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলুন, আর কত ক্ষণ এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন ? বিশেষতঃ, আপনকার নিমন্ত্রিত এই দুই মহাশয়ের অতিশয় কষ্ট হইতেছে।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা অভ্যন্তর হইতে বলিলেন, কিঙ্কর! ওরা সব কে, কি জন্যে দরজায় জমা হইয়া গোল করিতেছে ? হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, ঠাকুরাণি! গোলের কথা কেন বলেন, আপনাদের এই নগরটি উচ্ছৃঙ্খল লোকে পরিপূর্ণ ; এখানে গোলের অপ্রতুল কি। চন্দ্রপ্রভার স্বর শুনিতে পাইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, বলি, গিন্নি! আজকার এ কি কাণ্ড ? এই কথা শুনিবামাত্র চন্দ্রপ্রভা কোপে জ্বলিত হইয়া বলিলেন, তুই কোথাকার হতভাগা, দূর হয়ে যা, দরজার কাছে গোল করিস না, লক্ষ্মীছাড়ার আস্পর্ধা দেখ না, রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমায় গিন্নি বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! বড় লজ্জার কথা, এঁরা দুজন দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা দরজা খুলাইতে পারিলাম না। যাহাতে শীঘ্র খুলিয়া দেয়, তাহার কোনও উপায় করুন। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! আমি দেখিয়া শুনিয়া এক বারে হতবুদ্ধি হইয়াছি, আজকার কাণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন কিঙ্কর বলিল, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই, দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, অতঃপর সেই পরামর্শই ভাল ; দরজা ভাঙ্গা বই আর উপায় দেখিতেছি না। যেখানে পাও, সত্বর দুই তিন খান কুঠার লইয়া আইস। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

এই সময়ে রত্নদত্ত বলিলেন, মহাশয়! ধৈর্য অবলম্বন করুন। কোনও ক্রমে দরজা ভাঙ্গা হইবেক না। যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে ক্রোধসংবরণ করা সহজ নয়। রক্তমাংসের শরীরে এত সহ্য হয় না। কিন্তু সংসারী ব্যক্তিকে অনেক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়। এখন আপনি ক্রোধভরে এক কর্ম করিবেন ; কিন্তু ক্রোধশান্তি হইলে যার পর নাই অনুতাপগ্রস্ত হইবেন। অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কোনও কর্ম করা পরামর্শসিদ্ধ নয়। যদি এই দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আপনি দ্বারভঙ্গে প্রবৃত্ত হন, রাজপথবাহী সমস্ত লোক সমবেত হইয়া কত কুতর্ক উপস্থিত করিবেক।

আপনকার কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবেক না। মানবজাতি নিরতিশয় কুৎসাপ্রিয়; লোকের কুৎসা করিবার নিমিত্ত কত অমূলক গল্পের কল্পনা করে, এবং কল্পিত গল্পের আকর্ষণী শক্তির সম্পাদনের নিমিত্ত উহাতে কত অলঙ্কার যোজিত করিয়া দেয়। যদি কোনও ব্যক্তির প্রশংসা করিবার সহস্র হেতু থাকে, অধিকাংশ লোকে ভুলিয়াও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে না; কিন্তু কুৎসা করিবার অণুমাত্র সোপান পাইলে মনের আমোদে সেই দিকে ধাবমান হয়। আপনি নিতান্ত অমায়িক; মনে ভাবেন কখনও কাহারও অপকার করেন নাই, যথাশক্তি সকলের হিতচেষ্টা করিয়া থাকেন; সুতরাং কেহ আপনকার বিপক্ষ ও বিদ্বেষী নাই; সকলেই আপনকার আত্মীয় ও হিতৈষী; কিন্তু আপনকার সে সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। আপনি প্রাণপণে যাঁহাদের উপকার করিয়াছেন, এবং যে সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আপনকার বিষম বিদ্বেষী। ঐ সকল ব্যক্তি আপনকার যার পর নাই কুৎসা করিয়া বেড়ান। আপনকার যথার্থ গুণগ্রাহী কতকগুলি নিরপেক্ষ লোক আছেন; তাঁহারা আপনকার দয়া সৌজন্য প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি অতি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন; এক্ষণে জয়স্থলে বিলক্ষণ মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছেন; এজন্য, যে সকল লোক সচরাচর ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই অন্তঃকরণ ঈর্ষারসে নিরতিশয় কলুষিত হইয়া আছে। তাঁহারা আপনকার অনুষ্ঠিত কর্মমাত্রেরই এক এক অভিসন্ধি বহিষ্কৃত করেন; আপনি কোনও কর্ম ধর্মবুদ্ধিতে করিয়া থাকেন, তাহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে দেন না। আমি অনেক বার অনেক স্থলে দেখিয়াছি, আপনকার অনুষ্ঠিত কর্মসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া কেহ প্রশংসা করিলে, তাঁহাদের নিতান্ত অসহ্য হয়; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তত্তৎ কর্মকে অসদভিসন্ধিপ্রযোজিত বা স্বার্থানুসন্ধানমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান; অবশেষে, যাহা কখনও সম্ভব নয় এরূপ গল্প তুলিয়া আপনকার নির্মল চরিতে কুৎসিত কলঙ্ক যোজিত করিয়া থাকেন। এমন স্থলে, কুৎসা করিবার এরূপ সোপান পাইলে ঐ সকল মহাত্মাদের আমোদের সীমা থাকিবেক না; তাঁহারা আপনারে একেবারে নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন। আর, আমরা আপনকার গৃহিণীকে বিলক্ষণ জানি। তিনি নির্বোধ নহেন। তিনি যে এ সময়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না, অবশ্যই ইহার বিশিষ্ট হেতু আছে; আপনি এখন তাহা জানেন না, পরে সাক্ষাৎ হইলে তিনি অবশ্যই আপনাকে বুঝাইয়া দিবেন। অতএব, আমার কথা শুনুন, আর এখানে দাঁড়াইয়া গোল করিবার প্রয়োজন নাই; চলুন, এ বেলা আমরা স্থানান্তরে গিয়া আহার করি। অপরাহ্ণে একাকী আসিয়া এই বিসদৃশ ঘটনার কারণানুসন্ধান করিবেন।

রত্নদত্তের কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর বলিলেন, আপনি সৎপরামর্শের কথাই বলিয়াছেন; ধৈর্য অবলম্বন করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই সর্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। যাহা বলিলেন, আমার

স্ত্রী কোনও ক্রমে নির্বোধ নহেন। কিন্তু তাঁহার একটি বিষম দোষ আছে। আমার বাটীতে আসিতে বিলম্ব হইলে তিনি নিতান্ত অস্থির ও উন্মত্তপ্রায় হন, এবং মনে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিয়া অকারণে আমার সঙ্গে কলহ করেন। আজ বিশেষতঃ কিঙ্কর তাঁহাকে অতিশয় রাগাইয়া দিয়াছে; তাহাতেই এই অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি। অনন্তর বসুপ্রিয়কে বলিলেন, বোধ করি এত ক্ষণে হার প্রস্তুত হইয়াছে; তুমি অবিলম্বে বাটীতে প্রতিগমন কর; আমি অপরাজিতার আবাসে থাকিব, হার লইয়া তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; দেখিও, যেন কোনও মতে বিলম্ব না হয়। ঐ হার আমি অপরাজিতাকে দিব, তাহা হইলেই গৃহিণী বিলক্ষণ শিক্ষা পাইবেন, এবং আর কখনও আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবেন না। বসুপ্রিয় বলিলেন, যত সত্বর পারি হার লইয়া সাক্ষাৎ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব ও রত্নগর্ভ অভিপ্রেত স্থানে গমন করিলেন।

এ দিকে, আহারের সময় হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব প্রায়ই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, চন্দ্রপ্রভা বা বিলাসিনীর কোনও কথার উত্তর দিলেন না; এবং, কোথায় আসিয়াছি, কি করিতেছি, অবশেষেই বা কি বিপদে পড়িব, এই দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া ভাল রূপে আহারও করিতে পারিলেন না। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া চন্দ্রপ্রভা স্থির করিলেন, তিনি তাঁহার প্রতি এক বারেই নির্মম ও অনুরাগশূন্য হইয়াছেন। তদনুসারে, তিনি শিরে করাঘাত ও রোদন করিতে করিতে, গৃহান্তরে প্রবেশপূর্বক ভূতলশায়িনী হইলেন। চিরঞ্জীব ব্যতিরিক্ত আর কেহ সেখানে নাই দেখিয়া বিলাসিনী তাঁহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, দেখ ভাই! তুমি তাঁহার স্বামী নও, তিনি তোমার স্ত্রী নন, বারংবার যে এই সকল কথা বলিতেছ, ইহার কারণ কি? তুমি এত বিরক্ত হইতে পার, আমি ত দিদির তেমন কোনও অপরাধ দেখিতেছি না। এই তোমাদের প্রণয়ের সময়; যাহাতে উত্তরোত্তর প্রণয়ের বৃদ্ধি হয়, উভয়েরই প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা উচিত। প্রণয়বর্ধনের কথা দূরে থাকুক, তুমি এক বারে পরিণয়ের অপলাপ পর্যন্ত করিতেছ। যদি কেবল ঐশ্বর্যের অনুরোধে দিদির পাণিগ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই ঐশ্বর্যের অনুরোধেই দিদির প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শিত করা উচিত। আজ তোমার যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে দিদির উপর তোমার যে কিছুমাত্র দয়া বা মমতা আছে, এরূপ বোধ হয় না। তুমি আমার স্ত্রী নও, আমি তোমার পতি নই, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করি নাই, বাটীর সকল লোকের সমক্ষে দিদির মুখের উপর এ সকল কথা বলা অত্যন্ত অন্যায়। স্বামীর মুখে এরূপ কথা শুনা অপেক্ষা, স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর আর কিছুই নাই। বলিতে কি, আজ তুমি দিদির সঙ্গে নিতান্ত ইতরের ব্যবহার করিতেছ। যদি মনে অনুরাগ না থাকে, মৌখিক প্রণয় ও সৌজন্য দেখাইবার হানি কি? তাহা হইলেও দিদির মন অনেক তুষ্ট থাকে। যা হউক, ভাই! আজ তুমি বড় ঢলাঢলি করিলে। স্ত্রী-পুরুষে এরূপ ঢলাঢলি করা কেবল লোক হাসান মাত্র। তোমার

আজকার আচরণ দেখিলে তুমি যেন সে লোক নও বোধ হয়। কি কারণে আজ এত বিরস বদনে রহিয়াছ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মুখ দেখিলে বোধ হয়, তোমার অন্তঃকরণ দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া আছে। এখন আমার কথা শুন, ঘরের ভিতরে গিয়া দিদির সান্ত্বনা কর। বলিবে, পূর্বে যাহা কিছু বলিয়াছি, সে সব পরিহাসমাত্র; তোমার মনের ভাবপরীক্ষা ভিন্ন তাহার আর কোন অভিসন্ধি নাই। যদি দুটা মিষ্ট কথা বলিলে তাঁহার অভিমান দূর হয় ও খেদনিবারণ হয়, তাহাতে তোমার আপত্তি কি?

বিলাসিনীর বচনবিন্যাস শ্রবণগোচর করিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, অয়ি চারুশীলে! আমি দেখিয়া শুনিয়া এক কালে হতজ্ঞান হইয়াছি; আমার বুদ্ধিস্ফূর্তি বা বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইতেছে না। তোমার কথার কি উত্তর দিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি যে পথে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এত ক্ষণ আমায় উপদেশ দিলে, আমি সে পথের পথিক নই; প্রাণান্তেও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। তোমরা দেবী কি মানবী, আমি এ পর্যন্ত তাহা স্থির করিতে পারি নাই; যদি দেবযোনিসম্ভবা হও, আমায় স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি দাও; তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতে পারি; নতুবা, এখন আমার যেরূপ বুদ্ধি ও যেরূপ প্রবৃত্তি আছে, তদনুসারে আমি কোনও ক্রমে পরকীয় মহিলার সংস্রবে যাইতে পারিব না। স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, তোমার ভগিনী আমার পত্নী নহেন, আমি কখনও উঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই। তিনি অধীরা হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন, সত্য বটে; কিন্তু, তাঁহার খেদাপনয়নের নিমিত্তে তুমি এত ক্ষণ আমায় যে উপদেশ দিলে, আমি প্রাণান্তেও তদনুযায়ী কার্য করিতে পারিব না। আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি, তুমি আর আমায় ওরূপ উপদেশ দিও না। যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে তিনি বিবাহিতা কামিনী। জানিয়া শুনিয়া কি রূপে অপকর্মে প্রবৃত্ত হই, বল। আমি অবিবাহিত পুরুষ; তুমিও অদ্যাপি অবিবাহিতা আছ, বোধ হইতেছে। যদি তোমার অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত কর; আমি সহধর্মিণীভাবে তোমার পরিগ্রহে প্রস্তুত আছি; প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পরস্পর যথাবিধি পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে প্রাণপণে তোমার সন্তোষসম্পাদনে যত্ন করিব, এবং যাবজ্জীবন তোমার মতের অনুবর্তী হইয়া চলিব। প্রেয়সি! বলিতে কি, তোমার রূপলাবণ্যদর্শনে ও বচনমাধুরীশ্রবণে আমার মন এমন মোহিত হইয়াছে যে, তোমার সম্মতি হইলে আমি এই দণ্ডে তোমার পাণিগ্রহণ করি। বিলাসিনী শুনিয়া চকিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমার প্রেয়সী নই, দিদি তোমার প্রেয়সী; তাঁহার প্রতি এই প্রিয়সম্ভাষণ করা উচিত। চিরঞ্জীব বলিলেন, যাহার প্রতি মনের অনুরাগ জন্মে, সেই প্রেয়সী; তোমার প্রতি আমার মন অনুরক্ত হইয়াছে, অতএব তুমিই আমার প্রেয়সী। তোমার দিদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? তিনি আমার প্রেয়সী নহেন। এই কথা শুনিয়া বিলাসিনী বলিলেন, বলিতে কি,

ভাই ! তুমি যথার্থই পাগল হয়েছ, নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে। ছি ছি ! কি লজ্জার কথা ; আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্ম-ঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি ; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন। তোমার যে ভাব দেখিতেছি, আমি একাকিনী আর তোমার নিকটে থাকিতে পারিব না।

এই বলিয়া বিলাসিনী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। হেমকূটের চিরঞ্জীব, হতবুদ্ধি হইয়া একাকী সেই স্থানে বসিয়া গালে হাত দিয়া, কতই ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হেমকূটবাসী কিঙ্কর উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া চিরঞ্জীবের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং আকুল বচনে বলিতে লাগিল, মহাশয় ! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, রক্ষা করুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, ব্যাপার কি, বল। সে বলিল, এ বাটীর কর্ত্রী ঠাকুরাণী যেরূপ, পরিচারিণীগুলিও অবিকল সেইরূপ চরিত্রের লোক। কর্ত্রী ঠাকুরাণী যেমন আপনাকে পতি বলিয়া অধিকার করিতে চাহেন, পাকশালায় যে পরিচারিণী আছে, সে আমাকে পতি বলিয়া অধিকার করিতে চাহে। সে আমার নাম জানে, আমার শরীরের কোন্ স্থানে কি চিহ্ন আছে, সমুদয় জানে। সে কি রূপে এ সমস্ত জানিতে পারিল, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। সে সহসা আমার নিকটে উপস্থিত হইল এবং প্রণয়সম্ভাষণপূর্বক বলিল, এখানে একাকী বসিয়া কি করিতেছ ? পাকশালায় আইস, আমোদ আহ্লাদ করিব। সে এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তাহার আকার প্রকার দেখিয়া আমার মনে এমন ভয় জন্মিল যে, আমি কোনও ক্রমে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। সে যেমন বিশ্রী, তেমনই স্থূলকায় ও দীর্ঘাকার। আমি আপনকার সঙ্গে অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, কিন্তু কখনও এমন ভয়ানক মূর্তি দেখি নাই ; আমার বোধ হয়, সে রাক্ষসী, মানুষী নয়। আমি যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু প্রাণান্তেও পাকশালায় প্রবিষ্ট হইতে পারিব না। অধিক কি বলিব, তাহার আকার প্রকার দেখিয়া আমার শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমি পাকশালায় যাইতে যত অসম্মত হইতে লাগিলাম, সে উত্তরোত্তর ততই উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অবশেষে পলাইয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছি ; যাহাতে আমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাই তাহা করুন।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর ! আমি কিরূপে তোমার নিস্তার করিব, বল ; আমার নিস্তার কে করে, তাহার ঠিকানা নাই। এ দেশের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড। পাকশালার পরিচারিণী কি রূপে তোমার নাম ও শরীরগত চিহ্ন সকল জানিতে পারিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, সত্বর পলায়ন ব্যতিরেকে নিস্তারের পথ নাই। তুমি এক মুহূর্তও বিলম্ব করিও না ; এখনই চলিয়া যাও এবং অনুসন্ধান করিয়া জান, আজ কোনও জাহাজ এখান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে কি না। তুমি এই সংবাদ লইয়া আপণে যাইবে, আমিও ইতিমধ্যে তথায়

উপস্থিত হইতেছি। অথবা বিলম্বের প্রয়োজন কি? এখন এখানে কেহ নাই, এক সঙ্গেই পলায়ন করা ভাল। এই বলিয়া চিরঞ্জীব কিঙ্কর সমভিব্যাহারে সেই ভবন হইতে বহির্গত হইলেন, এবং তাহাকে অর্ণবপোতের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দ্রুত পদে আপণ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বসুপ্রিয় স্বর্ণকার জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবের আদেশ অনুসারে হার আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে হার লইয়া তাঁহার নিকটে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বোধ করিয়া বলিলেন, এই যে চিরঞ্জীববাবুর সহিত পথেই সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, হাঁ আমার নাম চিরঞ্জীব বটে। বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনকার নাম আমি বিলক্ষণ জানি, আপনারে আর সে পরিচয় দিতে হইবেক না; এ নগরে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আপনকার নাম জানে। আমি হার আনিয়াছি, লউন। এই বলিয়া সেই হার তিনি চিরঞ্জীবের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমায় এ হার দিতেছেন কেন, আমি হার লইয়া কি করিব? বসুপ্রিয় বলিলেন, সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আপনকার যাহা ইচ্ছা হয়, করিবেন; হার আপনকার আদেশে আপনকার জন্যে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, কই, আমি ত আপনাকে হার গড়িতে বলি নাই। বসুপ্রিয় বলিলেন, সে কি মহাশয়! এক বার নয়, দুই বার নয়, অন্ততঃ বিশ বার আপনি আমায় এই হার গড়িতে বলিয়াছেন। কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে, এই হারের জন্যে আমার বাটীতে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল বসিয়া ছিলেন, এবং আধ ঘণ্টা পূর্বে, আমায় এই হার লইয়া আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, পরিহাস শুনিবার সময় নাই। আপনি হার লইয়া যান; আমি পরে সাক্ষাৎ করিব এবং হারের মূল্য লইয়া আসিব। তিনি বলিলেন, যদি নিতান্তই আমায় হার লইতে হয়, আপনি উহার মূল্য লউন; হয় ত, অতঃপর আর আপনি আমার দেখা পাইবেন না; সুতরাং এখন না লইলে পরে আর হারের মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। বসুপ্রিয় বলিলেন, আমার সঙ্গে এত পরিহাস কেন।

এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। চিরঞ্জীব হার লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল। এখানকার লোকের ভাব বুঝাই ভার। এ ব্যক্তির সহিত কস্মিন্ কালেও আমার দেখা শুনা নাই, অথচ বহু মূল্যের হার আমার হস্তে দিয়া চলিয়া গেল; মূল্য লইতে বলিলাম, তাহাও লইল না। এ কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা এখানকার সকলই অদ্ভুত ব্যাপার। যাহা হউক, এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা বিধেয় নহে; জাহাজ স্থির হইলেই প্রস্থান করিব। সত্বর আপণে যাই; বোধ করি, কিঙ্কর এত ক্ষণে সেখানে আসিয়াছে। এই বলিতে বলিতে তিনি আপণ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বসুপ্রিয় স্বর্ণকার এক বিদেশীয় বণিকের নিকট পাঁচ শত টাকা ধার লইয়াছিলেন। যে সময়ে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার ছিল, তাহা অতীত হইয়া যায়, তথাপি বণিক্ টাকার জন্য বসুপ্রিয়কে উৎপীড়িত করেন নাই। পরে দূর দেশান্তরে যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে তিনি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে, সহজে টাকা পাওয়া দুর্ঘট বিবেচনা করিয়া এক জন রাজপুরুষ সঙ্গে লইয়া তিনি বসুপ্রিয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, আজ আমি এখান হইতে প্রস্থান করিব; সমুদয় আয়োজন হইয়াছে; জাহাজে আরোহণ করিলেই হয়; যে জাহাজে যাইব, উহা সন্ধ্যার প্রাক্কালে জয়স্থল হইতে চলিয়া যাইবেক। আমি যে প্রয়োজনে যাইতেছি, তাহাতে সঙ্গে কিছু অধিক টাকা থাকা আবশ্যক। অতএব আমার প্রাপ্য টাকাগুলি এখনই দিতে হইবেক; না দেন, আপনাকে এই রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত করিব। বসুপ্রিয় বলিলেন, টাকা দিতে আমার এক মুহূর্তের নিমিত্তেও আপত্তি বা অনিচ্ছা নাই। আপনি আমার নিকটে যত টাকা পাইবেন, চিরঞ্জীববাবুর নিকট আমার তদপেক্ষা অধিক টাকা পাওয়ানা আছে। তাঁহাকে এক ছড়া হার গড়িয়া দিয়াছি; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ঐ হারের মূল্য পাইব। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার বাটী পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে চলুন; সেখানে যাইবামাত্র আপনি টাকা পাইবেন। তিনি অগত্যা সম্মত হইলে, বসুপ্রিয় তাঁহাকে ও তাঁহার আনীত রাজপুরুষকে সমভিব্যাহারে লইয়া চিরঞ্জীবের আলয়ে চলিলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব অপরাজিতার আবাসে আহার করিয়াছিলেন। অপরাজিতার অঙ্গুলিতে একটি অতি সুন্দর অঙ্গুরীয় ছিল; চিরঞ্জীব তদীয় অঙ্গুলি হইতে ঐ অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া লয়েন, বলেন, আমি এটি আর ফিরিয়া দিব না; ইহার পরিবর্তে আপনারে এক ছড়া নূতন হার দিব। হারের বর্ণনা শুনিয়া অপরাজিতা, ভাবিয়া দেখিলেন, অঙ্গুরীয় অপেক্ষা হারের মূল্য অন্ততঃ দশগুণ অধিক। এইজন্য তিনি এই বিনিময়ে সম্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, আমি হার কখন পাইব। চিরঞ্জীব বলিয়াছিলেন, স্বর্ণকারের সহিত অবধারিত কথা আছে, হার লইয়া তিনি অবিলম্বে এখানেই আসিবেন। আপনি চার পাঁচ দণ্ডের মধ্যে হার পাইবেন। নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি স্বর্ণকার উপস্থিত হইলেন না। চিরঞ্জীব অতিশয় অপ্রতিভ হইলেন, এবং আমি স্বয়ং স্বর্ণকারের বাটীতে গিয়া হার আনিয়া দিতেছি, এই বলিয়া কিঙ্করকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া চিরঞ্জীব কিঙ্করকে বলিলেন, দেখ! আজ গৃহিণী যে আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, তাহার পুরস্কারস্বরূপ, হারের পরিবর্তে তাঁহাকে একগাছা মোটা দড়ি দিব; তিনি ও তাঁহার মন্ত্রিণীরা ঐরূপ হার পাইবারই উপযুক্ত পাত্র। তুমি ঐরূপ দড়ির সংগ্রহ করিয়া রাখিবে, এবং আমি বাটীতে যাইবামাত্র আমার হস্তে দিবে; দেখিও, যেন বিলম্ব না হয়। এই বলিয়া রজ্জুক্রয়ের নিমিত্ত

একটি টাকা দিয়া তিনি তাহাকে বিদায় করিতেছেন, এমন সময়ে স্বর্ণকার, বণিক্, ও রাজপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যথাকালে হার না পাওয়াতে চিরঞ্জীব স্বর্ণকারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ছিলেন; এক্ষণে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমার বাক্যনিষ্ঠাদর্শনে আজ আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমায় বারংবার বলিয়া দিলাম, এই সময়ের মধ্যে আমার নিকটে হার লইয়া যাইবে; না তুমি গেলে, না হার পাঠাইলে, কিছুই করিলে না; এজন্য আজ আমি বড় অপ্রস্তুত হইয়াছি; তোমার কথায় যে বিশ্বাস করে, তাহার ভদ্রস্থতা নাই। তুমি অতি অন্যায় করিয়াছ। এ পর্যন্ত তুমি না যাওয়াতে আমি হারের জন্যে তোমার বাটী যাইতেছিলাম।

বসুপ্রিয়, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব স্থির করিয়া, কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে, তাঁহার হস্তে হার দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত ব্যক্তিকে হার দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সংস্কার ছিল। এজন্য তিনি বলিলেন, মহাশয়! এখন পরিহাস রাখুন; আপনকার হারের হিসাব প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, দৃষ্টি করুন। এই বলিয়া সেই হিসাবের ফর্দ তাঁহার হস্তে দিয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনকার নিকট আমার পাওয়ানা পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা। আমি এই বণিকের পাঁচ শত টাকা ধারি। ইনি অদ্যই এখান হইতে প্রস্থান করিতেছেন। এত ক্ষণ কোন্ কালে জাহাজে চড়িতেন, কেবল এই টাকার জন্যে যাইতে পারিতেছেন না। অতএব আপনি হারের হিসাবে আমায় আপাততঃ পাঁচ শত টাকা দিউন।

তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, আমার সঙ্গে কি টাকা আছে যে এখনই দিব। বিশেষতঃ, আমার কতকগুলি বরাত আছে; সে সব শেষ না করিয়াও বাটী যাইতে পারিব না। অতএব তুমি এই মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আমার বাটীতে যাও; আমার স্ত্রীর হস্তে হার দিয়া আমার নাম করিয়া বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ টাকা দিবেন; আর, বোধ করি, আমিও ঐ সময়ে বাটীতে উপস্থিত হইতেছি। বসুপ্রিয় বলিলেন, হার আপনকার নিকটে থাকুক, আপনিই তাঁহাকে দিবেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, না, সে কথা ভাল নয়; হয় ত আমি যথাসময়ে পঁহুছিতে পারিব না; অতএব তুমিই হার লইয়া যাও। তখন বসুপ্রিয় বলিলেন, হার কি আপনকার সঙ্গে আছে? চিরঞ্জীব চকিত হইয়া বলিলেন, ও কেমন কথা! তুমি কি আমায় হার দিয়াছ যে, হার আমার সঙ্গে আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেছ। বসুপ্রিয় বলিলেন, মহাশয়! এ পরিহাসের সময় নয়, ইঁহার প্রস্থানের সময় বহিয়া যাইতেছে; আর বিলম্ব করা চলে না। অতএব আমার হস্তে হার দেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, তুমি যে হারের বিষয়ে আমার নিকট অঙ্গীকাররক্ষা করিতে পার নাই, সেই দোষ ঢাকিবার জন্য বুঝি এই সকল ছল করিতেছ। আমি কোথায় সে জন্যে তোমায় ভর্ৎসনা করিব মনে করিয়াছি; না হইয়া তুমি কলহপ্রিয়া কামিনীর ন্যায় অগ্রেই তর্জন গর্জন করিতে আরম্ভ করিলে।

এই সময়ে বণিক বসুপ্রিয়কে বলিলেন, সময় অতীত হইয়া যাইতেছে, আর আমি কোনও মতে বিলম্ব করিতে পারি না। তখন বসুপ্রিয় চিরঞ্জীবকে বলিলেন, মহাশয়! শুনিলেন ত, উনি আর বিলম্ব করিতে পারেন না। চিরঞ্জীব বলিলেন, হার লইয়া আমার স্ত্রীর নিকটে গেলেই টাকা পাইবে। শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, মহাশয়! আপনি কেমন কথা বলিতেছেন; কিঞ্চিৎ পূর্বে আমি আপনকার হস্তে হার দিয়াছি; আমার নিকটে আর কেমন করিয়া হার থাকিবেক। হয় হার পাঠাইয়া দেন, নয় লিখিয়া দেন। এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার কৌতুক আর ভাল লাগিতেছে না; হার কেমন হইয়াছে, দেখাও।

উভয়ের এইরূপ বিবাদদর্শনে ও বাদানুবাদশ্রবণে, যার পর নাই বিরক্ত হইয়া বণিক্ চিরঞ্জীবকে বলিলেন, আপনাদের বাক্‌চাতুরী আর আমার সহ্য হইতেছে না; আপনি টাকা দিবেন কি না, স্পষ্ট বলুন; যদি না দেন, আমি ইঁহাকে রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত করি। চিরঞ্জীব বলিলেন, আপনকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি যে, আপনি এত রূঢ় ভাবে আমার সহিত আলাপ করিতেছেন। তখন বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনি হারের হিসাবে আমার টাকা ধারেন, সেই সম্পর্কে উনি এরূপ আলাপ করিতেছেন। সে যাহা হউক, টাকা এই দণ্ডে দিবেন কি না, বলুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি যত ক্ষণ হার না পাইতেছি, তোমায় এক কপর্দকও দিব না। বসুপ্রিয় বলিলেন, কেন, আমি আধ ঘণ্টা পূর্বে আপনকার হস্তে হার দিয়াছি! চিরঞ্জীব বলিলেন, তুমি কখনই আমায় হার দাও নাই। এরূপ মিথ্যা অভিযোগ করা বড় অন্যায়। উহাতে আমার যথেষ্ট অনিষ্ট করা হইতেছে। বসুপ্রিয় বলিলেন, হার পাওয়ার অপলাপ করিয়া আপনি আমার অধিকতর অনিষ্ট করিতেছেন; চির কালের জন্যে আমার সম্ভ্রম যাইতেছে।

সত্বর টাকা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বণিক্ রাজপুরুষকে বলিলেন, আপনি ইঁহাকে অবরুদ্ধ করুন। রাজপুরুষ বসুপ্রিয়কে অবরুদ্ধ করিলে তিনি চিরঞ্জীবকে বলিলেন, দেখুন, আপনকার দোষে চির কালের জন্য আমার মান সম্ভ্রম যাইতেছে; আপনি টাকা দিয়া আমায় মুক্ত করুন; নতুবা আমিও আপনাকে এই দণ্ডে অবরুদ্ধ করাই। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নির্বোধ! আমি হার না পাইয়া টাকা দিব কেন? তোমার সাহস হয়, আমায় অবরুদ্ধ করাও। তখন বসুপ্রিয় রাজপুরুষের হস্তে অবরোধনের খরচ দিয়া বলিলেন, দেখুন, ইনি আমার নিকট হইতে এক ছড়া বহুমূল্য হার লইয়া মূল্য দিতেছেন না; অতএব আপনি ইঁহাকে অবরুদ্ধ করুন। সহোদরও যদি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করে, আমি তাহাকেও ক্ষমা করিতে পারি না। স্বর্ণকারের অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজপুরুষ চিরঞ্জীবকে অবরুদ্ধ করিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি যে পর্যন্ত টাকা জমা করিতে বা জামীন দিতে না পারিতেছি, তাবৎ আপনকার অবরোধে থাকিব।

এই বলিয়া তিনি বসুপ্রিয়কে বলিলেন, অরে দুরাত্মন্! তুমি যে অকারণে আমার অবমাননা করিলে, তোমায় তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে হইবেক; অধিক আর কি বলিব, এই অপরাধে তোমার সর্বস্বান্ত হইবেক। বসুপ্রিয় বলিলেন, ভাল দেখা যাইবেক। জয়স্থল নিতান্ত অরাজক স্থান নহে। যখন উভয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হইব, আপনকার সমস্ত গুণ এরূপে প্রকাশিত করিব যে, আপনি আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। আপনি অধিরাজ বাহাদুরের প্রিয় পাত্র বলিয়া এরূপ গর্বিত কথা বলিতেছেন। কিন্তু তিনি যেরূপ ন্যায়পরায়ণ, তাহাতে কখনই অন্যায় বিচার করিবেন না।

হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব স্বীয় অনুচর কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। সমুদয় স্থির করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত চিত্তে সে স্বীয় প্রভুকে এই সংবাদ দিতে যাইতেছিল; পথিমধ্যে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া স্বপ্রভুজ্ঞানে তাঁহার সম্মুখবর্তী হইয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়! আর আমাদের ভাবনা নাই, মলয়পুরের এক জাহাজ পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে আমাদের যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। ঐ জাহাজ অবিলম্বে প্রস্থান করিবেক; অতএব পান্থনিবাসে চলুন, দ্রব্যসামগ্রী সমুদয় লইয়া এ পাপিষ্ঠ স্থান হইতে চলিয়া যাই; শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নির্বোধ! অরে পাগল! মলয়পুরের জাহাজের কথা কি বলিতেছ। সে বলিল, কেন মহাশয়! আপনি কিঞ্চিৎ পূর্বে আমায় জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি তোমায় জাহাজের কথা বলি নাই, দড়ি কিনিতে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিল, না মহাশয়! আপনি দড়ি কিনিবার কথা কখন বলিলেন? জাহাজ দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন। তখন চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! এখন আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিতে পারি না; যখন সচ্ছন্দ চিত্তে থাকিব, তখন করিব, এবং যাহাতে উত্তরকালে আমার কথা মন দিয়া শুন, তাহাও ভাল করিয়া শিখাইয়া দিব। এখন সত্বর তুমি বাটী যাও, এই চাবিটি চন্দ্রপ্রভার হস্তে দিয়া বল, পাঁচ শত টাকার জন্য আমি পথে অবরুদ্ধ হইয়াছি: আমার বাক্সের ভিতরে যে স্বর্ণমুদ্রার থলি আছে, তাহা তোমা দ্বারা অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি অবরোধ হইতে মুক্ত হইব। আর দাঁড়াইও না, শীঘ্র চলিয়া যাও। এই বলিয়া কিঙ্করকে বিদায় করিয়া তিনি রাজপুরুষকে বলিলেন, অহে রাজপুরুষ! যত ক্ষণ টাকা না আসিতেছে, আমায় কারাগারে লইয়া চল। অনন্তর তাঁহারা তিন জনে কারাগার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিঙ্কর মনে মনে বলিতে লাগিল, আমায় চন্দ্রপ্রভার নিকটে যাইতে বলিলেন; সুতরাং, আজ আমরা যে বাটীতে আহার করিয়াছিলাম, আমায় তথায় যাইতে হইবেক। পাকশালার পরিচারিণীর ভয়ে সে বাটীতে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হইতেছে না। কিন্তু প্রভু যে অবস্থায় যে জন্য আমায় পাঠাতেছেন, না গেলে কোনও মতে চলিতেছে না। এই বলিতে বলিতে সে সেই বাটীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, বিলাসিনী হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের সমক্ষ হইতে পলাইয়া চন্দ্রপ্রভার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং চিরঞ্জীবের সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সবিশেষ সমস্ত শুনাইলেন। চন্দ্রপ্রভা শুনিয়া কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, বিলাসিনি ! তিনি যে তোমার উপর অনুরাগপ্রকাশ এবং পরিশেষে পরিণয়প্রস্তাব ও প্রলোভনবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমার বাস্তবিক বলিয়া বোধ হইল ? আমার অনুভব হয়, তিনি পরিহাস করিয়াছেন। বিলাসিনী বলিলেন, না, দিদি ! পরিহাস নয় ; আমার উপর তাঁহার যে বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই ; অন্তঃকরণে বিলক্ষণ অনুরাগসঞ্চার না হইলে পুরুষদিগের সেরূপ ভাবভঙ্গী ও সেরূপ কথাপ্রণালী হয় না। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে কখনই তোমার নিকট এই কথার উল্লেখ করিতাম না। শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল, তিনি কি কি কথা বলিলেন ? বিলাসিনী বলিলেন, তিনি বলিলেন, তোমার সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই, তিনি তোমার পাণিগ্রহণ করেন নাই, তোমার উপর তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, তিনি বৈদেশিক ব্যক্তি, জয়স্থলে তাঁহার বাস নয় ; পরে আমার উপর স্পষ্ট বাক্যে অনুরাগপ্রকাশ ও স্পষ্টতর বাক্যে পরিণয়প্রস্তাব করিলেন ; অবশেষে, তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভয় পাইয়া আমি পলাইয়া আসিলাম।

সমুদয় শ্রবণগোচর করিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, বিলাসিনি ! তোমার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে এজন্মে আর তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে হয় না। তিনি যে এমন নীচ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি একবারও মনে করি নাই। কিন্তু আমার মন কেমন, বলিতে পারি না। দেখ, তিনি কেমন মমতাশূন্য হইয়াছেন এবং কেমন নৃশংস ব্যবহার করিতেছেন ; আমি কিন্তু তাঁহার প্রতি সেরূপ মমতাশূন্য হইতে বা সেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতে পারিতেছি না ; এখনও আমার অনুরাগ অণুমাত্র বিচলিত হইতেছে না। এই বলিয়া চন্দ্রপ্রভা খেদ করিতে আরম্ভ করিলেন, বিলাসিনী প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হেমকূটের কিঙ্কর তাঁহাদের নিকটবর্তী হইল। তাহাকে দেখিয়া জয়স্থলের কিঙ্কর বোধ করিয়া বিলাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঙ্কর ! তুমি হাঁপাইতেছ কেন ? সে বলিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়াছি, তাহাতেই হাঁপাইতেছি। বিলাসিনী বলিলেন, তোমার প্রভু কোথায়, তিনি ভাল আছেন ত ? তোমার ভাব দেখিয়া ভয় হইতেছে ; কেমন, কোনও অনিষ্টঘটনা হয় নাই ত ? সে বলিল, তিনি রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত হইয়াছেন ; সে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া যাইতেছে। শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, কিঙ্কর ! কাহার অভিযোগে তিনি অবরুদ্ধ হইলেন ? সে বলিল, আমি তাহার কিছুই জানি না ; আমায় এক কর্মে পাঠাইয়াছিলেন ; কর্ম শেষ করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র, তিনি আমার হস্তে এই চাবিটি দিয়া আপনকার নিকটে আসিতে বলিলেন ; বলিয়া দিলেন, তাঁহার

বাক্সের মধ্যে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি আছে, আপনি চাবি খুলিয়া তাহা বাহির করিয়া আমার হস্তে দেন ; ঐ টাকা দিলে তিনি অবরোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। শুনিবা-মাত্র, বিলাসিনী চিরঞ্জীবের বাক্স হইতে স্বর্ণমুদ্রার থলি আনিয়া কিঙ্করের হস্তে দিলেন এবং বলিলেন, অবিলম্বে তোমার প্রভুকে বাটীতে লইয়া আসিবে। সে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিল ; তাঁহারা দুই ভগিনীতে দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া বিষম অসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

হেমকূটের চিরঞ্জীব, কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া, বহু ক্ষণ পর্যন্ত উৎসুক-চিত্তে তদীয় প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিলেন, এবং সমধিক বিলম্ব দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিঙ্করকে সত্বর সংবাদ আনিতে বলিয়াছিলাম, সে এখনও আসিল না কেন ? যে জন্য পাঠাইয়াছি, হয় ত তাহারই কোনও স্থিরতা করিতে পারে নাই, নয় ত পথিমধ্যে কোনও উৎপাতে পড়িয়াছে ; নতুবা যে বিষয়ের জন্য গিয়াছে, তাহাতে উপেক্ষা করিয়া বিষয়ান্তরে আসক্ত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না ; কারণ জয়স্থল হইতে পলাইবার নিমিত্ত সে আমা অপেক্ষাও ব্যস্ত হইয়াছে। অতএব, পুনরায় কোনও উপদ্রব ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। এ নগরের যে রঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে উপদ্রবঘটনার অপ্রতুল নাই। রাজপথে নির্গত হইলে সকল লোকই আমার নামগ্রহণপূর্বক সম্বোধন ও সংবর্ধনা করে ; অনেকেই চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় প্রিয় সম্ভাষণ করে ; কেহ কেহ এরূপ ভাব প্রকাশ করে, যেন আমি নিজ অর্থ দ্বারা তাহাদের অনেক আনুকূল্য করিয়াছি, অথবা আমার সহায়তায় তাহারা বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছে ; কেহ কেহ আমায় টাকা দিতে উদ্যত হয় ; কেহ কেহ আহারের নিমন্ত্রণ করে ; কেহ কেহ পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করে ; কেহ কেহ কহে, আপনি যে দ্রব্যের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সংগৃহীত হইয়াছে, আমার দোকানে গিয়া দেখিবেন, না বাটীতে পাঠাইয়া দিব ? পান্থনিবাসে আসিবার সময় এক দরজী পীড়াপীড়ি করিয়া দোকানে লইয়া গেল, এবং, আপনকার চাপকানের জন্য এই গরদের থান আনিয়াছি বলিয়া, আমার গায়ের মাপ লইয়া ছাড়িয়া দিল ; আবার এক স্বর্ণকার আমার হস্তে বহুমূল্যের হার দিয়া মূল্য না লইয়া চলিয়া গেল। কেহই আমায় বৈদেশিক বিবেচনা করে না। আমি যেন জয়স্থলের একজন গণনীয় ব্যক্তি। আর মধ্যাহ্নকালে দুই স্ত্রীলোক যে কাণ্ড করিলেন, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব। এ স্থানে মাদৃশ বৈদেশিক ব্যক্তির কোনও ক্রমে ভদ্রস্থতা নাই। এখানকার ব্যাপার বুঝিয়া উঠা ভার। যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে প্রস্থান করিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল। কিন্তু কিঙ্কর কি জন্যে এত বিলম্ব করিতেছে ? যাহা হউক, আর তাহার প্রতীক্ষায় থাকিলে চলে না, অন্বেষণ করিতে হইল।

এই বলিয়া পান্থনিবাস হইতে বহির্গত হইয়া চিরঞ্জীব রাজপথে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময় কিঙ্কর সত্বর গমনে তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং বলিল, যে স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই। ইহা বলিয়া সে স্বর্ণমুদ্রার থলি তাঁহার

হস্তে দিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি রূপে সেই ভীষণমূর্তি রাজপুরুষের হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন ; সে যে বড় টাকা না পাইয়া ছাড়িয়া দিল ? তিনি স্বর্ণমুদ্রা দর্শনে ও কিঙ্করের কথা শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, কিঙ্কর। এ স্বর্ণমুদ্রা কোথায় পাইলে, এবং কি জন্যই বা আমার হস্তে দিলে, বল ; আমি ত তোমায় স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য পাঠাই নাই ? কিঙ্কর বলিল, সে কি মহাশয়। রাজপুরুষ আপনাকে কারাগারে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় আপনি আমায় দেখিতে পাইয়া আমার হস্তে একটি চাবি দিয়া বলিলেন, বাক্সের মধ্যে পাঁচ শত টাকার স্বর্ণমুদ্রা আছে ; চন্দ্রপ্রভার হস্তে এই চাবি দিলে তিনি তাহা বহিষ্কৃত করিয়া তোমার হস্তে দিবেন ; তুমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার নিকটে আনিবে। তদনুসারে আমি এই স্বর্ণমুদ্রা আনিয়াছি। বোধ হয়, আপনকার স্মরণ আছে, আমরা মধ্যাহ্নকালে যে স্ত্রীলোকের আলয়ে আহার করিয়াছিলাম, তাঁহার নাম চন্দ্রপ্রভা। তিনি ও তাঁহার ভগিনী অবরোধের কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, এবং সত্বর আপনারে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। এক্ষণে আপনকার যেরূপ অভিরুচি। আমি কিন্তু প্রাণান্তেও আর সে বাটীতে প্রবেশ করিব না। আপনি বিপদে পড়িয়াছিলেন. কেবল এই অনুরোধে স্বর্ণমুদ্রা আনিতে গিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, আপনি যে এই অবান্ধব দেশে সহজে রাজপুরুষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, ইহাতে আমি বড় আহ্লাদিত হইয়াছি। তদপেক্ষা অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে, এই এক উপলক্ষে পাঁচ শত টাকার স্বর্ণমুদ্রা অনায়াসে হস্তগত হইল।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া, পরিহাসরসিক কিঙ্কর কৌতুক করিতেছে ইহা ভাবিয়া, চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নরাধম। আমি তোমায় যে জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কোনও কথা না বলিয়া কেবল পাগলামি করিতেছ। এখান হইতে অবিলম্বে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ, এই পরামর্শ স্থির করিয়া তোমায় জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব বল, আজ কোনও জাহাজ জয়স্থল হইতে প্রস্থান করিবেক কি না, এবং তাহাতে আমাদের যাওয়া ঘটিবেক কি না। কিঙ্কর বলিল, সে কি মহাশয়। আমি যে এক ঘণ্টা পূর্বে আপনাকে সে বিষয়ের সংবাদ দিয়াছি। তখন অবরোধের হঙ্গামে পড়িয়াছিলেন, সে জন্যই হউক আর অন্য কোনও কারণেই হউক, আপনি সে কথায় মনোযোগ করিলেন না, বরং আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নতুবা, এত ক্ষণে আমরা দ্রব্যসামগ্রী লইয়া জাহাজে উঠিতে পারিতাম। কিঙ্করের কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হতভাগ্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই পাগলের মত এত অসংবদ্ধ কথা বলিতেছে ; অথবা, উহারই বা অপরাধ কি, আমিও ত স্থানমাহাত্ম্যে অবিকল ঐরূপ হইয়াছি। উভয়েরই তুল্যরূপ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। তিনি মনে মনে এই সমস্ত আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে কিঙ্কর একটি স্ত্রীলোককে আসিতে দেখিয়া চকিত হইয়া আকুল বচনে বলিল, মহাশয়। সাবধান হউন, ঐ দেখুন, আবার কে এক ঠাকুরাণী আসিতেছেন। উনি যাহাতে আহারের লোভ দেখাইয়া, অথবা অন্য কোনও ছলে বা কৌশলে

ভুলাইয়া, আমাদিগকে লইয়া যাইতে না পারেন, তাহা করিবেন। পূর্ব বারে যেমন পতিসম্ভাষণ করিয়া হাত ধরিয়া এক ঠাকুরাণী আপন বাটীতে লইয়া গেলেন, আপনি একটিও কথা না বলিয়া চোরের মত চলিয়া গেলেন, এবার যেন সেরূপ না হয়।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব, স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিতে না পাইয়া, মধ্যাহ্নকালে অপরাজিতানাম্নী যে কামিনীর বাটীতে আহার করিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গুলি হইতে একটি মনোহর অঙ্গুরীয় উন্মোচিত করিয়া লয়েন, এবং সেই অঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে তাঁহাকে বসুপ্রিয়নির্মিত মহামূল্য হার দিবার অঙ্গীকার করেন। হার যথাকালে উপস্থিত না হওয়াতে লজ্জিত হইয়া তিনি স্বয়ং স্বর্ণকারের বিপণি হইতে হার আনিতে যান। অপরাজিতা তাঁহার সমধিক বিলম্ব দর্শনে তদীয় অন্বেষণে নির্গত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরে হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইলেন, এবং জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব মনে করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আমায় যে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, আপনকার গলায় এ কি সেই হার? এ বেলা আমার বাটীতে আহার করিতে হইবেক; আমি আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। এ আবার কোথাকার আপদ্ উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া, চিরঞ্জীব রোষকষায়িত লোচনে, সাতিশয় পরুষ-বচনে বলিলেন, অরে মায়াবিনি! তুমি দূর হও; তোমায় সতর্ক করিয়া দিতেছি, আমায় কোনও প্রকারে প্রলোভনপ্রদর্শন করিও না। কিঙ্কর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, স্বীয় প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহাশয়! সাবধান হইবেন, যেন এ রাক্ষসীর মায়ায় ভুলিয়া উহার বাটীতে আহার করিতে না যান।

উভয়ের ভাবদর্শনে ও বাক্যশ্রবণে অপরাজিতা বিস্মিত না হইয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, মহাশয়! আপনি যেমন পরিহাসপ্রিয়, আপনকার ভৃত্যটি আবার তদপেক্ষা অধিক। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার বাটীতে যাইবেন কি না বলুন; আমি আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! আমি পুনরায় সাবধান করিতেছি, আপনি কদাচ এই পিশাচীর মায়ায় ভুলিবেন না। তখন চিরঞ্জীব ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, অরে পাপীয়সি! তুমি এই মুহূর্তে এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক যে, তুমি আমায় আহার করিতে ডাকিতেছ। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে এখানকার স্ত্রীলোকমাত্রেই ডাকিনী। স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, যদি ভাল চাও, অবিলম্বে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবের সহিত এই স্ত্রীলোকের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল; তিনি যে তাঁহার প্রতি এবংবিধ অযুক্ত আচরণ করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। চিরঞ্জীববাবুর নিকট এরূপে অপমানিত হইলাম, এই ভাবিয়া তিনি সাতিশয় রোষপ্রকাশ ও অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্বক বলিলেন, এত কাল আপনাকে ভদ্র বলিয়া জানিতাম; কিন্তু আপনি কেমন ভদ্র, আজ তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। সে যাহা হউক, মধ্যাহ্নে আহারের সময় আমার অঙ্গুলি হইতে যে অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়াছেন, হয় তাহা ফিরিয়া

কলিকাতার গোলদীঘিতে স্থাপিত বিদ্যাসাগরের মর্মরমূর্তি
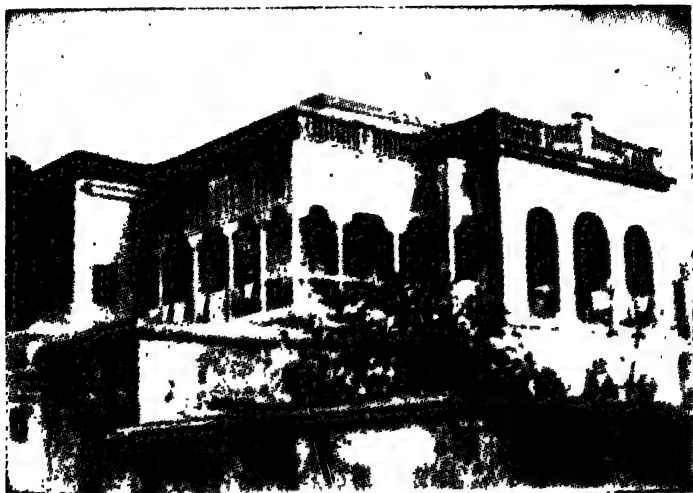
কলিকাতার বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের স্বনির্মিত বাসভবন

শ্মশানে বিদ্যাসাগর

দেন, নয় উহার বিনিময়ে যে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা দেন ; দুয়ের এক পাইলেই আমি চলিয়া যাই ; তৎপরে আর এ জন্মে আপনকার সহিত আলাপ করিব না ; এবং প্রাণান্ত সর্বস্বান্ত হইলেও কোনও সংস্রব রাখিব না। এই সকল কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, অন্য অন্য ডাইন, ছাড়িবার সময়, ঝাঁটা, কুলো, শিল, নোড়া, বা ছেঁড়া জুতা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া যায়, এ দিব্যাঙ্গনা ডাইনটির অধিক লোভ দেখিতেছি ; ইনি হয় হার, নয় আঙ্গটি, দুয়ের একটি না পাইলে যাইবেন না। মহাশয়! সাবধান, কিছুই দিবেন না ; দিলেই অনর্থপাত হইবেক। অপরাজিতা কিঙ্করের কথার উত্তর না দিয়া চিরঞ্জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! হয় হার, নয় আঙ্গটি দেন। বোধ করি, আমায় ঠকান আপনকার অভিপ্রেত নহে। চিরঞ্জীব উত্তরোত্তর অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, অরে ডাকিনি! দূর হও। এই বলিয়া কিঙ্করকে সঙ্গে লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

এইরূপে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া অপরাজিতা কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; অনন্তর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, চিরঞ্জীববাবু নিঃসন্দেহ উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, নতুবা উঁহার আচরণ এরূপ বিসদৃশ হইবেক কেন ? চিরদিন আমরা উঁহাকে সুশীল, সুবোধ, দয়ালু, ও অমায়িক লোক বলিয়া জানি ; কেহ কখনও কোনও কারণে উঁহারে ক্রোধের বশীভূত হইতে দেখি নাই ; আজ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। উন্মাদ ব্যতিরেকে এরূপ লোকের এরূপ ভাবান্তর কোনও ক্রমে সম্ভবে না। ইনি বিনিময়ে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়া অঙ্গুরীয় লইয়াছেন, এখন আমায় কিছুই দিতে চাহিতেছেন না। ইনি সহজ অবস্থায় এরূপ করিবার লোক নহেন। মধ্যাহ্নকালে আমার আলয়ে আহার করিবার সময় বলিয়াছিলেন, চন্দ্রপ্রভা আজ উঁহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তখন এ কথার ভাব বুঝিতে পারি নাই। এখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, উনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়াই তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন আমি কি করি ? তাঁহার স্ত্রীর নিকটে গিয়া বলি, আপনকার স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালে আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং বলপূর্বক আমার অঙ্গুরীয় লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। ইহা শুনিলে তিনি অবশ্যই আমার অঙ্গুরীয়প্রতিপ্রাপ্তির কোনও উপায় করিবেন। আমি অকারণে এক শত টাকা মূল্যের বস্তু হারাইতে পারি না। এই স্থির করিয়া তিনি চিরঞ্জীবের আলয় অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব মনে করিয়াছিলেন, কিঙ্কর সত্বর স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া দিবেক। কিন্তু বহু ক্ষণ পর্যন্ত সে না আসাতে তিনি অবরোধকারী রাজপুরুষকে বলিলেন, তুমি অকারণে আমায় কষ্ট দিতেছ ; যে টাকার জন্য আমি অবরুদ্ধ হইয়াছি, বাটী যাইবামাত্র তাহা দিতে পারি। অতএব তুমি আমার সঙ্গে চল। আর, আমি কারাগার হইতে বহির্গত হইলে পথে তোমার হাত ছাড়াইয়া পলাইব, সে আশঙ্কা করিও না। আমি নিতান্ত সামান্য লোকও নই, এবং তোমার অথবা অন্য কোনও রাজপুরুষের

নিতান্ত অপরিচিতও নই। কিঙ্কর টাকা না লইয়া আসিবার দুই কারণ বোধ হইতেছে; প্রথম এই যে, আমি জয়স্থলে কোনও কারণে অবরুদ্ধ হইব, আমার স্ত্রী সহজে তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না; সুতরাং, কিঙ্করের কথা শুনিয়া উপহাস করিয়াছেন। দ্বিতীয় এই যে, কি কারণে বলিতে পারি না, তিনি আজ সম্পূর্ণ বিকল-চিত্ত হইয়া আছেন; হয় ত সেই জন্য কিঙ্করের কথিত বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। রাজপুরুষ সম্মত হইলেন। চিরঞ্জীব তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় ভবনের দিকে চলিলেন।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে কিঙ্করকে দেখিতে পাইয়া চিরঞ্জীব রাজপুরুষকে বলিলেন, ঐ আমার লোক আসিতেছে। ও টাকার সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আর তোমায় আমার বাটী পর্যন্ত যাইতে হইবেক না। অল্প ক্ষণের মধ্যেই কিঙ্কর সম্মুখবর্তী হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন কিঙ্কর! যে জন্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার সংগ্রহ হইয়াছে কি না। সে কহিল, হাঁ মহাশয়! তাহার সংগ্রহ না করিয়া আমি আপনকার নিকটে আসি নাই। এই বলিয়া সে ক্রীত রজ্জু তাঁহাকে দেখাইল। চিরঞ্জীব বলিলেন, বলি, টাকা কোথায়? সে বলিল, আর টাকা আমি কোথায় পাইব? আমার নিকটে যাহা ছিল, তাহা দিয়া এই দড়ি কিনিয়া আনিয়াছি। তিনি বলিলেন, এক গাছা দড়ি কিনিতে কি পাঁচ শত টাকা লাগিল। এখন পাগলামি ছাড়; বল, আমি যে জন্যে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে পাঠাইলাম, তাহার কি হইল। সে বলিল, আপনি আমায় দড়ি কিনিয়া বাড়ী যাইতে বলিয়াছিলেন; দড়ি কিনিয়াছি এবং তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইতেছি। চিরঞ্জীব সাতিশয় কুপিত হইয়া কিঙ্করকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সমভি-ব্যাহারী রাজপুরুষ চিরঞ্জীবকে বলিলেন, মহাশয়! এত অধৈর্য হইবেন না; সহিষ্ণুতা যে কত বড় গুণ, তাহা কি আপনি জানেন না? এই কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, উঁহারে সহিষ্ণু হইবার উপদেশ দিবার প্রয়োজন কি? যে কষ্টভোগ করে, তাহারই সহিষ্ণুতাগুণ থাকা আবশ্যক; আমি প্রহারের কষ্টভোগ করিতেছি; আমায় বরং আপনি ঐ উপদেশ দেন। তখন রাজপুরুষ রোষপ্রদর্শন করিয়া বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! যদি ভাল চাও, মুখ বন্ধ কর। কিঙ্কর বলিল, আমায় মুখ বন্ধ করিতে বলা অপেক্ষা উঁহাকে হস্ত বন্ধ করিতে বলিলে ভাল হয়।

এই সকল কথা শুনিয়া যার পর নাই ক্রোধান্বিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে অচেতন নরাধম! আর আমায় বিরক্ত করিও না। সে বলিল, আমি অচেতন হইলে আমার পক্ষে ভাল হইত। যদি অচেতন হইতাম, আপনি প্রহার করিলে কষ্টের অনুভব করিতাম না। তিনি বলিলেন, তুমি অন্য সকল বিষয়ে অচেতন, কেবল প্রহারসহনবিষয়ে নহ; সে বিষয়ে তোমায় ও গর্দভে কোনও অংশে প্রভেদ নাই। সে বলিল, আমি যে গর্দভ, তার সন্দেহ কি; গর্দভ না হইলে আমার কান লম্বা হইবেক কেন। এই বলিয়া রাজপুরুষকে সম্ভাষণ করিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! জন্মাবধি প্রাণপণে ইঁহার পরিচর্যা করিতেছি; কিন্তু কখনও প্রহার ভিন্ন অন্য পুরস্কার

পাই নাই। শীতবোধ হইলে প্রহার করিয়া গরম করিয়া দেন; গরম বোধ হইলে প্রহার করিয়া শীতল করিয়া দেন; নিদ্রাবেশ হইলে প্রহার করিয়া সজাগর করিয়া দেন; বসিয়া থাকিলে প্রহার করিয়া উঠাইয়া দেন; কোনও কাজে পাঠাইতে হইলে প্রহার করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন; কার্য সমাধা করিয়া বাটীতে আসিলে প্রহার করিয়া আমায় সংবর্ধনা করেন; কথায় কথায় কান ধরিয়া টানেন, তাহাতেই আমার কান এত লম্বা হইয়াছে। বলিতে কি মহাশয়! কেহ কখনও এমন গুণের মনিব ও এমন সুখের চাকরি পাইবেক না; আমি ইঁহার আশ্রয়ে পরম সুখে কাল কাটাইতেছি।

এই সময়ে চিরঞ্জীব দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সহধর্মিণী কতকগুলি লোক সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। তখন তিনি কিঙ্করকে বলিলেন, অরে বানর! আর তোমার পাগলামি করিবার প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে; যদি ভাল চাও, এখন এখান হইতে চলিয়া যাও; আমার গৃহিণী আসিতেছেন। কিঙ্কর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, মা ঠাকুরাণি! শীঘ্র আসুন; বাবু আজ আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিবেন; হারের পরিবর্তে এক রমণীয় উপহার পাইবেন। এই বলিয়া হস্তস্থিত রজ্জু উত্তোলিত করিয়া সে তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল। চিরঞ্জীব ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

অপরাজিতার মুখে চিরঞ্জীবের উন্মাদের সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাধরনামক এক ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনেন। বিদ্যাধর ঐ পাড়ার গুরুমহাশয় ছিল; কিন্তু অবসরকালে পাড়ায় পাড়ায় চিকিৎসা করিয়া বেড়াইত। অনেকে বিশ্বাস করিত, ভূতে পাইলে কিংবা ডাইনে খাইলে সে অনায়াসে প্রতিকার করিতে পারে; এজন্য সে ঐ পল্লীর স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের নিকট বড় মান্য ও আদরণীয় ছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসা করিলেও, বিদ্যাধর না দেখিলে তাহাদের মনের সন্তোষ হইত না। ফলতঃ, ঐ সকল লোকের নিকটে বিদ্যাধরের প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। সে উপস্থিত হইলে চন্দ্রপ্রভা স্বামীর পীড়ার বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার হস্তে ধরিয়া বলেন, তুমি সত্বর তাঁহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া দাও, তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দিব। সে বলে, আপনি কোনও ভাবনা করিবেন না। আমি অনেক বিদ্যা জানি; আমার পিতা মাতা না বুঝিয়া আমার বিদ্যাধর নাম দেন নাই। সে যাহা হউক, অবিলম্বে তাঁহাকে বাটীতে আনা আবশ্যক। চলুন আমি সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু উন্মত্ত ব্যক্তিকে আনা সহজ ব্যাপার নহে; অতএব লোক সঙ্গে লইতে হইবেক। চন্দ্রপ্রভা পাঁচ সাত জন লোকের সংগ্রহ করিয়া, বিদ্যাধর, বিলাসিনী, ও অপরাজিতাকে সঙ্গে লইয়া চিরঞ্জীবের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে চিরঞ্জীব ক্রোধে অধীর হইয়া কিঙ্করকে প্রহার ও তিরস্কার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে চন্দ্রপ্রভা তাঁহার সমীপবর্তিনী হইলেন। অপরাজিতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ, তোমার স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন কি না। চন্দ্রপ্রভা

বলিলেন, উঁহার ব্যবহার ও আকার প্রকার দেখিয়া আমার আর সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে না। ইহা কহিয়া তিনি বিদ্যাধরকে বলিলেন, দেখ, তুমি অনেক মন্ত্র, অনেক ঔষধ, এবং চিকিৎসার অনেক কৌশল জান; এক্ষণে সত্বর উঁহারে প্রকৃতিস্থ কর; তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই দিয়া তোমায় সন্তুষ্ট করিব। বিলাসিনী সাতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, হায়! কোথা হইতে এমন সর্বনাশিয়া রোগ আসিয়া জুটিল; উঁহার সে আকার নাই, সে মুখশ্রী নাই; কখনও উঁহার এমন বিকট মূর্তি দেখি নাই; উঁহার দিকে তাকাইতেও ভয় হইতেছে। বিদ্যাধর চিরঞ্জীবকে বলিল, বাবু! তোমার হাতটা দাও, নাড়ীর গতি কিরূপ দেখিব। চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া বলিলেন, এই আমার হাত, তুমি কানটি বাড়াইয়া দাও। তখন বিদ্যাধর স্থির করিল, চিরঞ্জীবের শরীরে ভূতাবেশবশতঃ প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তদনুসারে সে কতিপয় মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া তাঁহার দেহগত ভূতকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিল, অরে দুরাত্মন্ পিশাচ! আমি তোরে আদেশ করিতেছি, অবিলম্বে উঁহার কলেবর হইতে বহির্গত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। চিরঞ্জীব শুনিয়া নিরতিশয় ক্রোধভরে বলিলেন, অরে নির্বোধ! অরে পাপিষ্ঠ! অরে অর্থপিশাচ! চুপ কর, আমি পাগল হই নাই। শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বাষ্পাকুল লোচনে অতি দীন বচনে বলিলেন, পূর্বে ত তুমি এরূপ ছিলে না। আমার নিতান্ত পোড়া কপাল বলিয়া আজ অকস্মাৎ এই বিষম রোগ তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। চন্দ্রপ্রভার বাক্যশ্রবণে চিরঞ্জীবের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহারে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, অরে পাপীয়সি! এই নরাধম বুঝি আজ কাল তোর অন্তরঙ্গ হইয়াছে? এই দুরাত্মার সঙ্গে আহার-বিহারের আমোদে মত্ত হইয়াই বুঝি দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলি, এবং আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দিস্ নাই? শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা চকিত হইয়া বলিলেন, ও কি কথা বলিতেছ; তোমার আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল বটে; তার পরে ত সকলে একসঙ্গে আহার করিয়াছি। তুমি আহারের পর বরাবর বাটীতে ছিলে; কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছ। এখন কি কারণে এরূপ ভর্ৎসনা করিতেছ ও এরূপ কুৎসিত কথা বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব স্বীয় অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে কিঙ্কর! আজ আমি কি মধ্যাহ্নকালে বাটীতে আহার করিয়াছি? সে বলিল, না মহাশয়! আজ আপনি বাটীতে আহার করেন নাই। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, আমি আজ যখন আহার করিতে যাই, বাটীর দ্বার রুদ্ধ ছিল কি না, এবং আমাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিয়াছিল কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হাঁ, বাটীর দ্বার রুদ্ধ করা ছিল এবং আপনাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, আচ্ছা, উনি নিজে অভ্যন্তর হইতে আমাকে গালি দিয়াছিলেন কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হাঁ, উনি অত্যন্ত কটু বাক্য বলিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, তৎপরে আমি অবমানিত

বোধ করিয়া ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া যাই কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হাঁ, তার পর আপনি ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া যান।

এই প্রশ্নোত্তরপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া চন্দ্রপ্রভা আক্ষেপবচনে কিঙ্করকে বলিলেন, তুমি বিলক্ষণ প্রভুভক্ত; প্রভুর যথার্থ হিতচেষ্টা করিতেছ। যাহাতে উঁহার মনের শান্তি হয়, সে চেষ্টা না করিয়া কেবল রাগবৃদ্ধি করিয়া দিতেছ। বিদ্যাধর বলিল, আপনি উহার অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন; ও অবিবেচনার কর্ম করিতেছে না। ও ব্যক্তি উঁহার রীতি ও প্রকৃতি বিলক্ষণ জানে। এরূপ অবস্থায় চিত্তের অনুবর্তন করিলে যেরূপ উপকার দর্শে, অন্য কোনও উপায়ে সেরূপ হয় না। চিরঞ্জীব চন্দ্রপ্রভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তুই স্বর্ণকারের সহিত যোগ দিয়া আমায় কয়েদ করাইয়াছিস; নতুবা স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইলি না কেন। শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, সে কি নাথ! এমন কথা বলিও না; কিঙ্কর আসিয়া অবরোধের উল্লেখ করিবামাত্র আমি উহা দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছি। কিঙ্কর চকিত হইয়া বলিল, আমা দ্বারা পাঠাইয়াছেন? আপনকার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, তাহাই বলিতেছেন। এই বলিয়া সে চিরঞ্জীবকে বলিল, না মহাশয়! আমার হস্তে এক পয়সাও দেন নাই; আপনি উঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। তখন চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য উঁহার নিকটে যাও নাই? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, ও আমার নিকটে গিয়াছিল, বিলাসিনী তদ্দণ্ডে উহার হস্তে স্বর্ণমুদ্রার থলি দিয়াছে। বিলাসিনীও বলিলেন, আমি স্বয়ং উহার হস্তে স্বর্ণমুদ্রার থলি দিয়াছি। তখন কিঙ্কর বলিল, পরমেশ্বর জানেন এবং যে রজ্জু বিক্রয় করে সে জানে, আপনি দড়ি কেনা বই আজ আমায় আর কোনও কর্মে পাঠান নাই।

এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণগোচর করিয়া বিদ্যাধর চন্দ্রপ্রভাকে বলিল, দেখুন, প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন; আমি উভয়ের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। বন্ধন করিয়া অন্ধকারগৃহে রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে প্রতিকার হইবেক না। চন্দ্রপ্রভা সম্মতি প্রদান করিলেন। শুনিয়া কোপে কম্পমান হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে মায়াবিনি! অরে দুশ্চারিণি! তুই এতদিন আমায় এমন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলি যে, তোরে নিতান্ত পতিপ্রাণা কামিনী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি, তুই ভয়ঙ্কর কালভুজঙ্গী; অসৎ অভিপ্রায়ের সাধনের নিমিত্ত, এই সকল দুরাচারদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমার প্রাণবধের চেষ্টা দেখিতেছিস, এবং উন্মাদের প্রচার করিয়া বন্ধনপূর্বক অন্ধকারময় গৃহে রাখিবি, এই মনস্থ করিয়া আসিয়াছিস। আমি তোর দুরভিসন্ধির সমুচিত প্রতিফল দিতেছি। এই বলিয়া তিনি কোপপ্রজ্বলিত লোচনে উদ্ধত গমনে চন্দ্রপ্রভার দিকে ধাবমান হইলেন। চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সন্নিহিত লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ; তোমাদের কি আচরণ বুঝিতে পারিতেছি না; শীঘ্র উঁহার বন্ধন কর,

আমার নিকটে আসিতে দিও না। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, যেরূপ দেখিতেছি, তুই নিতান্তই আমার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিস।

অনন্তর চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে সমভিব্যাহারী লোকেরা বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে, চিরঞ্জীব নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া রাজপুরুষকে বলিলেন, দেখ, আমি এক্ষণে তোমার অবরোধে আছি ; এ অবস্থায় আমায় কি রূপে ছাড়িয়া দিবে ? ছাড়িয়া দিলে তুমি সম্পূর্ণ অপরাধী হইবে। তখন রাজপুরুষ চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন, আপনি উঁহারে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারিবেন না, উনি অবরোধে আছেন। এই কথা শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, অহে রাজপুরুষ! তুমি সমস্তই স্বচক্ষে দেখিতেছ ও স্বকর্ণে শুনিতেছ, তথাপি কোন্ বিবেচনায় উঁহারে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছ না ? উঁহার এই অবস্থা দেখিয়া, বোধ করি, তোমার আমোদ হইতেছে। রাজপুরুষ বলিলেন, আপনি অন্যায় অনুযোগ করিতেছেন ; উঁহাকে ছাড়িয়া দিলে আমি পাঁচ শত টাকার দায়ে পড়িব। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি আমায় উঁহারে লইয়া যাইতে দাও ; আমি ধর্মপ্রমাণ অঙ্গীকার করিতেছি, উঁহার ঋণ পরিশোধ না করিয়া তোমার নিকট হইতে যাইব না। তুমি আমায় উঁহার উত্তমর্ণের নিকটে লইয়া চল। কি জন্যে ঋণ হইল, তাঁহার মুখে শুনিয়া টাকা দিব। তদনন্তর তিনি বিদ্যাধরকে বলিলেন, তুমি উঁহারে সাবধানে বাটীতে লইয়া যাও, আমি এই রাজপুরুষের সঙ্গে চলিলাম। বিলাসিনি! তুমি আমার সঙ্গে এস। বিদ্যাধর! তোমরা বিলম্ব করিও না, চলিয়া যাও, সাবধান, যেন কোনও রূপে বন্ধন খুলিয়া পলাইতে না পারেন। অনন্তর, বিদ্যাধর দৃঢ়বদ্ধ চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে লইয়া প্রস্থান করিল।

বিদ্যাধর প্রভৃতি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে চন্দ্রপ্রভা রাজপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কোন্ ব্যক্তির অভিযোগে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, বল। তিনি বলিলেন, বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের ; আপনি কি তাঁহাকে জানেন ? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, হাঁ আমি তাঁহাকে জানি ; তিনি কি জন্যে কত টাকা পাইবেন, জান ? রাজপুরুষ বলিলেন, স্বর্ণকার এক ছড়া হার গড়িয়া দিয়াছেন, তাহার মূল্য পান নাই। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার জন্য হার গড়িতে দিয়াছেন, শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু এ পর্যন্ত হার দেখি নাই। অপরাজিতা বলিলেন, আজ আমার বাটীতে আহার করিতে গিয়া, উনি আমার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় লইয়া পলায়ন করিলে পর, কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে পথে আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল ; তখন উঁহার গলায় এক ছড়া নূতন গড়া হার দেখিয়াছি। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, যাহা বলিতেছ অসম্ভব নয় ; কিন্তু আমি কখনও সে হার দেখি নাই। যাহা হউক, অহে রাজপুরুষ! সত্বর আমায় স্বর্ণকারের নিকটে লইয়া চল ; তাঁহার নিকট সবিশেষ না শুনিলে প্রকৃত কথা জানিতে পারিতেছি না।

হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ভর্ৎসনা ও ভয়প্রদর্শনদ্বারা অপরাজিতাকে দূর করিয়া দিয়া, কিঙ্কর সমভিব্যাহারে যে রাজপথে গমন করিতেছিলেন, চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতিও সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। বিলাসিনী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া

চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন, দিদি ! কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! ঐ দেখ, তিনি ও কিঙ্কর উভয়েই বন্ধন খুলিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন। এখন কি উপায় হয় ? চন্দ্রপ্রভা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া রাজপথবাহী লোকদিগকে ও সমভিব্যাহারী রাজপুরুষকে বলিতে লাগিলেন, যে রূপে পার, তোমরা উঁহারে বদ্ধ করিয়া আমার নিকটে দাও। এই উপলক্ষে বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। চিরঞ্জীব দেখিলেন, যে মায়াবিনী মধ্যাহ্নকালে ধরিয়া বাটীতে লইয়া গিয়াছিল, সে এক্ষণে এক রাজপুরুষ সঙ্গে করিয়া আসিতেছে। ইহাতেই তিনি ও তাঁহার সহচর কিঙ্কর বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছিলেন ; পরে, তাঁহারা, বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তরবারি নিষ্কাশনপূর্বক প্রহারের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, চন্দ্রপ্রভা ও তাঁহার ভগিনীকে সম্ভাষণ করিয়া রাজপুরুষ বলিলেন, একে উঁহাদের উন্মাদ অবস্থা, তাহাতে আবার হস্তে তরবারি ; এ সময়ে বন্ধনের চেষ্টা পাইলে অনেকের প্রাণহানির সম্ভাবনা। আমি এ পরামর্শে নাই, তোমাদের যেরূপ অভিরুচি হয়, কর ; আমি চলিলাম, আর এখানে থাকিব না ; আমার বোধে তোমাদেরও পলায়ন করা ভাল। এই বলিয়া রাজপুরুষ চলিয়া গেলে চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী অধিক লোকের সংগ্রহের নিমিত্ত প্রয়াণ করিলেন।

সকলকে আকুল ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া, চিরঞ্জীব স্বীয় সহচরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কিঙ্কর ! এখানকার ডাকিনীরা তরবারি দেখিলে ভয় পায়। ভাগ্যে আমাদের সঙ্গে তরবারি ছিল ; নতুবা পুনরায় আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত, এবং অবশেষে কি করিত, বলিতে পারি না। কিঙ্কর বলিল, মহাশয় ! যিনি মধ্যাহ্নকালে আপনকার স্ত্রী হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, দেখিলাম, তিনিই সর্বাপেক্ষায় অধিক ভয় পাইয়াছেন এবং সর্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছেন। তরবারি ডাইন তাড়াইবার এমন মন্ত্র, তাহা আমি এত দিন জানিতাম না। চিরঞ্জীব বলিলেন, দেখ কিঙ্কর। যত শীঘ্র জাহাজে উঠিতে পারি ততই মঙ্গল ; এখানকার যেরূপ কাণ্ড তাহাতে কখন কি উপস্থিত হয় বলা যায় না। অতএব চল, পান্থনিবাসে গিয়া দ্রব্যসামগ্রী লইয়া সন্ধ্যার মধ্যেই জাহাজে উঠিব। কিঙ্কর বলিল, আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন ? আজকার রাত্রি এখানে থাকুন। উহারা কখনই আমাদের অনিষ্ট করিবেক না। আমরা প্রথমে উহাদিগকে যত ভয়ঙ্কর ভাবিয়াছিলাম, উহারা সেরূপ নহে। দেখুন, কেমন মিষ্ট কথা কয় ; বাটীতে লইয়া গিয়া কেমন উত্তম আহার করায় ; কখনও দেখা শুনা নাই, তথাপি পতিসম্ভাষণ করিয়া প্রণয় করিতে চায় ; আবার, প্রয়োজন জানাইলে অকাতরে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে। ইহাতেও যদি আমরা উহাদিগকে অভদ্র বলি, লোকে আমাদিগকে কৃতঘ্ন বলিবেক। আমি ত আপনকার সঙ্গে অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, কোথাও এরূপ সৌজন্য ও এরূপ বদান্যতা দেখি নাই। বলিতে কি মহাশয় ! আমি উহাদের ব্যবহার দেখিয়া এত মোহিত হইয়াছি যে, যদি পাকশালার হস্তিনী আমার স্ত্রী হইতে না চাহিত, তাহা

হইলে আমি নিঃসন্দেহ আহ্লাদিত চিত্তে এই রাজ্যে বাস করিতাম্। চিরঞ্জীব শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, অরে নির্বোধ। অধিক আর কি বলিব, যদি এ রাজ্যের অধিরাজপদ পাই, তথাপি আমি কোনও ক্রমে এখানে রাত্রিবাস করিব না। চল, আর বিলম্বে কাজ নাই; সন্ধ্যার মধ্যেই অর্ণবপোতে আরোহণ করিতে হইবেক। এই বলিয়া উভয়ে পান্থনিবাস অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজপুরুষ জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে লইয়া তদীয় আলয় অভিমুখে প্রয়াণ করিলে পর, উত্তমর্ণ বণিক্ অধমর্ণ স্বর্ণকারকে বলিলেন, তোমায় টাকা দিয়া পাইতে এত কষ্ট হইবেক, তাহা আমি একবারও মনে করি নাই। হয় ত এই টাকার গোলে আজ আমার যাওয়া হইল না; যাওয়া না হইলে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইব। এখন বোধ হইতেছে, সে সময়ে তোমার উপকার করিয়া ভাল করি নাই। স্বর্ণকার সাতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আর আমায় লজ্জা দিবেন না; আমি আপনকার আবশ্যক সময়ে টাকা দিতে না পারিয়া মরিয়া রহিয়াছি। চিরঞ্জীববাবু যে আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। উনি যে হার লইয়া পাই নাই বলিবেন, অথবা টাকা দিতে আপত্তি করিবেন, এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয় নাই। আপনি এ সন্দেহ করিবেন না যে আমি উঁহাকে হার দি নাই, কেবল আপনকার সঙ্গে ছল করিতেছি। আমি ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, চারি দণ্ড পূর্বে আমি নিজে উঁহার হস্তে হার দিয়াছি। উনি সে সময়ে মূল্য দিতে চাহিয়াছিলেন; আমার কুবুদ্ধি, আমি বলিলাম, এখন কার্যান্তরে যাইতেছি; পরে সাক্ষাৎ করিব ও মূল্য লইব। উনি কিন্তু সে সময়ে বলিয়াছিলেন, এখন যদি না লও, পরে আর পাইবার সম্ভাবনা থাকিবেক না। তৎকালে কি অভিপ্রায়ে উনি এ কথা বলিয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু কার্যগতিকে উঁহার কথাই ঠিক হইতেছে।

স্বর্ণকারের এই সকল কথা শুনিয়া বণিক্ জিজ্ঞাসা করিলেন, বলি চিরঞ্জীববাবু লোক কেমন? বসুপ্রিয় বলিলেন, উনি জয়স্থলে সর্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় ব্যক্তি। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উঁহাকে জানে এবং সকলেই উঁহাকে ভাল বাসে। উনি সকল সমাজে সমান আদরণীয় ও সর্ব প্রকারে প্রশংসনীয় ব্যক্তি। ঐশ্বর্য ও আধিপত্য বিষয়ে এ রাজ্যে উঁহার তুল্য লোক নাই। কখনও কোনও বিষয়ে উঁহার কথা অন্যথা হয় না। পরোপকারার্থে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। উনি যে আজ আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিলেন, শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবেক না। এই সকল কথা শুনিয়া বণিক্ বলিলেন, আমরা আর এখানে অনর্থক বসিয়া থাকি কেন? চল, উঁহার বাটীতে যাই; তাহা লইলে শীঘ্র টাকা পাইব, এবং হয় ত আজই যাইতে পারিব। অনন্তর বসুপ্রিয় ও বণিক্ উভয়ে চিরঞ্জীবের ভবন অভিমুখে গমন করিলেন।

এই সময়ে, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব কিঙ্কর সমভিব্যাহারে পান্থনিবাসে প্রতিগমন করিতেছিলেন। বণিক্ দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বসুপ্রিয়কে বলিলেন, আমার বোধ হয়, চিরঞ্জীববাবু আসিতেছেন। বসুপ্রিয় বলিলেন, হাঁ তিনিই বটে; আর, আমার নির্মিত হারও উঁহার গলায় রহিয়াছে, দেখিতেছি; অথচ দেখুন, আপনকার সমক্ষে উনি স্পষ্ট বাক্যে বারংবার হার পাই নাই বলিলেন, এবং আমার সঙ্গে কত বিবাদ ও কত বাদানুবাদ করিলেন। এই বলিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, চিরঞ্জীববাবু! আমি আজ আপনকার আচরণ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। আপনি কেবল আমায় কষ্ট দিতেছেন ও অপদস্থ করিতেছেন, এরূপ নহে; আপনকারও বিলক্ষণ অপযশ হইতেছে। এখন হার পরিয়া রাজপথে বেড়াইতেছেন; কিন্তু তখন অনায়াসে শপথপূর্বক হারপ্রাপ্তির অপলাপ করিলেন। আপনকার এইরূপ ব্যবহারে এই এক ভদ্র লোকের কত কার্যক্ষতি হইল, বলিবার নয়। উনি স্থানান্তরে যাইবার সমুদয় স্থির করিয়াছিলেন; এত ক্ষণ কোন্ কালে চলিয়া যাইতেন; কেবল আমাদের বিবাদের জন্যে যাইতে পারিলেন না। তখন অনায়াসে হারপ্রাপ্তির অপলাপ করিয়াছেন, এখনও কি করিবেন?

বসুপ্রিয়ের এই কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে এই হার পাইয়াছি বটে; কিন্তু এক বারও তাহা অস্বীকার করি নাই; তুমি সহসা আমার উপর এরূপ দোষারোপ করিতেছ কেন? তখন বণিক্ বলিলেন, হাঁ আপনি অস্বীকার করিয়াছেন, এবং হার পাই নাই বলিয়া বারংবার শপথ পর্যন্ত করিয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি শপথ ও অস্বীকার করিয়াছি, তাহা কে শুনিয়াছে? বণিক্ বলিলেন, আমি নিজে স্বকর্ণে শুনিয়াছি। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, আপনকার মত নরাধমেরা ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিতে পায়। শুনিয়া কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, তুই বেটা বড় পাজি ও বড় ছোট লোক; অকারণে আমায় কটূ বলিতেছিস। আমি ভদ্র কি অভদ্র, তাহা এখনই তোরে শিখাইতেছি। মর বেটা পাজি, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। এই বলিয়া তিনি তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন; এবং বণিকও তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইলেন।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা কতকগুলি লোক সঙ্গে করিয়া সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং, বণিকের সহিত হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া, স্বীয় পতি জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এই বোধে, সাতিশয় কাতরতা-প্রদর্শনপূর্বক বণিক্‌কে বলিলেন, দোহাই ধর্মের, উঁহারে প্রহার করিবেন না; উনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় কোনও কারণে উঁহার উপর রাগ করা উচিত নয়। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছি, দয়া করিয়া ক্ষান্ত হউন। এই বলিয়া তিনি সঙ্গের লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা কৌশল করিয়া উঁহার হাত হইতে তরবারি ছাড়াইয়া লও, এবং প্রভু ও ভৃত্য উভয়কে বদ্ধ করিয়া বাটীতে লইয়া চল। চন্দ্রপ্রভাকে সহসা সমাগত দেখিয়া ও তদীয় আদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কিঙ্কর চিরঞ্জীবকে

বলিল, মহাশয়! আবার সেই মায়াবিনী ঠাকুরাণী আসিয়াছেন; আর এখানে দাঁড়াইবেন না, পলায়ন করুন, নতুবা নিস্তার নাই। এই বলিয়া সে চারি দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া বলিল, মহাশয়! আসুন, এই দেবালয়ে প্রবেশ করি; তাহা হইলে আমাদের উপর কেহ আর অত্যাচার করিতে পারিবেক না। তৎক্ষণাৎ উভয়ে দৌড়িয়া পার্শ্ববর্তী দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনী, ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারের লোক সকল দেবালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। এই গোলযোগ উপস্থিত দেখিয়া রাজপথবাহী লোক সকলও তথায় সমবেত হইতে লাগিল।

ঐ দেবালয়ের কার্যপর্যবেক্ষণের সমস্ত ভার এক বর্ষীয়সী তপস্বিনীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইনি যার পর নাই সুশীলা ও নিরতিশয় দয়াশীলা ছিলেন; এবং সুচারুরূপে দেবালয়ের কার্যসম্পাদন করিতেন; এজন্য, জয়স্থলবাসী যাবতীয় লোকের বিলক্ষণ ভক্তিভাজন ও সাতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। অভ্যন্তর হইতে অকস্মাৎ বিষম গোলযোগ শুনিয়া, কারণ জানিবার নিমিত্ত তিনি দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন এবং সমবেত লোকদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কি জন্যে তোমরা এখানে গোলযোগ করিতেছ। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার উন্মাদগ্রস্ত স্বামী পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে ও আমার লোকদিগকে ভিতরে যাইতে দেন; আমরা তাঁহারে বদ্ধ করিয়া বাটী লইয়া যাইব। তপস্বিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কত দিন তিনি এই দুর্দান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, পাঁচ সাত দিন হইতে তাঁহাকে সর্বদাই বিরক্ত, অন্যমনস্ক, ও দুর্ভাবনায় অভিভূত দেখিতাম; কিন্তু আজ আড়াই প্রহরের সময় অবধি এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়াছেন। এই বলিয়া তিনি সঙ্গের লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা ভিতরে গিয়া তাঁহাকে ও কিঙ্করকে বদ্ধ করিয়া সাবধানে লইয়া আইস। তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! তোমার একটি লোকও দেবালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবেক না। তখন চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তবে আপনকার লোকদিগকে বলুন, তাহারাই বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আমার নিকটে আনিয়া দিউক। তপস্বিনী বলিলেন, তাহাও হইবেক না; তিনি যখন এই দেবালয়ে আশ্রয় লইয়াছেন, তখন যত ক্ষণ বা যত দিন ইচ্ছা হয়, তিনি সচ্ছন্দে এখানে থাকিবেন; সে সময়ে তোমার বা অন্য কোনও ব্যক্তির তাঁহার উপর কোনও অধিকার থাকিবেক না। আমি তাঁহার চিকিৎসার ও শুশ্রূষার সমস্ত ভার লইতেছি। তিনি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলে আপন আলয়ে যাইবেন। এ অবস্থায় আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে তোমার হস্তে সমর্পিত করিতে পারিব না।

এই সকল কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন; আমি যেমন যত্নপূর্বক চিকিৎসা করাইব ও পরিচর্যা করিব, অন্যের সেরূপ করা সম্ভব নহে। আপনি তাঁহাকে আমার হস্তে সমর্পিত করুন। তখন তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! এত উতলা হইতেছ কেন, ধৈর্য অবলম্বন কর।

আমি অনেকবিধ মন্ত্র, ঔষধ, ও চিকিৎসা জানি, এবং এ পর্যন্ত শত শত লোকের শারীরিক ও মানসিক রোগের শান্তি করিয়াছি। যেরূপ শুনিতেছি, আমি অল্প কালের মধ্যেই তোমার স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিব ; তখন তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপন ভবনে প্রতিগমন করিবেন। আমাদের তপস্যার ও ধর্মচর্যার যেরূপ নিয়ম, এবং দেবালয়ের কার্যনির্বাহ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়মাবলী প্রচলিত আছে, তদনুসারে, যখন তোমার স্বামী এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অনিচ্ছায় বলপূর্বক তাঁহাকে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারি না। অতএব, বৎসে! প্রস্থান কর ; যাবৎ তিনি আরোগ্যলাভ না করিতেছেন, আমার নিকটেই থাকুন ; তাঁহার চিকিৎসা বা শুশ্রূষা বিষয়ে কোনও অংশে অণুমাত্র ত্রুটি হইবেক না, যে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কখনও এখান হইতে যাইব না। আমার অনিচ্ছায় ও অসম্মতিতে আমার স্বামীকে এখানে রুদ্ধ করিয়া রাখা কোনও মতে আপনকার উচিত হইতেছে না। আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ অনুধাবন না করিয়াই আমায় এখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! তুমি এ বিষয়ে অনর্থক আগ্রহপ্রকাশ করিতেছ ; তোমার সঙ্গে বৃথা বাদানুবাদ করিব না। আমি এক কথায় বলিতেছি, তোমার স্বামী সুস্থ না হইলে তুমি কখনও তাঁহাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিবে না ; এখন আপন আলয়ে প্রতিগমন কর।

এই বলিয়া তপস্বিনী দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ হইল ; সুতরাং আর কাহারও তথায় প্রবেশ করিবার পথ রহিল না। চন্দ্রপ্রভার এইরূপ অবমাননা দর্শনে বিলাসিনী অতিশয় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, দিদি! আর এখানে দাঁড়াইয়া ভাবিলে ও বৃথা কালহরণ করিলে কি ফল হইবেক বল ; চল আমরা অধিরাজ বাহাদুরের নিকটে গিয়া এই অহঙ্কারিণী তপস্বিনীর অন্যায় আচরণ বিষয়ে অভিযোগ করি ; তিনি অবশ্যই বিচার করিবেন। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, বিলাসিনি! তুমি বিলক্ষণ বুদ্ধির কথা বলিয়াছ ; চল, তাঁহার নিকটেই যাই। তিনি যত ক্ষণ না স্বয়ং এখানে আসিয়া আমার স্বামীকে বলপূর্বক দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমার হস্তে দিতে সম্মত হন, তাবৎ আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে ছাড়িব না ; তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিব এবং অবিশ্রামে অশ্রুবিসর্জন করিব। এই কথা শুনিয়া বণিক্ বলিলেন, আপনারা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে এইখানেই অধিরাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবেক। আমি অবধারিত জানি, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে তিনি এই পথ দিয়া বধ্যভূমিতে যাইবেন। বেলার অবসান হইয়াছে ; সায়ংকাল আগতপ্রায় ; তাঁহার আসিবার আর বড় বিলম্ব নাই। বসুপ্রিয় জিজ্ঞাসিলেন, তিনি কি জন্য এ সময়ে বধ্যভূমিতে যাইবেন ? বণিক্ বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই, হেমকূটের এক বৃদ্ধ বণিক্ জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; সেই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে ; তাঁহার শিরশ্ছেদনকালে অধিরাজ বাহাদুর স্বয়ং বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকিবেন। বিলাসিনী চন্দ্রপ্রভাকে

বলিলেন, অধিরাজ বাহাদুর দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তুমি তাঁহার চরণে ধরিয়া বিচার প্রার্থনা করিবে, কোনও মতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইবে না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, অধিরাজ বিজয়বল্লভ, রাজপুরুষগণ ও বধ্যবেশধারী সোমদত্ত প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র চন্দ্রপ্রভা তাঁহার সম্মুখবর্তিনী হইয়া অঞ্জলিবন্ধপূর্বক বিনীত বচনে বলিলেন, মহারাজ! এই দেবালয়ের কর্ত্রী তপস্বিনী আমার উপর যার পর নাই অত্যাচার করিয়াছেন; আপনারে অনুগ্রহ করিয়া বিচার করিতে হইবেক। শুনিয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, তিনি অতি সুশীলা ধর্মশীলা প্রবীণা নারী, কোনও ক্রমে অন্যায় আচরণ করিবার লোক নহেন; তুমি কি কারণে তাঁহার নামে অত্যাচারের অভিযোগ করিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, মহারাজ! আমি মিথ্যা অভিযোগ করিতেছি না; কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া আমার নিবেদন শুনিতে হইবেক। আপনি যে ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার পরিচারক কিঙ্কর উভয়ে উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, এবং রাজপথে ও লোকের বাটীতে অনেকপ্রকার অত্যাচার করিতেছেন; এই সংবাদ পাইয়া এক বার অনেক যত্নে বন্ধনপূর্বক তাঁহাকে ও কিঙ্করকে বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া, কোনও কার্যবশতঃ বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের আলয়ে যাইতেছিলাম, ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলাম, তিনি ও কিঙ্কর বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন। আমি পুনরায় তাঁহাদিগকে বাটীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইলাম। উভয়েই এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। আমাদিগকে দেখিবামাত্র উভয়েই তরবারি হস্তে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে আমার সঙ্গে অধিক লোক ছিল না, এজন্য আমি তৎক্ষণাৎ বাটী গিয়া লোকসংগ্রহপূর্বক তাঁহাকে ও কিঙ্করকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলাম। এবার আমাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইয়া উভয়ে এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইতেছিলাম, এমন সময়ে এখানকার কর্ত্রী তপস্বিনী দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। অনেক বিনয় করিয়া বলিলাম; কিন্তু তিনি কোনও ক্রমে আমায় তাঁহাকে লইয়া যাইতে দিবেন না। আমি তাঁহাকে এ অবস্থায় এখানে রাখিয়া কেমন করিয়া বাটীতে নিশ্চিন্ত থাকিব? মহারাজ! যাহাতে আমি অবিলম্বে তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যাইতে পারি, অনুগ্রহপূর্বক তাহার উপায় করিয়া দেন; নতুবা আমি আপনাকে যাইতে দিব না।

এই বলিয়া চন্দ্রপ্রভা অধিরাজের চরণে নিপতিত হইয়া রহিলেন, এবং অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অধিরাজের অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি পার্শ্ববর্তী রাজপুরুষকে বলিলেন, তুমি দেবালয়ের কর্ত্রীকে আমার নমস্কার জানাইয়া এক বার ক্ষণ কালের জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বল; অনন্তর তিনি চন্দ্রপ্রভার হস্তে ধরিয়া ভূতল হইতে উঠাইলেন; বলিলেন, বৎসে! শোকসংবরণ কর; এ বিষয়ে মীমাংসা না করিয়া আমি এখান হইতে যাইতেছি না।

এই সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া অতি আকুল বচনে চন্দ্রপ্রভাকে বলিতে লাগিল, মা ঠাকুরাণি। যদি প্রাণ বাঁচাইতে চান, অবিলম্বে কোনও স্থানে লুকাইয়া থাকুন। কর্তা মহাশয় ও কিঙ্কর উভয়ে বন্ধনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং দাসদাসীকে প্রহার করিয়া দৃঢ় রূপে বন্ধনপূর্বক বিদ্যাধর মহাশয়ের দাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছেন ; পরে আগুন নিভাইবার জন্য ময়লা জল আনিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিতেছেন। বিদ্যাধর মহাশয়ের উপর প্রভুর যেরূপ রাগ দেখিলাম, তাহাতে হয়ত তাঁহার প্রাণবধ করিবেন। এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় করুন এবং আপনি সাবধান হউন। শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, অরে নির্বোধ! তুই মিথ্যা বলিতেছিস ; তোর প্রভু ও কিঙ্কর উভয়ে কিছু পূর্বে এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ভৃত্য বলিল, মা ঠাকুরাণি! আমি মিথ্যা বলিতেছি না। তিনি বন্ধনচ্ছেদনপূর্বক দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলে, আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছি। এই কথা বলিতে বলিতে চিরঞ্জীবের তর্জন গর্জন শুনিতে পাইয়া সে বলিল, মা ঠাকুরাণি! আমি তাঁহার চীৎকার শুনিতে পাইতেছি ; বোধ হয়, এখানেই আসিতেছেন ; আপনি সাবধান হউন। তিনি বারংবার বলিয়াছেন, আপনাকে পাইলে নাক কান কাটিয়া হৃতশ্রী করিয়া দিবেন। সত্বর পলায়ন করুন, কদাচ এখানে থাকিবেন না। চন্দ্রপ্রভা ভয়ে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, বৎসে! ভয় নাই ; আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াও। এই বলিয়া তিনি রক্ষকদিগকে বলিলেন, কাহাকেও নিকটে আসিতে দিও না।

চিরঞ্জীবকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া চন্দ্রপ্রভা অধিরাজ বাহাদুরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, মহারাজ! কি আশ্চর্য দেখুন। প্রথমতঃ আমি উঁহারে দৃঢ় রূপে বদ্ধ করাইয়া বাটীতে পাঠাই ; কিঞ্চিৎ পরেই উঁহারে রাজপথে দেখিতে পাই ; তত অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধনচ্ছেদনপূর্বক রাজপথে উপস্থিত হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে। তৎপরে পলাইয়া এইমাত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। দেবালয়ে প্রবেশনির্গমের এক বই পথ নাই ; বিশেষতঃ আমরা সকলে দ্বারদেশে সমবেত আছি ; ইতোমধ্যে কেমন করিয়া দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বলিতে কি মহারাজ! উঁহার আজকার কাজ সকল মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিবেচনার অগম্য। এই সময়ে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব উন্মত্তের ন্যায় বিশৃঙ্খল বেশে অধিরাজের সম্মুখদেশে উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, দোহাই মহারাজের! আজ আমার উপর ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে ; আমি জন্মাবচ্ছেদে কখনও এরূপ অপদস্থ ও অপমানিত হই নাই, এবং কখনও এরূপ লাঞ্ছনাভোগ ও এরূপ যাতনাভোগ করি নাই। আমার স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত সাধুশীলার ন্যায় আপনকার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন ; কিন্তু আমি উঁহার তুল্য দুশ্চারিণী নারী আর দেখি নাই। কতকগুলি ইতরের সংসর্গে কালযাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; এবং, তাহাদের কুমন্ত্রণায় আজ আমায় যে যন্ত্রণা দিয়াছেন, এবং আমার যে দুরবস্থা করিয়াছেন, তাহা বর্ণন

করিবার নয়। আপনারে নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে হইবেক; নতুবা আমি আত্মঘাতী হইব।

চিরঞ্জীবের অভিযোগ শুনিয়া অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, তোমার উপর কি অত্যাচার হইয়াছে, বল; যদি বাস্তবিক হয়, অবশ্য প্রতিকার করিব। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! আজ মধ্যাহ্নকালে আহারের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, এবং সেই সময়ে কতকগুলি ইতর লোক লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন। শুনিয়া অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। অনন্তর তিনি চন্দ্রপ্রভাকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! এ বিষয়ে তোমার কিছু বলিবার আছে? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, মহারাজ! উনি অমূলক কথা বলিতেছেন। আজ মধ্যাহ্নকালে, উনি, আমি, বিলাসিনী, তিন জনে একত্র আহার করিয়াছি; এ কথা যদি অন্যথা হয়, আমার যেন নরকেও স্থান না হয়। বিলাসিনী বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমরা তিন জনে এক সঙ্গে আহার করিয়াছি; দিদি আপনকার নিকট একটিও অলীক কথা বলেন নাই। উভয়ের কথা শুনিয়া বসুপ্রিয় স্বর্ণকার বলিলেন, মহারাজ! আমি ইঁহাদের তুল্য মিথ্যাবাদিনী কামিনী ভূমণ্ডলে দেখি নাই; উভয়েই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতেছেন। চিরঞ্জীববাবু আজ উন্মাদগ্রস্তই হউন, আর যাই হউন, উনি যে অভিযোগ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আপনি এই দুই দুশ্চারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।

অনন্তর, চিরঞ্জীব নিজ দুরবস্থার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নির্দিষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! আমি মত্ত বা উন্মত্ত কিছুই হই নাই। কিন্তু, আজ আমার উপর যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, যাহার উপর সেরূপ হইবেক, সেই উন্মত্ত হইবেক। প্রথমতঃ আহারের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই; তৎকালে বসুপ্রিয় স্বর্ণকার ও রত্নদত্ত বণিক্ আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি ক্রোধভরে দ্বারভঙ্গে উদ্যত হইয়াছিলাম; রত্নদত্ত অনেক বুঝাইয়া, আমায় ক্ষান্ত করিলেন। পরে আমি বসুপ্রিয়কে সত্বর আমার নিকট হার লইয়া যাইতে বলিয়া রত্নদত্ত সমভিব্যাহারে অপরাজিতার বাটীতে আহার করিলাম। বসুপ্রিয়ের আসিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে আমি উঁহার অন্বেষণে নির্গত হইলাম। পথিমধ্যে উঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তৎকালে ঐ বণিক্‌টি উঁহার সঙ্গে ছিলেন। বসুপ্রিয় বলিলেন, কিঞ্চিৎ পূর্বে আমি তোমায় হার দিয়াছি, টাকা দাও। কিন্তু, জগদীশ্বর সাক্ষী, আমি এ পর্যন্ত হার দেখি নাই। উনি তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষ দ্বারা আমায় অবরুদ্ধ করাইলেন। পরে নিরুপায় হইয়া আমার পরিচারক কিঙ্করকে দেখিতে পাইয়া টাকা আনিবার জন্য বাটীতে পাঠাইলাম। সে যে গেল, সেই গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। আমি অনেক বিনয়ে সম্মত করিয়া, রাজপুরুষকে সঙ্গে লইয়া, বাটী যাইতেছিলাম, এমন সময়ে আমার স্ত্রী ও উঁহার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম, উঁহাদের

সঙ্গে কতকগুলি ইতর লোক রহিয়াছে; আর, আমাদের পল্লীতে বিদ্যাধর নামে একটা হতভাগা গুরুমহাশয় আছে, তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছেন। সে, লোকের নিকট, চিকিৎসক বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। তাহার মত দুশ্চরিত্র নরাধম ভূমণ্ডলে নাই। সেই দুরাত্মা আজ কাল আমার স্ত্রীর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছে। সে আমায় দেখিয়া বলিল, আমি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি। অনন্তর, তদীয় উপদেশ অনুসারে আমাকে ও কিঙ্করকে বদ্ধ করিয়া বাটীতে লইয়া গেল, এবং এক দুর্গন্ধপূর্ণ অন্ধকারময় গৃহে বদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া দিল। আমরা অনেক কষ্টে দন্ত দ্বারা বন্ধনচ্ছেদনপূর্বক পলাইয়া আপনকার সমীপে সমুদয় নিবেদন করিতে যাইতেছিলাম; ভাগ্যক্রমে এই স্থানে আপনকার সাক্ষাৎ পাইলাম। আপনি সাক্ষাৎ ধর্মের অবতার, এ রাজ্যে ন্যায় অন্যায় বিচারের একমাত্র কর্তা। আমার প্রার্থনা এই, যথার্থ বিচার করিয়া অপরাধীর সমুচিত দণ্ডবিধান করেন। আমি আপনকার সমক্ষে যে সকল কথা বলিলাম, যদি ইহার একটিও মিথ্যা হয়, আপনি আমার প্রাণদণ্ড করিবেন।

এই বলিয়া চিরঞ্জীব বিরত হইবামাত্র বসুপ্রিয় বলিলেন, মহারাজ! উনি আহারের সময় বাটীতে প্রবেশ করিতে পান নাই, এবং বাটীতে আহার করেন নাই, আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি; তৎকালে আমি উঁহার সঙ্গে ছিলাম। অধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উঁহারে হার দিয়াছ কি না, বল। বসুপ্রিয় বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমি স্বয়ং উঁহার হস্তে হার দিয়াছি। উনি কিঞ্চিৎ পূর্বে যখন পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করেন, উঁহার গলায় ঐ হার ছিল, ইঁহারা সকলে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। বণিক্ বলিলেন, মহারাজ! যখন উঁহার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, তখন এক বারে হারপ্রাপ্তির অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু, দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকার-কালে, হার পাইয়াছি বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমি উঁহার স্বীকার ও অস্বীকার উভয়ই স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তৎপরে কথায় কথায় বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়েই তরবারি লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিলাম; এমন সময়ে উনি পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করেন; এক্ষণে দেবালয় হইতে বহির্গত হইয়া আপনকার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! এ জন্মে আমি এ দেবালয়ে প্রবেশ করি নাই; বণিকের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই; বসুপ্রিয় কখনই আমার হস্তে হার দেন নাই। উঁহারা আমার নামে এ তিনটি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন।

এই সমস্ত অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ শ্রবণগোচর করিয়া অধিরাজ বলিলেন, ঈদৃশ দুরূহ বিষয় কখনও আমার সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। আমার বোধ হয়, তোমাদের সকলেরই দৃষ্টিক্ষয় ও বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিয়াছে। তোমরা সকলেই বলিতেছ, চিরঞ্জীব এইমাত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছে; যদি দেবালয়ে প্রবেশ করিত, এখনও দেবালয়েই থাকিত। তোমরা বলিতেছ, চিরঞ্জীব উন্মত্ত হইয়াছে; যদি উন্মত্ত হইত, তাহা হইলে

এরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে এত ক্ষণ আমার সমক্ষে অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ করিতে পারিত না। তোমরা দুই ভগিনীতে বলিতেছ, চিরঞ্জীব বাটীতে আহার করিয়াছে; কিন্তু বসুপ্রিয় তৎকালে তাহার সঙ্গে ছিল; সে বলিতেছে, চিরঞ্জীব বাটীতে আহার করে নাই। এই বলিয়া তিনি কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কি রে, তুই কি জানিস বল্। সে বলিল, মহারাজ! কর্তা আজ মধ্যাহ্নকালে অপরাজিতার বাটীতে আহার করিয়াছেন। অপরাজিতা বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আজ চিরঞ্জীববাবু আমার বাটীতে আহার করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে আমার অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমি এই অঙ্গুরীয়টি উঁহার অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া লইয়াছি, যথার্থ বটে। অধিরাজ অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন, তুমি কি চিরঞ্জীবকে দেবালয়ে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ? অপরাজিতা বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি প্রত্যুক্তি শ্রবণগোচর করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিরাজ বলিলেন, আমি এমন অদ্ভুত কাণ্ড কখনও দেখি নাই ও শুনি নাই। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তোমরা সকলেই উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছ। অনন্তর তিনি এক রাজপুরুষকে বলিলেন, আমার নাম করিয়া তুমি দেবালয়ের কর্ত্রীকে অবিলম্বে এখানে আসিতে বল; দেখা যাউক, তিনিই বা কিরূপ বলেন। রাজপুরুষ, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

চিরঞ্জীব অধিরাজের সম্মুখবর্তী হইবামাত্র, সোমদত্ত তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যদি শোকে ও দুরবস্থায় পড়িয়া আমার নিতান্তই বুদ্ধির ভ্রংশ ও দর্শনশক্তির ব্যতিক্রম না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এ ব্যক্তি আমার পুত্র চিরঞ্জীব, ও অপর ব্যক্তি উহার পরিচারক কিঙ্কর, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তিনি চিরঞ্জীবকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়াছিলেন, কেবল অভিযোগের ও প্রত্যভিযোগের গোলযোগে অবকাশ পান নাই; এক্ষণে অধিরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! যদি অনুমতি হয়, কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। অধিরাজ বলিলেন, যাহা ইচ্ছা হয় সচ্ছন্দে বল, কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না। সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! এত ক্ষণের পর এই জনতার মধ্যে আমি একটি আত্মীয় দেখিতে পাইয়াছি; বোধ করি, তিনি টাকা দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিতে পারেন। অধিরাজ বলিলেন, সোমদত্ত! যদি কোনও রূপে তোমার প্রাণরক্ষা হয়, আমি কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হই, বলিতে পারি না। তুমি তোমার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমার প্রাণরক্ষার্থে এই মুহূর্তে পাঁচ সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন কি না। তখন সোমদত্ত চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন গো বাবা! তোমার নাম চিরঞ্জীব ও তোমার পরিচারকের নাম কিঙ্কর বটে? বধ্যবেশধারী অপরিচিত বৈদেশিক ব্যক্তি অকস্মাৎ এরূপ

প্রশ্ন করিলেন কেন, ইহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া চিরঞ্জীব এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, তুমি নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় আমার দিকে চাহিয়া রহিলে কেন ? তুমি ত আমায় বিলক্ষণ জান। চিরঞ্জীব বলিলেন, না মহাশয়। আপনারে চিনিতে পারিতেছি না, এবং ইহার পূর্বে কখনও আপনাকে দেখিয়াছি এরূপ মনে হইতেছে না। সোমদত্ত বলিলেন, তোমার সঙ্গে শেষ দেখার পর শোকে ও দুর্ভাবনায় আমার আকৃতির এত পরিবর্ত হইয়াছে যে, আমায় চিনিতে পারা সম্ভব নহে ; কিন্তু তুমি কি আমার স্বর চিনিতে পারিতেছ না ? চিরঞ্জীব বলিলেন, না মহাশয় ! আমি আর কখনও আপনকার স্বর শুনি নাই। তখন সোমদত্ত কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন কিঙ্কর ! তুমিও কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না। কিঙ্কর বলিল, যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন, তবে বলি, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না। অনন্তর সোমদত্ত চিরঞ্জীবকে বলিলেন, আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তুমি আমায় চিনিতে পারিয়াছ। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমারও নিশ্চিত বোধ হইতেছে, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না ; চিনিলে অস্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আর, যখন আমি বারংবার বলিতেছি, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না, তখন আমার কথায় অবিশ্বাস করিবারও কোনও কারণ দেখিতেছি না।

চিরঞ্জীবের কথা শুনিয়া, সোমদত্ত বিষণ্ণ ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে এই সাত বৎসরে আমার স্বরের ও আকৃতির এত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে যে, একমাত্র পুত্র চিরঞ্জীবও আজ আমায় চিনিতে পারিল না। যদিও আমি জরায় জীর্ণ ও শোকে শীর্ণ হইয়াছি, এবং আমার বুদ্ধিশক্তি, দর্শনশক্তি, ও শ্রবণশক্তির প্রায় লোপাপত্তি হইয়াছে, তথাপি তোমার স্বর শুনিয়া ও আকৃতি দেখিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, তুমি আমার পুত্র ; এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় হইতেছে না। শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, মহাশয় ! আপনি সাত বৎসরের কথা কি বলিতেছেন, জ্ঞান হওয়া অবধি আমি আমার পিতাকে দেখি নাই। সোমদত্ত বলিলেন, বৎস ! যা বল না কেন, সাত বৎসর মাত্র তুমি হেমকূট হইতে প্রস্থান করিয়াছ। এই অল্প সময়ে এক কালে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছ, ইহাতে আমি আশ্চর্যজ্ঞান করিতেছি। অথবা, আমার অবস্থার বৈগুণ্যদর্শনে, এত লোকের সমক্ষে আমায় পিতা বলিয়া অঙ্গীকার করিতে তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহাশয় ! আমি জন্মাবচ্ছেদে কখনও হেমকূট নগরে যাই নাই ; অধিরাজ বাহাদুর নিজে, এবং নগরের যে সকল লোক আমায় জানেন, সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন ; আমি আপনকার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতেছি না। তখন অধিরাজ বলিলেন, সোমদত্ত ! চিরঞ্জীব বিংশতি বৎসর আমার নিকটে রহিয়াছে ; এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে ও যে কখনও হেমকূট নগরে যায় নাই, আমি তাহার সাক্ষী। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, শোকে, দুর্ভাবনায়, ও প্রাণদণ্ডভয়ে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই তুমি এই সমস্ত অসম্বদ্ধ কথা বলিতেছ। সোমদত্ত নিতান্ত নিরুপায়

ভাবিয়া নিরস্ত হইলেন, এবং দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্বক অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

এই সময়ে, দেবালয়ের কর্ত্রী, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে সমভিব্যাহারে লইয়া, অধিরাজের সম্মুখবর্তিনী হইলেন, এবং বহুমানপুরঃসর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, মহারাজ! এই দুই বৈদেশিক ব্যক্তির উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইয়াছে; আপনাকে তাহার বিচার করিতে হইবেক। ভাগ্যক্রমে ইঁহারা দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন; নতুবা ইঁহাদের প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটিতে পারিত।

এককালে দুই চিরঞ্জীব ও দুই কিঙ্কর দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, সমবেত ব্যক্তিবর্গ বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভা দুই স্বামী উপস্থিত দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব সোমদত্তকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং তদীয় দুরবস্থা দর্শনে সজল নয়নে জিজ্ঞাসিলেন, পিতঃ! আমি সাত বৎসর মাত্র আপনকার সহিত বিযোজিত হইয়াছি; এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনকার আকৃতির এত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে যে, সহসা চিনিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, আপনকার শরীরে বধ্যবেশ লক্ষিত হইতেছে কেন? হেমকূটবাসী কিঙ্করও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিল এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে জিজ্ঞাসিল, মহাশয়! কে আপনারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, বলুন। দেবালয়ের কর্ত্রীও কিয়ৎ ক্ষণ অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া সোমদত্তকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে কিঙ্করের কথা শুনিয়া বাষ্পাকুল লোচনে শোকাকুল বচনে বলিলেন, যে বন্ধন করুক, আমি উঁহার বন্ধনমোচন করিতেছি। অনন্তর তিনি সোমদত্তকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন মহাশয়! আপনকার স্মরণ হয়, আপনি লাবণ্যময়ীনাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ দুর্ভগার গর্ভে সর্বাংশে একাকৃতি দুই যমজ কুমার জন্মগ্রহণ করে। আমি সেই হতভাগা লাবণ্যময়ী, অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি। এ জন্মে আর যে আপনকার দর্শন পাইব, এক মুহূর্তের জন্যেও আমার সে আশা ছিল না। যদি পূর্ব বৃত্তান্তের স্মরণ থাকে,—

এই বলিতে বলিতে লাবণ্যময়ীর কণ্ঠরোধ হইল। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সহসা চিরঞ্জীবের মুখ দেখিয়া ও তদীয় অমৃতময় সম্ভাষণবাক্য শুনিয়া, সোমদত্তের হৃদয়কন্দর অনির্বচনীয় আনন্দসলিলে উচ্ছলিত হইয়াছিল; এক্ষণে আবার লাবণ্যময়ীর উদ্দেশ পাইয়া যেন তিনি অমৃতসাগরে অবগাহন করিলেন, এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে বলিলেন, প্রিয়ে! আমি যেরূপ হতভাগ্য, তাহাতে পুনরায় তোমার ও চিরঞ্জীবের মুখনিরীক্ষণ করিব, কোনও রূপে সম্ভব নহে। তোমাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বটে, কিন্তু তুমি যে বাস্তবিক লাবণ্যময়ী, আর ও যে বাস্তবিক চিরঞ্জীব, এখনও আমার সে বিশ্বাস হইতেছে না। বলিতে কি, আমি এই সমস্ত স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতেছি। যাহা হউক, যদি তুমি যথার্থই লাবণ্যময়ী হও, আমার

বল, যে পুত্রটির সহিত এক গুণবৃক্ষে বদ্ধ হইয়া সমুদ্রে ভাসিয়াছিলে, সে কোথায় গেল ? সে কি অদ্যাপি জীবিত আছে ? এই কথার শ্রবণমাত্র লাবণ্যময়ীর নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার বাক্যনিঃসরণ হইল না। পরে কিঞ্চিৎ অংশে শোকাবেগের সংবরণ করিয়া তিনি নিরতিশয় করুণ স্বরে বলিলেন, নাথ! তোমার কথা শুনিয়া আমার চিরপ্রসুপ্ত শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা তীরে উত্তীর্ণ হইলে পর, কর্ণপুরের লোকেরা চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে লইয়া পলায়ন করিল। আমি তোমার ও তনয়দিগের শোকে একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া অহোরাত্র হাহাকার করিয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া তোমাদের অন্বেষণে নির্গত হইলাম। কত কষ্টে কত দেশে পর্যটন করিলাম, কিন্তু কোনও স্থানে কোনও সন্ধান পাইলাম না। পরিশেষে তোমাদের পুনর্দর্শনবিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্বাস হইয়া স্থির করিলাম, আর আমার প্রাণধারণের প্রয়োজন নাই। এত ক্লেশে অসারদেহভারবহন করা বিড়ম্বনামাত্র; অতএব আত্মঘাতিনী হই, তাহা হইলে এক কালে সকল ক্লেশের অবসান হইবেক। পরে, আত্মঘাতিনী হওয়া সর্বথা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ তপস্যা ও দেবকার্যে নিয়োজিত করাই সৎপরামর্শ বলিয়া অবধারিত করিলাম। অবশেষে জয়স্থলে আসিয়া এই দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তপস্বিনীভাবে কালহরণ করিতেছি। জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীব ও তাহার সহচর কিঙ্কর অদ্যাপি জীবিত আছে কি না, আর যদিই জীবিত থাকে, কোথায় আছে, কিছুই বলিতে পারি না। অনন্তর লাবণ্যময়ী ও সোমদত্ত উভয়ে নিস্পন্দ নয়নে পরস্পর মুখনিরীক্ষণ ও প্রভূতবাষ্পবারিবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

সর্বাংশ একাকৃতি দুই চিরঞ্জীব ও দুই কিঙ্কর নয়নগোচর করিয়া, অধিরাজ বাহাদুরও কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, সন্দিহান চিত্তে কত কল্পনা করিতেছিলেন; এক্ষণে লাবণ্যময়ী ও সোমদত্তের আলাপশ্রবণে সর্বাংশে ছিন্নসংশয় হইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, সোমদত্ত! তুমি প্রাতঃকালে আত্মবৃত্তান্তের যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলে, তাহার অনেক অংশে আমার বিলক্ষণ সংশয় ছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমাদের স্ত্রীপুরুষের কথোপকথন শুনিয়া সকল অংশে সম্পূর্ণ রূপে সংশয়নিরাকরণ হইল। লাবণ্যময়ীর উপাখ্যান দ্বারা তোমার বর্ণিত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ সমর্থন হইতেছে। এখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, দুই চিরঞ্জীব তোমাদের যমজ সন্তান; দুই কিঙ্কর তোমাদের ক্রীত দাস। আমাদের চিরঞ্জীব অতি শৈশব অবস্থায় তোমাদের সহিত বিয়োজিত হইয়াছিলেন, এজন্য তোমায় চিনিতে পারেন নাই। যাহা হউক, মনুষ্যের ভাগ্যের কথা কিছুই বলিতে পারা যায় না। তুমি যাহাদের অদর্শনে এত-কাল জীবন্মৃত হইয়া ছিলে, এক কালে সেই সকলগুলির সহিত অসম্ভাবিত সমাগম হইল। তুমি এত দিন আপনাকে অতি হতভাগ্য জ্ঞান করিতে; কিন্তু এক্ষণে দৃষ্ট

হইতেছে, তোমার তুল্য সৌভাগ্যশালী মনুষ্য অতি বিরল। শেষ দশায় তোমার অদৃষ্টে যে এরূপ সুখ ও এরূপ সৌভাগ্য ঘটিবেক, ইহা স্বপ্নের অগোচর।

সোমদত্তকে এইরূপ বলিয়া, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জয়স্থলবাসী জ্ঞান করিয়া, অধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন চিরঞ্জীব! তুমি প্রথম কর্ণপুর হইতে আসিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, না মহারাজ! আমি নই; আমি হেমকূট হইতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অধিরাজ সস্মিত বদনে বলিলেন, হাঁ বুঝিলাম, তুমি আমাদের চিরঞ্জীব নও; তুমি এই দিকে স্বতন্ত্র দাঁড়াও; তোমাদের কে কোন্ ব্যক্তি, চিনা ভার। তখন জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! আমি কর্ণপুর হইতে আসিয়াছিলাম; আপনকার পিতৃব্য বিখ্যাত বীর বিজয়বর্মা আমায় সঙ্গে আনিয়াছিলেন। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, আমি উঁহার সঙ্গে আসি। বিজয়বল্লভ বলিলেন, তোমরা দুজনে একসঙ্গে একদিকে দাঁড়াও।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা চিরঞ্জীবদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের দুজনের মধ্যে কে আজ মধ্যাহ্নকালে আমার সঙ্গে আহার করিয়াছিলে। হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি কি আমার স্বামী নও। তিনি বলিলেন, না, আমি তোমার স্বামী নই; কিন্তু তুমি স্বামী স্থির করিয়া আমায় বলপূর্বক বাটীতে লইয়া গিয়াছিলে, এবং সেই সংস্কারে আমায় অনেক অনুযোগ করিয়াছিলে। তোমার ভগিনীও আমায় ভগিনীপতিজ্ঞানে পূর্বাপর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু আদ্যোপান্ত বলিয়াছিলাম, জয়স্থলে আমার বাস নয়, আমি তোমার পতি নই, আমি এ পর্যন্ত বিবাহ করি নাই। তোমরা তৎকালে আমার সে সকল কথায় বিশ্বাস কর নাই। আমিই তোমার পতি, তোমার উপর বিরক্ত হইয়া ঐরূপ বলিতেছি, তোমরা দুই ভগিনীতেই পূর্বাপর সেই জ্ঞান করিয়াছিলে। এই বলিয়া তিনি বিলাসিনীকে সম্ভাষণ করিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, আমি তৎকালে পরিণয়প্রস্তাব করাতে তুমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলে, এবং আমায় যথোচিত ভর্ৎসনা ও বহুবিধ আপত্তির উত্থাপন করিয়াছিলে; এখন বোধ হয় তোমার আর সে সকল আপত্তি হইতে পারে না। বিলাসিনী শুনিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। কিন্তু তদীয় আকার প্রকার দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিলেন, চিরঞ্জীবের প্রস্তাবে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। এই পরিণয়প্রসঙ্গশ্রবণে নিরতিশয় পরিতোষপ্রদর্শন করিয়া, অধিরাজ বিজয়বল্লভ প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে বলিলেন, শুভ কার্যের বিলম্বে প্রয়োজন নাই; চিরঞ্জীব! বিলাসিনী কন্যা তোমার সহধর্মিণী হইবেন।

অনন্তর বসুপ্রিয় স্বর্ণকার হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞাসিলেন, আমি আপনাকে যে হার দিয়াছিলাম, আপনার গলায় এ সেই হার কি না; তিনি বলিলেন, এ সেই হার বটে; আমি একবারও তাহা অস্বীকার করি নাই; তখন জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব স্বর্ণকারকে বলিলেন, তুমি কিন্তু এই হারের জন্যে আমায় অবরুদ্ধ করাইয়াছিলে। বসুপ্রিয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, হাঁ মহাশয়! আমি আপনারে রাজপুরুষের হস্তে

সমর্পিত করিয়াছিলাম। কিন্তু, পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আপনি আমায় অপরাধী করিতে পারেন না। চন্দ্রপ্রভা স্বীয় পতিকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার অবরোধের সংবাদ পাইয়া কিঙ্কর দ্বারা যে স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়াছিলাম, তুমি কি তাহা পাও নাই। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, কই আপনি আমা দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা পাঠান নাই। তখন হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া, পান্থনিবাসে বসিয়া উৎসুক চিত্তে তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে সে আসিয়া তোমার প্রেরিত বলিয়া আমার হস্তে এই স্বর্ণমুদ্রার থলি দেয়; আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আপন নিকটে রাখিয়াছিলাম।

এইরূপে সংশয়াপনোদনকাণ্ড সমাপিত হইলে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে সায়ংকালের মধ্যে দণ্ডের টাকা দিলেও আমার পিতা প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবেন, আপনি দয়া করিয়া এই আদেশপ্রদান করিয়াছেন; অনুমতি হইলে ঐ টাকা আনাইয়া দি। বিজয়বল্লভ বলিলেন, চিরঞ্জীব! তোমাদের এই অসম্ভাবিত সমাগমদর্শনে আমি যে অনির্বচনীয় প্রীতিলাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রাপ্তি অপেক্ষাও অধিকতর লাভবোধ হইয়াছে; অতএব তোমার পিতা দণ্ডপ্রদান ব্যতিরেকেই প্রাণদান পাইলেন। এই বলিয়া তিনি সন্নিহিত রাজপুরুষদিগকে সোমদত্তের বন্ধনমোচন ও বধ্যবেশের অপসারণ করিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপে সকল বিষয়ের সমাধান হইলে, লাবণ্যময়ী গলবস্ত্রা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বিজয়বল্লভকে বলিলেন, মহারাজ! আমার কিছু প্রার্থনীয় আছে; কৃপা করিয়া শ্রবণ করিতে হইবেক। বিজয়বল্লভ বলিলেন, লাবণ্যময়ি! যাহা ইচ্ছা হয় সচ্ছন্দে বল; সঙ্কুচিত হইবার অণুমাত্র আবশ্যকতা নাই; আজ তোমার কোনও কথাই অরক্ষিত হইবার বা কোনও প্রার্থনাই অপরিপূরিত থাকিবার আশঙ্কা নাই। শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিত ও উৎসাহিত হইয়া লাবণ্যময়ী বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি এতকাল মনে করিতাম, আমার মত হতভাগ্যা মানবী ভূমণ্ডলে আর নাই; কিন্তু আজ দেখিতেছি, আমার মত ভাগ্যবতী অতি অল্প আছে। 'চিরবিয়োগের পর, এই অতর্কিত পতিপুত্রসমাগম দ্বারা আমি যে আজ কি হইয়াছি, বলিতে পারি না; আমার কলেবরে আনন্দপ্রবাহের সমাবেশ হইতেছে না। মহারাজ! আজ আমার কি উৎসবের দিন, আপনি অনায়াসে তাহার অনুভব করিতে পারিতেছেন। বলিতে কি মহারাজ! এখনও এই সমস্ত ঘটনা আমার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার প্রথম প্রার্থনা এই, অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্বক আমায় পতি, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দেবালয়ে এই উৎসবরজনী অতিবাহিত করিবার অনুমতিপ্রদান করেন; দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, যে সকল ব্যক্তি আজ এই অদ্ভুত ঘটনার সংশ্রবে ছিলেন, তাঁহারা সকলে দেবালয়ে উপস্থিত থাকিয়া কিয়ৎ কাল আমোদ আহ্লাদ করেন; তৃতীয় প্রার্থনা এই,

মহারাজ নিজে উৎসবসময়ে দেবালয়ে অধিষ্ঠান করেন ; চতুর্থ প্রার্থনা এই, আমার তৃতীয় প্রার্থনা যেন ব্যর্থ না হয়।

লাবণ্যময়ীর প্রার্থনা শ্রবণে বিজয়বল্লভ সহাস্য বদনে বলিলেন, আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আজ আমি যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছি, জন্মাবচ্ছেদে কখনও তাদৃশ আনন্দের অনুভব করি নাই ; এবং উত্তরকালেও যে কখনও আর তদ্রূপ আনন্দলাভ ঘটিবেক, তাহা সম্ভাবিত বোধ হইতেছে না। অধিক আর কি বলিব, তোমরা আজ যেরূপ আনন্দের অনুভব করিতেছ, আমিও নিঃসন্দেহ সেইরূপ, বরং তদপেক্ষা অধিক আনন্দের অনুভব করিতেছি। চিরঞ্জীব! আমি যে পুত্রনির্বিশেষে তোমার লালন পালন করিয়াছিলাম, আজ তাহা সর্বতোভাবে সার্থক হইল। বোধ হয়, আমি পিতৃব্যের নিকট হইতে আগ্রহপূর্বক তোমায় না লইলে, আজকার এই অভূতপূর্ব সংঘটন দেখিতে, ও তন্নিবন্ধন এই অননুভূতপূর্ব আনন্দের অনুভব করিতে পাইতাম না। যাহা হউক, লাবণ্যময়ি! আমি স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের সকলকে আমার আলয়ে লইয়া গিয়া, এবং রাজধানীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোককে সমবেত করিয়া, আমোদ-আহ্লাদে এই উৎসবের রজনী অতিবাহিত করিব। কিন্তু তোমার ইচ্ছা শ্রবণগোচর করিয়া আমার সে ইচ্ছায় বিসর্জন দিলাম। আজ তোমার যে সুখের দিন, তাহাতে কোনও অংশে তোমার মনে অসুখের সঞ্চার হইতে দেওয়া উচিত নহে। ইচ্ছাবিঘাত হইলে পাছে তোমার অন্তঃকরণে অণুমাত্রও অসুখ জন্মে, এই আশঙ্কায় আমি তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইলাম। আজ সকল বিষয়ে তোমার ইচ্ছাই বলবতী থাকিবেক।

এই বলিয়া, রাজপুরুষদিগের প্রতি রাজধানীস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিমন্ত্রণের, ও উপস্থিত মহোৎসবের উপযোগী আয়োজনের আদেশ দিয়া, অধিরাজ বিজয়বল্লভ সোমদত্তপরিবারের সহিত দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

বিদ্যাসাগর চরিত

(স্বরচিত)

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার আত্মজীবনচরিতের যে সামান্য অংশ লিখিত হইয়াছিল, 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)' নামে নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তক প্রকাশের তারিখ ১৯৪৮ সংবৎ, ৯ই আশ্বিন—অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। বিদ্যারত্ন মহাশয় "বিজ্ঞাপনে" জানাইয়াছেন যে, ইহাতে "তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত, ও স্বীয় শৈশবের সামান্য বিবরণ মাত্র…লিপিবদ্ধ আছে।"

—সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে মুদ্রিত নির্দেশক।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শকাব্দাঃ ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরসিংহগ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনকজননীর প্রথম সন্তান।

বীরসিংহের আধ ক্রোশ অন্তরে, কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে; ঐ গ্রামে, মঙ্গলবারে ও শনিবারে, মধ্যাহ্নসময়ে, হাট বসিয়া থাকে। আমার জন্মসময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" এই সময়ে, আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিণী ছিল; তাহারও, আজ কাল, প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য, পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, "ও দিকে নয়, এ দিকে এস; আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া, সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।

এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে, অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে, তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাসবাক্যের উল্লেখ করিয়া, বলিতেন, "ইনি সেই এঁড়ে বাছুর; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন, বটে; কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরিহাস-বাক্যও বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার, ক্রমে, এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।" জন্মসময়ে, পিতামহদেব, পরিহাস করিয়া, আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর, সময়ে সময়ে, কার্য দ্বারাও, এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।

বীরসিংহগ্রামে আমার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু, এই গ্রাম আমার পিতৃপক্ষীয় অথবা মাতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষদিগের বাসস্থান নহে। জাহানাবাদের ঈশান কোণে, তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে, বনমালিপুর নামে যে গ্রাম আছে, উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান। যে ঘটনাসূত্রে পূর্বপুরুষদিগের বাসস্থানে বিসর্জন দিয়া, বীরসিংহগ্রামে আমাদের বসতি ঘটে, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান; জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ

আমার পিতামহ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরের অবমাননা-ব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগে, তদীয় অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন; অবশেষে, আর এস্থানে অবস্থিতি করা, কোনও ক্রমে, বিধেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এককালে, দেশত্যাগী হইলেন।

বীরসিংহগ্রামে, উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণে সবিশেষ পারদর্শিতাবশতঃ, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় রাঢ়দেশে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ বলিয়া, পরিগণিত হইয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষ, মহাসমারোহে, মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধসভায়, নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক প্রসিদ্ধ শঙ্কর তর্কবাগীশ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, স্বীয় ব্যাকরণবিদ্যার বিশিষ্টরূপ পরিচয় দিয়া, তর্কবাগীশ মহাশয়কে সাতিশয় সন্তুষ্ট করেন। তর্কবাগীশ মহাশয়, মুক্তকণ্ঠে, সাধুবাদপ্রদান, ও সবিশেষ আদর সহকারে, আলিঙ্গনদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, সর্বত্র, যার পর নাই, মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গর্ভে, তর্কভূষণ মহাশয়ের, দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস; জ্যেষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয়া গোবিন্দমণি, চতুর্থী অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।

রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন; দুর্গাদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনাভোগ, ও তদীয় পুত্রকন্যাদের উপর কর্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর, এত দূর পর্যন্ত হইয়া উঠিল, যে দুর্গাদেবীকে, পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া, পিত্রালয় যাইতে হইল। তদীয় ভ্রাতৃ-শ্বশুর প্রভৃতির আচরণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহার ও তাঁহার পুত্রকন্যাদের উপর যথোচিত স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল; দুর্গাদেবীর পিতা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; এজন্য, সংসারের কর্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল। সুতরাং, তিনিই বাটীর প্রকৃত কর্তা, ও তাঁহার গৃহিণীই বাটীর প্রকৃত কর্ত্রী। দেশাচার অনুসারে, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ও তাহার সহধর্মিণী, তৎকালে, সাক্ষিগোপালস্বরূপ ছিলেন; কোনও বিষয়ে তাঁহাদের কর্তৃত্ব খাটিত না; সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার, রামসুন্দর ও তাঁহার গৃহিণীর অভিপ্রায় অনুসারেই, সম্পাদিত হইত।

কিছু দিনের মধ্যেই, পুত্র কন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে

বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ ; অনিয়ত কালের জন্যে, সাতজনের ভরণ-পোষণের ভারবহনে, তাঁহারা, কোনও মতে, সম্মত নহেন। তাঁহারা দুর্গাদেবী ও তদীয় পুত্রকন্যাদিগকে গলগ্রহবোধ করিতে লাগিলেন। রামসুন্দরের বনিতা, কথায় কথায়, দুর্গাদেবীর অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, দুর্গাদেবী স্বীয় পিতা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের গোচর করিতেন। তিনি, সাংসারিক বিষয়ে, বার্ধক্যনিবন্ধন ঔদাসীন্য অথবা কর্তৃত্ববিরহবশতঃ, কোনও প্রতি-বিধান করিতে পারিতেন না। অবশেষে, দুর্গাদেবীকে, পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন, এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে, এক কুটীর নির্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গাদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, সেই কুটীরে অবস্থিতি ও অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিয়া, সেই সুত বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি, একাকিনী হইলে, অবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা, অবলীলাক্রমে, দিনপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু, তাদৃশ স্বল্প আয় দ্বারা, নিজের, দুই পুত্রের, ও চারি কন্যার ভরণ-পোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা, সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব, সাহায্য করিতেন ; তথাপি তাঁহাদের, আহারাদি সর্ববিষয়ে, ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি, মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জনের চেষ্টায়, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

সভারাম বাচস্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্র, জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার, সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলেন ; তাঁহার অনুগ্রহে ও সহায়তায়, কলিকাতায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়েন। ঠাকুরদাস, এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয় দিলেন, এবং কি জন্যে আসিয়াছেন, অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহা ব্যক্ত করিয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল, অকাতরে অন্নব্যয় করিতেন ; এমন স্থলে, দুর্দশাপন্ন আসন্ন জ্ঞাতিসন্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে। তিনি, সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক ঠাকুরদাসকে আশ্রয়প্রদান করিলেন।

ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে, রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছিল, এবং তিনিও তাদৃশ অধ্যয়নবিষয়ে, সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু, যে উদ্দেশে, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে নিযুক্ত হইলে, তাহা সম্পন্ন হয় না। তিনি, সংস্কৃত পড়িবার জন্য, সবিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, যথার্থ বটে ; এবং সর্বদাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করিতেন, যত কষ্ট, যত অসুবিধা হউক না কেন, সংস্কৃতপাঠে প্রাণপণে যত্ন করিব। কিন্তু, জননীকে ও ভাইভগিনীগুলিকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত, তখন সে ব্যগ্রতা ও সে প্রতিজ্ঞা, তদীয় অন্তঃকরণ হইতে, একবারে অপসারিত হইত। যাহা হউক, অনেক বিবেচনার পর, অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল, যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জনক্ষম হন, সেরূপ পড়াশুনা করাই কর্তব্য।

এই সময়ে, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম হইত। এজন্য, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু, সে সময়ে, ইঙ্গরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এখনকার মত, প্রতি পল্লীতে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্যোপযোগী ইঙ্গরেজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে, ঐ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয়কর্ম করিতেন ; সুতরাং, দিবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন্য, তিনি ঠাকুরদাসকে, সন্ধ্যার সময়, তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে, ঠাকুরদাস, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, তাঁহার নিকটে গিয়া ইঙ্গরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস, ইঙ্গরেজী পড়ার অনুরোধে, সে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না ; যখন আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না ; সুতরাং, তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া, তিনি, দিন দিন, শীর্ণ ও দুর্বল হইতে লাগিলেন। এক দিন, তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইতেছ, কেন ? তিনি, কি কারণে তাঁহার সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে, সেই স্থানে, শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্রজাতীয় এক দয়ালু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং ঠাকুরদাসকে বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার ওরূপ স্থানে থাকা কোনও মতে চলিতেছে না। যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি। এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, ঠাকুরদাস, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইলেন, এবং, পর দিন অবধি, তাঁহার বাসায় গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছিল না। তিনি, দালালি করিয়া, সামান্যরূপ উপার্জন করিতেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, ঠাকুরদাসের, নির্বিঘ্নে, দুই বেলা আহার ও ইঙ্গরেজী পড়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে, তদীয় আশ্রয়দাতার আয়

বিলক্ষণ খর্ব হইয়া গেল ; সুতরাং, তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের, অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি, প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, বহির্গত হইতেন, এবং কিছু হস্তগত হইলে, কোনও দিন দেড় প্রহরের, কোনও দিন দুই প্রহরের, কোনও দিন আড়াই প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন ; যাহা আনিতেন, তাহা দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টে, কোনও দিন বা সচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন, ঠাকুরদাসকে, সমস্ত দিন, উপবাসী থাকিতে হইত।

ঠাকুরদাসের সামান্যরূপ একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটী ছিল। থালাখানিতে ভাত ও ঘটীটিতে জল খাইতেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এক পয়সার শালপাত কিনিয়া রাখিলে, ১০।১২ দিন ভাত খাওয়া চলিবেক ; সুতরাং থালা না থাকিলে, কাজ আটকাইবেক না ; অতএব, থালাখানি বেচিয়া ফেলি ; বেচিয়া যাহা পাইব, তাহা আপনার হাতে রাখিব। যে দিন, দিনের বেলায় আহারের যোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু কিনিয়া খাইব। এই স্থির করিয়া, তিনি সেই থালাখানি, নূতন বাজারে, কাঁসারিদের দোকানে বেচিতে গেলেন। কাঁসারিরা বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিতে পারিব না। পুরাণ বাসন কিনিয়া, কখনও কখনও, বড় ফেসাতে পড়িতে হয়। অতএব, আমরা তোমার থালা লইব না। এইরূপে কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না। ঠাকুরদাস বড় আশা করিয়া, থালা বেচিতে গিয়াছিলেন ; এক্ষণে, সে আশায় বিসর্জন দিয়া, বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

এক দিন, মধ্যাহ্নসময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন, যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন ; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন ? ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন ; ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই ? তিনি বলিলেন, না, মা আজ আমি, এখন পর্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর,

জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া, নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই, এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্যপ্রদর্শন করিতেন না। যাহা হউক, যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে, তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া, ফলার করিয়া আসিতেন।

ঠাকুরদাস, মধ্যে মধ্যে, আশ্রয়দাতাকে বলিতেন, যাহাতে আমি, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইয়া, মাসিক কিছু কিছু পাইতে পারি, আপনি, দয়া করিয়া, তাহার কোনও উপায় করিয়া দেন। আমি ধর্মপ্রমাণ বলিতেছি, যাঁহার নিকট নিযুক্ত হইব, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব, এবং প্রাণান্তেও অধর্মাচরণ করিব না। আমার উপকার করিয়া, আপনাকে কদাচ লজ্জিত হইতে, বা কখনও কোনও কথা শুনিতে হইবেক না। জননী ও ভাইভগিনীগুলির কথা যখন মনে হয়, তখন আর ক্ষণকালের জন্যেও, বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। এই বলিতে বলিতে, চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত।

কিছু দিন পরে, ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম পাইয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও, বেতনের দুইটি টাকা, যথানিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও যার পর নাই পরিশ্রমী ছিলেন, এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া, সকল কর্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন; এজন্য, ঠাকুরদাস যখন যাঁহার নিকট কর্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন।

দুই তিন বৎসরের পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাইভগিনীগুলির, অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে, কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন; তথায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দেখিতে না পাইয়া, বীরসিংহে আসিয়া, পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগমলাভে, সকলেই আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। শ্বশুরালয়ে, বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন, এজন্য, কিছু দিন পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু, দুর্গাদেবীর মুখে

ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া, সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, বীরসিংহে অবস্থিতিবিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহগ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল।

বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে, তদীয় কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া, তিনি যথেষ্ট আশীর্বাদ ও সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বড়বাজারের দয়েহাটায়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মনুষ্য ছিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রস্তাব করিলেন, আপনি অতঃপর ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন, আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার লইতেছি; সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর তাহার, কোনও অংশে, অসুবিধা ঘটিবেক না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং ঠাকুরদাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া, বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন। এই অবধি, ঠাকুরদাসের আহারক্লেশের অবসান হইল। যথাসময়ে আবশ্যকমত, দুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি পুনর্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভ ঘটনা দ্বারা, তাঁহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল, এরূপ নহে; সিংহ মহাশয়ের সহায়তায়, মাসিক আট টাকা বেতনে এক স্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া, তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

এই সময়ে, ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত, তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতীদেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভগবতীদেবী, শৈশবকালে, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃহীনা ছিলেন না; তথাপি, কি কারণে, তাঁহাকে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতে হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত, ও তৎসমভিব্যাহারে তদীয় মাতুলকুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত, হইতেছে।

পাতুলনিবাসী মুখটী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের চারি পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়; জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা তারা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিজ বাটীতেই চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি, স্বগ্রামে ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে, সবিশেষ আদরণীয় ও সাতিশয় মাননীয় ছিলেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা বিবাহযোগ্যা হইলে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, গোঘাটে একটি সুপাত্র আছে, এই সংবাদ পাইয়া, ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাত্রের নাম রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমান্ ও নিরতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন; অবাধে অধ্যয়ন করিয়া, একুশ, বাইশ বৎসরে, ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন, এবং তর্কবাগীশ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি ছাত্রকে অন্নদান এবং ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, এই পাত্রের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ব্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া, আহ্লাদিতচিত্তে, কন্যাদানে সম্মত হইলেন, এবং বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্বক, পুত্রদের সহিত পরামর্শ করিয়া, রামকান্ত তর্কবাগীশের সহিত, জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার বিবাহ দিলেন।

কালক্রমে, গঙ্গাদেবীর গর্ভে, তর্কবাগীশ মহাশয়ের দুই কন্যা জন্মিল; জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী, কনিষ্ঠা ভগবতী। কিছু দিন পরে, তর্কবাগীশ মহাশয়, সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে, তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। অতঃপর, অধ্যাপনাকার্যে তাঁহার তাদৃশ যত্ন রহিল না। তাঁহার অযত্ন দেখিয়া, ছাত্রেরা, ক্রমে ক্রমে, তদীয় চতুষ্পাঠী হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত না হইয়া, অব্যাঘাতে তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে পারিব, এই ভাবিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়, অবশেষে, শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং, অল্প দিনের মধ্যেই, শবসাধনের সমুচিত ফললাভ করিলেন। শবের উপর উপবিষ্ট হইয়া, জপ করিতে করিতে, তিনি, তুড়ি দিয়া, "মঞ্জুর" বলিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন। ফলকথা এই, সেই অবধি, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে, উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। অতঃপর, কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসিলে, তিনি, তুড়ি দিয়া ও মঞ্জুর বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। সময়ে সময়ে, ইহাও অবলোকিত হইত, যখন তিনি একাকী উপবিষ্ট আছেন, কেবল তুড়ি দিতেছেন, ও মঞ্জুর মঞ্জুর বলিতেছেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহোদর বা অন্য কোনও অভিভাবক ছিলেন না। গঙ্গাদেবী, দুই শিশু কন্যা ও উন্মাদগ্রস্ত স্বামী লইয়া, বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং নিরুপায় ভাবিয়া, স্বীয় পিতা পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের নিকট, এই বিপদের সংবাদ পাঠাইলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, কন্যা, জামাতা ও দুই দৌহিত্রীকে আপন, বাটীতে আনিলেন। এক স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্ডপ উন্মাদগ্রস্ত জামাতার বাসার্থে নিযোজিত হইল; তিনি তথায় অবস্থিতি করিলেন; কন্যা ও দুই দৌহিত্রী পরিবারের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জামাতার বিশিষ্টরূপ চিকিৎসা করাইলেন; কিছুতেই কোনও উপকার দর্শিল না। অল্পদিনের মধ্যেই অবধারিত হইল, জামাতা, এজন্মে আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন না। অতঃপর, কন্যা, জামাতা, ও দুই দৌহিত্রীর ভরণ-পোষণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ভার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরেই বর্তিল। তিনিও যথোচিত যত্ন ও স্নেহ সহকারে, তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অবিদ্যমান হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ সংসারের কর্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ ও চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় বিষয়কর্ম করিতে লাগিলেন। চারি সহোদরে, যাবজ্জীবন, একান্নবর্তী ছিলেন ; যিনি যে উপার্জন করিতেন, জ্যেষ্ঠের হস্তে দিতেন। জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই, সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। স্বীয় পরিবারের উপর, তাঁহার যেরূপ স্নেহ ও যেরূপ যত্ন ছিল, ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, তিনি বরং তাহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ ও অধিক যত্ন করিতেন। ফলকথা এই, তাঁহার কর্তৃত্বকালে, কেহ কখনও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ দেখিতে পান নাই।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্তী ভ্রাতাদের, অধিক দিন, পরস্পর সদ্ভাব থাকে না ; যিনি সংসারে কর্তৃত্ব করেন, তাঁহার পরিবার যেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে থাকেন, অন্য অন্য ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, সেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে থাকা, কোনও মতে, ঘটিয়া উঠে না। এজন্য, অল্প দিনেই, ভ্রাতাদের পরস্পর মনান্তর ঘটে ; অবশেষে, মুখদেখাদেখি বন্ধ হইয়া, পৃথক হইতে হয়। কিন্তু, সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারিজনেই সমান ছিলেন ; এজন্য, কেহ, কখনও, ইঁহাদের চারি সহোদরের মধ্যে, মনান্তর বা কথান্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভাগিনেয়ীদের পুত্রকন্যাদের উপরেও, তাঁহাদের অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা, পুত্রকন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে গিয়া, যেরূপ সুখে সমাদরে, কালযাপন করিতেন, কন্যারা, পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে গিয়া, সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে, সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, ঐ অঞ্চলের কোনও পরিবার, এ বিষয়ে, এই পরিবারের ন্যায়, প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায়, রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া, কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া, সকলেই, পরম সমাদরে, অতিথিসেবা ও অভ্যাগতপরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায়, এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের, স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্তী বহুতর গ্রামে, আধিপত্যের সীমা ছিল না। এই সমস্ত গ্রামের লোক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন। অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদভঞ্জন, বিপদ্-মোচন, অসময়ে সাহায্যদান প্রভৃতি কার্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল ; কিন্তু সেই অর্থের সঞ্চয়, অথবা স্বীয় পরিবারের সুখসাধনে প্রয়োগ, এক দিন এক ক্ষণের জন্যেও,

তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিযোজিত ও পর্যবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত, অমায়িক, পরোপকারী, ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট, আমরা, অশেষ প্রকারে, যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, মাতৃদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্বয়ে, পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন। কিন্তু একদিনের জন্যেও, স্নেহ, যত্ন, ও সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্তুতঃ, ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্রকন্যাদের উপর এরূপ স্নেহপ্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হইলে, তদীয় একবর্ষীয় দ্বিতীয় সন্তান, বিংশতি বৎসর বয়স পর্যন্ত, আদ্যন্ত অবিচলিতস্নেহে, প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম। বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। গ্রামস্থ বালকগণ ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আমি তাঁহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদানবিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। ইঁহার পাঠশালার ছাত্রেরা, অল্প সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারিত ; এজন্য, ইনি উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া, বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয়দলের আদর্শস্বরূপ ছিলেন।

পাঠশালায় এক বৎসর শিক্ষার পর, আমি ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব, প্রথমতঃ এরূপ আশা ছিল না। কিছু দিনের পর, প্রাণনাশের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল ; কিন্তু, একবারে বিজ্বর হইলাম না। অধিক দিন জ্বরভোগ করিতে করিতে, প্লীহার সঞ্চার হইল। জ্বর ও প্লীহা উভয় সমবেত হওয়াতে, শীঘ্র আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা রহিল না। ছয় মাস অতীত হইয়া গেল ; কিন্তু, রোগের নিবৃত্তি না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

জননীদেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল, রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, আমার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া, বীরসিংহে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিয়া শুনিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, আমাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। পাতুলের সন্নিকটে কোটরীনামে যে গ্রাম আছে, তথায় বৈদ্যজাতীয় উত্তম উত্তম চিকিৎসক ছিলেন ; তাঁহাদের অন্যতমের হস্তে আমার চিকিৎসার ভার অর্পিত হইল। তিন মাস চিকিৎসার পর, সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম। এই সময়ে, আমার উপর, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবারবর্গের স্নেহ ও যত্নের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে, বীরসিংহে প্রতিপ্রেরিত হইলাম। এবং, পুনরায়, কালীকান্ত

চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া, আট বৎসর বয়স পর্যন্ত, তথায় শিক্ষা করিলাম। আমি গুরুমহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলাম। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, পাঠশালার সকল ছাত্র অপেক্ষা, আমার উপর তাঁহার অধিকতর স্নেহ ছিল। আমি তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার দেহাত্যয়ের কিছু দিন পূর্বে, একবার মাত্র, তাঁহার উপর আমার ভক্তি বিচলিত হইয়াছিল।

—শাকে (১), কার্তিক মাসে, পিতামহদেব, রামজয় তর্কভূষণ, অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া, ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকারপ্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, তাঁহার পক্ষে, কস্মিন্ কালেও, আবশ্যক হয় নাই।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তর্কভূষণ মহাশয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, বীরসিংহবাসে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্যালক, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে, সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।

তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি গ্রামের প্রধানেরা নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন; আপন ইষ্টসাধন বা অভিপ্রেত সম্পাদনের জন্য, না করিতে পারিতেন, এমন কর্মই নাই। এতদ্ভিন্ন, সময়ে সময়ে এমন নির্বোধের কার্য করিতেন, যে তাঁহাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, এরূপ বোধ হইত না। এজন্য, তর্কভূষণ মহাশয়, সর্বদা, সর্বসমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে, বলিতেন, এ গ্রামে একটাও মানুষ নাই,

(১) পাণ্ডুলিপিতে শাকের উল্লেখ নাই; বোধ হয়, পরে, কাগজপত্র দেখিয়া বসাইয়া দিবার অভিপ্রায় ছিল।

সকলই গরু। এক দিন, তিনি এক স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ঐ স্থানে, লোকে মলত্যাগ করিত। প্রধান কল্পের এক ব্যক্তি বলিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়! ওস্থানটা দিয়া যাইবেন না। তিনি বলিলেন, দোষ কি। সে ব্যক্তি বলিলেন, ঐ স্থানে বিষ্ঠা আছে। তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ, স্থিরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, বলিলেন, এখানে বিষ্ঠা কোথায়, আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না; যে গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক।

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহা-দিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্, ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন বটে; কিন্তু, তদীয় আকারে, আলাপে, বা কার্যপরম্পরায়, তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি, ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে, অথবা তদীয় অনিষ্টচিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না; এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত, ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য, সকলেই তাঁহাকে, সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া, নির্দেশ করিতেন। বনমালি-পুর হইতে প্রস্থান করিয়া, যে আট বৎসর অনুদ্দেশপ্রায় হইয়াছিলেন, ঐ আট বৎসরকাল কেবল তীর্থপর্যটনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম পর্যন্ত পর্যটন করিয়াছিলেন'।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল; উহা হস্তে না করিয়া, তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যূষে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য, অনেকে সমবেত না হইয়া, ঐ সকল স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস, ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায়, সকল

সময়ে, ঐ সকল স্থল দিয়া, একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই চারি বার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপ আক্কেলসেলামি পাইয়া, আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

একুশ বৎসর বয়সে, তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে অতিশয় জঙ্গল ও বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল। এক স্থলে খাল পার হইয়া, তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, ভালুকে আক্রমণ করিল। ভালুক নখর-প্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিলেন। এইরূপে, এই ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন, বটে ; কিন্তু তৎকৃত ক্ষত দ্বারা তাঁহার শরীরের শোণিত অনবরত বিনির্গত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই স্থান হইতে মেদিনীপুর প্রায় চারি ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। ঐ অবস্থাতে তিনি অনায়াসে পদব্রজে, মেদিনীপুরে পঁহুছিলেন, এক আত্মীয়ের বাসায়, দুই মাস কাল, শয্যাগত থাকিলেন, এবং ক্ষত সকল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে, বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার শরীরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত।

পিতৃদেবের ও পিতামহীদেবীর মুখে, সময়ে সময়ে, পিতামহদেবসংক্রান্ত যে সকল গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহারই স্থূল বৃত্তান্ত উপরিভাগে লিপিবদ্ধ হইল।

পিতামহদেবের দেহাত্যয়ের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন। তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বড়বাজারনিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সময়ে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্বে সিংহ মহাশয়ের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্তা। এই সময়ে, জগদ্দুর্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার এক পুত্র, এইমাত্র তাঁহার পরিবার। জগদ্দুর্লভবাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্যশব্দে সম্ভাষণ করিতেন ; সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদা মহাশয়, তাঁহার ভগিনীদিগকে, বড় দিদি ও ছোট দিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া, এক দিনের জন্যেও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু, কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির

স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ-বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এপর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহীদেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমতঃ কিছু দিন, তাঁহার জন্য, যার পর নাই, উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে, তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহ ও যত্নে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।

এই সময়ে, পিতৃদেব, মাসিক দশ টাকা বেতনে, জোড়াসাঁকোনিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের নিকট নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারের চকে মল্লিক মহাশয়ের এক দোকান ছিল। ঐ দোকানে লোহা ও পিতলের নানাবিধ বিলাতী জিনিস বিক্রীত হইত। যে সকল খরিদ্দার ধারে জিনিস কিনিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পিতৃদেবকে টাকা আদায় করিয়া আনিতে হইত। প্রতিদিন, প্রাতে এক প্রহরের সময়, কর্মস্থানে যাইতেন; রাত্রি এক প্রহরেব সময়, বাসায় আসিতেন। এ অবস্থায়, অন্যত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্লীগ্রামের অষ্টমবর্ষীয় বালকের পক্ষে, কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পারিত না।

জগদ্দুর্লভবাবুর বাটীর অতি সন্নিকটে, শিবচরণ মল্লিক নামে এক সম্পন্ন সুবর্ণবণিক ছিলেন। তাঁহাব বাটীতে একটি পাঠশালা ছিল। ঐ পাঠশালায় তাঁহার পুত্র, ভাগিনেয়, জগদ্দুর্লভবাবুর ভাগিনেয়েরা, ও আর তিন চারিটি বালক শিক্ষা করিতেন। কলিকাতায় উপস্থিতির পাঁচ সাত দিন পরেই, আমি ঐ পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, এই তিন মাস তথায় শিক্ষা করিলাম। পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদানবিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।

ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে আমি রক্তাতিসাররোগে আক্রান্ত হইলাম। ঐ পল্লীতে দুর্গাদাস কবিরাজ নামে চিকিৎসক ছিলেন; তিনি আমার চিকিৎসা করিলেন রোগের নিবৃত্তি না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিলে, আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই, এই স্থির করিয়া, পিতৃদেব বাটীতে সংবাদ

পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র, পিতামহীদেবী, অস্থির হইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, এবং, দুই তিন দিন অবস্থিতি করিয়া, আমায় লইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনা চিকিৎসায়, সাত আট দিনেই, আমি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আমি পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম। প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কিয়ৎ ক্ষণ চলিয়া, আর চলিতে না পারিলে, ঐ ভৃত্য খানিক আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া আসিত। এবার আসিবার পূর্বে, পিতৃদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, চলিয়া যাইতে পারিবে, না লোক লইতে হইবেক। আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবেক না, আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব। তদনুসারে আর লোক লওয়া আবশ্যক হইল না। পিতৃদেব আমায় লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। মাতৃদেবীর মাতুলালয় পাতুল বীরসিংহ হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্তী। এই ছয় ক্রোশ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিলাম। সে দিন পাতুলে অবস্থিতি করিলাম।

তারকেশ্বরের নিকটবর্তী রামনগরনামক গ্রাম আমার কনিষ্ঠা পিতৃস্বসা অন্নপূর্ণাদেবীর শ্বশুরালয়। ইতঃপূর্বে অন্নপূর্ণাদেবী অসুস্থ হইয়াছিলেন; এজন্য, পিতৃদেব, কলিকাতায় আসিবার সময়, তাঁহাকে দেখিয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে, আমরা পরদিন প্রাতঃকালে, রামনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। রামনগর পাতুল হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্তী। প্রথম দুই তিন ক্রোশ অনায়াসে চলিয়া আসিলাম। শেষ তিন ক্রোশে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। তিন ক্রোশ চলিয়া, আমার পা এত টাটাইল, যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফলকথা এই, আর আমার চলিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র রহিল না। অনেক কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা দুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকী রহিল।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া, পিতৃদেব বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব। এই বলিয়া তিনি লোভপ্রদর্শন করিলেন; এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল।* কিন্তু পার টাটানি কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্যন্ত রহিল না। ফলতঃ, আর এক পা চলিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া, ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খানিক দূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দুই একটা থাবড়াও দিলেন।

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, পিতৃদেব আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুর্বল ছিলেন, অষ্টমবর্ষীয় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিক দূর যাওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। সুতরাং খানিক গিয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাইলেন এবং বলিলেন, বাবা, খানিক চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কাঁধে করিব। আমি চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চলিতে পারিলাম না। অতঃপর, আর আমি চলিতে পারিব, সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, পিতৃদেব খানিক আমায় স্কন্ধে করিয়া লইতে লাগিলেন, খানিক পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড়প্রহর লাগিল। সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্বে আমরা রামনগরে উপস্থিত হইলাম, এবং তথায় সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়া, পরদিন শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিক্ষাবিষয়ে আমার কিরূপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। সেই সময়ে, প্রসঙ্গক্রমে, পিতৃদেব মাইল ষ্টোনের উপাখ্যান বলিলেন। সে উপাখ্যান এই—

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধারাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইল ষ্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইল ষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা আছে; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ, সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় "একের পিঠে নয় উনিশ" ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এটি ইঙ্গরেজীর এক আর এইটি ইঙ্গরেজীর নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইল ষ্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সে দিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আর

দরকার নাই ; এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি ইঙ্গরেজীর অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটীতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা, আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইল ষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া, নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না ; অনন্তর, পঞ্চম মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন্ মাইল ষ্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে ; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন ; তিনি আমার চিবুকে ধরিয়া "বেস বাবা বেস" এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদা মহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক। যাহা হউক, আমার এই পরীক্ষা করিয়া, তাঁহাবা সকলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া, আমিও তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

মাইল ষ্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া, পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়েরা একবাক্য হইয়া, "তবে ইহাকে রীতিমত ইঙ্গরেজী পড়ান উচিত" এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিলেন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, সিদ্ধেশ্বরীতলার ঠিক পূর্বদিকে একটি ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল। উহা হের সাহেবের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরামর্শদাতারা ঐ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া, বলিলেন, উহাতে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে ; ঐ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও ; যদি ভাল শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কালেজে পড়িতে পাইবেক ; হিন্দু কালেজে পডিলে ইঙ্গরেজীর চূড়ান্ত হইবেক। আর, যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও, অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে, ও যেমন তেমন জমাখরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম করিতে পারিবেক।

আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ী ; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্যবশতঃ ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই ; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এজন্য পূর্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হইল না। তিনি বলিলেন, উপার্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া, তিনি আমার ইঙ্গরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে, আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক ; আর যদি চাকরি করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে ; সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া, যাহারা ল কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেওয়াই উচিত। চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কালেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণ রূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর, বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।

প্রভাবতীসম্ভাষণ

'প্রভাবতীসম্ভাষণ' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতকালে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১২৯৯ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ, পৃষ্ঠা ৩-১০) এই অপ্রকাশিত রচনাটি মুদ্রিত করেন। সমাজপতি মহাশয়ের মতে ইহা ১৭৮৬ শকাব্দার ১লা বৈশাখ লিখিত হয়—ইংরেজি মতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস।'

এই প্রবন্ধরচনার একটু ইতিহাস আছে। সমাজপতি মহাশয়ের ভাষায় তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

"পূজ্যপাদ শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত, মাতামহদেবের বিশেষ সৌহৃদ্য ও আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রভাবতী এই রচনার বিষয়। ১৭৮২ শাকের ২৩শে মাঘ প্রভাবতীর জন্ম হয়; ১৭৮৫ শাকের ৪ঠা ফাল্গুন, তিন বৎসর বয়সে প্রভাবতীর মৃত্যু হয়। মাতামহদেব, প্রভাবতীকে অপত্য-নির্বিশেষে ভাল বাসিতেন। এই সময়ে, নানাবিধ কারণে, তিনি সংসারে সম্পূর্ণ বীতরাগ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। ...প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।"

—সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে মুদ্রিত নির্দেশক।

বৎসে প্রভাবতি। তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি, এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই। প্রতি ক্ষণেই, আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে—

১। যেন, তুমি বসিয়া আছ, আমায় অন্য মনে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, 'নীনা' (১) বলিয়া, করপ্রসারণপূর্বক, কোলে লইতে বলিতেছ।

২। যেন, তুমি, উপরের জানালা হইতে দেখিতে পাইয়া, 'আয় না' বলিয়া, সলীল করসঞ্চালন সহকারে, আমায় আহ্বান করিতেছ।

৩। যেন, আমি আহার করিতে গিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া, তোমার পূজ্যপাদ পিতামহীদেবীকে, প্রভাবতী কোথায়, এই জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি শ্রবণমাত্র, সত্বর পদসঞ্চারে আসিয়া, 'এই আমি এসেছি' বলিয়া, প্রফুল্লবদনে, আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতেছ।

৪। যেন, তুমি, আমার ক্রোড়ে বসিয়া আহার করিতে করিতে, 'মাগী শোলো' (২) বলিয়া, আমার জানুতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, শয়ন করিতেছ।

৫। যেন, আমি আহারান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র, তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছ; আর সকলে, সাতিশয় আহ্লাদিত মনে, সহাস্যবদনে, শ্রবণ ও অবলোকন করিতেছেন (৩)।

৬। যেন, আমি, বিকালে, বাড়ীর ভিতরে জল খাইতেছি; তুমি, ক্রোড়ে বসিয়া, আমার সঙ্গে জল খাইতেছ; এবং, জল খাওয়ার পর, আমি মুখে সুপারী দিবামাত্র, তুমি 'দুখুনি (৪) দে' বলিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা, আমার মুখ হইতে সুপারী বহিষ্কৃত করিয়া লইতেছ।

---

(১) নে না।

(২) মাগী শুইল। আমি আদর করিয়া, তোমায় মাগী বলিয়া আহ্বান ও সম্ভাষণ করিতাম; তদনুসারে, তুমিও মাগীশব্দে আত্মনির্দেশ করিতে। তোমার এই দৈনন্দিন মঞ্জুল শয়নলীলা নয়নগোচর করিয়া, ব্যক্তিমাত্রেই পুলকিত হইতেন।

(৩) তুমি, এই নিয়মিত কৃত্রিম ঝগড়ার সময়ে, এরূপ স্বরভঙ্গী, বাক্যবিন্যাস, ও অঙ্গসঞ্চালনাদি করিতে, যে তদ্দর্শনে নিতান্ত পামরেরও হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দপ্রবাহে ও অননুভূতপূর্ব কৌতুকরসে উচ্ছলিত হইত। বস্তুতঃ, এই ব্যাপার এত মধুর ও এত প্রীতিপ্রদ বোধ হইত, যে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, অনেকে তৎপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতেন।

(৪) দুখানি।

৭। যেন, তুমি, বাহিরে আসিবার নিমিত্ত, আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছ, এবং, সিঁড়ি নামিবার পূর্বক্ষণে, আমার চিবুকধারণপূর্বক, আকুল চিত্তে বলিতেছ, 'নাফাস্‌নি, পড়ে যাব।' আমি কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিতেছি, না আমি লাফাব। তুমি অমনি, ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়া, তোমার জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছ, 'দেখ্‌ দিখি মা, আমার কথা শোনে না' (৫)।

৮। যেন, তোমার দাদারা, উনি আর তোমায় ভাল বাসিবেন না, এই বলিয়া ভয়-প্রদর্শন করিতেছে। তুমি, তাহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া, পাছে আমি আর না ভাল বাসি, এই আশঙ্কায় আকুলচিত্ত হইয়া, 'ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি' (৬), এই কথা আমায় অনুপমেয় শিরশ্চালনসহকারে, বারংবার বলিতেছ (৭)।

৯। যেন, আমি, খাব খাব বলিয়া, তোমার মুখচুম্বনের নিমিত্ত, আগ্রহপ্রদর্শন করিতেছি। তুমি, 'এই খা' বলিয়া, ডাইনের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না বলিয়া মুখ ফিরাইতেছি। তুমি, 'তবে এই খা' বলিয়া, বামের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না বলিয়া, মুখ ফিরাইতেছি। অবশেষে, তুমি, আর কিছু না বলিয়া, আপন অধর আমার অধরে অর্পিত করিতেছ।

এইরূপে, আমি, সর্বক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি ও নিরতিশয়প্রীতিপ্রদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি ; কেবল, তোমায় কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না। দৈবযোগে, এক দিন, দিবাভাগে, আমার নিদ্রাবেশ ঘটিয়াছিল। কেবল, সেই দিন, সেই সময়ে, ক্ষণকালের জন্য, তোমায় পাইয়াছিলাম। দর্শনমাত্র, আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া, অভূতপূর্ব আগ্রহ সহকারে ক্রোড়ে লইয়া, প্রগাঢ় স্নেহভরে বাহু দ্বারা পীড়ন-পূর্বক, সজল নয়নে তোমার মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময়ে, এক ব্যক্তি, আহ্বান করিয়া, আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। এই আকস্মিক মর্মভেদী নিদ্রাভঙ্গ

---

(৫) তুমি এমন ভীরুস্বভাবা ছিলে, যে কখনও, সাহস করিয়া, গাড়ীতে চড়িতে পার নাই ; এবং, সেই ভীরুস্বভাবতাবশতঃ, পড়িয়া যাইবার ভয়ে, সিঁড়ি নামিবার পূর্বক্ষণে, আমায় সাবধান করিয়া দিতে।

(৬) ভাল বাসিবি, ভাল বাসিবি।

(৭) এই বিষয়ে, এক দিনের ব্যাপার মনে হইলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছি ; তুমি, বাড়ীর ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া, আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, 'উনি আর তোমায় ভাল বাসিবেন না।' তুমি অমনি, শিরশ্চালনপূর্বক, 'ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি', এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি, ভাল বাসিব বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সে দিন, সকলের অনুরোধে, আর ভাল বাসিব না, এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম। তুমিও, প্রতি বারেই, 'না ভাল বস্‌বি', এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি, স্ফূর্তিহীন বদনে, 'তুই ভাল বস্‌বিনি, আমি ভাল বস্‌বো', এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গী ও প্রভূত স্নেহরস সহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল। আমি, এই চিরস্মরণীয় ব্যাপার, কস্মিন্‌ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না।

দ্বারা, সে দিন, যে বিষম ক্ষোভ ও ভয়ানক মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে।

বৎসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন, তুমি, এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিত ছিল। তুমি, স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।

* * * *

বৎসে! কিছুদিন হইল, আমি, নানা কারণে, সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোনও বিষয়েই, কোনও অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। ইদানীং, একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের, কার্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, ইদানীং তুমিই আমার জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে। সুতরাং, তোমার অসদ্ভাবে, আমার কীদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি, ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে, স্বীয় অনুভবপথে উপনীত করিতে পার।

কিন্তু, এক বিষয় ভাবিয়া, আমি, কিয়ৎ অংশে, বীতশোক ও আশ্বাসিত হইয়াছি। বৎসে! তুমি এমন শুভ ক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে যে, ব্যক্তিমাত্রেই, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি ও প্রভূতমাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী দৃষ্টিগোচর করিয়া, নিরতিশয় পুলকিত ও চমৎকৃত হইতেন। তুমি সকলের নয়নতারা ছিলে। সকলেই তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। এই নগরের অনেক পরিবারের সহিত আমার প্রণয় ও পরিচয় আছে; কিন্তু, কোনও পরিবারেই, তোমার ন্যায়, অবিসংবাদে সর্বসাধারণের নিরতিশয় স্নেহভূমি ও আদরভাজন অপত্য, এ পর্যন্ত, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তুমি যে স্বল্পকাল সংসারে ছিলে, তাহা আদরে আদরে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছ, অস্নেহ বা অনাদর কাহাকে বলে, এক মুহূর্তের নিমিত্ত, তোমায় তাহার অণুমাত্র অনুভব করিতে হয় নাই।

কিন্তু, এই নৃশংস সংসারে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিলে, উত্তর কালে, তোমার ভাগ্যে কি ঘটিত, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। হয় ত, ভাগ্যগুণে সৎ পাত্রে প্রতিপাদিতা

ও সৎ পরিবারে প্রতিষ্ঠিতা, হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতে ; নয় ত, ভাগ্যদোষে, অসৎ পাত্রের হস্তগতা ও অসৎ পরিবারের করাল কবলে পতিতা হইয়া, অবিচ্ছিন্ন দুঃখসম্ভোগে কালাতিপাত করিতে হইত। যদি, পরম যত্নে ও পরম আদরে পরিবর্ধিত করিয়া, পরিশেষে, তুমি অবস্থার বৈগুণ্যনিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশ-পরম্পরায় কালযাপন করিতেছ, ইহা দেখিতে হইত, তাহা হইলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বোধ হয়, তোমার অতর্কিত অন্তর্ধাননিবন্ধন যাতনা অপেক্ষা, সে যাতনা বহু সহস্র গুণে গরীয়সী হইত। তুমি, স্বল্পকালে সংসারব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া, আমাদের সেই সম্ভাবিত অতি বিষম আন্তরিক যাতনাভোগের সম্পূর্ণরূপ অপসারণ করিয়াছ। তোমায় যে, ক্ষণকালের জন্য, কাহারও নিকটে, কোনও অংশে, অণুমাত্র অস্নেহ বা অনাদরের আস্পদ হইতে হইল না, আদিরে আদরে নরলীলা সম্পন্ন করিয়া গেলে, ইহা ভাবিয়া, আমি আমার অবোধ মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিতে পারিব।

বিশেষতঃ, দীর্ঘকাল নরলোকবাসিনী হইলে, অপরিহরণীয় পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়া, প্রৌঢ় অবস্থায়, তোমার যে সকল লীলা ও অনুষ্ঠান করিতে হইত, নিতান্ত শৈশব অবস্থাতেই, তুমি তৎসমুদয় সম্যক্‌ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। স্বভাবসিদ্ধ অদ্ভুত কল্পনা-শক্তির প্রভাববলে, তুমি শ্বশুরালয় প্রভৃতি উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছিলে (৮)।

১। কখনও কখনও, স্নেহ ও মমতার আতিশয্যপ্রদর্শনপূর্বক, ঐকান্তিক ভাবে, তনয়ের লালনপালনে বিলক্ষণ ব্যাপৃত হইতে।

২। কখনও কখনও, 'তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছে' বলিয়া, দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, ধরাসনে শয়ন করিয়া থাকিতে।

৩। কখনও কখনও, 'শ্বশুরালয় হইতে অশুভ সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া ম্লান বদনে ও আকুল হৃদয়ে, কালযাপন করিতে।

৪। কখনও কখনও, 'স্বামী' আসিয়াছেন' বলিয়া, ঘোমটা দিয়া, সঙ্কুচিত ভাবে, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে ; এবং, সেই সময়ে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, লজ্জাশীলা কুলমহিলার ন্যায়, অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিতে।

৫। কখনও কখনও, 'পুত্রটি একলা পুকুরের ধারে গিয়াছিল, আর একটু হইলেই ডুবিয়া পড়িত', এই বলিয়া, সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয় আকুলতাপ্রদর্শন করিতে।

৬। কখনও কখনও, 'শ্বাশুড়ীর পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া, অবিলম্বে শ্বশুরালয়ে যাইবার নিমিত্ত, সজ্জা করিতে (৯)।

---

(৮) তুমি শ্বশুরালয়ের নাম কৃষ্ণনগর, স্বামীর নাম গোবর্ধন, শাশুড়ীর নাম ভাগ্যবতী, পুত্রের নাম নদে রাখিয়াছিলে।

(৯) তুমি, স্বকপোলকল্পিত সাংসারিক কাণ্ড লইয়া, যে সমস্ত লীলা করিয়াছ, তৎসমুদায় প্রায়

এইরূপে, তুমি সংসারযাত্রাসংক্রান্ত সকল লীলা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। বোধ হয়, যদি এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে অধিক দিন থাক, উত্তর কালে বিবিধ যাতনাভোগ একান্ত অপরিহার্য, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলে। এই জন্যই, ঈদৃশ স্বল্প সময়ে, যথাসম্ভব, সাংসারিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়া, সত্বর অন্তর্হিত হইয়াছ। তুমি, স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কার্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয় ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, অশেষবিধ যাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই, সুখে ও স্বচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।

কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে। অন্তিম পীড়াকালে, তুমি, উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলে। কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমায় ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই। ঔষধ সেবনান্তে, কিঞ্চিৎ দিবার পর, আকুল বচনে, 'আর খাব' 'আর খাব' বলিয়া, জলের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি লালসাপ্রদর্শন করিতে। কিন্তু, আমি, ইচ্ছানুরূপ জলপ্রদানের পরিবর্তে, তোমায় কেবল প্রবঞ্চনাবাক্যে সান্ত্বনাপ্রদানের চেষ্টা করিতাম। যদি তৎকালে জানিতে পারিতাম, তুমি অবধারিত পলায়ন করিবে, তাহা হইলে, কখনই, তোমায় পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির ও কাতর হইতে দিতাম না; ইচ্ছানুরূপ জলপান করাইয়া, নিঃসন্দেহ, তোমার উৎকটপিপাসানিবন্ধন অসহ্য যাতনার সর্বতোভাবে নিবারণ করিতাম। সে যাহা হউক, বৎসে! তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপ্রার্থনাকালে, আমার দিকে, বারংবার, যে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, চির দিনের নিমিত্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যদি তোমার সকল কাণ্ড বিস্মৃত হই, ঐ মর্মভেদী কাতর দৃষ্টিপাত, এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবেক না। যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলে, আবার মত পামর ও পাষণ্ড ভূমণ্ডলে আর নাই।

বৎসে! আমি যে তোমায় আন্তরিক ভাল বাসিতাম, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আর, তুমি যে আমায় আন্তরিক ভাল বাসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি, তোমায় অধিক ক্ষণ না দেখিলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতাম। তুমিও, আমায় অধিক ক্ষণ না দেখিতে পাইলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতে; এবং, আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব, আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন,

---

প্রবীণতা সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে। * * * কখনও, কখনও, তোমার পূজ্যপাদ পিতামহী দেবী, তোমার কল্পিত স্বামীর উল্লেখপূর্বক, পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসিতেন, 'কেমন প্রভা, সে এসেছিল?' তুমি অমনি, শিরশ্চালনপূর্বক, 'কাল এসেছিল' বলিয়া, উত্তর দিতে। পর ক্ষণেই তিনি, 'কি দিয়ে গেল,' এই জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি, 'চারি পয়সা ও সিকি পয়সার শাক,' এই উত্তর দিতে।

অনুক্ষণ, এই অনুসন্ধান করিতে। এক্ষণে, এত দিন তোমায় দেখিতে না পাইয়া, আমি অতি বিষম অসুখে কালহরণ করিতেছি। কিন্তু, তুমি এত দিন আমায় না দেখিয়া, কি ভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছি না। বৎসে! যদিও তুমি, নিতান্ত নির্মম হইয়া, এ জন্মের মত, অন্তর্হিত হইয়াছ, এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত হইতেছ কি না, জানিতে পারিতেছি না ; আর হয় ত, এত দিনে, আমায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ ; কিন্তু, আমি তোমায়, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না। তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্তি, চির দিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যার পর নাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। সতত পাঠ করিয়া, তোমায় সর্বক্ষণ স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিব ; তাহা হইলে, আর আমার তোমায় বিস্মৃত হইবার অণুমাত্র আশঙ্কা রহিল না।

বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না ; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।

বি বি ধ

নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস

বিজ্ঞাপন

সপ্তদশ বৎসর অতীত হইল, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ. তর্কালঙ্কারপ্রণীত শিশুশিক্ষা উপলক্ষে, আমার উপর, পরস্বহারী বলিয়া, যে দোষারোপ করেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের অভিলাষে, তদ্বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য, লিপিবদ্ধ করিয়া, পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় ছিল। নানা কারণে, তৎকালে সে অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারি নাই ; এবং, এতদিনের পর, আর তাহা সম্পন্ন করিবার অণুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিতে পাই, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর আরোপিত দোষের উল্লেখ করিয়া, অদ্যাপি অনেক মহাত্মা আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এজন্য, কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, স্বীয় বক্তব্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে হইল।

যে মহোদয়েরা, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, আমি পরস্বহারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, অনুগ্রহপূর্বক, কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এই পুস্তকে একবার দৃষ্টিসঞ্চারণ করেন ; তাহা হইলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, যোগেন্দ্রনাথ বাবু, উচিতানুচিত-বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, আমার উপর যে উৎকট দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা, কোনও মতে, সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

যোগেন্দ্রনাথ বাবু স্বীয় শ্বশুরের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ জীবনচরিতে তিনি আমার বিষয়ে যাদৃশ বিসদৃশ অভিপ্রায়প্রকাশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে, এই পুস্তকের শেষভাগে, তাহাও পরিদর্শিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে বাবু দীননাথ বসু উকীলের দুইখানি পত্র প্রকাশিত, এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই পত্রের আবশ্যক এক এক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।* পাছে কেহ এরূপ মনে করেন, এই সকল পত্র কৃত্রিম ; এজন্য, লিথগ্রাফি প্রণালীতে মুদ্রিত ও পুস্তকের শেষে যোজিত হইল। যাঁহারা তাঁহাদের হস্তাক্ষর জানেন, অন্ততঃ তাঁহারা, এইসকল, পত্র কৃত্রিম বলিয়া, আমার উপর দোষারোপ করিতে পারিবেন না।

কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১২৯৫ সাল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায়, তিনি ও আমি, উভয়ে সমাংশভাগী ছিলাম। কতিপয় বৎসর পরে, তর্কালঙ্কার, মুরসিদাবাদে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া, কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন। কিছু দিন পরে, তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েন।

ক্রমে ক্রমে, এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে, তর্কালঙ্কারের সহিত কোনও বিষয়ে সংস্রব রাখা উচিত নহে। এজন্য, উভয়ের আত্মীয় পটোলডাঙ্গা-নিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দে দ্বারা, তর্কালঙ্কারের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাই, হয় তিনি, আমার প্রাপ্য আমায় দিয়া, ছাপাখানায় সম্পূর্ণ স্বত্ববান্ হউন, নয় তাঁহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্ক ছাড়িয়া দিউন, অথবা উভয়ে ছাপাখানার যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লওয়া যাউক। তদনুসারে তিনি, আপন প্রাপ্য লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্কত্যাগ স্থির করেন। অনন্তর, উভয়ের সম্মতিক্রমে, বাবু শ্যামাচরণ দে, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই তিন ব্যক্তি, হিসাব নিকাস ও দেনা পাওনা স্থির করিয়া দিবার নিমিত্ত, সালিস নিযুক্ত হয়েন, এবং খাতা পত্র দেখিয়া, হিসাব নিকাস ও দেনা-পাওনার মীমাংসা করিয়া দেন। তাঁহাদের মীমাংসাপত্রের প্রতিলিপি তর্কালঙ্কারের নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি পত্রদ্বারা শ্যামাচরণ বাবুকে জানান, আমি এক্ষণে যাইতে পারিব না; আদালত বন্ধ হইলে, কলিকাতায় গিয়া, আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইব। কিছু দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহার পত্নী, কলিকাতায় আসিয়া, ছাপাখানা সংক্রান্ত স্বীয় পতির প্রাপ্য বুঝিয়া লয়েন।

কলিকাতায়, মুরসিদাবাদে, ও কাঁদিতে কর্ম করিবার সময়, তর্কালঙ্কারের পরিবার তাঁহার নিকটে থাকিতেন; তাহার বৃদ্ধা জননী বিল্বগ্রামের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর, তাঁহার পরিবার বিল্বগ্রামের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে, তর্কালঙ্কারের মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় আগমন করিলেন, এবং নিরতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, বিলাপ ও অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্র হইয়াছিল। কনিষ্ঠটি, কিছু কাল পূর্বে, কালগ্রাসে পতিত হয়েন। জ্যেষ্ঠ তর্কালঙ্কার জননীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। জননীর দুর্ভাগ্যবশতঃ, তিনিও মানবলীলার সংবরণ করিলেন। এমন স্থলে, জননীর যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে, তাহা অনায়াসেই সকলের অনুভবপথে আসিতে পারে। দুই তিন দিন পরে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তর্কালঙ্কার আপনকার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, মদন আমার কোনও ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। বধূমাতা,

আপন কন্যাগুলি লইয়া, স্বতন্ত্র আছেন। আমার দিনপাতের কোনও উপায় নাই; এজন্যে তোমার নিকটে আসিয়াছি। যদি তুমি দয়া করিয়া অন্ন বস্ত্র দাও, তবেই আমার রক্ষা; নতুবা আমায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। এই বলিয়া, তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া, আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, তর্কালঙ্কার যথেষ্ট টাকা রাখিয়া গিয়াছেন; অথচ তাঁহার বৃদ্ধা জননীকে, অন্ন-বস্ত্রের জন্যে, অন্যের নিকটে ভিক্ষা করিতে হইতেছে। যাহা হউক, কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর, তিনি বলিলেন, মাস মাস দশ টাকা পাইলে, আমার দিনপাত হইতে পারে। এই সময়ে, রোগ, শোক, আহারক্লেশ প্রভৃতি কারণে, তাঁহার শরীর সাতিশয় শীর্ণ হইয়াছিল; অধিকন্তু, চক্ষুর দোষ জন্মিয়া, ভাল দেখিতে পাইতেন না। তিনি বলিলেন, শরীর সুস্থ থাকিলে, ও চক্ষুর দোষ না জন্মিলে, পাঁচ টাকা হইলেই আমার চলিতে পারিত। কিন্তু শরীরের ও চক্ষুর যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে একটি পরিচারিকা ব্রাহ্মণকন্যা না রাখিলে, আমার কোনও মতে চলিবেক না। আমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি অধিক দিন বাঁচিব না; সুতরাং, অধিক দিন তোমায় আমার ভার বহিতে হইবেক না। এই সকল কথা শুনিয়া, আমি তাঁহাকে মাস মাস দশ টাকা দিতে সম্মত হইলাম; এবং, মাসে মাসে, তাঁহার নিকটে টাকা পাঠাইয়া দিতে লাগিলাম। (১)

কিছু দিন পরে, তিনি পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিলেন। কি জন্যে আসিয়াছেন, এই জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন, বাবা! তুমি আমার অন্নবস্ত্রের ক্লেশ দূর করিয়াছ। আর এক বিপদে পড়িয়া, পুনরায় তোমায় জ্বালাতন করিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন, অমুকের অত্যাচারে আমি আর বাটীতে তিষ্ঠিতে পারি না। বিশেষতঃ, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আমাদের

(১) এই সময়ে, তাঁহার আকার দেখিলে, তিনি অধিক দিন বাঁচিবেন, কিছুতেই এরূপ বোধ হইত না। কিন্তু কাশীতে গিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়, এবং চক্ষুর দোষ এক কালে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ, তাঁহার আকারের এত পরিবর্ত হইয়াছিল যে, এক বৎসর পরে, কাশীতে গিয়া, আমি তাঁহাকে কোনও মতে চিনিতে পারি নাই। তিনি, তাহা বুঝিতে পারিয়া, আমায় বলিলেন, বাবা! তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না, আমি মদনের মা। এই কথা শুনিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম, এবং বলিলাম, আপনি, জুয়াচুরি করিয়া, আমাকে বিলক্ষণ ঠকাইয়াছেন। তিনি, কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া, আমায় বলিলেন, বাবা! আমি কি জুয়াচুরি করিয়াছি। আমি বলিলাম, শুকনা হাড় ও কানা চোখ দেখাইয়া, আপনি বলিয়াছিলেন, আমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি অধিক দিন বাঁচিব না; সুতরাং, অধিক দিন, তোমায় আমার ভার বহিতে হইবেক না। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে অন্ততঃ আর বিশ বৎসর আপনি বাঁচিবেন। তখন ইহা বুঝিতে পারিলে, আমি আপনাকে মাস মাস দশ টাকা দিতে সম্মত হইতাম না। এই কথা শুনিয়া, তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন। আঠার বৎসর হইল, তাঁহার সহিত এই কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন। এ দেশে থাকিলে, তিনি এত দিন জীবিত থাকিতেন, কোনও ক্রমে এরূপ প্রতীতি হয় না।

বাটীতে আসিলে, তাহাদের সমক্ষে, তিনি অকারণে আমার এত তিরস্কার করেন যে, প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে তোমার নিকটে আসিলাম। তখন আমি বলিলাম, মা! আপনকার এ অসুখের নিবারণ করা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর, আমি বলিলাম, আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আর আপনকার সংসারে থাকিবার কোনও আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না। আমার বিবেচনায়, অতঃপর কাশীবাস করাই আপনকার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়। আমার পিতৃদেব কাশীবাসী হইয়াছেন; যদি মত করেন, আপনাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিই। তিনি বাসা স্থির করিয়া দিবেন; সর্বদা তত্ত্বাবধান করিবেন; আপনকার পরিচর্যার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণকন্যা স্থির করিয়া দিতে পারিবেন; তাঁহার নিকট হইতে মাস মাস দশ টাকা পাইবেন; যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে মাসিক দশ টাকাতে, সেখানে সচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারিবেন। তিনি সম্মত হইলেন; তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি অদ্যাপি কাশীবাস করিতেছেন; এবং, আমার নিকট হইতে, মাস মাস, দশ টাকা পাইতেছেন।

একদা, তর্কালঙ্কারের পত্নী ও বিধবা মধ্যমা কন্যা কুন্দমালা কলিকাতায় আসিলেন। এক দিন কুন্দমালা, তাহার জননীর সমক্ষে, আমায় বলিল, দেখ, কাকা! পিতা অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন; মা বুঝিয়া চলিলে, আমাদের সচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারিত। কিন্তু উনি বিবেচনা করিয়া চলিতেছেন না, সকলই উড়াইয়া ফেলিতেছেন। আর কিছু দিন পরে, আমাদিগকে অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ পাইতে হইবেক। উঁহার অদৃষ্টে যাহা আছে, হউক; কিন্তু আমি অল্পবয়স্কা ও অনাথা; আমায় অধিক দিন বাঁচিতে হইবেক। আমার অদৃষ্টে কত কষ্টভোগ আছে, বলিতে পারি না। এই বলিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, কুন্দমালা অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে নিরতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন আমি কুন্দমালাকে বলিলাম, বাছা! রোদন করিও না; আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তুমি অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না। আমি তোমাকে মাস মাস দশ টাকা দিব; তাহা হইলেই তোমার অনায়াসে দিনপাত হইতে পারিবেক। এই বলিয়া, সেই মাস অবধি, আমি কুন্দমালাকে, মাস মাস, দশ টাকা দিতে আরম্ভ করিলাম। সে অদ্যাপি, আমার নিকট হইতে, মাস মাস, দশ টাকা পাইতেছে।

এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক, ছাপাখানা স্থাপিত হইবার কিছু দিন পরে, একটি সরকার নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়। তর্কালঙ্কারের ভগিনীপতি মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতিকষ্টে দিনপাত করিতেন, ইহা আমি সবিশেষ অবগত ছিলাম; এজন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলাম। তর্কালঙ্কার প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না; অবশেষে, আমার পীড়াপীড়িতে, তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। মাধবচন্দ্র, মাসিক দশ টাকা বেতনে, নিযুক্ত হইলেন। কিছু কাল কর্ম করিয়া, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তর্কালঙ্কারের ভগিনী, কলিকাতায় আসিয়া, আমার নিকটে রোদন

করিতে লাগিলেন, এবং সাতিশয় কাতর বচনে বলিলেন., দাদা। কাল কি খাইব, তাহার সংস্থান নাই। অতএব, দয়া করিয়া, আমার কোনও উপায় কর। নতুবা, ছেলেমেয়ে লইয়া, আমায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। তর্কালঙ্কারের ভগিনী যাহা বলিলেন, তাহা কোনও অংশে অপ্রকৃত নহে ; এজন্য তর্কালঙ্কারের নিকট প্রস্তাব করিলাম, যত দিন তোমার ভাগিনেয়টি মানুষ না হয়, তাবৎ, ছাপাখানার তহবিল হইতে, তোমার ভগিনীকে মাস মাস দশ টাকা দিতে হইবেক। তর্কালঙ্কার, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, সম্মত হইলেন। তাঁহার ভগিনী, ছাপাখানার তহবিল হইতে, মাস মাস দশ টাকা পাইয়া, দিনপাত করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে, তর্কালঙ্কার মুরসিদাবাদ হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন, আমার ভগিনীকে, ছাপাখানার তহবিল হইতে, মাস মাস যে দশ টাকা দেওয়া হয়, তাহা আমি, আগামী মাস হইতে, রহিত করিলাম। এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহার ভগিনী, কলিকাতায় আসিয়া, আমার নিকটে রোদন করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, ছাপাখানার তহবিল হইতে আর আমি তোমায় টাকা দিতে পারিব না। আমি এইমাত্র করিতে পারি, আমার অংশের পাঁচ টাকা তুমি মাস মাস আমার নিকট হইতে পাইবে ; ইহার অতিরিক্ত দেওয়া আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। তিনি, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া, বাটী গমন করিলেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, আমার নিকট হইতে, মাস মাস, পাঁচ টাকা পাইয়া, কোনও রূপে দিনপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই, তদীয় পুত্রটির প্রাণত্যাগ ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয়া বিধবা কন্যা, যত দিন জীবিত ছিলেন, আমার নিকট হইতে মাস মাস দুই টাকা লইয়া, দিনপাত করিয়াছিলেন।

এক দিন, তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, তর্কালঙ্কারের বিধবা মধ্যমা কন্যা কুন্দমালার উল্লেখ করিয়া, আমায় বলিলেন, মেজ দিদি বলেন, কাকা, দয়া করিয়া, আমায় মাস মাস দশ টাকা দিতেছেন ; তাহাতে আমার দিনপাত হইতেছে। যদি তিনি, দয়া করিয়া, শিশুশিক্ষার তিন ভাগ আমায় দেন, তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়। এই কথা শুনিয়া, আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে বলিলাম, কুন্দমালাকে বলিবে, আমি, তাহার প্রার্থনা অনুসারে, শিশুশিক্ষার তিন ভাগ তাহাকে দিলাম। আজ অবধি, সে ঐ তিন পুস্তকের উপস্বত্বভোগে অধিকারিণী হইল। যোগেন্দ্রনাথ বাবু কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর আমায় বলিলেন, দেখুন, আপনি পুস্তক তিন খানি দয়া করিয়া তাঁহাকে দিতেছেন, এরূপ ভাবিবেন না। সালিসেরা যে মীমাংসাপত্র লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে শিশুশিক্ষার কোনও উল্লেখ নাই ; সুতরাং শিশুশিক্ষা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি। এই কথা শুনিয়া, আমি চকিত হইয়া উঠিলাম ; এবং, সহসা কিছুই অবধারিত বুঝিতে না পারিয়া, যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে বলিলাম, তবে শিশুশিক্ষার বিষয় আপাততঃ স্থগিত থাকুক। সবিশেষ অবগত না হইয়া, আমি এ বিষয়ে কিছু বলিতে ও করিতে পারিতেছি না। যদি এরূপ হয়, আমি পরকীয়

সম্পত্তি অন্যায় রূপে অধিকার করিতেছি, তাহা হইলে, কেবল পুস্তক তিন খানি দিয়া, নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না ; যে কয় বৎসর ঐ তিন পুস্তক আমার অধিকারে আছে, সেই কয় বৎসরের যে প্রকৃত উপস্বত্ব হইবেক, তাহাও, পুস্তকের সহিত, তর্কালঙ্কারের উত্তরাধিকারীদিগকে দিতে হইবেক। অতএব, তুমি কিছু দিন অপেক্ষা কর ; আমি, এ বিষয়ের সবিশেষ তদন্ত করিয়া, প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তোমায় জানাইব।

এই কথা বলিয়া, সে দিন যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে বিদায় করিলাম ; এবং, অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্মা হইয়া, উপস্থিত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। সর্বাগ্রে সালিস মহাশয়দিগের মীমাংসাপত্র বহিষ্কৃত করিলাম ; তাহাতে শিশুশিক্ষার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। পরে, সালিস মহাশয়দিগকে, উপস্থিত বিষয় অবগত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, এ বিষয়ে আপনাদের কিছু স্মরণ হয় কি না। তাঁহারা বলিলেন, বহু বৎসর পূর্বে, আমরা সালিসি করিয়াছিলাম ; এক্ষণে তৎসংক্রান্ত কোনও বিষয়ের কিছুই স্মরণ হইতেছে না। অনেক ক্ষণ কথোপকথনের পর, শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, আমার ঠিক কিছুই মনে পড়িতেছে না ; তবে আপাততঃ এইমাত্র স্মরণ হইতেছে, তুমি তোমাদের রচিত পুস্তকের বিষয়ে কোনও প্রস্তাব করিয়াছিলে। মদন, সে বিষয়ে, আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন। যদি সে পত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে, বোধ করি, আর কোনও গোল থাকে না।

আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম। তিনি, তাহা না করিয়া, আমায় ভয় দেখাইয়া, সত্বর কার্যশেষ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে বাগবাজারনিবাসী বাবু দীননাথ বসু উকীলের নিকটে গমন করিলেন। দীননাথ বাবু, তাঁহার মুখে যেরূপ শুনিলেন, তদনুসারে আমায় নিম্নদর্শিত পত্র লিখিলেন,

"PUNDIT ISSWAR CHUNDER BIDYSAGOR.

My dear Sir,

The widow and children of the late lamented Mudun mohun Turkalankar are in difficulty in consequence of your having stopped their allowance for profits in Turkalankar's works and preventing their publication by them. I hope you will please do something for them to avoid scandal and future botheration. The matter has been brought into my notice by persons interested for the family of Turkalankar and I have assured them that there will be no difficulty for them to get back their rights. Kindly try to settle the matter amicably as soon as possible lest it grows serious by delay.

Hoping you are well. I remain

17 May 71. Yours V Sincerely

DINONATH BOSE"

পত্রের অনুবাদ

"আপনি মদনমোহন তর্কালঙ্কারপ্রণীত পুস্তকের উপস্বত্ব হিসাবে তাঁহার পরিবারকে যাহা দিতেন, তাহা রহিত করিয়াছেন; এবং তাঁহাদিগকে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিতেছেন না; এজন্য তাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন। আমি আশা করি, আপনি এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবেন; নতুবা আপনাকে দুর্নামগ্রস্ত ও উৎপাতে পতিত হইতে হইবেক। তর্কালঙ্কারপরিবারের হিতৈষী ব্যক্তিরা এ বিষয় আমার গোচর করিয়াছেন; এবং আমি তাঁহাদিগকে অবধারিত বলিয়াছি, তাঁহাদের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইতে তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হইবেক না। আপনি দয়া করিয়া, যত সত্বর পারেন, এ বিষয়ের আপোশে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবেন; বিলম্ব করিলে আপনাকে কষ্ট পাইতে হইবেক।"

আমি তর্কালঙ্কারের পরিবারকে, তাঁহার পুস্তকের উপস্বত্বহিসাবে, যাহা দিতাম, তাহা রহিত করিয়াছি, এবং তাঁহাদিগকে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিতেছি না; যোগেন্দ্রনাথ-বাবু, কোন বিবেচনায়, দীননাথ বাবুর নিকট, এরূপ অলীক নির্দেশ করিলেন, বলিতে পারি না। তর্কালঙ্কারের পরিবার, পুস্তকের উপস্বত্ব উপলক্ষে, আমার নিকট কখনও কোনও দাবি করেন নাই, এবং আমিও, পুস্তকের উপস্বত্ব বলিয়া, তাঁহাদিগকে কখনও কিছু দিই নাই। আর তাঁহারা ঐ পুস্তক ছাপাইতে চাহেন, আমার নিকট কখনও এরূপ কথার উত্থাপন হয় নাই। এমন স্থলে, আমি পুস্তকের উপস্বত্বদান রহিত করিয়াছি, এবং পুস্তক ছাপাইতে দিতেছি না, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে, মহামতি যোগেন্দ্রনাথ বাবু ব্যতীত অন্যের তাহা বুঝিবার অধিকার নাই। ফলকথা এই, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর এই নির্দেশ সম্পূর্ণ অলীক ও কপোলকল্পিত। তিনি, তর্কালঙ্কারের মধ্যমা কন্যা কুন্দমালার নাম করিয়া, আমার নিকটে, ভিক্ষাস্বরূপ, শিশুশিক্ষা প্রার্থনা করিবার পূর্বে, কখনও, কোনও সূত্রে, কোনও আকারে, শিশু-শিক্ষার কোনও উল্লেখ হয় নাই।

যাহা হউক, দীননাথ বাবুর পত্র পাইয়া, আমি সাতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। শ্যামাচরণ বাবুও, পত্রার্থ অবগত হইয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে, ইহার তিন চারি দিন পরেই, তর্কালঙ্কারের পত্র হস্তগত হইল। পত্রপাঠ করিয়া, সমস্ত বিষয় আমার ও শ্যামাচরণ বাবুর স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। সে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

সালিস মহাশয়েরা হিসাব নিকাসে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, আপনাদিগকে দুই প্রকার হিসাব করিতে হইবেক; প্রথম এই, অন্যান্য পুস্তকের ন্যায়, আমাদের উভয়ের রচিত পুস্তকের ছাপার খরচ ধরিয়া লইয়া, ছাপাখানার হিসাব করিতে হইবেক; দ্বিতীয় এই, আমাদের রচিত পুস্তকের, ছাপার ও বিক্রয়ের খরচ বাদে, যে মুনাফা থাকিবেক, তাহার স্বতন্ত্র হিসাব করিতে হইবেক। ছাপাখানার মুনাফায় উভয়ে তুল্যাংশভাগী হইব; এবং, ছাপার ও বিক্রয়ের খরচা বাদে, কাপি-রাইট হিসাবে, আমরা স্ব স্ব পুস্তকের উপস্বত্ব পাইব। শ্যামাচরণ বাবু পত্রদ্বারা

তর্কালঙ্কারকে এই বিষয় এবং আর কতিপয় বিষয় জানাইলে, তর্কালঙ্কার তদুত্তরে এ বিষয়ে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান,—

> "Copyright বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছ তদ্বিষয়ে কয়েক কথা বক্তব্য আছে, আমি যে পর্যন্ত ছাপাখানার কার্য করিয়াছিলাম তৎকাল পর্যন্ত কাপিরাইটের কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত ছিল না, এবং আমার যেন এইরূপ স্মরণ হইতেছে, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল হইলেন তখনি মৃত মহাত্মা বীটন সাহেব তাঁহাকে ছাপাখানার ব্যবসায় বিষয়ক কি Hint দিয়াছিলেন অথবা দত্তবংশীয়েরা তাঁহার উপর কোন কলঙ্কারোপ না করিতে পারে এই বিবেচনা করিয়া ফলে আমার সে কথা ঠিক স্মরণ পড়িতেছে না, বিদ্যাসাগর ভায়া ছাপাখানার অংশীদার থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি আর ছাপাখানার অংশ গ্রহণ করিবেন না, যে সকল পুস্তক তিনি রচনা করিয়া দিবেন, তাহার কাপিরাইট তিনি লইবেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য উপস্বত্বের ভাজন আমাকে করিবেন এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ফলে বিদ্যাসাগরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত তোমাদিগে জানাইতে পারিবেন, অতএব উক্ত সময় হইতে কাপি-রাইটের হিসাব করা উচিত হয়, তাহার পূর্বে যে কথা ছিল না ও হয় নাই, সে কথার নূতন প্রসঙ্গ করা উচিত হয় না।"

তর্কালঙ্কারের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সালিস মহাশয়েরা আমায় জিজ্ঞাসিলেন, এক্ষণে আমরা কিরূপ করিব, বল। আমি বলিলাম, তর্কালঙ্কার যেরূপ বলিতেছেন, তাহা, আমার বিবেচনায়, কোনও মতে, সঙ্গত ও ন্যায়ানুগত নহে। কিন্তু তাহাতে আপত্তি করিতে গেলে, কার্য শেষ হইবার পক্ষে, অনেক বিলম্ব ঘটিবেক। যত সত্বর হয়, তর্কালঙ্কারের সহিত সর্বপ্রকার সংশ্রব রহিত হওয়া আমার সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়। অতএব, আপনারা, তদীয় অভিপ্রায় অনুসারেই, সত্বর, কার্য শেষ করিয়া দিউন। তখন তাঁহারা বলিলেন, তবে তর্কালঙ্কার যে সময় হইতে কাপি-রাইটের হিসাব করা উচিত হয় বলিতেছেন, তাহার পূর্বে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, তাহার একটি ফর্দ, আর তাহার পরে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহার একটি ফর্দ করিয়া দাও। আমি দুইটি ফর্দ করিয়া দিলাম। প্রথম ফর্দে তর্কালঙ্কারের উল্লিখিত সময়ের পূর্বে লিখিত পুস্তকের, দ্বিতীয় ফর্দে ঐ সময়ের পরে লিখিত পুস্তকের বিবরণ রহিল। তর্কালঙ্কারের অভিপ্রায় অনুসারে, প্রথমফর্দনির্দিষ্ট পুস্তকগুলি (২) ছাপাখানার সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল; সুতরাং, ঐ সমস্ত পুস্তকের উপস্বত্ব ছাপাখানার উপস্বত্বের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। এই সমবেত উপস্বত্বে উভয়ে তুল্যাংশভাগী হইয়াছিলাম।

(২) তর্কালঙ্কারের লিখিত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ; আমার লিখিত বেতালপঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবনচরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ তিন ভাগ।

আমি, তর্কালঙ্কারের পত্র লইয়া, প্রথমতঃ অনরবল জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়ের নিকটে উপস্থিত হইলাম, এবং সবিশেষ সমস্ত তাঁহার গোচর করিলাম। তিনি, তর্কালঙ্কারের পত্র পাঠ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তর্কালঙ্কার যে সময় হইতে কাপিরাইটের হিসাব করা উচিত হয় বলিতেছেন, তাঁহার শিশুশিক্ষা তাহার পূর্বে অথবা পরে লিখিত। আমি বলিলাম, শিশুশিক্ষা তাহার বহু বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, তর্কালঙ্কারের মীমাংসা অনুসারে, শিশুশিক্ষা ছাপাখানার সম্পত্তি হইয়াছে; সে বিষয়ে তদীয় উত্তরাধিকারীদের আর দাবি করিবার অধিকার নাই; আপনি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। এইরূপে আশ্বাসিত ও অভয় প্রাপ্ত হইয়া, আমি বাবু দীননাথ বসু উকীলের নিকটে উপস্থিত হইলাম; এবং, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিয়া, তর্কালঙ্কারের পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলাম। পত্র পাঠ করিয়া, এবং বারংবার জিজ্ঞাসা দ্বারা সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, দীননাথ বাবু. কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর আমায় বলিলেন, যোগেন্দ্রনাথ বাবু যে এরূপ চরিত্রের লোক, তাহা আমি জানিতাম না। আপনি তর্কালঙ্কারের পরিবারকে তদীয় পুস্তকের উপস্বত্ব হিসাবে যাহা দিতেন, তাহা রহিত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে ঐ পুস্তক ছাপাইতে দিতেছেন না, আমার নিকটে এরূপ অলীক নির্দেশ করা, তাঁহার মত সুশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে, নিতান্ত অনুচিত কার্য হইয়াছে; আর, আমিও, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, আপনাকে ওরূপ পত্র লিখিয়া, নিতান্ত অন্যায় কার্য করিয়াছি। আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন। তৎপরে তিনি আমায় বলিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন; এজন্য আর আপনকার উদ্বিগ্ন হইবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। তর্কালঙ্কারের মীমাংসা অনুসারে, তদীয় পরিবারের শিশুশিক্ষায় আর অধিকার নাই। আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে এ বিষয়ে নিরস্ত হইতে বলিব, এবং তিনি যেরূপ বলেন, তাহা আপনাকে জানাইব।

এইরূপে উভয় স্থানে অভয় প্রাপ্ত হইয়া, আমি যোগেন্দ্রনাথ বাবুকে, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে, পটোলডাঙ্গার শ্যামাচরণ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইতে বলিয়া পাঠাইলাম। যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যোগেন্দ্রনাথ বাবু এবং তর্কালঙ্কারের শ্যালক শ্রীযুত বাবু রামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয়ে উপস্থিত আছেন। তাঁহাদিগকে তর্কালঙ্কারের পত্র দেখাইলাম। পত্র পাঠ করিয়া, যোগেন্দ্রনাথ বাবু, বিষণ্ণ বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; কিয়ৎ ক্ষণ পরে আমায় বলিলেন, তবে আপনি দয়া করিয়া যেরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপই দেন। আমি বলিলাম, তুমি কুন্দমালার নাম করিয়া প্রার্থনা করাতে, আমি, দ্বিরুক্তি না করিয়া, পুস্তক তিন খানি দিতে সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু তৎপরে তোমরা যে ফেসাৎ উপস্থিত করিয়াছ, তাহাতে আর আমার দয়া করিবার ইচ্ছাও নাই, আবশ্যকতাও নাই। তোমরা উকীলের চিঠি দিয়াছ, নালিসের ভয় দেখাইয়াছ, এবং, আমি ফাঁকি দিয়া পরের সম্পত্তি ভোগ করিতেছি বলিয়া, নানা স্থানে আমার কুৎসা করিয়াছ। আমাদের

দেশের লোক নিরতিশয় পরকুৎসাপ্রিয় ; তোমার মুখে আমার কুৎসা শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন ; এবং, তত্ত্বানুসন্ধানে বিমুখ হইয়া, আমার কুৎসাকীর্তন করিয়া, বিলক্ষণ আমোদ করিতেছেন। এমন স্থলে, আর আমার দয়া করিতে প্রবৃত্তি হইবেক কেন ? তবে কুন্দমালাকে বলিবে, আমি তাহাকে, মাস মাস, যে দশ টাকা দিতেছি, অনেকে, তোমাদের আচরণদর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহা রহিত করিবার নিমিত্ত আমায় পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু কুন্দমালা নিতান্ত অনাথা ; আর, আমি যত দূর বুঝিতে পারিতেছি, এ বিষয়ে তাহার কোনও অপরাধ নাই। এজন্য, আমি তাহাকে মাস মাস যে দশ টাকা দিতেছি, তাহা দিব, কদাচ তাহা রহিত করিব না। এই বলিয়া, আমি তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলাম।

ইহার কিছু দিন পরে, বাবু দীননাথ বসু উকীলের নিকট হইতে নিম্নদর্শিত পত্র পাইয়াছিলাম।

"পরম পূজনীয় শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেষু

প্রণাম শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ।—

মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবার পরেই ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জামাতা আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকল কথা কহাতে অনেক বাদানুবাদের পর তেঁহ অত্র বিষয় সালিস দ্বারা নিষ্পত্য করা ভাল বলিয়া প্রকাশ করাতে আমি তাঁহাকে তদ্বিষয় ধার্য্য ও তাহাতে আপনকার কিরূপ অভিরুচি হয় তাহা জানিবার কথা কহাতে তিনি তাহা স্থির করিয়া আমাকে কহিবেন বলিয়া যান। তদবধি আমি তাহার কোন সংবাদ না পাওয়ায় অত্র বিষয়ে কোন উত্তেজনা করি নাই। আমার নিজ মঙ্গল মহাশয়ের শারীরিক কুশলসংবাদে তুষ্ট রাখিবেন। ইহা নিবেদনেতি তারিখ ২৬ জ্যৈষ্ঠ।

সেবক শ্রীদীননাথ দাস বসু।
মোঃ বাগবাজার।"

যোগেন্দ্রনাথ বাবু সালিস দ্বারা নিষ্পত্তির কথা আমার নিকটে উপস্থিত করেন নাই। বোধ হয়, তর্কালঙ্কারের পত্র দেখিয়া, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ বিষয়ে নালিস অথবা সালিস দ্বারা নিষ্পত্তির চেষ্টা করিলে, ইষ্টসিদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নাই ; এই জন্যই, হতোৎসাহ হইয়া, আমার নিকটে সালিস দ্বারা নিষ্পত্তির প্রস্তাব উপস্থিত না করিয়া, "তবে আপনি দয়া করিয়া যেরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপই দেন," এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার পর, যোগেন্দ্রনাথ বাবু, অথবা তর্কালঙ্কার-পরিবারের অন্য কোনও হিতৈষী আত্মীয়, আমার নিকটে, আর কখনও, কোনও আকারে, শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত কোনও কথার উত্থাপন করেন নাই।

যোগেন্দ্রনাথ বাবু, শ্বশুরপরিবারের হিতসাধনবাসনার বশবর্তী হইয়া, আমার পক্ষে যাদৃশ ভদ্রতাপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দর্শিত হইল। তিনি, শ্বশুরের গৌরববর্ধন-

বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, আমার পক্ষে যাদৃশ ভদ্রতাপ্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ, বেতাল পঞ্চবিংশতির দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হইতেছে।

"১৯০৩ সংবতে, বেতালপঞ্চবিংশতি প্রথম প্রচারিত হয়। ২৫ বৎসর অতীত হইলে, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা, শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., তদীয় জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—

> "বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থ-গুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে"।

যোগেন্দ্রনাথ বাবু, কি প্রমাণ অবলম্বনপূর্বক, এরূপ অপ্রকৃত কথা লিখিয়া প্রচারিত করিলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি, বেতালপঞ্চবিংশতি মুদ্রিত করিবার পূর্বে, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলাম। শুনাইবার অভিপ্রায় এই যে, কোনও স্থল অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন; তদনুসারে, আমি সেই সেই স্থল সংশোধিত করিব। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, কোনও কোনও উপাখ্যানে একটি স্থলও তাঁহাদের অসঙ্গত বা অসংলগ্ন বোধ হয় নাই; সুতরাং সেই সেই উপাখ্যানের কোনও স্থলেই কোনও প্রকার পরিবর্ত করিবার আবশ্যকতা ঘটে নাই। আর, যে সকল উপাখ্যানে তাঁহারা তদ্রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই উপাখ্যানে, স্থানে স্থানে, দুই একটি শব্দ মাত্র পরিবর্তিত হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন ও তর্কালঙ্কার ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই। সুতরাং, বেতালপঞ্চবিংশতি তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর এই নির্দেশ কোনও মতে সঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয় নাই। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। তিনি এক্ষণে সংস্কৃত কালেজে সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক। এ বিষয়ে, তিনি আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে যে পত্র লিখিয়াছেন, ঐ উত্তরপত্র, আমার জিজ্ঞাসাপত্রের সহিত, নিম্নে নিবেশিত হইতেছে।

"অশেষগুণাশ্রয়

শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভ্রাতৃপ্রেমাস্পদেষু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিছু দিন হইল, সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন-চরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বিদ্যাসাগর-প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার

দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।” বেতালপঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। যোগেন্দ্রনাথ বাবুর উক্তি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত করিব, স্থির করিয়াছি। বেতালপঞ্চবিংশতির সংশোধনবিষয়ে তর্কালঙ্কারের কত দূর সংস্রব ও সাহায্য ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার পত্র খানি, আমার বক্তব্যের সহিত, প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় আছে, জানিবে ইতি।

কলিকাতা। ত্বদেকশর্ম্মশর্ম্মণঃ
১০ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল। শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ”

“পরমশ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়
জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিমেষু

শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, “বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।” এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত; আমার বিবেচনায়, এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্রনাথ বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে, আমার অথবা তর্কালঙ্কারের, এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্রখানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি।

কলিকাতা সোদরাভিমানিনঃ
১২ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল। শ্রীগিরিশচন্দ্রশর্ম্মণঃ”

যোগেন্দ্রনাথ বাবু স্বীয় শ্বশুরের জীবনচরিত পুস্তকে, আমার সংক্রান্ত যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এইরূপ অমূলক। দৃষ্টান্তস্বরূপ আর একটি স্থল প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

> "সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইল। এরূপ শুনিতে পাই, বেথুন তর্কালঙ্কারকে এই পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের যোগ্য বলিয়া বেথুনের নিকট আবেদন করায়, বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তর্কালঙ্কারের ন্যায় সদাশয় উদারচরিত ও বন্ধুহিতৈষী ব্যক্তি অতি কম ছিলেন। হৃদয়ের বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতর পদে অভিষিক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার বন্ধুত্বের ও ঔদার্য্যের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।"

গ্রন্থকর্তার অলৌকিক কল্পনাশক্তি ব্যতীত এ গল্পটির কিছুমাত্র মূল নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হয়েন; ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সালের নবেম্বর মাসে, মুরসিদাবাদের জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রস্থান করেন। তর্কালঙ্কারের নিয়োগসময়েও, যিনি (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তর্কালঙ্কারের প্রস্থান-সময়েও, তিনিই (বাবু রসময় দত্ত) সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফলতঃ, তর্কালঙ্কার যত দিন সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় মধ্যে, এক দিনের জন্যেও, ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয় নাই। সুতরাং, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়াতে, বেথুন সাহেব মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, তর্কালঙ্কার, ঔদার্যগুণের আতিশয্যবশতঃ, আমাকে ঐ পদের যোগ্য বিবেচনা করিয়া, ও বন্ধুস্নেহের বশীভূত হইয়া, বেথুন সাহেবকে আমার জন্য অনুরোধ করাতে, আমি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, ইহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে, তাহা মহামতি যোগেন্দ্রনাথ বাবুই বলিতে পারেন।

আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজপণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, মুরসিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজের তৎকালীন সেক্রেটারি, শ্রীযুত ডাক্তর মোয়েট সাহেব, আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। (৩) আমি, নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি বলিয়াছিলাম, যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি। তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্মে একখানি পত্র লেখাইয়া লয়েন। তৎপরে, ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের

(৩) এই সময়ে আমি ফোর্টউইলিয়ম কালেজে হেড রাইটর নিযুক্ত ছিলাম।

অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছু দিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদ পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কালেজের বর্তমান অবস্থা, ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষাসমাজ আমাকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কালেজে অধ্যক্ষতাকার্য, সেক্রেটারি ও আসিস্টান্ট সেক্রেটারি, এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্বাহিত হইয়া আসিতেছিল ; ঐ দুই পদ রহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট হইল। ১৮৫১ সালেব জানুয়ারি মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।

যোগেন্দ্রনাথ বাবুর কল্পিত গল্পটির মধ্যে, "এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয়", এই কথাটি লিখিত আছে। যাঁহারা, বহু কাল অবধি, সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত আছেন, অথবা যাঁহারা কোনও রূপে সংস্কৃত কালেজের সহিত কোনও সংস্রব রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনও এরূপ জনশ্রুতি কর্ণগোচর করেন নাই। যাহা হউক, যদিই দৈবাৎ ঐরূপ অসম্ভব জনশ্রুতি, কোনও সূত্রে, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছিল, ঐ জনশ্রুতি অমূলক অথবা সমূলক, ইহা পরীক্ষা করা তাঁহার আবশ্যক বোধ হয় নাই। আবশ্যক বোধ হইলে, অনায়াসে তাঁহার সংশয়চ্ছেদন হইতে পারিত ; কারণ, আমার নিয়োগবৃত্তান্ত সংস্কৃত কালেজ সংক্রান্ত তৎকালীন ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। যোগেন্দ্রনাথ বাবু সংস্কৃত কালেজের ছাত্র ; যে সময়ে তিনি আমার নিয়োগের উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, বোধ হয়, তখনও তিনি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। যদি, সবিশেষ জানিয়া, যথার্থ ঘটনার নির্দেশ করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, আমার নিয়োগ সংক্রান্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকিত না।

ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। (৪) আমি, বিশিষ্ট হেতুবশতঃ, অধ্যাপকের পদগ্রহণে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করি। (৫) তদনুসারে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। এই প্রকৃত বৃত্তান্তটির সহিত, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর কল্পিত গল্পটির, বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে।"

আমি তর্কালঙ্কারের সংস্রবত্যাগে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলে, তিনি পটোলডাঙ্গার শ্যামাচরণ বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়ৎ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে। এই উদ্ধৃত

(৪) এই সময়ে, আমি সংস্কৃত কালেজে আসিস্টান্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলাম।

(৫) এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কালেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

অংশ দৃষ্টিগোচর করিলে, আমি ও তর্কালঙ্কার, এ উভয়ের চাকরি বিষয়ে পরস্পর কিরূপ সম্পর্ক, তাহা অনায়াসে যোগেন্দ্রনাথ বাবুর হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবেক।

"ভ্রাতঃ! ক্রমশঃ পদোন্নতি ও এই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী পদপ্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলই বিদ্যাসাগরের সহায়তা বলে হইয়াছে, অতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ্ ও বিরক্ত হইলেন তবে আর আমার এই চাকরি করায় কাজ নাই, আমার এখনি ইহাতে ইস্তাফা দিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিৎ হয়। শ্যাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব, আমি এই সবডিভিজনে আসিয়া অবধি যেন মহাসাপরাধীর ন্যায় নিতান্ত ম্লান ও স্ফূর্তিহীন চিত্তে কর্মকাজ করিতেছি, অথবা আমার অসুখের ও মনোগ্লানির পরিচয় আর কি মাথা মুণ্ড জানাইব, আমার বাল্যসহচর, একহৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক, পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজ ৬ ছয় মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই, আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি। শ্যাম! তুমি আমার সকল জান, এই জন্যে তোমার নিকট এত দুঃখের পরিচয় পাড়িলাম।"

'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস'-এর ভূমিকায় প্রকাশিত কয়েকটি পত্রের অবিকল প্রতিলিপি অনাবশ্যক বোধে মুদ্রিত হইল না।

রামের রাজ্যাভিষেক

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রামের রাজ্যাভিষেক' নামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপর একখানি সাহিত্য-পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুস্তক কিয়দংশ লিখিত হইলে পর পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সুখের বিষয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত অংশ নষ্ট হয় নাই। তাঁহার পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে স্বরচিত 'রামের অধিবাস' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত 'রামের রাজ্যাভিষেক' অংশ এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। সেই অংশটুকু 'রামের রাজ্যাভিষেক' নামে মুদ্রিত হইতেছে।

নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের রচিত 'রামের অধিবাস'-এর বিজ্ঞাপন হইতে নিম্নাংশ উদ্‌ধৃত হইল :

"পূজ্যপাদ পিতৃদেব, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, চরম বয়সে, 'রামের রাজ্যাভিষেক' নাম দিয়া, একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিয়দংশ লিখিত হইলে, শ্রীযুত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রামের রাজ্যাভিষেক' প্রকাশিত হয়। এজন্য, পিতৃদেব, তদীয় উদ্যম হইতে বিরত হয়েন।......

......আমি, মধ্যে, পিতৃদেবলিখিত অংশ সন্নিবেশিত করিয়া,......'রামের অধিবাস' নাম দিয়া পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম।"

—সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে মুদ্রিত নির্দেশক

আমি দীর্ঘকাল অকণ্টকে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিলাম। লোকে, যে সমস্ত সুখসম্ভোগের অভিলাষ করে, আমি তদ্বিষয়ে পূর্ণাভিলাষ হইয়াছি। এইরূপে সর্ব-সুখসম্পন্ন হইয়াও, এক বিষয়ে অসুখী ছিলাম ; ভাবিয়াছিলাম, সংসারাশ্রমসংক্রান্ত সকল সুখের সারভূত পুত্রমুখসন্দর্শনসুখে বঞ্চিত থাকিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে, চরম বয়সে, সেই সর্বজনপ্রার্থনীয় অনির্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছি। পুত্র অনেকের জন্মে, কিন্তু কোনও ব্যক্তিই আমার সমান সৌভাগ্যশালী নহেন। কেহ কখনও রামসম সর্বগুণাস্পদ পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ, সকল বিষয়েই আমার বাসনা সর্বপ্রকারে পূর্ণ হইয়াছে ; কোনও বিষয়েই আমার আর প্রার্থয়িতব্য নাই ; কেবল রামকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত দেখিলেই, সকল সুখের একশেষ হয়। গুণ, বয়স, লোকানুরাগ বিবেচনা করিলে, রাম আমার সর্বতোভাবে সিংহাসনের যোগ্য হইয়াছে ; তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, স্বয়ং রাজকার্য হইতে অবসৃত হই। শরীর ক্ষণভঙ্গুর ; বিশেষতঃ, আমার চরম দশা উপস্থিত ; কখন কি ঘটে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই ; অতএব, এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। যদি, এক দিনের জন্য রামকে সিংহাসনারূঢ় দেখিয়া, এই জরাজীর্ণ শীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবনযাত্রা সফল হয়।

মনে মনে এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, দশরথ অমাত্যগণের নিকট অতি সঙ্গোপনে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা একবাক্য হইয়া কহিলেন, মহারাজ উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন ; আমাদের মতে আর কালাতিপাত করা কর্তব্য নহে। এ বিষয় সম্পন্ন হইলে যে কেবল মহারাজের সুখের একশেষ হইবে, এরূপ নহে ; রামচন্দ্র যেরূপ সর্বগুণালঙ্কৃত ও সর্বলোকপ্রিয়, বোধ করি, সসাগরা ধরা মধ্যে এরূপ ব্যক্তি নাই যে, সে তদীয় রাজ্যাভিষেকশ্রবণে অন্তঃকরণে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিবে না। অতএব, মহারাজ! আর সদসৎপরামর্শ ও কর্তব্যাকর্তব্যবিবেচনা নাই ; বিলম্ব করাই অপরামর্শ ও অকর্তব্য। রাজা কহিলেন, তোমরা যে, আমার অভিপ্রেত বিষয়ের অনুমোদন করিলে, ইহাতে আমি কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, বলিতে পারি না। তোমরা প্রত্যেকে বুদ্ধি ও নীতিবিদ্যায় অদ্বিতীয়। আমি, তোমাদের বুদ্ধিকৌশলে ও নীতিজ্ঞানপ্রভাবে, পূর্বাপর সর্ব বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া আসিয়াছি ; সর্বকাল তোমাদের অনুমোদিত বিষয়ে অসন্দিহান চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; আর, আপাততঃ সাতিশয় প্রিয় বোধ হইলেও, তোমাদের অননুমোদিত বিষয় হইতে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়াছি। যখন তোমাদের মতে রামের যৌবরাজ্যাভিষেক সর্বথা কর্তব্য স্থির হইতেছে, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা কোনও মতে উচিত নহে। কিন্তু, তোমরা পূর্বাপর শুনিয়া আসিতেছ, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা যার পর নাই লোকানু-রাগপ্রিয় ছিলেন ; বরং প্রাণান্ত ও সর্বস্বান্ত স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি লোকবিরাগ-

সংগ্রহের কার্য করিতে পারেন নাই। আমি সেই প্রশংসনীয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং, আমার কুলব্রত প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। আমার এই আশঙ্কা হইতেছে, রামকে এরূপ তরুণ বয়সে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে, পাছে প্রজালোকে, অপরিণতবয়স্ক বালক বলিয়া, তাহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করে; এবং পাছে মনে ভাবে, আমি তাহাদের হিতাহিতচিন্তায় বিসর্জন দিয়া, কেবল স্নেহের বশীভূত হইয়া, এই দুর্বহ রাজ্যভার এক সুকুমার শিশুর হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাহারা অনায়াসেই আমায় অবিমৃষ্যকারী ও সদসৎপরিবেদনাবিহীন বিবেচনা করিতে পারে। আমি অভিলষিত বিষয়ে তোমাদের সম্মতি লাভ করিলাম; এক্ষণে, আমার একান্ত মানস, পৌরগণের, জানপদবর্গের এবং অনুগত ও শরণাগত নৃপতিমণ্ডলের মতামত পরিজ্ঞানার্থে, সকলকে সমবেত করিয়া, তাঁহাদের নিকট আত্ম অভিলাষ ব্যক্ত করি; তাঁহারা যেরূপ কহিবেন, তদনুসারে কর্তব্য স্থির করা যাইবে।

রাজার এইরূপ নিরপেক্ষ ও সদ্বিবেচনাপূর্ণ বচনপ্রপঞ্চ শ্রবণগোচর করিয়া, অমাত্যগণ চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি যে অত্যুচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার এ উক্তি তদুপযুক্তই বটে। এরূপ না হইলেই বা, সূর্যবংশীয় নরপতিগণ এত প্রশংসনীয় ও প্রাতঃস্মরণীয় হইবেন কেন। ইতিহাসপ্রবন্ধে অনেকানেক রাজবংশের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়; কিন্তু, প্রজারঞ্জনবিষয়ে সূর্যবংশীয়দিগের সমকক্ষ লক্ষিত হয় না। ফলতঃ, কোনও রাজবংশই এরূপ দিগন্তব্যাপিনী ও কল্পান্তস্থায়িনী কীর্তি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। মহারাজ! আপনি অভিলষিত বিষয়ে সর্বসাধারণের মতামত পরিজ্ঞানের যে প্রসঙ্গ করিলেন, তাহার কর্তব্যতাবিষয়ে অণুমাত্র সংশয় করিতে পারি না; বরং, তদ্ব্যতিরেকে রামচন্দ্রকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিলে, চিরনির্মল রঘুকুলে কলঙ্ক স্পর্শিবার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু, মহারাজ! তদুপলক্ষে অনর্থ কালহরণ করা হইবে না; আপনি এই আসনেই অনুমতি প্রদান করুন; আমরা অবিলম্বে যাবতীয় নৃপতিগণ ও পৌরজানপদবর্গ সমবেত করিতেছি। মহারাজ! "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি", শুভ কার্যের অনেক বিঘ্ন; যাহা মনস্থ করিয়াছেন, তৎসম্পাদনে বিলম্ব করা বিধেয় নহে। এ বিষয়ে আর অধিক বলা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতাপ্রদর্শন। সকল বিষয়ে মহারাজের ইচ্ছাই বলবতী। মহারাজ নিজে যাহা বিধেয় বোধ করিবেন, তাহাই সর্বতোভাবে বিধেয়।

অমাত্যগণের এইরূপ মনোনুকূল অনুমোদনবাক্য আকর্ণন করিয়া, নরপতির হৃদয়কন্দর আহ্লাদসলিলে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, আনন্দগদ্গদ স্বরে, সকলকে সমবেত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। অমাত্যগণ, আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র, অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, নৃপতিসমীপে বিদায় লইলেন, এবং কালাতিপাত ব্যতিরেকে, সর্বদেশীয় নরপতিগণের নিকট নিরূপিত দিবসে অযোধ্যায় আসিবার

আহ্বানসূচক রাজনামাঙ্কিত পত্র প্রেরণ করিলেন। প্রধান প্রধান পৌরগণ ও জানপদবর্গও, ঐ সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, আহূত হইলেন।

নির্ধারিত দিবস উপস্থিত হইল। নানাদেশীয় নৃপতিমণ্ডল, এবং পৌরগণ ও জানপদবর্গ, যথাকালে রাজসভায় সমাগত হইয়া, যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচারপরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে, সকলে উৎসুক চিত্তে দশরথের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, মেঘগম্ভীর স্বরে, সকলকে সম্বোধন করিয়া, রাজা দশরথ কহিতে লাগিলেন, তোমরা সবিশেষ অবগত আছ, আমার পূর্বপুরুষেরা কিরূপ সুপ্রণালীতে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে এই দুর্বহ রাজ্যভার আমার দুর্বল হস্তে পতিত হইলে, আমি সর্বদা সতর্ক থাকিয়া, লোকরক্ষাব্যাপারনির্বাহে প্রাণপণে যত্ন করিয়া আসিয়াছি; কত দূর কৃতকার্য হইয়াছি, তোমরা বলিতে পার। এক্ষণে আমার চরম দশা উপস্থিত; জরাজীর্ণ ও শীর্ণকলেবর হইয়াছি। অতঃপর, আমা দ্বারা এ দুরূহ ব্যাপারের সম্যক্ সমাধা হওয়া দুর্ঘট। যদি তোমরা, একবাক্য হইয়া, অনুমোদন কর, তাহা হইলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া, জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট ভাগ বিশ্রামসুখসেবায় যাপন করি। এ বিষয়ে তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইবার মানসে, সকলকে সমবেত করিয়াছি; তোমরা, আমার মুখাপেক্ষা না করিয়া, অসঙ্কুচিতচিত্তে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

দশরথ বিরত হইবামাত্র, সমবেত নৃপতিমণ্ডল, পৌরগণ ও জানপদবর্গ, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, প্রীতিপ্রফুল্ললোচনে গদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি এই দণ্ডে রামচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করুন। এ বিষয়ে আমাদের অনুমোদনের অপেক্ষা রাখিয়াছেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না। রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, ইহাতে কাহার অনাহ্লাদ আছে। মহারাজ! সকলেই সমবেত হইয়াছি; শুভ দিন, শুভ লগ্ন, নিরূপণ করুন; আমরা এই যাত্রাতেই রামচন্দ্রকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত দেখিয়া প্রতিগমন করিব। এইরূপ অভিলাষানুরূপ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া, রাজার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, বিশেষরূপে তাহাদের মনঃপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কহিলেন, তোমরা যে আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুমোদন করিলে, বোধ হইতেছে, তাহা কেবল আমার মুখাপেক্ষায় করিয়াছ; নতুবা, রাম নিতান্ত বালক ও একান্ত অনভিজ্ঞ; তাহার হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত হইলে, তোমাদের মনঃপূত হইবে, ইহা কোনও ক্রমে আমার অন্তঃকরণে লইতেছে না। অতএব, তোমাদের যথার্থ মনোগত কি, অকপটে আমার নিকটে ব্যক্ত কর।

মহীপতির মুখ হইতে এই কথা নিঃসৃত হইলে, সভাস্থ সমস্ত লোকের সম্মতিক্রমে, মহামতি মগধরাজ কহিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! আমরা সরল অন্তঃকরণে বলিতেছি, কেবল মহারাজের সন্তোষার্থে, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকবিষয়ে অনুমোদন

করিতেছি না। আমরা তদীয় রমণীয় গুণগ্রামদর্শনে নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়া আছি। মানবকলেবরে গুণসমুদয়ের ঈদৃশ সমবায় অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ঘটনা। রামচন্দ্র যেমন অনুপম রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণ, তেমনই নিরুপম গুণরত্নশোভায় বিভূষিত; স্বভাবতঃ সাতিশয় সৌম্যমূর্তি; মুখারবিন্দ সর্বদাই প্রসন্ন ও প্রফুল্ল রহিয়াছে, দেখিলেই অন্তঃকরণে অনির্বচনীয় প্রীতি জন্মে; সম্ভাষণকালে যাদৃশ মৃদু মধুর বচনবিন্যাস করেন, তাহাতে কাহার কর্ণকুহর অমৃতরসে অভিষিক্ত না হয়; রূঢ় বা গর্বিত, অসার বা অশ্লীল ভাষা কখনও মুখ হইতে নির্গত হয় না; কোনও বিষয়ে কদাচ বাচালতা বা চপলতা দেখিতে পাওয়া যায় না; সর্বদা সর্ববিধ লোকের সহিত সমুচিত সমাদরপূর্বক আলাপ করেন, সুতরাং নিকটে গিয়া কেহ কখনও ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট হয় না; যে সকল বিষয় ঘটিলে লোক ক্রোধে অন্ধ হয়, তাদৃশ বিষয়েও অন্তঃকরণে বিকারমাত্র জন্মে না; কেহ কখনও সামান্যরূপ উপকার করিলে, উহা মহোপকার বোধে সর্বকাল স্মৃতিপথে আরূঢ় থাকে; কেহ ভয়ানক অপকার করিলেও, অন্তঃকরণে রোষের বা অসন্তোষের সঞ্চার হয় না; উহা অবুদ্ধিপূর্বকৃত বা অনবধানকৃত বিবেচনা করিয়া, উপেক্ষা প্রদর্শন করেন; কখনও কোনও বিষয়ে অহিত, অসদৃশ, অপ্রমিত বা অপ্রীতিকর আচরণ করেন না; বিষয়মাত্রেই দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া চলেন; নিজমুখে কখনও পরের গ্লানি করেন না, অন্যের মুখেও পরের গ্লানি শুনিতে ভাল বাসেন না; সচরাচর, রাজকুমারেরা বিলক্ষণ বিলাসী ও ভোগাভিলাষী হইয়া থাকেন, কিন্তু বিলাস ও ভোগাভিলাষ কাহাকে বলে, তাহা অবগত নহেন; অভিপ্রায়মাত্রই শুভ, অশুভ শব্দে নির্দেশ করিতে পারা যায়, তাদৃশ অভিপ্রায় মনে স্থান পায় না; যার পর নাই দ্রুতদর্শী ও ক্ষিপ্রকারী, সমদর্শী ও শুদ্ধচারী, সূক্ষ্মদর্শী ও সারগ্রাহী, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, অমায়িক ও নিরহঙ্কার, ক্ষমাশীল ও বিমৃষ্যকারী, পরিণামদর্শী ও পরগুণগ্রাহী; বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই মাননীয়, ধর্মশীল ব্যক্তিমাত্রেই পূজনীয়, গুণবান্ ব্যক্তিমাত্রেই আদরণীয়; হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া, কৌটিল্য, মাৎসর্য প্রভৃতি দোষে একান্ত অনাঘ্রাতচিত্ত; কখনও অসাধু বা অর্বাচীন লোকের সংসর্গে থাকেন না, সতত সৎসংসর্গে ও পণ্ডিতসহবাসে কাল যাপন করেন; অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্, অসাধারণ মেধাবী, অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী, অথচ মনে অভিমানমাত্র নাই; দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, গুরুভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণপরম্পরার নিরুপম আশ্রয়স্থল; কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে কদাচ অনবহিত বা উপেক্ষাকারী নহেন; হিতাহিতনিরূপণে, গুরুলঘুবিবেচনে ও স্বপরপরিদর্শনে অতি প্রবীণ; অন্যের অনিষ্টাপাতশ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হন, অন্যের সুখসমৃদ্ধিদর্শনে আহ্লাদে পুলকিত হন; ফলতঃ তত্তুল্য পরসুখে সুখী ও পরদুঃখে দুঃখী কখনও দেখা যায় নাই। এতদ্ব্যতিরিক্ত, অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় হইয়াছেন; বল, বিক্রম, সাহস, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, তাড়কানিধনে, হরকোদণ্ডখণ্ডনে ও জামদগ্ন্যদর্পদলনে তৎসমুদয় বিলক্ষণ পরীক্ষিত হইয়াছে; সন্ধিবিগ্রহাদিকার্যে যেরূপ চাতুর্য জন্মিয়াছে, তাহা কাহার অবিদিত আছে। এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন হইয়াও

নিরতিশয় নম্রপ্রকৃতি ; ইহাতে তাঁহার অলৌকিক গুণসমুদয়ের কি অনির্বচনীয় শোভা হইয়াছে। বিনয় সদ্‌গুণের শোভা সম্পাদন করে, এই চিরন্তনী কথা যথার্থরূপে রামচন্দ্রে যেরূপে বর্তিয়াছে, অন্যত্র কুত্রাপি সেরূপ লক্ষিত হয় না। মহারাজ! বলিতে গেলে ধৃষ্টতাপ্রদর্শন হয়, কিন্তু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, অপরাধ মার্জনা করিবেন, আপনার সৌভাগ্যের অবধি নাই ; রামচন্দ্রসদৃশ পুত্র লাভ অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। আমরা অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, আপনি রামচন্দ্রকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিলে, আমরা আন্তরিক পরিতোষ লাভ করিব ; অধিক আর কি বলিব, পরশ্রীকাতর পামরেরাও অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। অনেক দিন অবধি আমাদের মানস ছিল, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত, সকলে সমবেত হইয়া, মহারাজের নিকট প্রার্থনা জানাইব। কিন্তু পাছে, মহারাজের অন্তঃকরণে বিরুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হয়, এই ভয়ে সাহস করিয়া সে বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারি নাই। এক্ষণে, মহারাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন. ইহাতে আমরা আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়াছি ; দিন নির্ধারিত করিয়া, অভিষেকসংক্রান্ত আয়োজনের আদেশ প্রদান করিলেই চরিতার্থ হই।

রামের রাজ্যাভিষেকবিষয়ে সভাস্থ সমস্ত লোকের ঈদৃশ আগ্রহ দর্শনে, রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং, আর কালাতিপাত করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, পার্শ্বোপবিষ্ট কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন, যাবতীয় রাজমণ্ডল, এবং পৌরগণ ও জানপদবর্গ অদ্যকার সভায় সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা একবাক্য হইয়া রামের রাজ্যাভিষেকবিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিতেছেন ; সকলেরই মানস, ত্বরায় কার্য সম্পন্ন হয়। অতএব, বিবেচনা করিয়া বলুন, কোন্ দিন উপস্থিত ব্যাপার সমাধানের পক্ষে সর্বাংশে শুভ। বশিষ্ঠদেব কহিলেন, মহারাজ! আপনার অভিমত হইলে, অদ্য অপরাহ্নে অধিবাস, কল্য প্রভাতে অভিষেকক্রিয়া, সম্পন্ন হইতে পারে। রাজা কহিলেন, তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তদুপযোগী আয়োজনের আদেশ প্রদান করুন। বশিষ্ঠ, তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র কি রাজগণ, কি পুরবাসিগণ, কি জানপদগণ, সকলেরই সমান প্রিয় ছিলেন ; তিনি কল্য রাজা হইবেন, তাহার সমুদয় আয়োজন হইতে আরম্ভ হইল, ইহা দেখিয়া, তাঁহারা যেন অমৃতহ্রদে অবগাহন করিলেন। তদীয় আনন্দকোলাহলে সভামণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠিল।

কর্মচারীদিগের প্রতি অভিষেকসংক্রান্ত যাবতীয় আয়োজনের ভারপ্রদান করিয়া, বশিষ্ঠদেব সভামণ্ডপে প্রত্যাগত হইলে, দশরথ স্বীয় সারথি মহামতি সুমন্ত্রের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি অবিলম্বে রামচন্দ্রকে একবার এই স্থানে উপস্থিত কর। সুমন্ত্র, নরপতির আদেশ প্রাপ্তিমাত্র, দ্রুতগমনে রামভবনে উপস্থিত

হইলেন, এবং রামের সম্মুখবর্তী হইয়া কহিলেন, মহারাজ আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। রামচন্দ্র, আকর্ণনমাত্র, সভাগমনের উপযোগী বেশভূষা সমাধান করিয়া, সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন, এবং যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে পিতৃচরণে প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা প্রাণাধিকপ্রিয় পুত্রকে সমাগত দেখিয়া, হর্ষোৎফুল্ললোচনে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিলেন, এবং পার্শ্বস্থিত মহার্হ আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন। রাম উপবিষ্ট হইলেন এবং অঞ্জলিবন্ধপূর্বক বিনীত ভাবে, আদেশপ্রতীক্ষায়, পিতৃবদনে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, নরপতি রামকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস, আমি দীর্ঘকাল প্রজাপালনকার্যে ব্যাপৃত আছি ; এক্ষণে বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়াছি ; জরার আবেশবশতঃ, আমার শরীরে আর এরূপ সামর্থ্য নাই যে, অতঃপর আমা দ্বারা এ দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। সমস্ত রাজগণ ও যাবতীয় পৌর-জানপদগণ সভায় সমবেত হইয়াছেন ; সকলেরই একান্ত অভিলাষ, তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, আমি রাজকার্য হইতে অবসৃত হই। তদনুসারে স্থির করিয়াছি, কল্য প্রভাতে, তোমার হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিব। অধিবাসের ও অভিষেকের আয়োজনার্থ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অদ্য অপরাহ্নে অধিবাস। তুমি, স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া, পূত ও সংযত হইয়া থাকিবে। বৎস ! আমার সকল সুখভোগ সম্পন্ন হইয়াছে ; তোমায় সিংহাসনে সন্নিবিষ্ট দেখিলেই, জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ ফললাভ হয়। এই বলিয়া, স্নেহভরে তদীয় মুখচন্দ্র চুম্বন করিয়া, রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। রাম, পিতার চরণসরসীরুহে প্রণতি ও অনুমতিগ্রহণ পূর্বক, স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজাও, সমবেত সর্বসাধারণ লোকদিগকে অপরাহ্নে অধিবাস দর্শনের নিমন্ত্রণ করিয়া, সভাভঙ্গ করিলেন।

রাম সভামণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলে, সর্বাগ্রে প্রাণাধিক লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি, তাঁহাকে অভিষেকবৃত্তান্ত কহিয়া, তৎসমভিব্যাহারে স্বীয় জননীর বাসভবনে প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সীতা, তিন জনে, একাসনে উপবিষ্ট হইয়া, হৃষ্ট মনে কথোপকথন করিতেছেন। সন্নিহিত হইয়া, রাম, মাতা ও বিমাতার চরণে প্রণাম করিলেন, এবং কৌশল্যাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ ! পিতা কহিলেন, কল্য প্রাতে আমায় প্রজাপালনকার্যে নিযুক্ত করিবেন। অধিবাসের ও অভিষেকের আয়োজন হইতেছে। অদ্য অপরাহ্নে অধিবাস। অতএব, সে বিষয়ের যে কিছু ইতিকর্তব্যতা থাকে, তাহার উদ্যোগ কর। এই সংবাদ শুনিয়া, কৌশল্যার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি, অশ্রুপূর্ণলোচনে পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া, গদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস ! রঘুকুলদেবতারা তোমায় নিরাময় ও দীর্ঘজীবী করুন। কি শুভ ক্ষণেই আমি তোমায় গর্ভে ধরিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। আমার গর্ভের সন্তান সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবে, ইহা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি। তোমায় সিংহাসনে সন্নিবেশিত দেখিয়া, যদি এক মুহূর্তও প্রাণধারণ করি, তাহা হইলেই আমার মানবজন্ম সফল হইল। এই বলিয়া, কৌশল্যা

দেবতাদিগের নিকট পুত্রের মঙ্গলপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাম, মাতা ও বিমাতার চরণে পুনরায় প্রণাম করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত স্বীয় নিকেতনে গমন করিলেন।

অদ্য অধিবাস, কল্য রাম রাজা হইবেন, এই সংবাদ সর্বতঃ সঞ্চারিত হইবামাত্র, সমস্ত অযোধ্যানগর শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনি ও আনন্দধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি শিশু কি বৃদ্ধ, কি ধনী কি দরিদ্র, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, সর্ব প্রকার লোক এককালে আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। গৃহে গৃহে মহোৎসব ও মঙ্গলাচার হইতে আরম্ভ হইল। রাজপথ সকল মার্জিত ও সুগন্ধ সলিলে সংসিক্ত হইতে লাগিল। সহকারশাখা ও সুশোভিত কুসুমমালা, দ্বারে দ্বারে দ্বারে লম্বিত হইতে লাগিল। পূর্ণ কলস, দ্বারদেশের উভয় পার্শ্বে, সন্নিবেশিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক ভবনের উপরিভাগে, পতাকা সকল উড্ডীয়মান হইতে লাগিল।

শব্দমঞ্জরী

অ, অং সামান্যতঃ নিষেধবাচক, স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না, অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হইয়া বিশেষ বিশেষ অর্থের বোধক হয়। অভাব অর্থাৎ না থাকা এই অর্থ বোধক যথা—অযত্ন, অসঙ্গতি, অনিয়ম, অসংস্থান, অমনোযোগ ইত্যাদি। ভিন্ন অর্থাৎ নয় এই অর্থ বোধক যথা—অপটু, অভদ্র, অযোগ্য, অসাধু, অস্থির, অসমর্থ ইত্যাদি। হীন এই অর্থ বোধক যথা—অধন, অধৈর্য, অমূল্য, অকপট, অকণ্টক, অসহায় ইত্যাদি। নিষেধভিন্ন অর্থেরও বোধক হয় যথা—অবিচার অন্যায় বিচার, অবিবেচনা অন্যায় বিবেচনা, অকাল অযোগ্য কাল, অসময় অযোগ্য সময়, অকার্য অসৎ কার্য, অযশ কুযশ ইত্যাদি। স্বরবর্ণের পূর্বে থাকিলে অন্ হয়। যথা—অনাদর, অনিচ্ছা, অনুচিত, অনৈক্য ইত্যাদি।

অঋণী, (অ—ঋণিন্ যে ধারে) বিং ঋণী নয়, যে কারও কিছু ধারে না। ঋণমুক্ত, যে ঋণ পরিশোধ করিয়াছে।

অকণ্টক, (অ—কণ্টক) বিং কণ্টকহীন, যেখানে কণ্টক নাই, যথা অকণ্টক পথ। নির্বিঘ্ন, নিরাপদ, নিরুপদ্রব, যথা অকণ্টক রাজ্যভোগ, গ্রাম অকণ্টক হইয়াছে।

অকথনীয়, (অ—কথনীয়) বিং যাহা কহিবার উপযুক্ত নয়, যাহা বলা উচিত নয়, অকথ্য, অবাচ্য, অবক্তব্য।

অকথা, (অ—কথা) সং কুকথা, কুৎসিত কথা, অশ্লীল কথা, যে কথা মুখে আনা উচিত নয়।

অকথ্য, (অ—কথ্য) বিং অকথনীয় দেখ।

অকপট, (অ— কপট) বিং কপটহীন, ছলশূন্য, সরল যথা অকপট হৃদয়ে। ক্রিং কপট। ব্যতিরেকে, কপট না করিয়া, যথা অকপটে বল।

অকরণীয়, (অ—করণীয়) বিং কর্তব্য নয়, করা উচিত নয়, অকর্তব্য।

অকরুণ, (অ—করুণা) বিং করুণাশূন্য, যার করুণা নাই, নির্দয়, নিষ্ঠুর।

অকর্তব্য, (অ—কর্তব্য) বিং অকরণীয় দেখ।

অকর্মণ্য, (অ—কর্মণ্য) বিং কর্মণ্য নয়, কোনও কর্মের নয়। বস্তু ও ব্যক্তি উভয়েরই বিশেষণ হয়।

অকর্মা, (অ—কর্মন্ কর্ম) বিং যে কোন কর্ম সম্পন্ন করিতে পারে না, যে কোন কর্মে লাগে না, যাহা দ্বারা কোন কর্ম হয় না। কেবল ব্যক্তির বিশেষণ হয়।

অকল্পিত, (অ—কল্পিত) বিং কল্পিত নয়, কাল্পনিক নয়, প্রকৃত, যথার্থ, বাস্তবিক, অকাল্পনিক।

অকল্যাণ, (অ—কল্যাণ) সং অমঙ্গল, অশুভ, অশিব।

অকস্মাৎ, (অ—কস্মাৎ যাহা হইতে, কোথা হইতে) ক্রিং হঠাৎ, বিনা কারণে, অসম্ভাবিত রূপে।

অকাতর, (অ—কাতর) বিং অব্যাকুল, অনভিভূত। নির্ভয়, নিঃশঙ্ক। ক্রিং অক্ষোভে, অক্লেশে, অনায়াসে।

অকারণ, (অ কারণ) ক্রিং বিনা কারণে, অনর্থক, নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজনে, যথা অকারণে কলহ করা অকর্তব্য। বিং কারণশূন্য, যথা অকারণ কার্যোৎপত্তি।

অকার্য, (অ—কার্য) সং অসৎ কার্য, কুকর্ম, গর্হিত কর্ম, অসৎ কর্ম।

অকাল, (অ - কাল) সং অপ্রকৃত কাল, যার যে কাল নয়, যথা অকালের ফল, অকালে তাঁহার মৃত্যু হইল। অশুদ্ধ কাল, শুভ কর্মের অযোগ্য কাল। দুর্ভিক্ষ, যে সময়ে আহারের দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে।

অকালসহ, (অ—কাল—সহ যে সয়) বিং যার কাল সয় না, যার বিলম্ব সয় না, অধৈর্য, অস্থির। যাহাতে কালবিলম্ব সয় না, যথা অকালসহ বিষয়ে বিলম্ব করা অবিধেয়।

অকাল্পনিক, (অ—কাল্পনিক) বিং অকল্পিত দেখ।

অকিঞ্চন, (অ—কিঞ্চন কিছু) বিং যার কিছু নাই, নিঃস্ব, দীন, দরিদ্র।

অকিঞ্চনতা, (অ—কিঞ্চন) সং কিছুমাত্র সঙ্গতি না থাকা, নিঃস্বতা, দীনতা, দরিদ্রতা।

অকীর্তি, (অ—কীর্তি) সং অখ্যাতি, অযশ, নিন্দা, দুর্নাম, কলঙ্ক।

অকীর্তিকর, (অকীর্তি—কৃ করা) বিং যাহাতে অকীর্তি হয়, নিন্দাকর, অখ্যাতিকর, কলঙ্ককর।

অকুতোভয়, (অ—কুতঃ কোথা হইতে, কাহা হইতে—ভয়) বিং নিতান্ত নির্ভয়, যে কাহাকেও ভয় করে না, যে কোন কারণে ভয় পায় না।

অকুতোভয়তা, (অ—কুতোভয়) সং নিতান্ত নির্ভয়তা, কাহাকেও ভয় না করা, কোন কারণে ভয় না পাওয়া।

অকৃত, (অ—কৃত) বিং কৃত নয়, যাহা করা যায় নাই, অননুষ্ঠিত, অসম্পাদিত।

অকৃতজ্ঞ, (অ—কৃতজ্ঞ) বিং কৃতজ্ঞ নয়, উপকার স্মরণ করে না, উপকারকের সহিত সদ্ব্যবহার করে না, উপকারকের অনিষ্ট চিন্তা করে।

অকৃতজ্ঞতা, (অকৃতজ্ঞ) সং অকৃতজ্ঞের ব্যবহার, উপকার স্মরণ না করা, উপকারকের সহিত অসদ্ব্যবহার করা, উপকারকের অনিষ্ট চিন্তা করা।

অকৃতদার, (অকৃত—দার স্ত্রী) বিং যে বিবাহ করে নাই, যে দারপরিগ্রহ করে নাই, অনূঢ়, অবিবাহিত, অপরিণীত, অকৃতবিবাহ।

অকৃতাপরাধ, (অকৃত—অপরাধ) বিং যে অপরাধ করে নাই, নিরপরাধ, অপরাধশূন্য। ক্রিং বিনা অপরাধে, অপরাধ ব্যতিরেকে।

অকৃতিত্ব, (অকৃতিন্ অক্ষম) সং অক্ষমতা, অযোগ্যতা, কোনও ক্ষমতা না থাকা।

অকৃতী, (অকৃতিন্ অক্ষম) বিং কৃতী নয়, অক্ষম, অযোগ্য, ক্ষমতাহীন, যোগ্যতাহীন।

অকৃত্রিম, (অ—কৃত্রিম) বিং কৃত্রিম নয়, কাল্পনিক নয়, যথার্থ, যথা এ কথা অকৃত্রিম বোধ হইতেছে। অকপট, ছলশূন্য, যথা অকৃত্রিম স্নেহ, অকৃত্রিম প্রণয়, অকৃত্রিম ব্যবহার। খাঁটি, বিশুদ্ধ, অমিশ্রিত, যথা অকৃত্রিম তৈল, অকৃত্রিম ঘৃত, অকৃত্রিম স্বর্ণ।

অকৈতব, (অ—কৈতব) বিং অকপট, ছলশূন্য, অকৃত্রিম, কৈতবহীন।

অকোপন, (অ—কোপন) বিং অক্রোধন দেখ।

অকৌশল, (অ—কৌশল) সং বিরোধ, বিবাদ। মনোভঙ্গ, অস্বরস।

অক্ত, (অঞ্জ, মাখা, লেপা) বিং লিপ্ত, যথা তৈলাক্ত, রক্তাক্ত, ঘর্মাক্ত। শব্দযোগ ভিন্ন প্রায় স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না।

অক্রেয়, (অ—ক্রেয়) বিং আক্রা, যাহা ক্রয় করিতে পারা যায় না, যাহা রীতিমত মূল্যে না হইয়া অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, মহার্ঘ, দুর্মূল্য।

অক্রোধ, (অ—ক্রোধ) বিং ক্রোধহীন, যাহার ক্রোধশান্তি হইয়াছে।

অক্রোধন, (অ—ক্রোধন) বিং ক্রুদ্ধস্বভাব নয়, যে সহসা ক্রুদ্ধ হয় না, অসন্তোষের কারণ ঘটিলেও যার ক্রোধ জন্মে না, যে অনায়াসে ক্রোধ সংববরণ করিতে পারে, অকোপন, অরোষণ।

অক্লান্ত, (অ—ক্লান্ত) বিং ক্লান্ত নয়, যার ক্লান্তি বোধ হয় না, যে পরিশ্রম করিয়া কাতর হয় না।

অক্লিষ্ট, (অ—ক্লিষ্ট) বিং ক্লিষ্ট নয়, শ্রম করিয়া ক্লেশ বোধ করে না। যার হ্রাস বা নিবৃত্তি হয় না, যথা অক্লিষ্ট যত্ন, অক্লিষ্ট উৎসাহ, অক্লিষ্ট অধ্যবসায়।

অক্লেশ, (অ—ক্লেশ) ক্রিং ক্লেশ ব্যতিরেকে, বিনা ক্লেশে, সহজে, অনায়াসে।

অক্ষ, সং রুদ্রাক্ষ। পাশা।

অক্ষক্রীড়া, (অক্ষ—ক্রীড়া) সং পাশক্রীড়া, পাশা খেলা।

অক্ষত, (অ—ক্ষত) বিং ক্ষত নয়, আঘাতশূন্য। সং আতপতণ্ডুল।

অক্ষতযোনি, (অক্ষত—যোনি) বিং যে বিবাহিতা স্ত্রীর পুরুষসঙ্গ হয় নাই।

অক্ষম, (অ—ক্ষম) বিং যার কোন ক্ষমতা নাই, অকৃতী, অযোগ্য, ক্ষমতাহীন, যোগ্যতাহীন, যথা সে নিতান্ত অক্ষম। দুর্বল, অপটু, যথা রোগে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। অপারক, অসমর্থ, যথা আমি এ বিষয়ে উত্তর দিতে অক্ষম।

অক্ষয়, (অ—ক্ষয়) বিং যার ক্ষয় নাই, ক্ষয়শূন্য, অবিনাশী, অনশ্বর, অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী।

অক্ষর, সং বর্ণ, অ আ ক খ ইত্যাদি।

অক্ষবাট, (অক্ষ যুদ্ধ—বাট স্থান) সং মল্লভূমি, কুস্তির আখড়া।

অক্ষার লবণ, সং সৈন্ধব লবণ। দুগ্ধ ঘৃত আতপতণ্ডুল সৈন্ধব লবণ প্রভৃতি অশৌচ-কালীন আহারদ্রব্য।

অক্ষি, সং চক্ষু।

অক্ষুণ্ণ, (অ—ক্ষুণ্ণ) বিং ক্ষুণ্ণ নয়, যাহাকে ক্ষুণ্ণ হইতে হয় নাই, যাহাকে কোনও বিষয়ে নিরাশ হইয়া দুঃখ পাইতে হয় নাই। অপরিশীলিত যথা অক্ষুণ্ণ ভূভাগ অর্থাৎ যে ভূভাগে কেহ কখনও যায় নাই। অনবগাঢ়, অনালোড়িত, যথা অক্ষুণ্ণ হ্রদ অর্থাৎ যে হ্রদে কেহ কখনও অবগাহনাদি করে নাই।

অক্ষুব্ধ, (অ—ক্ষুব্ধ) বিং ক্ষুব্ধ নয়, ভয়ের কারণ বা বিপদ ঘটিলে যে ব্যাকুল হয় না, ক্ষোভশূন্য, অব্যাকুল, অনাকুল, অনাকুলিত।

অক্ষোভ, (অ—ক্ষোভ) বি' ক্ষোভশূন্য। যে অপ্রস্তুত হয় না। ক্রি' ক্ষোভ ব্যতিরেকে।

অক্ষৌহিণী, (অক্ষ সেনা—ঊহিনী একত্র সমাগম) সং সর্বাঙ্গসম্পন্ন সৈন্য, এক অক্ষৌহিণীতে ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্বারোহ, ২১৮৭০ রথ, ২১৮৭০ হস্তী এই সমুদায় থাকে।

অখণ্ড, (অ—খণ্ড) বিং খণ্ডহীন, খণ্ড করা নয়, পূর্ণ, সমগ্র।

অখণ্ডনীয়, (অ—খণ্ডনীয়) বিং যাহা খণ্ডন করিতে পারা যায় না, যাহা অন্যথা করিতে পারা যায় না, যাহা পরিবর্ত বা উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না।

অখণ্ডিত, (অ—খণ্ডিত) বিং খণ্ডিত নয়, সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ।

অখাদ্য, (অ—খাদ্য) বিং খাদ্য নয়, যাহা খাওয়া উচিত নয়, যাহা খাইতে ভাল লাগে না।

অখিল, বিং সকল, সমস্ত, সমুদায়।

অখ্যাতি, (অ—খ্যাতি) সং অযশ, নিন্দা, দুর্নাম, কলঙ্ক, অকীর্তি, অপযশ।

অগঙ্গ, (অ—গঙ্গা) বিং গঙ্গাহীন, যেখানে গঙ্গা নাই, যথা অগঙ্গ দেশ।

অগণন, (অ—গণনা) বিং যার গণনা হয় না, যাহা গণিয়া উঠা যায় না, অগণ্য, অগণনীয়, অসঙ্খ্য, অসঙ্খ্যেয়।

অগণনীয়, (অ—গণনীয়) বিং অগণন দেখ।

অগণিত, (অ—গণিত) বিং যার গণনা হয় নাই, যাহা গণিতে পারা যায় নাই, অসঙ্খ্যাত।

অগণ্য, (অ—গণ্য) বিং অগণন দেখ।

অগতি, (অ—গতি) বিং গতিহীন, যার গতি নাই, নিতান্ত নিরুপায়।

অগত্যা, (অ—গতি) ক্রিং গতি না থাকাতে, অন্য গতি নাই বলিয়া, আর কোন পথ বা উপায় নাই এজন্য।

অগম্য, (অ—গম্য) বিং যেখানে যাওয়া যায় না। যেখানে যাওয়া দুর্ঘট, দুর্গম, দুর্গম্য। যেখানে যাওয়া উচিত নহে।

অগম্যা, (অগম্য) বিং যে স্ত্রীকে সম্ভোগ করা বিহিত নহে।

অগম্যাগমন, (অগম্যা—গমন) সং অগম্যা স্ত্রীকে সম্ভোগ করা।

অগাধ, (অ—গাধ যার তল স্পর্শ করা যায়) বিং অতলস্পর্শ, এত গভীর যে তার তল স্পর্শ করিতে পারা যায় না, যথা অগাধ সমুদ্র। গভীর, যথা এই সংরোবরে অগাধ জল। প্রগাঢ়, অসাধারণ, যথা অগাধ বুদ্ধি, অগাধ বিদ্যা।

অগার, সং গৃহ, বাটী।

অগুণ, (অ - গুণ) সং অহিত, অনুপকার। বিং নির্গুণ, গুণহীন।

অগুণকারক, (অগুণ—কৃ করা) বিং যাহাতে অগুণ করে, অহিতকারক, অনুপ-কারক।

অগোচর, (অ—গোচর) বিং যাহা বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারা যায় না, যথা বুদ্ধির অগোচর, মনের অগোচর, নয়নের অগোচর, পরোক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, অজ্ঞেয়, অবিজ্ঞেয়, অপরিজ্ঞেয়। ক্রিং পরোক্ষে, অজ্ঞাতসারে, যথা আমার অগোচরে এই কর্ম করা হইয়াছে।

অগ্নি, সং বহ্নি, অনল, জ্বলন, দহন, পাবক, কৃশানু, হুতাশন।

অগ্নিকার্য, (অগ্নি—কার্য) সং অগ্নিদ্বারা কার্য, মৃত ব্যক্তির দাহক্রিয়া।

অগ্নিকোণ, (অগ্নি—কোণ) সং পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ। অগ্নি ঐ কোণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া উহার নাম অগ্নিকোণ।

অগ্নিতপ্ত, (অগ্নি—তপ্ত) বিং অগ্নিতে উত্তপ্ত। অগ্নির মত উষ্ণ।

অগ্নিদগ্ধ (অগ্নি—দগ্ধ) বিং যাহা বা যে ব্যক্তি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে।

অগ্নিপক্ক, (অগ্নি—পক্ক) বিং যাহা অগ্নিতে পাক করা হইয়াছে।

অগ্র, সং আগা, যথা অঙ্গুলির অগ্র। ক্রিং আগে, পূর্বে, যথা অগ্রে জানিতাম না।

অগ্রগ, (অ—গম্ গমন করা) বিং যে অগ্রে গমন করে, যে সকলের আগে যায়, অগ্রগামী।

অগ্রগণ্য, (অগ্র—গণ্য) বিং অগ্রে গণনীয়, সর্বাগ্রে যার গণনা অর্থাৎ উল্লেখ করিতে হয়, যথা মূর্খের অগ্রগণ্য, অহঙ্কারীর অগ্রগণ্য, কালিদাস কবিদিগের অগ্রগণ্য।

অগ্রগামী, (অগ্র—গম্, গমন করা) বিং অগ্রগ দেখ। স্ত্রীং অগ্রগামিনী।

অগ্রজ, (অগ্র—জন্ উৎপন্ন হওয়া) সং যে অগ্রে জন্মে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রজন্মা।

অগ্রজন্মা, (অগ্র—জন্মন্ উৎপত্তি) বিং অগ্রে যার জন্ম হয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রজ, প্রথমজ।

অগ্রণী, (অগ্র—নী প্রেরণ করা) বিং যাহাকে অগ্রে প্রেরণ করিতে হয়, মুখ্য, প্রধান।

অগ্রদানী, (অগ্র—দান) বিং নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণজাতি শ্রাদ্ধের অগ্রদান গ্রহণ করে।

অগ্রসর, (অগ্র—সৃ গমন করা) বিং যে অগ্রে যায়, অগ্রগ, অগ্রগামী, যথা আপনি অগ্রসর হউন। যে কোন কর্মে সকলের অগ্রে প্রবৃত্ত বা উদ্যোগী হয়, যথা তিনি সকল কর্মে অগ্রসর হন।

অগ্রহায়ণ, (অগ্র প্রথম—হায়ণ বৎসর) সং কার্তিক ও পৌষের মধ্যবর্তী মাস। পূর্বকালে এই মাস অবধি বৎসরের আরম্ভ গণনা হইত। এক্ষণে অগ্রহায়ণ বৎসরের অষ্টম মাস।

অগ্রাহ্য, (অ – গ্রাহ্য) বিং গ্রাহ্য নয়, গ্রাহ্য করিবার উপযুক্ত নয়, হেয়, অবজ্ঞেয়, অশ্রদ্ধেয়, যথা অগ্রাহ্য কথা। যাহা গ্রহণ করা উচিত নয়, যথা অধমের দান অগ্রাহ্য।

অগ্রিম, (অগ্র) বিং অগ্রে উৎপন্ন, অগ্রজ, প্রথমজ। যাহা অগ্রে দেওয়া যায়, যথা অগ্রিম মূল্য।

অঘটন, (অ—ঘটন যাহা ঘটে) বিং অসম্ভব, যাহা ঘটে না, যাহা ঘটা সম্ভব নয়।

অঘটনঘটনা, (অঘটন—ঘটনা) সং যাহা ঘটিবার নয় তাহার সংঘটন, অসম্ভব ঘটনা।

অঘোর, (অ অত্যন্ত—ঘোর) বিং অত্যন্ত ভয়ানক, প্রচণ্ড, দুর্ধর্ষ।

অঙ্ক, সং চিহ্ন। ক্রোড়। নাটকের পরিচ্ছেদ। আঁক, ১ ২ ৩ ৪ ৫ ইত্যাদি।

অঙ্কিত, (অঙ্ক—চিহ্নকরণ) বিং চিহ্নিত।

অঙ্কুর, সং আঁকুড়, বীজ বপন বা রোপণ করিলে সর্ব প্রথম যাহা নির্গত হয়, যথা ধান্যের অঙ্কুর, যবের অঙ্কুর, কলায়ের অঙ্কুর। দীর্ঘ উকার বিশিষ্টও হয়।

অঙ্কুরিত, (অঙ্কুর) বিং যার অঙ্কুর নির্গত হইয়াছে।

অঙ্কুশ, সং লৌহনির্মিত সূক্ষ্মাগ্র দণ্ড বিশেষ, এই দণ্ড দ্বারা মস্তকে প্রহার করিয়া হস্তীকে চালায় অথবা উহার দুষ্টতা দমন করে। দীর্ঘ উকার যুক্তও হয়।

অঙ্গ, সং অবয়ব, শরীরের অংশ, যথা হস্ত পদ উদর ইত্যাদি। শরীর। অপরিহার্য অংশ, যে অংশ না হইলে সম্পন্ন হয় না, যথা যে কর্মের যে অঙ্গ, এ কর্মের অঙ্গই এই। কোন কোন স্থলে স্ব আপন ইত্যাদি অর্থের বোধক হয়, যথা অঙ্গীকার।

অঙ্গজ, (অঙ্গ—জন্ উৎপন্ন হওয়া) সং শরীর হইতে উৎপন্ন, সন্তান। বিং অঙ্গ হইতে জাত।

অঙ্গন, সং উঠান, চত্বর। ন মূর্ধণ্যও হয়।

অঙ্গনা, সং স্ত্রীলোক।

অঙ্গরাগ, (অঙ্গ—রাগ) সং শরীর পরিষ্কার করিয়া সুগন্ধ দ্রব্য লেপন।

অঙ্গবিক্ষেপ, (অঙ্গ—বিক্ষেপ) সং অঙ্গসঞ্চালন, কৌতুক দেখাইবার নিমিত্ত হস্ত-পদাদি অঙ্গের চালন।

অঙ্গসৌষ্ঠব, (অঙ্গ—সৌষ্ঠব) সং অঙ্গের সৌন্দর্য, কোনও অবয়বের গঠনে কোনও দোষ না থাকা।

অঙ্গহীন, (অঙ্গ—হীন) বিং যার এক বা তদধিক অঙ্গ না থাকে। অসম্পূর্ণ, কোনও অংশে ন্যূন, যথা অঙ্গহীন কর্ম।

অঙ্গাঙ্গি, (অঙ্গ—অঙ্গ স্ব স্ব) সং স্ব স্ব পক্ষীয় লোকের প্রতি পক্ষপাত, আপন আপন পক্ষীয় লোকের টানটানা, যথা তাহারা বড় অঙ্গাঙ্গি করে।

অঙ্গাঙ্গিভাব, সং অঙ্গাঙ্গি দেখ।

অঙ্গার, সং কয়লা।

অঙ্গাবরণ, (অঙ্গ—আবরণ) সং অঙ্গের আবরণবস্ত্র, যাহা দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদন করা যায়।

অঙ্গীকরণ, (অঙ্গ স্ব—কৃ করা) সং অঙ্গীকার দেখ।

অঙ্গীকার, (অঙ্গ স্ব—কৃ করা) সং দিব করিব বলিব যাইব ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া প্রতিজ্ঞা করা, স্বীকার, স্বীকরণ, অঙ্গীকরণ, প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রবণ।

অঙ্গীকৃত, (অঙ্গ স্ব—কৃ করা) বিং যে বিষয়ে অঙ্গীকার করা হইয়াছে, স্বীকৃত, প্রতিশ্রুত।

অঙ্গুরীয়, (অঙ্গুরি, অঙ্গুলি) সং অঙ্গুলির আভরণ, আঙ্গটি।

অঙ্গুল, সং অঙ্গুলি, আঙুল। অষ্ট যবোদর পরিমাণ, সারি সারি আটটি যব রাখিলে তাহার মধ্য স্থানের যত পরিমাণ।

অঙ্গুলি, অঙ্গুলী, সং আঙুল।

অঙ্গুষ্ঠ, সং বৃদ্ধ অঙ্গুলি, বুড়ো আঙুল।

অচল, (অ—চল যে চলে) সং পর্বত। অনির্বাহ, যথা আমার বড় অচল। বিং স্থির, দৃঢ়, অবিচলিত, যথা অচল সিদ্ধান্ত, অচল অঙ্গীকার। অব্যবহৃত, যথা সে গ্রামে অচল হইয়া আছে। যাহা দ্বারা কাজ চলে না, যথা এ লেখা অচল। দোষযুক্ত, যথা এ টাকা অচল। প্রচলিত নয়, যথা পল্লিগ্রামে পাই পয়সা অচল। নির্বাহের উপায় শূন্য, যথা আমার সংসার অচল। স্ত্রীং অচলা, যথা অচলা যুক্তি, অচলা বুদ্ধি, অচলা ভক্তি।

অচলা, (অ—চল যে চলে) সং পৃথিবী।

অচিকিৎসনীয়, (অ—চিকিৎসনীয়) বিং যার চিকিৎসা নাই, চিকিৎসা দ্বারা যার প্রতিকার হইতে পারে না, চিকিৎসা দ্বারা যার প্রতিকার হওয়া দুর্ঘট বা বা অসম্ভব, অচিকিৎস্য।

অচিকিৎসা, (অ—চিকিৎসা) সং কু চিকিৎসা। চিকিৎসার অভাব।

অচিকিৎস্য, (অ—চিকিৎস্য) বিং অচিকিৎসনীয় দেখ।

অচিন্তনীয়, (অ—চিন্তনীয়) বিং চিন্তার অতীত, যাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না, যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করা যায় না, অচিন্ত্য, অভাবনীয়, অতর্কণীয়।

অচিন্তিত, (অ—চিন্তিত) বিং যাহা ভাবা যায় নাই, যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করা যায় নাই, অভাবিত, অতর্কিত।

অচিন্ত্য, (অ—চিন্ত্য) বিং অচিন্তনীয় দেখ।

অচির, (অ—চির) বিং দীর্ঘ নয়, অল্প, যথা অচিরকালে এই কর্ম সম্পন্ন হইবে। ক্রিং শীঘ্র, সত্বর, অচিরাৎ, অবিলম্বে।

অচেতন, (অ—চেতন) বিং জড়, যার চেতনা নাই, যথা জল মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতি পদার্থ। রোগ শোক মোহ প্রভৃতি কারণে যার চেতনা আচ্ছন্ন হয়, মূর্ছিত, বিচেতন, অচৈতন্য।

অচৈতন্য, (অ—চৈতন্য) বিং চৈতন্যরহিত, মূর্ছিত, অচেতন, বিচেতন।

অচ্ছ, বিং নির্মল, মলহীন, পরিষ্কৃত।

অচ্ছিদ্র, (অ—ছিদ্র) বিং যাহাতে ছিদ্র নাই, নিশ্ছিদ্র, ছিদ্ররহিত। অঙ্গহীন নয়, সাঙ্গ, সম্পূর্ণ।

অচ্ছেদ্য, (অ—ছেদ্য) বিং যাহা ছেদন করিতে পারা যায় না। যাহা ছেদন করা উচিত নয়।

অজ, (অজ্—ভ্রমণ করা) সং ছাগ, ছাগল, পুং ছাগল।

অজগর, (অজ ছাগল—গৄ গিলিয়া ফেলা) সং একজাতীয় বৃহৎ সর্প, এত বৃহৎ যে আস্ত ছাগল গিলিয়া ফেলে, বোড়া সাপ।

অজয্য, (অ—জি জয় করা) বিং যাহা বা যাহাকে জয় করিতে পারা যায় না, অজেয়, অবিজেয়, অপরাজেয়।

অজর, (অ—জরা) বিং জরাহীন, যে বা যাহা জীর্ণ হয় না, জরাগ্রস্ত হয় না।

অজস্র, ক্রিং সতত, অবিরত, নিরন্তর, অবিশ্রান্ত, অনবরত।

অজা, সং ছাগী, স্ত্রীছাগল।

অজাগর, সং অজগর দেখ।

অজাত, (অ—জাত) বিং যে বা যাহা জন্মে নাই, অনুৎপন্ন।

অজিত, (অ—জিত) বিং যাহাকে জয় করিতে পারা যায় নাই, অবিজিত, অপরাজিত। অবশ, অনায়ত্ত, অবশীকৃত।

অজিতেন্দ্রিয়, (অ—জিতেন্দ্রিয় বা অজিত—ইন্দ্রিয়) বিং জিতেন্দ্রিয় নয়, যার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত নয়, যে ইন্দ্রিয়ের দমন করিতে অক্ষম, অবশেন্দ্রিয়।

অজিন, সং চর্ম, চামড়া।

অজীর্ণ, (অ—জীর্ণ) সং অপাক, অপচার, বিং পরিপাক না হওয়া, জীর্ণ না হওয়া, যথা আমার অজীর্ণ রোগ হইয়াছে। যাহা জীর্ণ হয় নাই, যাহা পরিপাক হয় নাই, যথা অজীর্ণ অন্ন অত্যন্ত অগুণকারক।

অজেয়, বিং অজয্য দেখ।

অজ্ঞ, (অ—জ্ঞ যে জানে) বিং যে কিছু জানে না, মূর্খ, মূঢ়, অজ্ঞান, জ্ঞানহীন।

অজ্ঞতা, (অজ্ঞ) সং মূর্খতা, মূঢ়তা, জ্ঞানহীনতা।

অজ্ঞাত, (অ—জ্ঞাত) বিং যাহা জানা যায় নাই বা যে জানিতে পারে নাই, অবিদিত, অবিজ্ঞাত, অপরিজ্ঞাত, অনবগত।

অজ্ঞান, (অ—জ্ঞান) বিং যার জ্ঞান নাই, মূর্খ, মূঢ়, অজ্ঞ, জ্ঞানহীন। সং অজ্ঞতা, মূর্খতা, মূঢ়তা।

অজ্ঞেয়, (অ—জ্ঞেয়) বিং যাহা জানিতে পারা যায় না, যাহা বুঝিতে পারা যায় না, অবিজ্ঞেয়, অপরিজ্ঞেয়, অনবগম্য।

অঞ্চল, সং বস্ত্রের প্রান্তভাগ, আঁচল। প্রদেশ, দেশের অংশ, যথা পূর্ব অঞ্চল, পশ্চিম অঞ্চল।

অঞ্জন, (অঞ্জ—লিপ্ত করা শোভিত করা) সং কজ্জল, কাজল।

অঞ্জলি, সং দুই হাত একত্র চিৎ করিয়া গণ্ডূষের আকার করিলে যেরূপ হয়, আঁজলা।

অঞ্জলিবন্ধ, (অঞ্জলি—বন্ধ) সং অঞ্জলি বাঁধা, অঞ্জলি করা।

অটবি, অটবী, সং বন।

অট্ট, বিং অধিক, উচ্চ, উৎকট, যথা অট্টহাস। হাস্যস্থলে প্রয়োগ হয়।

অট্টালিকা, সং রাজভবন, প্রস্তর বা ইষ্টক নির্মিত প্রশস্ত ভবন।

অণিমা, (অণু) সং অণুত্ব, অণু হইয়া যাওয়া।

অণু, বিং অল্প, ক্ষুদ্র, ঈষৎ।

অণ্ড, সং ডিম্ব, ডিম।

অণ্ডজ, (অণ্ড—জন্ উৎপন্ন হওয়া) সং পক্ষী প্রভৃতি যে সকল জন্তু ডিমে জন্মে। বিং অণ্ড হইতে উৎপন্ন।

অতএব, (অতঃ এই হেতুতে—এব নিশ্চয়বোধক) ক্রিং এই জন্যে, এই নিমিত্তে, এই কারণে, এই হেতুতে।

অতথ্য, (অ—তথ্য) বিং মিথ্যা, অসত্য, অলীক, অবাস্তব।

অতথ্যভাষী, (অতথ্য—ভাষ্ বলা) বিং মিথ্যাবাদী।

অতথ্যবাদী, (অতথ্য—বদ্ বলা) বিং মিথ্যাবাদী।

অতন্দ্র, (অ—তন্দ্রা) বিং তন্দ্রাহীন, সতর্ক, সাবধান, অনলস, মনোযোগী।

অতন্দ্রিত, (অ—তন্দ্রা) বিং অতন্দ্র দেখ।

অতর্কণীয় (অ—তর্কণীয়) বিং যাহা তর্ক দ্বারা নির্ণয় করিতে পারা যায় না, যাহা ঘটিবে বলিয়া অগ্রে বুঝিতে পারা যায় না, অভাবনীয়, অচিন্তনীয়।

অতর্কিত, (অ—তর্কিত) বিং যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে ভাবা যায় নাই, অচিন্তিত, অভাবিত, অসম্ভাবিত।

অতর্কিতচর, (অতর্কিত) বিং যাহা ঘটিতে পারে বলিয়া কেহ কখনও মনে ভাবে নাই।

অতলস্পর্শ, (অ—তল—স্পৃশ্ স্পর্শ করা) বিং যাহার তল স্পর্শ করা যায় না, অগাধ, অতি গভীর, যথা সমুদ্র অতলস্পর্শ।

অতঃপর, (অতঃ ইহা হইতে—পর পরে) ক্রিং ইহার পর।

অতি, বিং অধিক, অতিশয় যথা অতি যত্ন, অতি সমাদর, অতি দীন, অতি দুঃখিত, অতি শীঘ্র, অতি সত্বরে। অসঙ্গত, অনুচিত যথা অতি দান, অতি লোভ, অতি গর্ব।

অতিক্রম, (অতি বাহিরে—ক্রম পা ফেলা) সং লঙ্ঘন, উল্লঙ্ঘন, বাহিরে যাওয়া যথা নিয়ম অতিক্রম, সীমা অতিক্রম।

অতিক্রমণীয়, (অতি—বাহিরে—ক্রম পা ফেলা) বিং যাহা অতিক্রম করা যাইতে পারে, যাহা অতিক্রম করা উচিত, লঙ্ঘনীয়, উল্লঙ্ঘনীয়।

অতিক্রান্ত, (অতি বাহিরে—ক্রম পা ফেলা) বিং গত, অতীত, যথা সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। লঙ্ঘিত, উল্লঙ্ঘিত, যথা নিয়ম অতিক্রান্ত হইল, সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে।

অতিথি, (অ—তিথি দিন) সং যে অপরিচিত ব্যক্তি আহার বা অবস্থিতির নিমিত্ত কোন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয় কিন্তু এক রাত্রির অধিক থাকে না।

অতিপাত, (অতি বাহিরে—পৎ গমন করা) সং অতিক্রম, লঙ্ঘন। বিঘ্ন, ব্যাঘাত।

অতিপ্রসঙ্গ, (অতি অতিশয়—প্রসঙ্গ আসক্তি) সং বাহুল্য, বিস্তার, বাড়াবাড়ি।

অতিরিক্ত, (অতি - রিচ্ অধিক হওয়া) বিং অধিক, অতিশয়।

অতিরেক, (অতি - রিচ্ অধিক হওয়া) সং আধিক্য, আতিশয্য।

অতিবর্তন, (অতি বাহিরে—বৃৎ স্থিতি করা) সং অতিক্রম, লঙ্ঘন, অতিপাত।

অতিবর্তনীয়, (অতি বাহিরে—বৃৎ স্থিতি করা) বিং অতিক্রমণীয়, লঙ্ঘনীয়।

অতিবর্তিত, (অতি বাহিরে—বৃৎ স্থিতি করা) বিং অতিক্রান্ত, লঙ্ঘিত।

অতিবাহন, (অতি—বাহি যাপন করা) সং যাপন, কাটান, যথা সময়াতিবাহন।

অতিবাহিত, (অতি—বাহি যাপন করা) বিং যাপিত, যাহা কাটান হইয়াছে, যথা সময় অতিবাহিত হইল।

অতিশয়, (অতি—শী অধিক হওয়া) বিং অধিক, অত্যন্ত। সং আধিক্য।

অতীত, (অতি—ইত গত) বিং যাহা হইয়া গিয়াছে, গত, অতিক্রান্ত।

অতীন্দ্রিয়, (অতি অতিক্রান্ত—ইন্দ্রিয়) বিং ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা যাহা জানিতে পারা যায় না, পরোক্ষ, অপ্রত্যক্ষ।

অতুল, (অ—তুলা তুলনা) বিং যাহার তুলনা নাই।

অতুল্য, (অ—তুল্য) বিং যাহার তুল্য নাই।

অতৃপ্ত, (অ—তৃপ্ত) বিং যাহার তৃপ্তি জন্মে নাই, অবিতৃপ্ত, অপরিতৃপ্ত। যাহার আশা মিটে নাই।

অত্যধিক, (অতি—অধিক) বিং অত্যন্ত অধিক, যত অধিক হওয়া অথবা করা উচিত নয়।

অত্যন্ত, (অতি অতিক্রান্ত—অন্ত সীমা) বিং অতিশয়। বাড়াবাড়ি, অসঙ্গত, অনুচিত, যত হওয়া বা করা উচিত নয়।

অত্যয়, (অতি অত্যন্ত—অয়্ যাওয়া) সং বিনাশ, ধ্বংস, লোপ।

অত্যল্প, বিং অতি অল্প।

অত্যাচার, (অতি অতিক্রম—আচার) অসৎ আচরণ, অভদ্র আচরণ। অন্যায় আচরণ, দৌরাত্ম্য, উপদ্রব।

অত্যাচারী, (অত্যাচার) বিং যে অত্যাচার করে, অত্যাচারকারী।

অত্যাজ্য, (অ—ত্যাজ্য) বিং যাহা পরিত্যাগ করিবার নয়, অপরিত্যাজ্য।

অত্যায়ত, বিং অতি আয়ত, অতি বিস্তৃত।

অত্যুক্তি, (অতি—উক্তি) সং অত্যন্ত বাড়াইয়া বলা, অসম্ভব বলা, উৎকট বর্ণনা, অসম্ভব বর্ণনা।

অত্যুৎকট, বিং অতি উৎকট।

অত্যুৎকৃষ্ট, বিং অতি উৎকৃষ্ট, অত্যুত্তম।

অত্যুত্তম, বিং অতি উত্তম, অত্যুৎকৃষ্ট।

অত্রত্য, (অত্র—এখানে) বিং এখানকার, এখানে উৎপন্ন, এই স্থান সংক্রান্ত।

অত্রস্ত, (অ—ত্রস্ত) অভীত, যে ভয় পায় নাই।

অথবা, অং বা, কিংবা, পক্ষান্তরবোধক, যথা অদ্য অথবা কল্য যাইব।

অথর্ব, বিং রোগ বার্ধক্য প্রভৃতি কারণবশতঃ অশক্ত ও অকর্মণ্য।

অদণ্ডনীয়, (অ- দণ্ডনীয়) বিং যাহার দণ্ড হওয়া উচিত নয়, অদণ্ড্য।

অদণ্ড্য (অ—দণ্ড) বিং অদণ্ডনীয় দেখ।

অদত্ত, (অ—দত্ত) বিং দত্ত নয়, যাহা দান করা হয় নাই। স্ত্রীং অদত্তা, যথা অদত্তা কন্যা।

অদত্তা, বিং যে কন্যাকে দান করা যায় নাই অর্থাৎ যে কন্যার বিবাহ হয় নাই, অনূঢ়া, অপরিণীতা, অবিবাহিতা।

অদন্ত, (অ—দন্ত) বিং দন্তহীন, যার দন্ত নাই অর্থাৎ দন্ত হয় নাই অথবা পড়িয়া গিয়াছে।

অদর্শন, (অ—দর্শন) সং দর্শনের অভাব, দৃষ্টির বাহির হওয়া। বিং দৃষ্টির বহির্ভূত, দৃষ্টির অগোচর।

অদাতা, (অ—দাতৃ দাতা) বিং দাতা নয়, ধন সত্ত্বেও দান করিতে কাতর, কৃপণ।

অদৃশ্য, (অ—দৃশ্য) বিং দৃষ্টির অগোচর, যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

অদৃষ্ট, (অ—দৃষ্ট) বিং দৃষ্টির বহির্ভূত, যাহা দেখা যায় নাই। ভাগ্য, ভাগধেয়।

অদৃষ্টচর, (অদৃষ্ট) বিং যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই, অদৃষ্টপূর্ব।

অদৃষ্টপূর্ব, (অ—দৃষ্ট—পূর্ব) বিং যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই, অদৃষ্টচর।

অদেয়, (অ—দেয়) বিং দেয় নয়, যাহা দেওয়া উচিত নয়, যাহা দিতে পারা যায় না।

অদ্ভুত, বিং আশ্চর্য, চমৎকারজনক।

অদ্য, অং আজি, বর্তমান দিবসে।

অদ্যতন, (অদ্য) বিং আজি যাহা ঘটিয়াছে, আজি যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, বর্তমান দিবস সংক্রান্ত।

অদ্যাপি, (অদ্য—অপি) সং আজিও, এখনও, এ পর্যন্তও, একাল পর্যন্তও।

শব্দ-সংগ্রহ

অ

অকষ্টবদ্ধ অকাজ্জ অকাজুআ অকাট্য অকালকুষ্মাণ্ড অকুলান অকূল অক্কা অখল অগচ্ছিত অগণন অগতি অগন্তি অগমতা অগা অগুণ অগৌণ অঘর অঘোর অচিনা অজচ্ছল অজম্মিত অজানা অজ্ঞানিত অটল অটুট অঠেল অড়হর অন্ত অতদ্বির অদন্ত (?) অধম্ম অধম্মিতা অধঃপাত অধঃপাতিআ অনাসৃষ্টি অন্তর অন্তরঙ্গ অন্তরা অন্তরাল অপগণ্ড অপড় অপয়া অপাজ্জ অপাজ্জমান অবাক অবাদ অবাধ অবুঝ অবেলা অভাগা অভাগিআ অভাগী অমত্ত অমন অমনি অমিঅ অম্বল অম্বলিআ অরন্ধন অলম্বড়িডআ অষ্টাসি অসাজন্ত অসাড় অসাধ অসান অসূদ অসূচ ।

আ

আঅন আই আইন আউল আউলিআ আউস আএব আএবি আএস আওআজ আওআজি আওল আওলাত আক আকনি আকল আকাচা আকাট আকাটা আকামাম আকাল আকাঁড়া আকিঞ্চন আক্কেল আক্কেলগুড়ুম আক্কেলমন্ত আখড়া আখড়াধারী আখনজী আখা আখাম্বা আখুট্টি আখেজ আখের আগ্ আগড় আগড়া আগত্রা (?) আগমনী আগল আগলা আগলান আগা আগাই আগাগোড়া আগাছা আগাড় আগাড়ি আগান আগানি আগাস আগাঁথা আগু আগুয়ান আগুন আগুনখাকি আগুরি আগুসর আঘাটী আঘাসা আঙ আঙট আঙটা আঙটি আঙরা আঙরাখা আঙ র আঙিয়া আঙুর আঙুল আচমূখা আচমনি আচম্বিত আচসা আচা আচাভূআ আচোট আচ্ছা আছ আছাড় আছাড়া আছাড়ান আছানা আছাবা আছাঁটা আজ আজকাল আজগবি আজব আজবি আজমাইস আজা আজাড় আজাড়া আজাড়ান আজানা আজালা আঝাড়া আঝালা আট আটই আটক আটকা আটকান আটকিআ আটকৌড়িআ আটচল্লিস আটচালা আটত্রিস আটসট্টি আটসাল আটা আটাইস আটান্তর আটানব্বই আটাম আটাল আটাসি আটাসিআ আটি আঠা আঠাকাঠি আঠার আঠারই আড্ডা আড় আড়কাট আড়খত্ত আড়গড়া আড়ঙ আড়ত আড়তদার আড়বাঁকা আড়ভাঙা আড়মাদলা আড়া আড়াআড়ি আড়াই আড়ানি আড়াল আড়ি আড়ি তোলা আড়ি পাতা আড়িমারা আড়ুনি আড়েহাত আতপ আতর আতরদান আতসবাজি আতা আতিত (?) আদ আদকপালিআ আদকামারিআ আদখেঁচড়া আদত আদব আদারিআ আদা আদাগা আদামাদা আদামূলা আদালত আদুড়িয়া আদুরিআ আদুলি আদেক আদেঙ্গা আদৌ আদ্দাশ আধ আধানিক আন্ আনকোরা আনখা আনা আনাজ আনাড় আনাড়ি আনান আনামাসা আনারস আনুপাড়ি আন্দাজ আন্দাজি আন্দেসা আপন আপনি আপস আপসোস আপাণ্ড আপাদমস্তক আপামরসাধারণ আপিল আপিলান্ট আপিলি আপিস আফলন্ত আফলা আফাই আফাটা আফিঙ আফিম আফিমি আফুটা আফুলা

আবকারি আবদার আবদারিআ আবাচ্চি আবাছা আবাদ আবাদি আবার আবির আভাঙ আভাঙা আম আমচুর আমট আমড়া আমড়াগাছিআ আমতা আমদানি আমন আমমোক্তার আময়দা আমরক্ত আমল আমলকি আমলদারি আমলনামা আমলা আমসত্ত আমা আমাটি আমানি আমাসয় আমির আমিরানা আমিরি আয়না আয়মা আয়মাদার আয়া আর আরক আরজ আরজবেগ আরজি আরতি আরদালি আরব্ধ আর্সা আরসি আরসুলা আরাম আল আলকাতরা আলকুসি আলগছ আলগা আলজিব আলতপালত আলতা আলনা আলপাকা আলপিন আল্পো আলবোলা আলমারি আলসিআ আলা আলান আলাপন আলাপি আলিপনা আলু আলুদোষ আলুন আলেকম আল্লা আশী আস্ আস্ক আসন আসনা আসনাই আসবাব আসমান আসমানি আসর আসল আসা আসান আসামি আসাঁতলা আসাঁতলান আস্কারা আস্কিআ আহআল আহলুদিআ আহা আহামক আহামকি আহামরি আহাহা আহির আহোআল আঁইস আঁউমাউ আঁক আঁকড আঁকড়ান আঁকড়াআঁকড়ি আঁকড়ি আঁকসি আঁকা আঁকাড় আঁকাড়ান আঁকাড়ামাকাড়ি আঁকুড়-র আঁকুবাঁকু আঁখর আঁখরতাড়া আঁখরবন্দি আঁখি আঁচ আঁচড় আঁচড়া আঁচড়াআঁচড়ি আঁচড়ান আঁচল আঁচলা আঁচা আঁচাআঁচি আঁচান আঁচিল আঁজির আঁট্ আঁটন আঁটনি আঁটা আঁটাআঁটি আঁটান আঁটাল আঁঠি আঁঠু আঁড়িআ আঁত আঁৎক্ আঁতকান আঁতখানি আঁতটান আঁতড়ি আঁতুড় আঁতুড়িআ আঁধ আঁধার আঁধারমাণিক আঁব আঁবুই আঁস আঁসুআ আঃ।

ই

ইআদ ইআদদস্ত ইআর ইআরকি ইকুন ইচড় ইচাড়পাকা ইজারদার ইজারদারি ইজারা ইজের ইজ্জত ইজ্জতমস্ত ইট ইটখোলা ইতফাক ইতবার ইতবারি ইতর ইতরামি ইতরিআ ইথু ইথে ইস্তিহাম ইমাম ইমামদার ইমারত ইমারতি ইঁদ ইঁদারা ইঁদুর ইয়াদা ইরসাল ইলিস ইষ্টকিং ইষ্টাম্প ইষ্টিমার ইষ্টেট ইষ্টেসন ইসপাত ইসবগুল ইস্তক ইস্তফা ইস্তমজাজ ইস্তাহার ইস্তাহারি ইস্ত্রি ইহকাল ইহা ইহুদি।

উ

উই উইটিপি উইল উকি উকিল উকিলী উকুন উগর উগরা উগরান উগা উগ্রক্ষত্রিয় উচক্থা উচা উচাটন উচু উচ্ছিআ উজবুক উজাড় উজালা উজির উজ্জাপন উজ্জোগ উট উঠ্ উঠা উঠান উঠিত উড়্ উড়া উড়ান উড়ানচণ্ডি উড়ানি উড়িধান্য উড়িআ উতলা উতর্ উতরা উত্তরান উৎখাত উৎপাত উৎপাতিআ উদম উদমাদা উদরি উদাস উনান উনুই উপকথা উপছ উপছা উপছান উপজ্ উপজান উপড়্ উপড়া উপড়ান উপর উপরওআলা উপরচড়া উপড়পড়া উপরি উপসর্গ উপোস উপোসি উবুড় উবুদল উভরায় উমর উমরা উমেদ উমেদার উমেদারী উল উলট্ উল্টা উল্টান উলান উলু উলু উলুটি উসখুস উসুল উসুলি উস্ক উস্কান উহা উহু।

এ

এ এই এও এওত এওতি একগাছিআ একঘরিআ একধাইআ একচল্লিস একচাটিআ একচালা একজাই একজাতিআ একট একটানা একটিন একতারা একতালা একত্রিত একত্রিস একাত্রীস একলা একলাই একসাট্ট একসা একহারা একা একাত্রক একাত্তর একানব্বই একান্ন একাসী একিদা একুন একুস একুসে একে এখন এখান এগ্ এগজামিন এগজিকিউটর এগন এগানা এগার এগারই এজমাল এজমালি এজলাস এজাহার এজাহারি এঠুয়া এড্ এড়া এড়ান এড়ানিআ এত এতবার এতবারি এথা এবং এবারত এবালিস এবালিসি এবে এমত এমন এমামবাড়ী এল এলথেল এলন এলপাতাড়ি এলবাস এলমেল এলাকা এলাচি এলাহি এঁঠ এঁড় এঁড়বিচি।

ও

ওআর ওআরিস ওআরিসান ওআরিসি ওকর ওকালতনামা ওকালতী ওখান ওগারহ (?) ওজন ওজর ওজরি ওঝা ওড়নপাড়ন ওড়না ওড়ম্বা ওত ওথা ওল ওলদ-ওলন ওলন্দাজ ওলন্দাজি ওলপ ওলা ওলাউঠা ওলানি ওসআস ওসার ওসার-ওআলা ওস্তাগর।

ক

কই কএত কএদ কএদি কখন কচকচ কচকচি কচা কচালা কচালান কচি কচু কচুরি কজাক কট কটকট কটকটান কটকটানি কটকটিআ কটকোআলা কটরা কটা কটাল কটালিআ কটাস কড় কড়ক্ কড়কড় কড়কড়ানি কড়কড়িয়া কড়কান কড়কানি কড়খ্ কড়খা কড়খান কড়খানি কড়চা কড়মড় কড়মড়ান কড়মড়ানি কড়মড়ি কড়মড়িআ কড়সি কড়া কড়াই কড়কড় কড়াকড়ি কড়াকিআ কড়ানিআ কড়ি কড়িআ কড়িওআলা কড়িকসা কড়িকটকা কড়ুই কড়েআ কত কতক কতল কথক কথকতা কদম কদমা কদর কদরদান কদিচ কহ্ কনকন কনকনানি কনকনিআ কনকনানিআ কনিষ্ঠি কনুই কপাল কপালিআ কবজ কবজা কবজি কবর কবি কবিওআলা কবু কবুতর কবুল কবুলতি কবুলা কবুলান কভু কম কমজোর কমফর্টর কমবক্ত কমবেশ কমলা কমা কমান কমি কমিটি কমিবেসি কমিসনর কমোড কম্পাস কম্পোজ কম্পোজিটর কয় কয়লা কয়াল কয়ালি কয়েক কর্ করম করবুলি (?) করজ করজা করমচা করলা করা করাকরি করাত করাতি করান কল কলকল কলকলানি কলকা কলপ কলম কলমদান কলমপেসা কলমি কলশুদ্ধ কলা কলাই কলাখাকুআ কলাচুসা কলান কলিকা কলিজা কস্ কসকস কসকসান কসকসানি কসম কসা কসাই কসব কসবি কসবিগিরি কসাকসি কসান কসামাজা কসি কসুটিআ কসুনি কসুর কসুরি কস্ত কস্তাকস্তি কহ কহত কহন কাই কাউর কাএম কাএমি কাওরা কাওরানি কাক কাগজ কাগজি কাগডিমিআ কাঙাল কাঙালিনি কাঙ্ই কাচ্ কাচা কাচান কাচানি কাছ কাছা কাছাকাছি কাছাড় কাছান কাছারি কাছি কাছিম কাছে কাজ কাজপাগলা

কাজল কাজললতা কাজলিআ কাজি কাজুআ কাজেকাজে কাট্ কাটন কাটনা কাটনি কাটা কাটাকাটি কাটান কাটানি কাটানিআ কাটারি কাটুনি কাটুরবুটুর কাঠ কাঠখোট্টা কাঠখোলা কাঠগড়া কাঠবিরালি কাঠা কাঠাকালি কাঠাকিআ কাঠাবাড়ি কাঠাম কাঠি কাঠুরিআ কাড়্ কাড়া কাড়াকাড়ি কাড়ান কাত কাতর কাতরান কাতরানি কাতলা কাতা কাতান কাতার কাতুকুতু কাতুরকুতুর কাদা কাদাখোঁচা কান কানড় কানা কানাকানি কানাচ কানাত কানি কানুন কানুনগুঁই কানেড় কাপ কাপড় কাপাস কাপাসি কাপেকাপ কাপ্তেন কাফর কাফরি কাবা কাবাড়ি কাবাব কাবার কাবিল কাবু কাবুলিআ কাবেল কামটা কামড় কামড়-কামড়ি কামড়ান কামড়ানি কামবাই কামবাইআ কামরা কামরাঙা কামাই কামান কামানি কামানিআ কামার কামারনি কামাল কামিজ কামিম কামেআ কায়ক্লেশ কায়দা কায়েত কায়েতনি কায়েম কায়েমি কারকুন কারকুনি কারখানা কারচোপ কারচোপি কারপরদাজ কারবার কারবারি কারসাজি কারিকর কারিকরি কারিগর কারিগরি কারিন্দা কালা কালি কালিআ কালেক্টর কালেক্টরী কালেজ কালেজি কালেভদ্রে কাস্ কাসন্দি কাসা কাসান কাসি কাসুআ কাস্তিআ কাহার কাহারনি কাহিল কাহিলি কাঁকড়া কাঁকড়ি কাঁকর কাঁকাল কাঁকুই কাঁকুড় কাঁখ কাঁচ কাঁচকলা কাঁচপোকা কাঁচা কাঁচান কাঁচামিঠা কাঁচি কাঁচুমাচু কাঁটা কাঁটাল কাঁটালি কাঁড় কাঁড়া কাঁড়ান কাঁড়ি কাঁড়ন কাঁত কাঁতড়া কাঁথা কাঁদ্ কাঁদন কাঁদনি কাঁদনিআ কাঁদা কাঁদাকাঁদি কাঁদান কাঁদানিআ কাঁদি কাঁধ কাঁপ কাঁপন কাঁপনি কাঁপা কাঁপানিআ কাঁসর কাঁসা কাঁসারি কাঁসি কাঁসিদার কাঁহান কাঁহিনি কি কিআ কিচকিচ কিচকিচি কিচড় কিচিকিচি কিচিমিচি কিছু কিতা কিতাব কিতাবত কিতাবতি কিতাবি কিন কিনা কিনান কিপটিআ কিফাত কিমাকার কিম্ভূত কিস্মত কিস্মতি কিল কিলকিল কিলান কিল্লা কিস কিসমত কিসমিস কু কুআ কুআসা কুইআ কুইনাইন কুইল কুকাজ কুকাল কুচ কুচকুচ কুচনি কুচা কুচাল কুচুটিআ কুট কুটকচালিআ কুটনা কুটনি কুটনিপনা কুটা কুটান কুটি কুটুম কুটুরকাটুর কুটুরিআ কুঠ কুঠরি কুঠরিআ কুঠি কুঠিআল কুড় কুড়চি কুড়বা কুড়া কুড়াকুড়ি কুড়ান কুড়াল—কুড়ি কুড়িআ কুড়িআমি কুত কুতুকুতু কুতুরকাতুর কুত্তা কুত্তি কুদাল কুন কুনকুন কুনকুনান কুনকুনানি কুপতি কুফল কুমার কুমারনি কুমির কুর কুরকুর কুরনি কুরা কুরান কুল কুলকুল কুলঙ্গি কুলপি কুলা কুলান কুলি কুলুই কুলুপ কুসী কুস্তি কুস্তিগির কুহক কুহকি কুঁকড়্ কুঁকড়া কুঁকড়ান কুঁকড়ি কুঁকুড়া কুঁচি কুঁজড়া কুঁজি কুঁড়া কুঁদ্ কুঁদনি কুঁদরি কুঁদা কুঁদান কুঁদানি কুঁদি কুঁহুনি কুঁহুনিআ কেঅট কেউ কেউটিআ কেতা কেতাব কেতাবি কেদারা কেন কেনা কেমন কেমনে কেমবিস কেরানি কেরামত কেলাস কেসুর কেহ কেঁক্ কেঁকান কেঁকানি কেঁচ কেঁচ কেঁচকেঁচানি কেঁচকেঁচিআ কেঁট কেঁটকেঁট কেঁটকেঁটানি কেঁটকেঁটিআ কোকসিমা কোঙা কোচ কোচমান কোট কোটাল কোটালনি কোটালি কোটালিআ কোঠা কোড়া কোড়ান কোতোআল কোতোআলি কোথা কোথায় কোদাল কোণ কোণঠাসা কোনাকোনি কোপ্তা

কোমর কোমরাকুমরি কোমরবন্দ কোম্পানি কোর কোরকাপ কোরন্দ কোরন্দিআ কোরমা কোরা কোরাকুরি কোরান কোল কোলঙ্গা কোলঙ্গি কোলা কোলাকুলি কোলাচ কোলাচিআ কোলু কোলুনি কোসা কোঁক কোঁকড়া কোঁকড়ান কোঁঙা কোঁচড়া কোঁছড় কোঁছড়িআ কোঁছা কোঁড় কোঁত কোঁতকোঁত কোঁতা কোঁতানি কোঁদল কোঁদলি কোঁদলিআ কোঁপা কৌটা।

খ

খই খএর খএরখাঁ খক খকখক খকখকানি খচ খচখচ খচর খট খটখট খটখটানি খটখটিআ খড় খড়খড় খড়খড়ানি খড়খড়ি খড়খড়িআ খড়ম খড়ান খড়ি খড়ুআ খত খতম খতান খতিআন খত্তান খনখন খনখনিআ খনা খন্তা খন্তি খপ খপড়দার খপড়দারি খবর খবিস খয়রা খয়রাত খয়রাতি খয়ের খয়েরখাঁ খর খরগোস খরচ খরচা খরচিআ খরসান খরা খরান খরিস খরিসলা খলিপা খলিসা খস খসখস খসখসিআ খসম খসা খসান খসানিআ খা খাই খাউন্তি খাউন্তিআ খাওআ খাওআখাই খাওআন খাওআনি খাওনিআ খাক খাকি খাকুআ খাগড়া খাগড়াই খাঙরা খাঙরান খাঙরানি খাজা খাজনা খাজারি খাট খাটনি খাটা খাটাখাটি খাটাল খাটিআ খাট্টা খাড়া খাড়াখাড়া খাড়াদম খাড়ি খাড়ু খাত খাতক খাতকালি খাতকি খাতা খাতাল খাতির খাতিরজমা খাতিরি খাদ খান খানকি খানকিপনা খানকিগিরি খানসামা খানসামাগিরি খানা খানা-তলাসি খানামানা খানি খানিক খাপ খাপা খাপান খাবল খাবলা খাবলান খাম খামকা খামচ খামচা খামচান খামচানি খামল খামার খামি খামিন্দা খামিরা খার খারা খারাপ খারাপি খাল খালা খালাস খালাসি খালি খালুই খাস খাসা খাসি খাস্তা খাঁচা খাঁজ খাঁটি খাঁড় খাঁড়া খাঁড়ি খাঁদা খাঁদি খিআ খিআঘাট খিআন খিআল খিআলি খিআলিআ খিচ খিচখিচ খিচখিচি খিচড়ি খিচিমিচি খিজমত খিজমতগার খিটখিট খিটান খিটখিটিআ খিড়কি খিড়কিদার খিতাব খিদা খির খিরসা খিরা খিল খিলখিল খিলান খিঁচ খিঁচন খিঁচনিআ খিঁচড় খিঁচড়ন খিঁচড়া খুআ খুআড় খুআর খুক খুকখুক খুকি খুঙি খুচড়া খুজ খুজা খুজান খুটখুট খুড়খুড় খুড়তত খুড়সাস খুড়া খুড়াশ্বশুর খুড়ি খুদ খুদা খুদান খুন খুনি খুব খুবি খুর খুরপা খুরপি খুরি খুল্‌ খুলা খুলান খুলি খুস খুসখুস খুসকি খুসখুসান খুসখুসানি খুসখুসিআ খুসি খুঁচ খুঁচানি খুঁচড় খুঁচড়ান খুঁচা খুঁচান খুঁচি খুঁট খুঁটনি খুঁটা খুঁটান খুঁটি খুঁড়ি খুঁড়িআ খুঁত খুঁতখুঁতিআ খেআল খেআলি খেআস খেই খেইহারা খেউড় খেউর খেউরি খেঙরা খেঙরান খেঙরানি খেজুর খেজুরিআ খেত খেদ খেদান খেদানিআ খেপ খেপা খেপান খেপি খেমটা খেমটাওআলি খে খেআ খেআঘাট খেআন খেআমত খেআমতকারী খেরুআ খেল্‌ খেলআড় খেলা খেলাত খেলান খেলানা খেলুআ খেস খেসারত খেসারতি খেঁউড় খেঁকসিআলি খেঁচ খেঁচক খেঁচকা খেঁচকান খেঁচকানি খেঁচড়া খেঁচড়ানি খেঁচড়াপনা খেঁচনি খেঁচা খেঁচাখেঁচি খেঁচান খেঁট খেঁটিআ খেঁতখেঁত খেঁতখেঁতান খেঁতখেঁতানি খোআ খোআন খোকা খোজ খোজা খোজান খোট্টা খোট্টাই খোট্টাগিরি খোদ খোদকস্তা খোদা

খোদান খোদানি খোদাবন্দ খোনা খোর খোরপোষ খোরা খোরাক খোরাকি খোল খোলস খোলসা খোলা খোলাকুচি খোলান খোলানি খোলাসা খোস খোসা খোসামদ খোসামদি খোসামদিআ খোঁআড় খোঁআরি খোঁচ খোঁচড়াখুঁচড়ি খোঁচড়ান খোঁচড়ানি খোঁচনি খোঁচাখোঁচি খোঁচান খোঁটা খোঁড়া খোঁদল খোঁপা।

গ

গইন্দা গইন্দাগিরি গইব গইবি গঙ্গাজলি গঙ্গাজলিআ গচ গচ্ছা গচ্ছিত গচ্ছিতি গছ গছা গছান গছাল গজ গজব গজবি গজরা গজল গজা গজান গজাল গজি গট গঠন গড় গড়গড় গড়গড়ানি গড়গড়িআ গড়ন গড়া গড়াগড়ি গড়ান গড়িআ গড়িআন গড়িমসি গড়ুই গণ্ডগোল গণ্ডগ্রাম গণ্ডা গণ্ডাকিআ গণ্ডার গণ্ডিআ গতর গতরখাকুআ গতরজমা গতাজি গতিক গতিক্রিয়া গতিবিধি গত্ত গদ গদগদ গদাইনস্করি গদি গদিআন গন্ গনতি গনা গনান গনানি গপ গপগপ গপ্প গপ্পিআ গবা গবাটিআ গম গমগম গমগমিআ গয়ঙ্গচ্ছ গয়রাত গয়লা গয়লানি গয়ালি গয়েশ্বরি গরগর গরগরান গরগরানি গরজ গরজি গরজিআ গরদ গরদা গরদান গরদানি গরব গরবিআ গরবী গরবিণী গরম গরমাগরম গরমি গরিব গরিবানা গরিবি গল গলগল গলগলিআ গলতি গলন গলা গলাগলি গলান গলাবন্দ গলানি গলি গলুই গহরা গহিরি গঁদ গঁদান গা গাই গাএন গাওআ গাগর গাগরা গাঙ গাছ গাছড়া গাছা গাছি গাজন গাজনিআ গাজর গাজল গাড় গাড়আন গাড়আনি গাড়ন গাড়া গাড়ান গাড়ি গাড়িওআলা গাঢাকা গাঢালা গাদ্ গাদন গাদনি গাদা গাদান গাদামি গাদি গাদোলা গাফিল গাব গারা গাবান গাবাল গাবিন্ গাভি গামছা গামলা গারদ গাল গালা গালাগালি গালান গালানি গালি গালিম গালিমি গাহক গাঁই গাঁএন গাঁজর গাঁজা গাঁজাখোর গাঁজাখোরি গাঁট গাঁটকাটা গাঁঠ গাঁঠা গাঁত গাঁতি গাঁতিদার গাঁথ্ গাঁথনি গাঁথা গাঁথান গাঁদা গিড়গিড় গিড়গিড়ান গিড়গিড়িআ গিনি গিমি গিল্ গিলন গিলা গিলান গিলাপ গিসগিস গু গুছ্ গুছনি গুছা গুছানি গুছাল গুছি গুজর গুজরত গুজরা গুজরাটি গুজরান গুজিআ গুট্ গুটন গুটনিআ গুটান গুটি গুটিগুটি গুটিপোকা গুড় গুড়গুড় গুড়গুড়নি গুড়গুড়ি গুড়ন গুড়ান গুড়ি গুড়িমারা গুডুক গুডুকিআ গুড়ুম গুণধাম গুণমাণ গুণমন্ত গুদস্তা গুদড়ি গুদাম গুদি গুন গুনগুন গুনগুনানি গুনা গুনান গুবন গুম গুমট গুমটি গুমখুন গুমর গুমরা গুমরান গুমসা গুমান গুমি গুমুক গুল গুলগুলুআ গুলুন গুলনি গুলা গুলান গুলানা গুলি গুলিখোর গুলুআ গুঁজ গুঁজা গুঁজান গুঁজি গুঁজিকাটি গুঁড়্ গুঁড়া গুঁড়ান গুঁড়ানি গুঁড়ি গুঁত্ গুঁতন গুঁতনি গুঁতনিআ গুঁতা গুঁতান গুঁতিআ গুঁফো গেদা গেরদা গেলা গেলান গেলাপ গেলাস গেলি গেঁজ গেঁজগেঁজ গেঁজগেঁজানি গেঁড় গেঁড়া গেঁড়ি গেঁড়িভাঙা গেঁড়ুআ গেঁতুআ গেঁদা গোআল গোআলা গোআলিনি গোএন্দা গোএন্দাগিরি গোকল (?) গোখাদক গোঙা গোচর গোচারণ গোছ গোছা গোছান গোছাল গোট গোটা গোঠ গোড় গোড়া গোড়াগুড়ি গোদ গোদা গোধড় গোবর গোবরাট গোভাগাড় গোমুআ গোর গোড়স গোরস্থান

গোরা গোরু গোল গোলমাল গোলমালিআ গোলা গোলাবাড়ি গোলাপ গোলাপজাম গোলাপি গোলাম গোলামচোর গোলামি গোলাল গোসা গোসাপ গোহাল গোঁ গোঁআন গোঁআনা গোঁআর গোঁআরিত্তি গোঁজ গোঁজা গোঁজাগোঁজি গোঁজামিল গোঁজামিলন গোঁড় গোঁড়া গোঁড়ামি গোঁতা গোঁফ গৌন।

ঘ

ঘট্ ঘটক ঘটকালি ঘটকি ঘটঘট ঘটা ঘটান ঘটি ঘড়ঘড ঘড়ঘড়ানি ঘড়া ঘড়াঞ্চি ঘড়ি ঘড়িআল ঘন্ট ঘন্টা ঘনা ঘনাঘনি ঘনিষ্ঠ ঘনিষ্ঠতা ঘনুআ ঘর ঘরকন্না ঘরনি ঘরভাঙা ঘরা ঘরাঘরি ঘরানা ঘরামি ঘস্ ঘসন ঘসনি ঘসা ঘসাঘসি ঘসান ঘা ঘাই ঘাগরা ঘাগী ঘাট ঘাটতি ঘাটআল ঘাটআলি ঘাড় ঘাড়ান ঘানি ঘাম ঘামাচি ঘামুআ ঘাল ঘাসিআডা ঘাঁট ঘাঁটন ঘাঁটনি ঘাঁটা ঘাঁটাঘাঁটি ঘাঁটান ঘি ঘিচ্ ঘিনঘিন ঘিনঘিনান ঘিনঘিনানি ঘিনঘিনিআ ঘির ঘিরা ঘিরান ঘুঙনি ঘুচ্ ঘুচন ঘুচা ঘুচান ঘুট ঘুটা ঘুটিঙ ঘুটিঙিয়া ঘুনি ঘুম ঘুমগড়িআ ঘুমনা ঘুমন্ত ঘুমান ঘুর্ ঘুরঘুরিআ ঘুরন ঘুরনি ঘুরনুআ ঘুরা ঘুরান ঘুর্নুআ ঘুল ঘুলঘুলি ঘুলনি ঘুস ঘুসখোর ঘুসনি ঘুসা ঘুসাঘুসি ঘুসান ঘুসি ঘুসিম ঘুসিমি ঘুঁটিআ ঘুঁড়ি ঘেঅর ঘেউ ঘেউঘেউ ঘেউঘেউনি ঘেটিআ ঘেটু ঘেটুআ ঘেনঘেন ঘেনঘেনান ঘেনঘেনানি ঘেনঘেনিআ ঘের ঘেরন ঘেরা ঘেরান ঘেঁচ ঘেঁচড় ঘেঁচড়া ঘেঁচড়ান ঘেঁচডানি ঘেঁচড়াপড়া ঘেঁটু ঘেঁতঘেঁত ঘেঁতঘেঁতিআ ঘেঁস ঘেঁসা ঘেঁসাঘেঁসি ঘোঙরা ঘোচা ঘোচান ঘোটন ঘোটনা ঘোটা ঘোটাঘুটি ঘোটান ঘোপ ঘোরা ঘোরান ঘোল ঘোলা ঘোলান ঘোলানি ঘোঁজ ঘোঁট ঘোঁটাঘুঁটি ঘোঁটুআ ঘোঁড়া।

চ

চক চকচক চকচকানি চকচকিআ চকমকি চকসা চকা চকি চকিত চট চটক চটকা চটকান চটকাভাঙা চটচট চটচটিআ চটপট চটপাটিআ চটা চটাচটি চটান চটানিআ চটি চড় চড়চড় চড়চড়ানি চড়াচড়ি চড়ক চড়কতলা চড়ন চড়নদার চড়নদারি চড়া চড়ান চড়ানিয়া চড়ুই চড়ুইভাতি চনচন চনচনিআ চনমন চনমনান চনমনিআ চনাচুর চপচপ চপচপিআ চপাটি চব্বিশ চব্বিশে চর চরখা চরবি চরস চরা চরান চল চলতি চলন চলনি চলা চলাচল চলান চলিত চস চসম চসমখোর চসমনামাই চসমা চসা চসান চা চাউনি চাউল চাওয়া চাক চাকন্দা চাকর চাকরান চাকরানি চাকরি চাকরিআ চাকলা চাকলাদার চাকা চাকি চাকু চাখ্ চাখড়ি চাখন চাখনদার চাখনবিবি চাখা চাখাচাখি চাখান চাগড় চাগাড় চাঙারি চাঙ্গা চাট্ চাটন চাটনি চাটা চাটাই চাটাচাটি চাটান চাটি চাটু চাটুআ চাড় চাড়া চাতাল চাদর চা-দান চাপ চাপকান চাপট চাপড চাপড়ান চাপড়ানি চাপন চাপনি চাপরাস চাপরাসি চাপা চাপাচাপি চাপান চাপানি চাব্ চাবা চাবি চাবুক চাম চামচিআ চামচিকা চামড়া চামার চামারনি চামেলি চার চারা চারান চারানি চারি চাল চালতা চালন

চালনা চালান চালা চালাক চালাকি চালাচালি চালানি চালি চাস চাসবাস চাসাড়িআ চাহ্‌ চাহন চাহনি চাহা চাহান চাঁচ চাঁচর চাঁচি চাঁছ চাঁছনি চাঁছা চাঁছান চাঁছি চাঁটি চাঁদ চাঁদিআ চাঁদনি চাঁদা চাঁদি চাঁপ চাঁপা চাঁপাকলি চি চিআন চিক চিকচিক চিকন চিকনা চিকনাই চিকিমিকি চিঙড়ি চিচিঙ্গা চিট চিটা চিঠি চিঠিবাজি চিড় চিড়ান চিড়িয়া চিড়িয়াখানা চিত চিতপাত চিতল চিতা চিতান চিন চিনা চিনান চিনি চিনিআ চিপ চিপটান চিপটানিআ চিব্‌ চিবা চিবান চিমড়িআ চির চিরকালিআ চিরনি চিরা চিরান চিল চিলিয়া (ছাতা) চিঁড়া চুআ চুআত্তর চুয়ান্ন চুআল চুআল্লিশ চুক চুকচুক চুকলি চুকলিখোর চুকা চুকান চুটু চুটকি চুটান চুড়ি চুড়িদার চুন চুনা চুনারি চুনি চুপ চুপচাপ চুবড়ি চুম্‌ চুমক চুমকি চুমরা চুমরান চুর চুরট চুরনব্বই চুরাশি চুরি চুল চুলা চুলি চুস চুসা চুসান চুসি চুঁচি চেক চেঙ চেঙরা চেত্‌ চেতা চেতান চেপটা চেরা চেরান চেরানি চেল্‌ চেলা চেলান চেলানি চেলি চেলুআ চেহারা চেঁচ চেঁচাচেঁচি চেঁচান চেঁচানি চেঁচামেচি চেঁট চৈ চৈটে চৈতনচুটকি চোখ চোখাল চোঙ চোঙা চোট চোটপাট চোটা চোটাচুটি চোটান চোপদার চোপদারি চোপা চোমরা চোমরান চোমা চোমান চোঁ চোঁচ চোঁচা চৌকি চৌকিআ চৌকিদার চৌকিদারান চৌকিদারি চৌখুলি চৌঘরা চৌচাপট চৌঠা চৌতারা চৌত্রিশ চৌথ চৌদানি চৌদিক চৌদ্দ চৌধুরি চৌপায়া চৌপালা চৌবাচ্চা চৌমাথা চৌষট্টি চৌহদ্দি।

ছ

ছক ছকা ছকান ছটপট ছটপটানি ছটপটিআ ছটাক ছটাকিআ ছড় ছড়া ছড়াছড়ি ছড়ান ছড়ি ছড়িদার ছনছন ছমছম ছমছমিআ ছনমন ছয়লাপ ছয়লাপি ছরাদ ছল্‌ ছলছল ছলছলান ছলছলিয়া ছলা ছা ছাই ছাউনি ছাওআ ছাওআল ছাওআলি ছাগল ছাগলিআ ছাড় ছাড়া ছাড়াছাড়ি ছাড়ান ছাড়ানি ছাত ছাতা ছাতি ছাতিম ছাতু ছাদন ছান ছানা ছানান ছানি ছান্‌তা ছাপ ছাপর ছাপা ছাপাখানা ছাপাছাপি ছাপান ছাপানি ছাব ছাবা ছাবাখানা ছাবাছাবি ছাবান ছাবানি ছার ছারকপালিআ ছারখার ছারপোকা ছাল ছালন ছালা ছাঁক ছাঁকন ছাঁকা ছাঁকান ছাঁচ ছাঁচা ছাঁট ছাঁটন ছাঁটা ছাঁটাছাঁটি ছাঁটান ছাঁদ ছাঁদানি ছাঁদা ছি ছিআ ছিআল ছিট ছিটা ছিটান ছিটাফোঁটা ছিন ছিনছিন ছিনা ছিনান ছিনানি ছিনার ছিনারি ছিনিআ ছিপ ছিপি ছিমড়িয়া ছিল ছিলা ছিলান ছিলিম ছিঁচ ছিঁচকা ছিঁচকাদনিআ ছিঁচা ছিঁচান ছিঁড় ছিঁড়া ছিঁড়াছিঁড়ি ছিঁড়ান ছিঁদ ছুকরি ছুট ছুটা ছুটাছুটি ছুটান ছুটি ছুত ছুতা ছুতার ছুতারনি ছুব ছুবান ছুবানি ছুরি ছুল ছুলা ছুলান ছুলি ছুঁ ছুঁআ ছুঁআচ ছুঁআচিআ ছুঁআছুঁই ছুঁআন ছুঁইছুঁই ছুঁচ ছুঁচাবাজি ছুঁড়ি ছে ছেছে ছেড় ছেপ ছেঁক ছেঁকা ছেঁচ ছেঁচকি ছেঁচাছেঁচি ছেঁচান ছেঁড়া ছেঁড়ান ছেঁদা ছোআরা ছোকরা ছোকা ছোট ছোটকা ছোটকি ছোটা ছোটান ছোব ছোবা ছোবান ছোবানি ছোরা ছোলা ছোলান ছোঁ ছোঁআচ ছোঁআচিআ।

জ

জউ জক জকা জখন জখম জখমি জগঝম্প জজ জজমেণ্ট জজিয়তি জঞ্জাল জট জটলা জটামাংসি জটিআ জড় জড়াও জড়াজড়ি জড়ান জড়ি জড়িত জত জতন জনম জনমভর জনার জপ জপা জপান জবড়জঙ জবর জবরদস্ত জবরদস্তি জবাই জবান জবানবন্দি জবানি জবাব জবাবি জবে জম্ জমক্ জমকা জমকান জমকাল জমা জমাখরচি জমাট জমাদার জমাদারি জমান জমাবন্দি জমি জমিদার জমিদারি জমানবিস জন্ম জন্মশোধ জর জরজর জরা জরান জরি জরিপ জরিপি জরু জরুর জরুরি জল জলন জলন্ত জলা জলাতন জলান জলানিঅা জলুই জসম জহন্নম জহর জহরত্তি জহরি জা জউ জাওআ জাঅন জাগ্ জাগন্ত জাগরনি জাগরানি জাগা জাগাজাগি জাগান জাগানি জাঙ জাঙাল জাঙিআ জাট জাড় জাড়ি জাত জাদু জাদুগর জাদুগরি জাদুঘর জাদুমণি জান জানত জানা জানাজানি জানান জানালা জানানা জাব জাবেতা জাম জামরুল জামা জামাই জামিআর জামিন জামিনদার জামিনি জামির জায় জায়গা জায়গির জায়গিরদার জায়দাদ জায়ফল জারক জারা জারান জারি জারিজুরি জারুল জাল জালন জালা জালাতন জালান জালানি জালানিআ জালিআত জালিআতি জালিআ জালিআনি জালিম জালিমি জাসু জাসুগিরি জাহা জাহাজ জাহাজি জাহির জাহিরি জঁাক জঁাকজমক জঁাকড় জঁাকড়ি জঁাক জঁাকাজঁাকি জঁাকান জঁাকাল জঁাকুআ জঁাত জঁাতা জঁাতি জি জিঅন জিঅন্ত জিঅল জিআন জিউ জিউদান জিউলি জিকির জিগির জিত জিতপাখা জিতপাটি জিতা জিতান জিদ জিদ্দি জিন জিনা জিনিস জিব জিবিআ জিম্মা জিম্মাদার জিরন্দাজ জিরা জিলদ জিলা জিলাপি জুআ জুআচুরি জুআচোর জুআন জুআনি জুআর জুআরি জুআলি জুজু জুট্ জুটা জুটান জুড় জুড়া জুড়ান জুড়ি জুড়িদার জুড়িদারি জুৎ জুতন্ত জুতা জুতান জুতাবরদার জুদা জুমর জুমল জুমলা জুরি জুল জুলাপি জুলি জুঁই জে জেঠ জেঠতত জেঠা জেঠাই জেঠাত জেঠামি জেঠি জেত জেব জেমন জের জেরদস্ত জেরবার জেরা জেল জেলখানা জেলখালাসি জেলে জেলেনি জো জোগাড় জোগাড়িআ জোগান জোগানিআ জোট জোটপাট জোটবাঁধা জোটা জোটাই জোটান জোড় জোড়ঘাই জোড়তাড় জোরভাঙা জোড়ন জোড়া জোড়াতাড়া জোড়ান জোত জোতদার জোতা জোতাজুতি জোনাকি জোনাপোকা জোর জোরআর জোরআরি জোরাল জোল জোলা জোলাপ জেঁাক জেঁাকা।

ঝ

ঝক ঝকঝক ঝকঝকানি ঝকনি ঝকা ঝকঝকি ঝগড়া ঝগড়াটিআ ঝট ঝটপট ঝটপটানি ঝটপটিআ ঝড় ঝড়া ঝড়ান ঝড়ি ঝড়ুআ ঝন ঝনঝন ঝনঝনানি ঝনঝনি ঝনঝনিআ ঝন্ঝাট ঝপ ঝম ঝমঝম ঝমঝমানি ঝমঝমিআ ঝর ঝরখা ঝরন ঝরনা ঝরঝরিআ ঝরান ঝলঝল ঝলঝলিআ ঝলমল ঝলমলানি ঝলমলিআ ঝাউ ঝাড় ঝাড়ন ঝাড়া ঝাড়াঝাড়ি ঝাড়ান ঝাড়ানি ঝাড়ু ঝাড়ুবরদার ঝামা ঝারা ঝারি ঝাল

ঝাঁ ঝাঁক ঝাঁকড়া ঝাঁকর ঝাঁকরা ঝাঁকরান ঝাঁকরানি ঝাঁকা ঝাঁকি ঝাঁট ঝাঁটা ঝাঁটান ঝাঁটি ঝাঁতলা ঝাঁতাড়ু ঝাঁপ ঝাঁপনি ঝাঁপা ঝাঁপান ঝাঁপানা ঝাঁপানিআ ঝাঁলি ঝি ঝিউড়ি ঝিকুর ঝিঙা ঝিট ঝিটা ঝিনঝিন্ ঝিনঝিনি ঝিনুক ঝিম ঝিমকিনি ঝিমান ঝিল ঝিঁক ঝিঁকরা ঝিঁকা ঝিঁঝিঁ ঝিঁঝিঁট ঝিঁটি ঝুট ঝুটা ঝুড় ঝুড়া ঝুড়ান ঝুড়ি ঝুন ঝুনা ঝুপ ঝুপড়ি ঝুপি ঝুম ঝুমকা ঝুমঝুমি ঝুমুর ঝুর্ ঝরা ঝুরি ঝুল ঝুলন ঝুলনা ঝুলা ঝুলাঝুলি ঝুলান ঝুলনযাত্রা ঝুলি ঝুঁক ঝুঁকা ঝুঁকান ঝুঁকি ঝুঁটি ঝোড় ঝোড়া ঝোড়ান ঝোপ ঝোল ঝোলনা ঝোলা ঝোলান ঝোঁক ঝোঁকাঝোঁকি।

ট

টক টকঝক টকুআ টক্কর টক্করাটক্করি টগর টঙ টনকা টনটন টনটনিআ টনটনানি টপটপ টপটপানি টপাটপ টব টল টলটল টলটলান টলটলিআ টলন টলমল টলমলান টলমলিআ টলান টঙ্ক্ টঙ্কান টসটস টসটসানি টসটসিআ টহল টহলদার টহলিআ টাকুআ টাক টাকা টাকসাল টাঙ টাঙন টাঙা টাঙান টাঙি টাট টাটকা টাটান টাটানি টাটি টাটু টাণ্ডাই টান টানা টানাটানি টানান টাপু টায়টায় টারপিন টাল টালমাটাল টালা টালাটালি টালান টালি টাঁক টাঁকন টাঁকা টাঁঠি টাঁড় টি টিআ টিক টিকটিকি টিকা টিকাদার টিকাদারি টিকান টিটকারি টিন টিপ টিপানি টিপা টিপাটিপি টিপান টিমক টু টুআন টুক টুকটাক টুকটুকিআ টুকনি টুকরা টুকরি টুকা টুকান টুট টুটা টুটান টুটি টুপি টুপিওআলা টুনি টুঁ টেক্ক টেকসই টেকুআ টেঙরা টেঙাড়ি টেড়া টেড়ি টেনা টেপা টেপান টেবিল টের টেরা টেলিগ্রাফ টেলিগ্রাম টেঁ টেঁক টেঁকখর টেঁটা টেঁপা টেঁপারি টেঁকো টেঁস্ টেঁসটেঁস টেঁসটেসিআ টৈটুম্বুর টোকা টোকান টোঙর টোপ টোপর টোপা টোল টোলা টোসা ট্রেজরি।

ঠ

ঠক ঠকঠক ঠকঠাক ঠকা ঠকাঠকি ঠকান ঠকানিআ ঠকামি ঠঙ ঠঙঠঙ ঠঙঠঙানি ঠন ঠনঠন ঠনঠনান ঠনঠনানি ঠসমস ঠসমসিআ ঠাঅর ঠাঅরা ঠাঅরান ঠাকুর ঠাকুরঝি ঠাকুরদাদা ঠাকুরপো ঠাকুরমা ঠাকুরানি ঠাকুরানিদিদি ঠাকুরালি ঠাট ঠাট্টা ঠাট্টাবাজ ঠাট্টাবাজি ঠাড় ঠাড়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডাগারদ ঠাণ্ডি ঠামি ঠার ঠারেঠোরে ঠাস ঠাসন ঠাসা ঠাসাঠাসি ঠাসান ঠাহর ঠাহরা ঠাহরান ঠাঁ ঠাঁই ঠাঁইনাড়া ঠিক ঠিকা ঠিকাদারি ঠিকানা ঠিল ঠিলান ঠুক ঠুকর ঠুকরান ঠুকরানি ঠুকা ঠুঙ ঠুনি ঠুস ঠুসা ঠুসানি ঠেক ঠেকনুআ ঠেকা ঠেকাঠেকি ঠেকান ঠেঙ ঠেঙা ঠেঙাঠেঙি ঠেঙাড়িআ ঠেঙান ঠেঙানি ঠেল ঠেলা ঠেলাঠেলি ঠেলান ঠেলানি ঠেস ঠেসঠোস ঠেসান ঠেঁটি ঠোকর ঠোকরান ঠোকরানি ঠোঙা ঠোনা ঠোস ঠোসন ঠোসা ঠোঁট।

ড

ডগ ডগা ডগানি ডগাসাল ডগি ডাক ডাকা ডাকাডাকি ডাকাত ডাকাতি ডাকান ডাকিনী ডাক্তর ডাক্তারি ডাগর ডাঙ ডাঙপিটিয়া ডাঙস ডাঙা ডাঙান ডাব ডাবর

ডাবা ডাম্বর ডামাডোল ডাল ডালকুত্তা ডালনা ডালা ডালান ডালি ডালিম ডাহা ডাঁইন ডাঁট ডাঁটা ডাঁড় ডাঁড়ি ডাঁস ডাঁসান ডিক্রি ডিক্রিজারি ডিক্রিদার ডিগবাজি ডিঙ্‌ ডিঙন ডিঙা ডিঙান ডিঙি ডিপজিট ডিপজিটরি ডিম ডিমকি ডিম্বল ডিমডিম ডিমডিমি ডিসমিস ডিহি ডুকর্‌ ডুকরান ডুব ডুবডুবি ডুবা ডুবান ডুবি ডুবুডুবু ডুমুর ডুরি ডুরিআ ডুলি ডেক ডেকচি ডেগরা ডেঙ ডেঙডেঙ ডেড় ডেড়া ডেড়ি ডেঁকল ডোকরা ডোব ডোবা ডোবান ডোম ডোমনি ডোর ডোরা ডৌল ।

ঢ

ঢক ঢকি ঢঙ ঢঙঢঙ ঢঙঢঙানি ঢনঢন ঢনঢনানি ঢনঢনিআ ঢপ ঢপঢপ ঢপঢপিয়া ঢল ঢলঢল ঢলঢলিআ ঢলা ঢালঢলি ঢলান ঢলানি ঢাক ঢাকন ঢাকনা ঢাকনি ঢাকা ঢাকাই ঢাকাঢাকি ঢাকান ঢাকি ঢাল ঢালা ঢালাঢালি ঢালান ঢালি ঢিট ঢিপ ঢিপঢিপ ঢিপনি ঢিল ঢিলন ঢিলা ঢু ঢুক্‌ ঢুকা ঢুকান ঢুপ ঢুপঢাপ ঢুপঢুপ ঢুপঢুপি ঢুল ঢুলনি ঢুলা ঢুলাই ঢুলান ঢুলি ঢুলঢুল ঢুসান ঢুসানিআ ঢুঁড়্‌ ঢুঁড়া ঢেউ ঢেকফাজিল ঢেকা ঢেকুর ঢেঙা ঢেঙি ঢেপ ঢেপঢেপ ঢেপিয়া ঢেপসা ঢেমন ঢেমনা ঢেমনি ঢেমনিবাজ ঢেমনিবাজি ঢের ঢেরা ঢেরাসই ঢেরি ঢেলা ঢেলান ঢেলামারা ঢেঁকি ঢেঁকিশাল ঢেঁস্‌কাল ঢেঁটা ঢেঁটামি ঢেঁড়রা ঢেঁড়স ঢেঁড়ি ঢোক ঢোকনা ঢোকা ঢোকান ঢোল ঢোলা ঢোলাই ঢোলান ঢোলী ঢোঁক ঢোঁড়া ঢোঁসা ঢোঁসান

ত

তক তকতক তকতকিআ তক্তপোস তক্তা তকরার তকরারি তক্তি তকমা তকমারি তখন তজবিজ তটস্থ তড়তড় তড়তড়িআ তড়াক তত তদবির তদবিরি তন্মধ্যে তপসিল তফাত তফিল তফিলদারি তবক তবাক তবিয়ত তুবু তবে তমসুক তমসুকি তমাদি তয়ের তয়েরি তর্‌ তর তরআল তরকারি তরঘর তরজা তরতরিআ তরদ্দুদ তরফ তরফসান তরকসানি তরবির তরমুজ তরস্ত তরা তরাজু তরান তরিবত তরুই তল তলতল তলতলিআ তলা তলান তলাস তলাসি তলি তলুআ তল্লাট তসর তসরপাত তসলা তহবিল তহবিলদার তহবিলদারি তহমত তহমতি তা তাই তাইদ তাইদনবিস তাইদনবিসি তাইন তাউই তাওআ তাওআল তাক তাকতম্বি তাকান তাকানে তাকিআ তাকিত তাকুড় তাকুত তাখিত তাগ তাগা তাগাড় তাগাদা তাগিদ তাগুড়্‌ তাগুড়ান তাজ তাজা তাজারুজু তাড় তাড়ন তাড়া তাড়াতাড়ি তাড়ান তাড়ানিআ তাড়ি তাড়ু তাত তাতরসি তাতা তাতান তাতিল তান তানপুরা তানানা তামা তামাক তামাম তামাসা তামাসাগিরি তামিল তামুলি তামুলিনি তার তারান তারিখ তারিফ তাল তালা তালাস তালাসি তালি তালিকা তালিম তালিমি তালুক তালুকদার তালুকদারি তালেবর তাল্লাক তাস তাসা তাসান তাহদ্দ তাহুদ তাঁত তাঁতি তাঁতিনি তাঁরা তাঁবেদার তাঁবেদারি তিঅর তিআরি তিকোনা তিখুড় তিত তিতির তিন তিনি তিপান্তর তিপ্পান্ন তিয়াত্তর তিরনব্বই

তিরন্দাজ তিরন্দাজি তিরপল তিরপাই তিরবির তিরবিরান তিরাশী তিলিআ তিলুআ তু তুআজ তুই তুইতকার তুইতকারি তুইতকারিআ তুক তুক্কা তুখড় তুড় তুড়া তুড়ান তুত তুকান তুমর তুমরি তুমি তুরপন তুরিত তুরুপ তুল তুলকালাম তুলা তুলান তুলাপাড়া তুস তুসা তুসি তেইসা তেইসে তেউটি তেউড় তেকর তেকোনা তেগ তেজ তেজপাত তেজারত তেজারতি তেজাল তেজি তেজিমন্দি তেড়া তেড়ি তেতলা তেতালিস তেত্রিস তেপান্তর তেপান্তরি তেপায়া তেবাচক তেমত তেমন তেমনি তেমাথা তেমোহানা তের তেরই তেরিআ তেরিজ তেরিমেরি তেল তেলা তেলি তেলুআ তেষট্টি তেহাই তেহারা তেঁত তেঁতুল তেঁতুলিআ তোক তোকা তোড় তোড়ান তোতলা তোতা তোপ তোরঙ তোলন তোলা তোলান তোলাপাড়া তোষক তোষামদ তৌজি তৌজিভুক্ত তৌল তৌলন্দার তৌলন্দারি তৌলা তৌলান।

থ

থই থক থকা থপ থপথপ থপথাপিআ থমথমিআ থর থরথর থরথরানি থল থলথল থলথলিআ থলি থলিআ থলুআ থসথস থসথসিআ থা থাই থাউকা থাক থাকন থাকবস্ত থাকা থাকাথাকি থান থানদার থানদারি থানফাড়া থানা থাপড় থাবড় থাবড়া থাবড়ানি থাম থামা থামান থামাল থাল থালা থালি থালিআ থাস থাসন থাসা থাসান থিং থিতন থিন থিনান থির থু থুআ থুআপাড়া থুক্‌ থুড় থুড়নি থুড়া থুড়ি থুত্‌ থুতু থুথু থুপ্‌ থুপ থুপথুপ থুপথুপিআ থুর থুরথুর থুরথুর থুরথুরিআ থুরা থুরান থুসুআ থেঁতল থেঁতলা থেঁতলান থেঁতলানি থৈ থৈথৈ থোক থোকা থোড় থোড়া থোড়ান থোপ থোপা থোবা থোলা থোরা থৌকা।

দ

দই দইআ দগদগ দগদগিআ দঙ্গল দড় দড়কচা দড়দড় দড়বড় দড়বড়িআ দড়া দড়ি দপ দপদপ দপদপানি দপ্তর দপ্তরি দফা দফাঅত দফাদার দফাদারি দবদবা দবদবানি দম দমক দমকা দমদমা দমপোক্তা দমবাজ দমবাজি দমা দমান দয়াল দয়েল দর দরআন দরআনি দরকার দরকচা দরকসান দরকসুরি দরকারি দরখাস্ত দরজা দরজি দরদ দরদালান দরদি দরবারি দরমা দরমাহা দল দলপতি দলস্থ দলভুক্ত দলা দলাক্রান্ত দলাদলি দলান দলিল দলিলি দলুআ দস্ত দস্তক দস্তখত দখখতি দস্তাবেজ দস্তুর দস্তুরি দহরম দহি দঁক দা দাই দাএর দাএরি দাএআ দাওআদার দাকোটা দাখিল দাখিলা দাখিলি দাগ দাগনি দাগা দাগান দাগাবাজ দাগাবাজি দাগি দাঙ্গা দাঙ্গাবাজ দাড় দাড়া দাড়িআ দাড়িম দাড়ু দাদ দাদন দাদনি দাদা দাদাশ্বশুর দাদি-শাশুড়ি দাদেইজ্র দাদেইজি দানা দানাদার দানাই দানি দাপ দাপট দাব দাবড়ি দাকা দাকান দাবনি দাবা দাবান দাবি দাবিদার দাম দামড়া দামড়ি দামা দামামা দামি দায় দায়গ্রস্ত দায়রা দায়মাল দারা দারি দারিক দারু দালান দালাল দালালি দালিম দাসখত দাস্ত দাঁ দাঁও দাঁড় দাঁড়া দাঁড়ান দাঁড়ি দাঁত দাঁতন দাঁতুআ দি দিক দিকদারি দিগর দিগার দিঘি দিদি দিদিশাশুড়ি দিল দিলদরিআ দিলদার

দিলদারি দিলামা দিশা দিশাহারা দিস্তা দু দুআ দুআত দুআন দুআনি দুআর দুআল দুআলি দুআঁসলা দুই দুও দুকর দুখ দুখচাটিআ দুখিণী দুখী দুগজন দুড়দুড় দুড়দুড়ানি দুধ দুধল দুনা দুনাদুনি দুপ দুপদাপ দুপদুপ দুপদুপানি দুপাক দুবরা দুম দুমদাম দুরন্ত দুল দুলন দুলনা দুলা দুলান দুলাল দুসরা দেইজ দেইজি দেউল দেউলিআ দেক দেকদার দেকদারি দেদার দেন দেনদার দেনমোহর দেনা দেনাদার দেমাক দেমাকিআ দেরি দেসেলাই দেহাত দৈসত দোআ দোআত দোআল দোআঁসলা দোকতা দোকর দোকান দোকানি দোকানদার দোকানদারি দোক্তা দোগজ দোঘেঁচড়া দোটান দোতরফা দোনর দোনা দোপিআঁজা দোবরা দোরোখা দোল দোলন দোলমালাই দোলযাত্রা দোলা দোলাই দোলান দোলুআ দোবরা দোসর দোসরা দোস্ত দোস্তি দোহর দোহা দোহাই দৌড় দৌড়ন দৌড়নি দৌড়া দৌড়াদড়ি দৌড়ান দৌলত দৌলতমস্ত।

ধক ধকধক ধড় ধড়ধড় ধড়ধড়ানি ধপপড় ধড়পড়ানি ধড়া ধড়িধক্কার ধড়িবাজ ধড়িবাজি ধনিআ ধনুক ধনুকধারী ধন্ধ ধমক ধমকান ধমকানি ধরণ ধরণা ধরা ধরাকাট ধরাট ধরাধরি ধস ধসা ধা ধাই ধাউড়িআ ধাউস ধাওআ ধাওড় ধাড়া ধাড়ি ধাড়িআ ধান ধানি ধানুআ ধাপ ধাপ্পা ধাবড়া ধামা ধামি ধার ধারক ধারণ ধারণা ধারা ধারানি ধারাল ধারি ধারুআ ধাস ধাঁচা ধাঁধাঁ ধিতকার ধিতকারি ধিনধিন ধিনি ধু ধুক ধুকড়ি ধুকড়িআ ধুকধুকনি ধুকধুকি ধুতি ধুতুরা ধুধু ধুন ধুনা ধুনাচি ধুনান ধুনানি ধুনি ধুপ ধুপধাপ ধুপড়ি ধুম ধুমধাম ধুমধামিআ ধুমল ধুমলান ধুমসা ধুমসি ধুমা ধুমি ধুরপদ ধুরবাজ ধুরবাজি ধুল ধুলা ধুলি ধুলিগুঁড়ি ধুঁআ ধুঁক ধেঙে ধেড় ধেড়-ধেড়িআ ধেড়ান ধেড়ানি ধেধত ধেরজ ধোআ ধোআট ধোআন ধোআনি ধোপ ধোপা ধোপানি ধোপ ধোবা ধোবানি ধোলাই ধোসা ধোকা।

ন

নকল নকলদানা নকলনবিস নকলনবিসি নকলিআ নকাসি নওর নচ্ছার নজর নজরবন্দি নজরানা নট নটিআ নটী নঠ নড় নড়ন নড়বড় নড়বড়িআ নড়া নড়ানড়ি নড়ি নড়িআভোলা নত নথি নধর ননদ ননদি ননদিনি ননি নন্দাই নফর নবাত নবাব নবাবি নবুদ নব্বই নমাজ নমুদ নর নরম নরাজ নরুন নল নলচালা নলি নলিআন নষ্ট নষ্টামি নহবত না নাই নাইকুণ্ডল নাএর নাএবি নাক নাকচ নাকাল নাকি নাগর নাগরী নাগরালি নাগরিনি নাগাল নাঙ নাচ নাচন নাচনিআ নাচা নাচান নাচানিআ নাচার নাচারি নাছ নাছি নাছোড়বান্দা নাজানা নাজির নাজিমি নাজুক নাট নাটশালা নাটা নাটাই নাটিম নাড় নাড়ন নাড়া নাড়ান নাড়ানাড়ি নাড়ানি নাতক নাতি নাতিবউ নাতিন নাতিনি নাদ নাদনা নাদান নাদা নানকপন্থি নানা নানান নান্দি

নাপাজ্জ নাপাজ্জমান নাপিতনি নাব্‌ নাবা নাবান নাবানি নাবাল নাবালগ নাবি নাম নামঞ্জুর নামতা নামা নামান নারাঙ্গি নারসাই নারাজ নারাজি নারাকাতরিআ নাল নালা নালায়েক নালি নালিতা নাস নাসা নাহক নাহি নাহিক নিকর নিকড়িআ নিকস নিকাস নিকাসি নিকি নিখরচা নিখুঁত নিখুঁতি নিগাছ নিগূঢ় নিঙড় নিঙড়ান নিছক নিছু নিজস্ব নিজাম নিজামত নিজামতি নিট নিটুট নিঠুর নিড় নিড়বিড় নিড়বিড়িআ নিড়ান নিনতা নিনামি নিব নিব্‌ নিবা নিবান নিম নিমক নিমকচৌকি নিমকি নিরদয় নিরমল নিরালা নিরিখ নিরবিল নিরেট নিরোগা নিলাম নিলামি নিসান নিসানা নিসি নিহাইত নিহাল নুগা নুড়ি নুন নুনি নুনু নুর নুরি নুলা নেউস নেকা নেকাপনা নেকামি নেকি নেঙা নেচি নেজ নেজা নেজুড় নেড় নেড়া নেড়ি নেড়ুনি নেদা নেসা নেসাখোর নেহাইত নেহাল নোঙরা নোঙরামি নোট নোড় নোড়া নোনা নোলা নোলাবাজ নোলাবাজি নৌবত।

প

পইপই পকুড়ি পকেট পগার পঙ্গপাল পচ্‌ পচা পচান পচানি পচাল পচলাপচলি পচি পছত পছতান পছতানি পছন্দ পছন্দদার পছন্দসই পঞ্চম পট পটক পটকা পটকান পটকানি পটপট পটপটানি পটপটি পটপটিআ পটাপটি পটি পটিদার পটুআ পঠ্‌ পঠন পঠা পঠান পঠিত পড় পড়তা পড়ন পড়পড় পড়শ পড়সি পড়া পড়াক পড়ান পড়িআন পড়ুআ পড়িত পতর পদক পদবি পদান পদিনা পদ্দার পয় পয়জার পয়ড়া পয়দা পয়নালা পয়মন্ত পয়মাল পয়মাস পয়সা পয়াড় পয়ার পরআ পরআনা পরকলা পরকিত পরখ পরখদার পরখা পরখান পরগনা পরঘরি পরজ পরচালা পরঠা পরতাল পরদা পরদানসিন পরদেশি পরব পরবস্তি পরভাতি পরমিট পরস পরসন পরসু পরান পরানি পরি পরিষ্টি পলক পলখা পলটন পলতা পলা পলান পলি পসম পসমি পসার পসুরি পঁহুছ পঁহুছন পঁহুছা পঁহুছান পা পাই পাওয়া পাওআন পাওআনা পাওআনাদার পাক পাকলা পাকসাঁড়াসি পাকা পাকান পাকাপাকি পাকাম পাকি পাকুড় পাখআজ পাখনা পাখা পাখি পাখুরা পাগ পাগড়ি পাগল পাগলা পাগলামি পাঙা প্যাঙাস পাঙাসিআ পাচক পাচার পাচিকা পাছ পাছড় পাছড়া পাছড়ান পাছা পাছাড় পাছাড়া পাছাড়ান পাছাড়াপাছাড়ি পাছুড়ি পাছে পাজ পাজা পাজান পাজামা পাজি পাজিআমি পাট পাটকরনি পাটকিলা পাটা পাটাদার পাটাসেলামি পাটি পাঠ পাঠান পাঠাপাঠ পাড় পাড়ন পাড়া পাড়ান পাড়ানি পাড়াপড়সি পাড়াবেড়ানি পাড়াবেড়ানিআ পাড়ি পাড়িওআলা পাণ্ডা পাণ্ডাগিরি পাত পাতকুআ পাতখোলা পাতড়া পাতড়ামারা পাতল পাতলা পাতা পাতান পাতি পাথর পাথরি পাথরিআ পাদরি পাদোদক পান পানকাঁটা পানকৌটি পানড়া পানতা পানতি পানতুআ পানদান পানদানি পানমসলা পাননুছি পানসি পানসিআ পানা পানাদার পানি পানিফল পাপুজা

পাপোস পায়খানা পায়তক্ত পার পারক পারকতা পারদর্শী পারদর্শিতা পারদারিকতা পারা পারান পারানি পারাপার পারাপারি পারুল পাল পালআন পালক পালকি পালনি পালা পালান পালানিআ পালাছড়কি পালি পালিস পালুই পাস পাসর পাসরা পাসরান পাহাড় পাহাড়ি পাহাড়িআ পাঁউরুটি পাঁক পাঁকাটি পাঁকাল পাঁকুআ পাঁকুই পাঁচ পাঁচড়া পাঁচন পাঁচনি পাঁচালি পাঁচির পাঁচুটিআ পাঁজ পাঁজর পাঁজরা পাঁজা পাঁজারি পাঁজি পাঁঠা পাঁঠি পাঁঠিআন পাঁড় পাঁড়ে পাঁতি পাঁপড় পাঁপর পাঁয়জোর পাঁয়তারা পাঁয়দল পাঁস পাঁসকুড় পাঁসটিআ পিআদা পিআর পিআরা পিআলা পিআস পিক পিকদান পিকদানি পিঙলা পিচ পিচকারি পিচাস পিচুটি পিছ পিছন পিছা পিছে পিট পিটন পিটনবাজি পিটনা পিটপিটনি পিটপিটিআ পিটা পিটান পিঠ পিঠটান পিঠা পিঠাপিঠি পিঠালি পিতল পিন পিনাস পিনিস পিপরমেন্ট পিপা পিপুল পিয়াদা পিয়ারা পিয়ালা পিয়াস পির পিরান পিরালি পিল পিলখানা পিলপিল পিলসুজ পিলুড়ি পিস্ পিসবোট পিসা পিসাত পিসান পিসাশ্বশুর পিসি পিসিশ্বাশুড়ি পিঁয়াজ পিঁজ পিঁজা পিঁজান পিঁড়া পিঁপা পুআ পুআল পুই পুকুর পুজ পুজারি পুট পুটলি পুড় পুড়নি পুড়া পুড়ান পুত পুতলি পুতা পুতান পুতি পুতুপুতু পুতুল পুদিনা পুনরায় পুনু পুর পুরা পুরান পুরি পুরিআ পুরিখাকি পুরু পুরুষ্ট পুল পুলবন্দি পুলি পুলিস পুলিসি পুলিন্দা পুহ পুহান পুঁ পুঁক পুঁজ পুঁজি পুঁঠি পুঁথি পেগম্বর পেজ পেট পেটভরা পেটভাঙ্গা পেটা পেটাস্তিআ পেটি পেটুক পেটুকামি পেটুকুআ পেন্টুলুন পেরাকি পেরু পেরেক পেরেত পেরেসান পেস পেসকস পেসকার পেসকারি পেসা পেসাদার পেসাদারি পেসান পেসানি পেঁক পেঁকপেঁক পেঁকপেঁকানি পেঁচ পেঁচা পেঁচাপেঁচি পেঁটরা পেঁটরি পেঁটারি পেঁড়া পেঁড়ি পেঁপিআ পৈতা পৈতাধারী পো পোআতি পোতান পোআল পোকা পোক্ত পোক্তা পোক্তাই পোক্তান পোড়া পোড়ান পোড়ানি পোতা পোতান পোদ পোদ্দার পোনা পোল পোলা পোলাও পোস পোসা পোসাক পোসাকি পোসান পোসানি পোস্ত পোস্তা পোহ পোহান প্রাণপ্রিয়সি প্রিয়াস।

ফ

ফইজৎ ফক ফকা ফকামি ফকির ফকিরনি ফকিরি ফক্কা ফক্কুড়ি ফক্কুড়িআ ফচকিআ ফচকিআমি ফজলি ফজিহৎ ফট ফটক ফটফটিআ ফটিক ফটকিরি ফড়িআ ফড়িঙ ফতনা ফতা ফতে ফম ফরক ফরকাল ফরসি ফরাস ফরাসি ফরিআদ ফরিআদি ফলন ফলনা ফলন্ত ফলা ফলান ফলাফল ফলার ফলারিআ ফলুই ফসল ফস্ক ফস্কা ফস্কান ফাইলি ফাও ফাগ ফাগুন ফাজিল ফাট ফাটন ফাটা ফাটান ফাটাফাটি ফাটাল ফাড় ফাড়ন ফাড়া ফাড়ানি ফানস ফাপর ফারখত ফারখতি ফারম ফারমান ফাল ফালতুআ ফালা ফালি ফাঁক ফাঁকা ফাঁকি ফাঁকেফাঁকে ফাঁড়া ফাঁড়ি ফাঁপ ফাঁপন ফাঁপনি ফাঁপর ফাঁপা ফাঁপান ফাঁপানি ফাঁস ফাঁসন ফাঁসা ফাঁসান ফাঁসি ফাঁসিআড়া

ফাঁসিকাট ফিক ফিকফিক ফিকা ফিকির ফিকিরি ফিঙা ফিচ্ ফিচান ফিচানি ফিট ফিটফাট ফিতা ফির ফিরন ফিরা ফিরান ফিলকৌল ফুট ফুটকড়াই ফুটফুট ফুটা ফুটান ফুটি ফুনফুন ফুল ফুলড়ি ফুলা ফুলান ফুলারি ফুস ফুসফুস ফুসফুসি ফুসল ফুসলান ফুসলানি ফুক্ ফুঁকন ফুঁকা ফুঁকান ফুঁপ ফুঁপি ফেন ফেনফেন ফেনফেনিআ ফেনা ফেফে ফের ফেরত ফেরা ফেরান ফেরুআ ফেল ফেলফেল ফেলফেলানি ফেলা ফেলান ফেলানি ফেলানেল ফেসাত ফেসাতিআ ফৈজত ফৈরাদ ফৈরাদি ফোকলা ফোড় ফোড়ন ফোড়া ফোস্কা ফোঁটা ফোঁড় ফোঁপান ফোঁপানি ফোঁপানিআ ফোঁস ফোঁসফাঁস ফোঁসান ফৌজ ফৌজদার ফৌজদারি ফৌত।

ব

বআ বআন বআনি বই বইন বইনঝি বইনপো বউ বউনি বউকাঁটকি বএল বক বকনা বকবক বকম বকরিদ বকসি বকসিস বকা বকান বকাবকি বকাল বক্কেশ্বর বখরা বখরাদার বখেড়া বখিল বগ বগল বগলস বগনি বগি বগুন বচ বজবজ বজবজানি বজবজিআ বজ্জাত বজ্জাতি বটব্যাল বটুয়া বটের বড় বড়বড়ানি বড়সি বড়া বড়াই বড়াল বড়ি বড়িআ বণ্টন বদ বদনা বদনাম বদনামি বদমাস বদমাসি বদমিজাজি বদমিজাজ বদল বদলা বদলাই বদলান বদলানি বদলাবদলি বদলি বদিঅত বনতি বনবন বন বনাজ বনান বনিয়াদ বনিয়াদি বনিবনাও বন্ধান বন্ধানি বম বমবম বমা বমি বয়নামা বয়রাত বয়া বয়ান বরকন্দাজ বরখাস্ত বরগি বরজ বরণ বরফ বরফি বরবাদ বরযাত্র বরলা বরস বরসা বরাত বরাতি বরাদ্দ বরাদ্দি বরাবর বরাভরণ বরামদ বরামদি বরামদিআ বল বলক বলকা বলগিঅত বলদ বলদিআ বলবল বলা বলান বলাবল বলাবলি বলিদান বলিষ্ঠ বস্ বসা বসাক বসান বহ্ বহতা বহা বহান বহানি বহি বহির্বাস বহুগুনা বহুত বহুতর বঁটি বা বাঅ বাআ বাআন্ন বাই বাউল বাওআ বাওআন বাকর বাকড়া বাকল বাকস বাক্স বাখড় বাখান বাখানি বাখারি বাখুল বাগ বাগড়া বাগা বাগান বাগাল বাগালি বাগি বাগিছা বাঘ বাঘিনি বাঙাল বাঙালি বাঙি বাচ বাচকানি বাছ বাছন বাছনি বাছা বাছাগোছা বাছান বাছানি বাছাবাছি বাছুর বাচ্ছুরি বাজ বাজন বাজনদার বাজনা বাজা বাজান বাজাবেতা বাজার বাজি বাজিগর, বাজিগরি বাজু বাজুবন্দ বাজে বাজোর বাট বাটখারা বাটনা বাটা বাটান বাটালি বাটি বাটী বাড় বাড়ন বাড়ন্ত বাড়া বাড়ান বাড়াবাড়ি বাড়ি বাড়ুই বাত বাতা বাতাবি বাতাস বাতাসা বাতি বাতিক বাতিল বাতিলি বাদ বাদল বাদলা বাদলি বাদলিআ বাদা বাদান বাদাবাদি বাদাম বাদামি বাদুর বাধআ বাধাই বান বানক বানরিআ বানা বানান বানানি বানি বানিকর বানেআ বাপ বাপা বাপান্ত বাপু বাব বাবত বাবরসা বাবলা বাবা বাবাজি বাবু বাবুই বাবুগিরি বামন বামনা বামনাই বামনি বায়না বার বারইআরি বারকস বারতা বারদুআরি বারিক বারুই বারুদ বালা বালাই বালাখানা বালাগন্তি বালাখি বালাপোস বালাভোলা বালাম বালি বালিস বালুসাই

বাস বাসন বাসর বাসা বাসাড়িআ বাসি বাসিন্দা বাহক বাহা বাহাদুর বাহাদুরি বাহানা বাহির বাহআ বাঁ বাঁআ বাঁউনি বাঁউনিআ বাঁএন বাঁক বাঁকন বাঁকা বাঁকান বাঁকি বাঁখারি বাঁচ বাঁচন বাঁচা বাঁচনি বাঁট বাঁটআ বাঁটআরা বাঁটআরি বাঁটন বাঁটা বাঁটান বাঁটুল বাঁদ বাঁদন বাঁদনি বাঁদর বাঁদরামি বাঁদা বাঁদান বাঁদাবাঁদি বাঁদি বাঁধ বাঁধন বাঁধনি বাঁধা বাঁধান বাঁধাবাঁধি বাঁধি বাঁস বাঁসমতি বাঁসরি বাঁসি বিআ বিআই বিআইন বিআড়া বিউলি বিক্ বিকন বিকুনি বিকান বিক্রী বিখোড় বিগড় বিগড়ন বিগড়া বিগড়ান বিঘা বিচ বিচালি বিচি বিচিকিচ্ছি বিছ্ বিচ্ছনি বিছা বিছান বিছানা বিছানি বিচ্ছিরি বিচ্ছু বিজ্‌বিজ্ বিজক বিজাতক বিজুত বিজুলি বিজোড় বিটল বিটলিআ বিড় বিড়ন বিড়নি বিড়বিড়ান বিড়বিড়িআ বিদল বিদায় বিন বিনন বিননি বিনাট বিনান বিনানিআ বিবি বিম বিমজ্জিম বিমা বিয়ানা বিল বিলন বিলনি বিলাত বিলাতি বিলান বিলি বিশ বিশি বিশে বিসবিস বিসবিসান বিহন বিহান বিহিদানা বুক বুকবুক বুকনি বুকল বুকবুক বুচকি বুজ বুজন বুজা বুজান বুজানি বুঝ বুঝা বুঝান বুট বুটদার বুড় বুড়ন বুড়া বুড়ান বুড়ানি বুড়ি বুড়িকসা বুন্‌বুনন বুননি বুনা বুনাট বুনান বুনানি বুয়ল বুল্ বুলন বুলবুল বুলবুলি বুলা বুলান বুলানি বেঅকুব বেঅকুবি বেআইন বেআইনি বেআড়া বেআন্দাজ বেআন্দাজি বেইজ্জত বেইমান বেইমানি বেউড় বেওআরিস বেওআরিসী বেকসুর বেকার বেকারি বেগ বেগম বেগার বেগারিআ বেগুন বেগুনিআ বেঙ বেঙাচি বেচ্ বেচা বেচান বেচারা বেচারি বেচাল বেজায় বেজার বেটা বেটি বেটুআ বেঠিক বেঠিকানা বেড় বেড়া বেড়ান বেড়ি বেড়িআ বেত বেতর বেআইন বেতার বেতাল বেতালা বেতি বেথা বেথাক বেথাকিআ বেথি বেথিক বেথুআ বেদল বেদানা বেদিআ বেদুআ বেধড়ক বেনা বেনাম বেনামি বেনিআ বেনুক বেন্নন বেপরআ বেপার বেপারি বেপোট বেফাঁস বেবসা বেবসাদার বেভার বেভারিআ বেমক্কা বেমজলিসি বেমনাসিব বের বেরঙ বেরন বেরান বেরেঁআ বেল বেলআরি বেলকার বেলকুল বেলমোক্তা বেলসুঁটা বেলা বেলি বেলিআ বেলিক বেলিকামি বেলুন বেস বেসন বেসর বেসাত বেসাতি বেসি বেসুআ বেহাগ বেহাদ্দ বেহান বেহায়া বেহারা বেহাল বেহুদা বেঁঠিআ বেঁধা বেঁধান বেসুঁআ বৈকাল বৈকালি বৈকালিক বৈঠক বৈঠকখানা বৈঠকি বো বোআল বোকা বোকামি বোজা বোজাই বোঝ বোঝা বোঝাই বোঝান-বোট বোটকা বোড়া বোতল বোতাম বোদা বোদাম বোনা বোনাট বোনান বোমা বোমবেটিআ বোরা বোল বোঁচ বোঁচামি বোঁটা বৌ বৌকাঁটকি বৌনি।

ভ

ভক ভকভক ভকত ভকতি ভগন্দর ভড় ভড়কান ভড়ঙ ভড়ভড় ভনভন ভনভনানি ভয়সা ভর্ ভরন ভরতি ভরম ভরন্তর ভরসা ভরা ভরাট ভরাডুবি ভরান ভরাভর ভরি ভস ভসকা ভসকান ভসকানি ভসভস ভসভসিআ ভাই ভাইজামাই ভাইঝি ভাগ ভাগড়া ভাগা ভাগান ভাগিনজামাই ভাগিনবৌ ভাগিনা ভাঙ ভাঙচুর

ভাঙন ভাঙা ভাঙান ভাঙানি ভাঙাভাঙি ভাচা ভাজ ভাজন ভাজনা ভাজা ভাজন ভাজি ভাট ভাটা ভাটি ভাটিআরাখানা ভাড়া ভাত ভাতা ভাতার ভাতুড়িআ ভান ভানা ভানাকুটা ভানানি ভাত্বরিআ ভাপ ভাপা ভাপান ভাব ভাবন ভাবনি ভাবা ভাবান ভাবান্তর ভাবান্তরি ভায়রাভাই ভায়া ভায়াদ ভায়াদগিরি ভায়াদি ভার ভারা ভারান ভারানি ভারার্পণ ভাল ভালবাস্ ভালবাসা ভালবাসাবাসি ভালা ভালাভালি ভালুক ভালুকী ভাস্ ভাসা ভাসান ভাসুর ভাঁটা ভাঁড় ভাঁড়ান ভাঁড়াভাঁড়ি ভাঁড়ামি ভাঁড়ুই ভিআন ভিক ভিকারি ভিকন ভিখারি ভিজ্ ভিজা ভিজান ভিট ভিটা ভিড় ভিড়ভিড় ভিড়ান ভিত ভিতা ভিতরবুদিআ ভিতরি ভিন ভিয়ান ভিরকুটি ভুক ভুকা ভুক্তভোগী ভুখ ভুখা ভুগ্ ভুগনি ভুগা ভুগান ভুজা ভুট ভুটা ভুড়ভুড় ভুড়ভুড়নি ভুন ভুনা ভুনান ভুনি ভুরা ভুল ভুলনি ভুলা ভুলান ভুলুআ ভুসা ভুসি ভুসুণ্ডি ভুঁড়ি ভুঁড়িআ ভেউ ভেউভেউ ভেক ভেকা ভেকান ভেকানি ভেকুআ ভেঙ ভেঙচ্ ভেঙচন ভেঙচনি ভেঙচান ভেঙভেঙ ভেঙভেঙা ভেঙভেঙানি ভেঙভেঙিআ ভেঙানি ভেঙ্গ্ ভেজান ভেজাল ভেট ভেটেরাখানা ভেড়া ভেড়ি ভেড়িআ ভেড়ুয়া ভেদ ভেনভেন ভেনভেনান ভেনভেনানি ভেনভেনিআ ভেল ভেলকি ভেলভেল ভেলভেলান ভেলভিলিআ ভেঁউট ভেঁপু ভোগা ভোগান ভোগানি ভোচকা ভোচকানি ভোজ ভোজনা ভোজানি ভোড় ভোমা ভোম্বল ভোর ভোলা ভোঁক ভোঁতা ভোঁদর ভোঁসা।

ম

মই মউ মউআ মকাই মক্কা মগ মগাই মগজ মগজি মগন মজকুর মজপুত মজা মজাড়িআ মজান মজাদার মজিল মজুদ মজুদি মজুমদার মজুর মজুরি মটকা মটকি মটমট মটর মড়ক মড়কান মড়কানি মড়মড় মড়মড়ানি মড়মড়িআ মড়া মড়াঞ্চি মড়াঞ্চিআ মড়ামড়ি মড়ুইপোড়া মত মতন মতমত মতলব মতলববাজ মতামত মতামতি মতান্তর মতি মতিচুর মথ্ মথন মথা মথান মদ মদত মদরসা মদিঅন মদুআ মন মনকসা মনকির মনক্কা মনস্থ মনহরা মনাকসা মনাকসাকসি মনা মনাকাটা মনান্তর মনান্তরি মনাসিব মনিব মনিবানা মনিবি মন্দিরা মম মমজামা মমঢাল মমতা মমত্ব ময়দা ময়দান ময়না ময়রা ময়লা মর্ ময়কটিআ মরজি মরদ মরদানি মরন্ত মরা মরাই মরিআ মরক মল মলঙ্গি মলদ্বার মলমল মলা মলান মলাহিজা মলিদা মসগুর মসলা মসলাদার মসহারা মসা মসান মসাপির মসারি মসাল মসালচি মসিল মস্ত মস্তাকি মস্তাভির মহস্তরান মহন্ত মহল মহলা মহরম মা মাই মাইনা মাকড় মাকড়সা মাকড়া মাকড়ি মাকুন্দিআ মাখ মাখন মাখা মাখান মাখামাখি মাখাল মাগ মাগন মাগনা মাগা মাগি মাগুর মাগোঁসাই মাঙ্গা মাছ মাছরাঙা মাছিতা মাছিমুড়িআ মাছুআ মাছুআনি মাজ মাজন মাজা মাজান মাজি মাজুম মাজুমি মাজুব মাজুবি মাজুল মাজুলি মাঝ মাঝার মাঝারি মাট মাটকড়াই মাটমিট মাটা মাটাতোলা মাটাম মাটি মাঠ মাঠত মাঠা মাঠাল মাড় মাড়ন মাড়া মাড়ামাড়ি মাড়ি মাত মাতকাটা মাতকাটান মাতন মাতনি মাতর মাতব্বরি মাতা

মাতান মাতাল মাতালামি মাথট মাথা মাথাল মাথি মাথুর মাদক মাদল মাদার মাদি মাদুর মান মানআর মানআরি মানকচু মানত মানসিক মানা মানান মানিক মাপ মাপা মাপান মাপানি মামলা মামলাবাজ মামা মামাত মামাশ্বশুর মামি মামিশাশুড়ি মামু মামুল মায় মায়না মার্ মারকা মারকিন মারকামারা মারকুতুআ মারকুনি মারখেকুআ মারগিজ মারণ মারপিট মারফত মারা মারান মারানিআ মারামারি মারী মাল মালকোষ মালখানা মালঞ্চ মালসা মালসাভোগ মালসি মালাকার মালামাল মালাবদল মালিক মালিকানা মালিকি মালিস মালিসি মালিনী মালী মালুম মাস মাসক মাসকাবারি মাসকিআ মাসচটক মাসতত মাসতদারক মাসা মাসাস মাসি মাসিত মাসুর মাসুরি মাহ মাহিআনা মাহিয়ত্ মাহুত মিআ মিআদ মিয়াদি মিআমি মিছরি মিছা মিছামিছি মিছিল মিজাজ মিট মিটমিট মিটমিটিআ মিটা মিটান মিঠ মিঠা মিঠাই মিঠান মিড়মিড় মিতবর মিতা মিনতি মিনা মিনাহ্ মিরগেল মিল্ মিলন মিলা মিলান মিলাপ মিস মিসমিসিআ মিসান মিসাল মিসি মিহি মিহিদানা মুআ মুই মুখড় মুখাহার মুখস মুগ মুগা মুগি মুগুর মুচ্‌লকা মুচি মুছ মুছলন্দ মুছলম্ মুছা মুছান মুছি মুচ্ছদ্দি মুট মুটমুট মুটরি মুটিআ মুঠা মুঠি মুঠুম মুড় মুড়ন মুড়মুড় মুড়মুড়িআ মুড়া মুড়ান মুড়ি মুত মুতফরকা মুতা মুতান মুথা মুদাম মুদ্দাই মুদ্দার মুদ্দারফরাস মুনফা মুনসি মুনসিআনা মুনসিগিরি মুনসেফ মুনসেফি মুনসিবি মুনিস মুরগি মুরব্বি মুরব্বিগিরি মুরব্বিআনা মুল মুলন মুলতবি মুলতানি মুল মুলান মুলুক মুলুকজোড়া মুসব্বর মুসলমান মুসলমানি মুসাবিদা মুসুর মুহরি মুহুরি মুহুরিআন মুহুরিগিরি মেক মেকদার মেকনি মেচকফের মেজ মেজ-মেজিআ মেজর্ষর মেজর্ষরি মেজাজ মেজাজি মেজাজঠাণ্ডা মেজাম মেজিস্ট্রেট মেজে মেটে মেটেনি মেড় মেড়া মেড়ে মেথর মেথরগিরি মেথরানি মেথি মেদা মেদামারা মেনা মেম মেয়ে মেরামত মেরিনো মেল মেলবন্ধ মেলবন্ধন মেলা মেলানি মেস মেসক মেহনত মেহনতি মেহেরবান মেহেরবানি মৈ মৌআ মোক্তার মোক্তারনামা মোক্তারি মোকাম মোকামি মোচা মোছা মোজা মোট মোটা মোড় মোড়া মোড়াই মোড়ান মোড়াসা মোতি মোতিহারি মোনা মোনাকাটা মোনাসিব মোফ্‌ত মোম মোমজামা মোরগ মোরব্বা মোলাহিজা মোসাফির মোসাহেব মোসাহেবি মোহনভোগ মোহর মোহানা মৌজা মৌজদার মৌত মৌতা।

র

রআ রকম রকমওআরি রগ রগড় রগড়া রগড়ারগড়ি রগড়ানি রঙ রঙওয়ালা রঙচঙ রঙচঙিয়া রঙদার রঙন রঙান রঙিন রঙিল রঙ্‌আ রচ্ রচা রচান রট রটনা রটা রটান রটানিআ রতন রতি রদ রদা রদি রনকুআসা রপ্‌ট রপটন রপটান রপটানি রপ্‌তানি রপ্ত রফা রফিয়ত্ রবরবা রবার রবাহুত রম রমজান রমারম রমলা রস্ রসকরা রসগোল্লা রসবড়া রসভড়া রসমরা রসা রসান রসানিআ রসাল রসি রসিদ রসুই রসুইআ রসুন রাই রাইঅত রাইঅতি রাখ রাখন রাখা রাখান

রাখারাখি রাখাল রাখালি রাখি রাগ রাগত রাগিণী রাগী রাঘব রাঙ রাঙচিতা রাঙচাল রাঙতা রাঙা রাঙান রাঙানি রাজ রাজকর রাজগদি রাজঘরানা রাজযোটক রাজডঙ্কা রাজতক্ত রাজদূত রাজদ্বার রাজি রাজিনামা রাঢ় রাঢ়িয় রাতি রাতিকানা রানী রান্না রান্নাঘর রাসি রাহা রাহাগির রাহাজানি রাঁড় রাঁড়ি রাঁধ রাঁধনি রাঁধনিআ রাঁধা রাঁধান রাঁধাবাড়া রিকাবি রিগিড় রিগিড়িআ রিঙ রিজ্ রিজান রিঠা রিফু রিফুগর রিম রিস রিসারিসি রিহাই রুআ রুআন রুই রুইদাস রুকিশ রুখ্ রুখা রুগনি রুগি রুচ্ রুচা রুচি রুটি রুটিওআলা রুনুঝুনু রুনুরুনু রুপদস্তা রুপস রুপসি রুপা রুমাল রুমালি রুল রুলি রুসুম রুসুম রেও রেক রেকাব রেজকি রেজা রেড়ি রেত রেতি রেয়ত রেয়তি রেয়ো রেল রেলওএ রেলরোড রেসবত রেসবতখোর রেসম রেসসি রেসারেসি রেহাই রেহাইখোর রোআ রোআন রোআনি রোক রোখ রোখা রোখারোখি রোখাল রোগা রোজ রোজগার রোজগারি রোজনামা রোজনামাজ রোজা রোজান রোজানি রোজানিআ রোড়া রোদ রোয়দাদ রোয়দাদি রোল রোলা রোসনাই রোঁ রোঁআ রোঁদ।

ল

লওআ লওআন লওজিমা লক লকলক লকলকিআ লগন লগা লগি লঙ লঙ্কা লচপচিআ লজ্জত লটঘটি লড়াই লড়াক লত লতানিআ লহর লহরা লহরান লাই লাউ লাক লাকপতি লাগ লাগা লাগান লাগানি লাগাপাড়া লাগাম লাগাল লাগালাগি লাঙল লাজ লাজুক লাট লাটবন্দি লাটিম লাটুদার লাঠালাঠি লাঠি লাঠিআল লাঠিআলি লাড়ু লাথ লাথি লাথিখোর লাফ লাফান লাফানি লাফানিআ লালচ লালচি লালচিআ লালবন্দ লালায়িত লালমোহন লালা লাস লাহুড়ি লিচু লুচি লুচ্চা লুচ্চামি লুট লুটতরাজ লুটতরাজি লুটপাট লুড়ি লেখা লেখাপড়া লেঠা লেন লেনদেন লেপ লেপা লেপান লেবু লেস লোআ লোআচুর লোকলৌকতা লোকালয় লোচ্চা লোচ্চামি লোটা লোড়া লোড়াঙিআ লোনা লোহা লোহচুর লৌকতা লৌকিকতা।

শ

শশব্যস্ত

স

সই সইস সওআ সওআন সওগাত সওদা সওদাগর সওদাগরি সকরকন্দ সকাল সখ সঙ সঙিন সঙ্গে সচ্ছল সজনি সজাগ সজারু সজিনা সড় সড়ক সড়কিআ সড়সড় সড়সড়ান সড়সড়ানি সড়সড়ি সড়সড়িআ সড়ুঙ্গিআ সতর সতরই সতরঞ্চ সতরঞ্চি সত্তর সদর সদরি সদ্দার সদ্দারি সদাজাগ সন সনন্দ সনসন সনসনানি সনসনি সনসনিআ সনাক্ত সঞ্চ সন্দ সন্দেস সপ সপন সপনাস্তা

সপাসপ সপিসা সফর সফেদ সফেদা সব সবজি সবলোট সবা সবুজ সবুর
সমন সম্বিস্তারে সয়তান সয়তানি সয়াল সর সরকার সরকারি সরগি সরজ সরা
সরাই সরান সরাসর সরাসরি সরিক সরিকানা সরিকানি সরিপ সরিকা সরিষা
সরু সরুকুটিআ সরুঙ্গিআ সরেস সল সলন সলা সলি সলুই সসা সসাজ
সসেমিরা সস্তা সহ সহজ সহর সহরতলি সহরিআ সহা সহান সহি সহিস সংস্থা
সংস্থান সঁপ সঁপা সাঅড়া সাইত সাউকর সাউকরি সাউড়ি সাএব সাএবি
সাএর সাকিম সাগ সাগু সাঙড় সাঙড়া সাঙড়ান সাঙা সাজ সাজন্ত সাজা
সাজান সাজানি সাজি সাট সাড় সাড়া সাড়ি সাড়ুভাই সাড়ে সাত সাতচল্লিশ
সাতনর সাতনরি সাতনালা সাতসাট্ট সাতা সাতাইস সাতাস সাতান্ন সাতাত্তর
সাতাশী সাতানব্বই সাতু সাথ সাথি সাদা সাদের সাধ সাধা সাধান সাধাসাধি
সাধে সান সানক সানকি সানা সানাই সানান সাপ সাপট সাপুড়িআ সাফ
সাফা সাফাই সাবর সাবান সাবালগ সাবাস সাবাসি সাবু সাবুদ সাবুদানা
সাবেক সামনে সামল সামলা সামলান সামাই সামাল সামি সামুক সায় সায়ের
সার সারকুড় সারা সারান সারানি সারাল সারি সারিন্দা সাল সালতামামি
সালন সালা সালাজ সালি সালিআনা সালিক সালিপতি সালিপো সালু সালুক
সাস সাসা সাসান সাসানি সাসি সাসুড়ি সাসুড়িআ সাহা সাহেব সাহেবগিরি
সাহেবি সাঁইত্রিশ সাঁক সাঁকআলু সাঁকার সাঁকারা সাঁকারান সাঁখ সাঁখচুন্নি সাঁখা
সাঁখারি সাঁচা সাঁচি সাঁঝ সাঁঝানি সাঁঝুতি সাঁড় সাঁড়াসি সাঁতল সাঁতলন সাঁতলা
সাঁতলান সাঁপি সাঁপ সাঁসাল সিআ সিআখত সিআখতি সিআন সিআনা সিআমন্তি
সিআল সিউ সিউর সিউরা সিউরান সিউলি সিকড় সিকড়িআ সিকল সিকলি
সিকা সিকার সিকারি সিকি সিকিম সিখ সিখা সিখান সিঙ সিঙাড়া সিঙ্গার সিঙ্গি
সিঙ্গ সিঙ্গান সিঙ্গিল সিড়সিড় সিড়সিড়ান সিড়সিড়ানি সিড়ি সিধা সিন্দুক সিপ
সিপি সিম সিমানা সিমুল সিয়া সিয়াখত সিয়াখতি সির সিরখারা সিরপা সিরপেঁচ
সিল সিলন সিলাই সিলান সিস সিসা সিসি সিসু সিহর সিহরন সিহরা সিহরান
সিঁধ সিঁধিআল সিঁধিআলি সীতাভোগ সুঅর সুআ সুআন সুআর সুক সুকড়
সুকন সুকনি সুকরুখা সুকা সুকান সুক্তা সুক্তানি সুগড় সঙ সুঙল সুজ সুজা
সুজি সুড়ঙ্গ সুড়ি সুত সুতলি সুতা সুতার সুদ সুদখোর সুদি সুদ্দ সুধ সুধর
সুধরা সুধরান সুধান সুধু সুন্নি সুপারি সুপারিস সুপারিসি সুবচনি সুবদনি
সুবা সুবাদার সুবাদারি সুবাস সুম সুমর সুমরণ সুমরা সুমরান সুরকি সুরথ
সুরট সুরতি সুরথাল সুরব সুল সুলন সুলি সুলুপ সুসঙ্গ সুসাত সুসার সুসুক
সুঁট সুঁটী সুঁড় সুঁড়ি সুঁদরি সে সেই সেউ সেক সেকরা সেকরানি সেকা
সেকাইত সেকাইতি সেকান সেখ সেখা সেখান সেগুন সেঙা সেঙাত সেঙাতনি
সেজ সেজতুলানি সেজা সেজান সেট সেটারা সেতখানা সেতার সেতারি সেদ সেন
সের সেরা সেল সেলাই সেলাখানা সেলাম সেহা সেঁকুআ সেঁকুল সেঁত সেঁতসেঁতিআ
সেঁতা সেঁতনি সোআ সোআগ সোআগা সোআগি সোআগিআ সোআন

সোআনিআ সোআর সোআরি সোথ সোদ সোদরা সোদরান সোনা সোনাল সোনালি সোর সোল সোলুই সোসর সোহাগ সোহাগা সোহাগি সোহাগিআ সোহাগিনি সোঁতা সোঁদা সোঁদাল।

হ

হক হকদার হকনাহক হকিঅত হকিঅতি হকিকত হকুক হঙ্গাম হঙ্গামিআ হজরত হজুর হট হটহট হটা হটান হড় হড়হড় হড়হড়ানি হড়হড়ি হড়হড়িআ হদ্দ হনহন হনহনিআ হন্দর।

বিভিন্ন গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'

ঋজুপাঠ ॥ প্রথম ভাগ

বিজ্ঞাপন

ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। ইহাতে পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যান ও মহাভারতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গিয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া ইহার রচনা অতি সরল। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ সরল গ্রন্থ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নিমিত্ত, যাহারা প্রথম সংস্কৃত প'ড়িতে আরম্ভ করে পঞ্চতন্ত্র তাহাদিগের অতি উপযুক্ত পুস্তক। কিন্তু, মধ্যে মধ্যে অনেক দীর্ঘ সমাস আছে, অনেক অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে, এবং কয়েকটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। ইহাতে, অধুনাতন গ্রন্থের ন্যায়, রচনার মাধুর্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য নাই। অধিকন্তু, লিপিকরপ্রমাদবশতঃ স্থানের স্থানের পাঠ এমত অপভ্রংশিত হইয়াছে যে অর্থবোধ ও তাৎপর্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। এরূপ গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করা অনাবশ্যক ও অবিধেয় বোধ হওয়াতে, কয়েকটি উপাখ্যান মাত্র পরিগৃহীত হইল। অল্পবয়স্ক বালকদিগের অধ্যয়নোপযোগী করিবার নিমিত্ত ঐ কয়েকটি উপাখ্যানেরও কোন কোন অংশ পরিবর্জিত ও কোন কোন অংশ পরিবর্তিত হইল। মহাভারতেরও যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহারও কোন কোন ভাগ পরিত্যাগ ও কোন কোন স্থানে পরিবর্ত করা গিয়াছে।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
সংবৎ ১৯০৮। ১লা অগ্রহায়ণ। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

•

ঋজুপাঠ ॥ দ্বিতীয় ভাগ

বিজ্ঞাপন

ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইল। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, রামায়ণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই প্রাচীন গ্রন্থ মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কোন কোন আলঙ্কারিকেরা রামায়ণকে মহাকাব্যমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কাব্যের যে সকল লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদায় কালিদাসাদিপ্রণীত রঘুবংশাদি অপেক্ষাকৃত নব্য কাব্যগ্রন্থ-সমূহে যেরূপ লক্ষিত হয়, প্রাচীন কাব্য রামায়ণে সেরূপ লক্ষিত হয় না। বাল্মীকিকাব্যে পৌনরুক্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতি বিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি কতিপয়

গুরুতর দোষ আছে। যাহা হউক, অনায়াসে এই নির্দেশ করা যাইতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় এরূপ প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট পদ্যগ্রন্থ আর নাই। রামায়ণের মধ্যে অযোধ্যাকাণ্ডের রচনা যেরূপ চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী, অন্যান্য কাণ্ডের রচনা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগে অযোধ্যাকাণ্ডের কতিপয় উৎকৃষ্ট অংশ সঙ্কলিত হইল। সঙ্কলিত অংশ সকলের কোন কোন ভাগ অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
২২এ ফাল্গুন। সংবৎ ১৯০৮ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

ঋজুপাঠ ॥ তৃতীয় ভাগ

বিজ্ঞাপন

ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার এই কয়েক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল। এই সকল গ্রন্থের যে যে স্থান উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাদের কোনও কোনও ভাগ এক বারেই পরিত্যক্ত ও কোনও কোনও ভাগ কিয়দংশে পরিবর্তিত হইয়াছে।

হিতোপদেশকর্তা গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পঞ্চতন্ত্র ও অন্য এক গ্রন্থ হইতে আপন গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। বাস্তবিক, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের প্রতিরূপস্বরূপ। পঞ্চতন্ত্রের গুণ ও দোষের অধিকাংশই হিতোপদেশে লক্ষিত হয়। বিশেষ এই পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা হিতোপদেশের রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ় এবং প্রস্তুত বিষয়ের বৈশদ্য অথবা দৃঢ়ীকরণ বাসনায়, নানা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, দৃষ্টান্ত ও উদাহরণস্বরূপ উত্তম উত্তম শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকর্তার সম্যক্ সহৃদয়তার অসদ্ভাবপ্রযুক্ত, অনেক স্থলেই উদ্ধৃত শ্লোক সকল অসংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। তত্তৎ স্থলে প্রকৃত বিষয়ের সহিত ঐ সকল শ্লোকের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিতোপদেশকর্তা বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। (১) কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটি আদিরসঘটিত অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। অতএব, আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি প্রকারে গ্রন্থকর্তার ঐরূপ অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্তি হইল। কোন্ ব্যক্তি হিতোপদেশ রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি। অনেকে বিষ্ণুশর্মাকে হিতোপদেশ-কর্তা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ নাই। হিতোপদেশ চারি অংশে

১। কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।
হিতোপদেশ॥

বিভক্ত ; মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি। তন্মধ্যে মিত্রলাভপ্রকরণমাত্র এই পুস্তকে পরিগৃহীত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত গ্রন্থ ; পাঠমাত্রেই অর্থপ্রতীতি হয়। পুরাণের যে পাঁচ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, (২) বিষ্ণুপুরাণ সেই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত। এই পুরাণ অন্যান্য যাবতীয় পুরাণ অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য পুরাণের ন্যায়, ইহাতে অপ্রাকরণিক কথা নাই। সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের রচনা প্রাচীন বোধ হয়। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন যে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পাঠ করিলে, এই তিন গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রতীতি হওয়া দুষ্কর। বিষ্ণুপুরাণ সর্বাংশে উৎকৃষ্ট বটে ; কিন্তু ইহাতে বালকদিগের পাঠোপযোগী বিষয় অধিক নাই। যে কয়েক স্থান প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী বোধ হইয়াছিল, তাহা পরিগৃহীত হইয়াছে।

মহাভারত বেদব্যাসবিরচিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে ; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সহিত মহাভারতের রচনার এত বিভিন্নতা যে যিনি বিষ্ণুপুরাণ, কিংবা ভাগবত, অথবা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচিত বোধ হয় না। মহাভারত পুরাণ-মধ্যে পরিগণিত নহে। ইহাকে ইতিহাস কহে। ইহাতে পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর, নানা রাজবংশ এবং নানাবংশীয় নরপতিগণের চরিতকীর্তন থাকে। মহাভারতে এক নির্দিষ্ট রাজবংশের চরিত বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহাতে, আনুষঙ্গিক, নানা পৌরাণিক বিষয়ও সঙ্কলিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের রচনা যেরূপ প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত, মহাভারতের সেরূপ নয়। আবৃত্তিমাত্র সকল স্থলের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। অনেক স্থল এরূপ দুরূহ অথবা অস্পষ্ট যে কোনও ক্রমেই অর্থপ্রতীতি হয় না। মহাভারতে নীতিগর্ভ ও হিতোপদেশঘটিত প্রস্তাব অনেক আছে। তন্মধ্যে আদি ও বন পর্ব হইতে কয়েকটি পরিগৃহীত হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত ইহাতে এত উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আছে যে সমস্ত উদ্ধৃত করিলে, একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারে।

ভট্টিকাব্যে রামের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকর্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম-নির্দেশ করেন নাই। প্রামাণিক টীকাকার জয়মঙ্গল কহেন, এই কাব্য বলভীনগর-নিবাসী ভট্টিনামক কবির রচিত। এবং ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও, ইহাই সম্যক্ প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু অধুনাতন টীকাকার ভরতমল্লিক, আপন মতের প্রতিপোষক প্রমাণপ্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভট্টিকাব্যকে ভর্তৃহরিপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভর্তৃহরি, ও এই কাব্যের রচয়িতা, উভয়েই অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ ছিলেন ; বোধ হয়, এই সাদৃশ্য

২। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

দর্শনেই ভরতমল্লিকের এই ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে ভর্তৃহরি স্বয়ং রাজা ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন তিনি, অমুক রাজার রাজধানীতে থাকিয়া আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম, আপন গ্রন্থে কদাচ এরূপ নির্দেশ করেন না। (৩) ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর; বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে শরদ্বর্ণনা আছে, তাহা এমন মনোহর যে তদ্দ্বারা গ্রন্থকর্তার অসামান্য কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্তার যেরূপ উদ্দেশ্য, কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করা তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্ত ভট্টিকাব্যের অধিকাংশই অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। ফলতঃ, ভট্টিকাব্য কোনও মতেই উৎকৃষ্টকাব্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই কাব্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গ মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।

ঋতুসংহার অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের রসময়ী লেখনীর মুখ হইতে বহির্গত। এই উৎকৃষ্ট কাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। এক এক সর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির, বসন্ত ছয় ঋতু বর্ণিত হইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলঙ্কার, ঋতুসংহার প্রায় আদ্যোপান্ত তাহাতে অলঙ্কৃত। কিন্তু রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি কতিপয় অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়; স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের তাদৃশ মনোরম বোধ হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ঋতুসংহারকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলেন না। কেহ কেহ এই উৎকৃষ্ট কাব্যকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশী এই সকল সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। ঋতুসংহার, রঘুবংশাদি হইতে অনেক অংশে ন্যূন বটে। কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কারবিবর্জিত ও সহৃদয়পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া অভিনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে, ঋতুসংহারে সেই সমস্ত গুণের সমুদয় লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ঋতুসংহারে যেমন অনেক অসাধারণ গুণ আছে, তেমনই এক অসাধারণ দোষও আছে। ঋতুসংহারের অধিকাংশই আদিরসঘটিত। বিশেষতঃ, হিম, শিশির, বসন্তবর্ণনা আদিরসে এত পরিপূর্ণ, যে এই তিন সর্গ কোনও ক্রমেই বালকদিগের পাঠযোগ্য নহে। এই নিমিত্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ বর্ণনা মাত্র এই পুস্তকে পরিগৃহীত হইল। এই তিন সর্গেরও আদিরসঘটিত শ্লোক সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বেণীসংহারনাটক ভট্টনারায়ণবিরচিত। এরূপ কিংবদন্তী আছে, আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ হইতে গৌড়দেশে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের

৩। কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলাভ্যাং
শ্রীধরসূনুনরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্তিরতো ভবতাং নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥ ২২ সর্গ ৩৫ শ্লোক।

একজন। এই নাটক নাটকের সমুদয়লক্ষণাক্রান্ত। সাহিত্যদর্পণে নাটকপরিচ্ছেদে নাটকসংক্রান্ত বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শনার্থে বেণীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য কোনও নাটক হইতে তত নহে। কিন্তু এই নাটকের রচনা প্রাচীন কবিদিগের রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। ভট্টনারায়ণ নাটকের নিয়ম যত প্রতিপালন করিয়াছেন, কবিত্বশক্তি তত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বেণীসংহার, নাটকের সমুদয়লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, কাব্যাংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী, উত্তরচরিত প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ন্যূন। নাটকে সংস্কৃত ভিন্ন প্রাকৃত, পৈশাচী, রাক্ষসী প্রভৃতি অনেক ভাষা থাকে। সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ না হইলে, সে সকল ভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় না। এই নিমিত্ত, বেণীসংহারের যে অংশে ঐ সকল ভাষার সংস্রব নাই, তাহাই ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগে উদ্ধৃত করা গিয়াছে।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১৬ই পৌষ ; সংবৎ ১৯০৮।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা

বিজ্ঞাপন

কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে, সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে, বিদ্যার্থিগণ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আদ্যন্ত এবং ধাতুপাঠ, অমরকোষ ও ভট্টিকাব্যের কিয়দংশ পাঠ করিয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হয় ; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় তাদৃশী ব্যুৎপত্তি জন্মে না। এই নিমিত্ত, ছাত্রেরা, যখন সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে, উত্তম উত্তম কাব্যের প্রকৃত রূপে অর্থবোধ ও ভাবগ্রহ করিতে পারে না। বাস্তবিক, ব্যাকরণশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ও অগ্রে সহজ সহজ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট না হইলে, কোনও ক্রমেই উৎকৃষ্ট কাব্যনাটকাদি গ্রন্থের অধ্যয়নে অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, অমরকোষ ও ভট্টিকাব্যের কিয়দংশমাত্র পাঠ করিয়া ব্যাকরণশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ও সংস্কৃত ভাষায় অধিকারী হওয়া কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দুরূহ ; অল্পবয়স্ক বালকদিগের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে। যাহারা প্রথম অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে তাহারা গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে ও তাৎপর্যগ্রহ করিতে কোনও ক্রমেই সমর্থ হয় না ; অধ্যাপকের মুখে যাহা শুনে তাহাই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। বিশেষতঃ, বিলক্ষণ রূপে আদ্যন্ত মুগ্ধবোধ পাঠ করিলেও সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মে না। অনেক স্থলে এ রূপে লিখিত হইয়াছে যে সহজে তাৎপর্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। সেই সেই স্থলে টীকাকারদিগের সাহায্য

আবশ্যক। কিন্তু যে সকল মহাশয়েরা মুগ্ধবোধের টীকা লিখিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। সুতরাং ব্যাকরণের যথার্থমতগ্রহ-বিরহে, অনেক স্থলেই, স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দ্বারা অসম্বদ্ধ অপ্রামাণিক অর্থ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

মুগ্ধবোধব্যবসায়ীরা মুগ্ধবোধশব্দের দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকেন। তদনুসারে এই দুই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। এক অর্থ এই যে, মুগ্ধবোধপাঠে ব্যাকরণে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মে। দ্বিতীয় এই যে, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মূঢ়জনেরও সম্যক্ ব্যাকরণজ্ঞান জন্মে।* কিন্তু এই দুই কথাই অলীক ও অপ্রামাণিক। মুগ্ধবোধব্যবসায়ীরা, ব্যাকরণ মাত্র পাঠ করিয়া, ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন না এবং অত্যন্ত সুবুদ্ধি না হইলে মুগ্ধবোধে বোধাধিকার হয় না। ফলতঃ মুগ্ধবোধের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনে যাদৃশ পরিশ্রম ও কষ্ট, কোনও ক্রমেই তদনুযায়ী ফললাভ হয় না।

ধাতুপাঠ ও অমরকোষ সম্যক্ রূপে অর্থসঙ্কলনপূর্বক, আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিলে, অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যয়নকালে শব্দার্থপরিজ্ঞানবিষয়ে আনুকূল্য হয় যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ দুই গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিতে যেরূপ আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, ঐ আনুকূল্যে তদনুরূপ উপকার বোধ হয় না। বরং ঐ গ্রন্থদ্বয় কণ্ঠস্থ করিতে যে সময় যায় ও যে পরিশ্রম হয়, সেই সময় ও সেই পরিশ্রম, বিবেচনাপূর্বক বিষয়বিশেষে নিয়োজিত হইলে, তদপেক্ষা অনেক অংশে সমধিকফলোপধায়ক হইতে পারে।

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়েরা মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ, অমরকোষ এই গ্রন্থ ত্রিতয়ের পাঠনা রহিত করিয়া সিদ্ধান্তকৌমুদী অধ্যয়নের আদেশ-প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় যত ব্যাকরণ আছে, সিদ্ধান্তকৌমুদী সর্বোৎকৃষ্ট। সিদ্ধান্তকৌমুদী আদ্যন্ত পাঠ হইলে, ব্যাকরণের অবশ্যজ্ঞেয় কোনও কথাই অপরিজ্ঞাত থাকে না।

ব্যাকরণপাঠ না হইলে সংস্কৃত ভাষায় অধিকার হয় না; কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং, যাহারা প্রথম ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করে, তাহারা অধীয়মান গ্রন্থের অর্থবোধ ও তাৎপর্যগ্রহ করিতে পারে না। সেই নিমিত্ত, সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিতে এত সময় নষ্ট ও এত কষ্ট হয়। বিশেষতঃ, সংস্কৃত কালেজে যাহারা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে তাহারা নিতান্ত শিশু; শিশুগণের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণপাঠ কোনওক্রমেই সহজ ও সুসাধ্য নয়। যাঁহারা ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে অত্যন্ত উৎসুক ও অত্যন্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অত্যন্ত দুরূহ ও অত্যন্ত নীরস বলিয়া সাহস করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

---

* মুগ্ধঃ সুন্দরো বোধো জ্ঞানং ভবত্যস্মাদিতি, মুগ্ধান্ মূঢ়ান বোধয়তীতি বা মুগ্ধবোধম্।

বস্তুতঃ, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভাষা উভয়ের পরস্পরসাপেক্ষতা থাকাতেই সংস্কৃতভাষাশিক্ষা এরূপ দুরূহ হইয়া রহিয়াছে।

প্রথমেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ, এবং ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াই এক বারে রঘুবংশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য পড়িতে আরম্ভ করা কোনও ক্রমেই শ্রেয়স্কর বোধ না হওয়াতে, শিক্ষাসমাজের সম্মতিক্রমে এই নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে ; ছাত্রেরা, প্রথমতঃ অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ, ও অতি সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ, পাঠ করিবেক ; তৎপরে সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ বোধাধিকার জন্মিলে, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ও রঘুবংশাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেক। তদনুসারে সরল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণসঙ্কলন ও দুই তিনখানি সহজ সংস্কৃত পুস্তক প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, প্রথম পাঠার্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা নামে এই পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল।

এই গ্রন্থে অল্পবয়স্ক বালকদিগের প্রথমশিক্ষোপযোগী স্থূল স্থূল বিষয় সকল সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিবেক না যথার্থ বটে ; কিন্তু উপদেশসাপেক্ষ হইয়া সহজ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সহজে অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা জন্মিবেক, সন্দেহ নাই ; এবং ইহাই এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার মুখ্য তাৎপর্য। প্রায় সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরেই মুদ্রিত ; বাস্তবিকও যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরেই মুদ্রিত ও অনুশীলিত হওয়া উচিত। এই নিমিত্ত বালকদিগের দেবনাগর অক্ষরপরিচয় অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই পুস্তকের শেষে, সহজে উক্ত অক্ষর পরিচয়ের উপায় বিধান করা গিয়াছে। আর হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার, বেণীসংহার এই কয়েক গ্রন্থ হইতে বালকদিগের পাঠোপযোগী অংশ সকল সঙ্কলন করিয়া ঋজুপাঠ নামে তিনখানি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত মুগ্ধবোধ অথবা লঘুকৌমুদীতে ব্যাকরণের যত বিষয় লিখিত আছে, সেই সমুদয় বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলন করিয়া অতি ত্বরায় ব্যাকরণ-কৌমুদী নামে আর একখানি পুস্তক প্রস্তুত করা যাইবেক।

সংস্কৃত কালেজে প্রথম প্রবিষ্ট ছাত্রেরা প্রথম বৎসরে অগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা পাঠ করিয়া ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ পাঠ করিবেক। দ্বিতীয় বৎসর, ব্যাকরণকৌমুদী ও ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ। এই সকল পাঠ করিয়া, ব্যাকরণে এক প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, এবং সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবেশ হইলে, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে সিদ্ধান্তকৌমুদী, ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ এবং রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব পাঠ করিবেক। এইরূপে চারি পাঁচ বৎসরে ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ভাষাতেও বিলক্ষণ বোধাধিকার জন্মিতে পারিবেক।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
সংবৎ ১৯০৮। ১লা অগ্রহায়ণ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

VYAKARANA-KAUMUDI
OR
Outlines of Sanskrit Grammar
Part IV
The Sanskrit Press
1862

বিজ্ঞাপন

ব্যাকরণকৌমুদীর শেষভাগ প্রচারিত হইল। এই ভাগে নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। অনেকে ব্যাকরণকৌমুদীতে সংস্কৃত সূত্র দিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করেন। ঐ অনুরোধের তাৎপর্য এই যে বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত সূত্র অপেক্ষা অল্পাক্ষরগ্রথিত সংস্কৃত সূত্র অনায়াসে অভ্যাস করা ও স্মরণ রাখা যাইতে পারে। তাঁহাদের অনুরোধ যুক্তিযুক্ত বোধ হওয়াতে এই ভাগে সংস্কৃত সূত্র সন্নিবেশিত হইল এবং ঐ হেতুবশতঃ পূর্ব তিন ভাগেও ক্রমে ক্রমে এই প্রণালী অবলম্বিত হইবেক। সকল সূত্র নূতন সঙ্কলিত নহে, অনেক স্থলে পাণিনিপ্রণীত সূত্র অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

কলিকতা
সংবৎ ১৯১৮। ২০এ মাঘ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

THE MEGHADUTA
by
KALIDASA
with
THE COMMENTARY OF MALLINATHA
1869

মেঘদূতম্

মেঘদূত ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত। কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদে যথার্থ অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য,

সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কোনও দেশের কোনও কবি, কালিদাসের ন্যায় সর্ব বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।

২। কালিদাস যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, স্বপ্রণীত কাব্যসমূহে সেই শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তদীয়গ্রন্থপাঠে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়কন্দর অনির্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। বর্ণনার চাতুর্য ও রচনার মাধুর্য বিষয়ে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তদীয় বর্ণনা পাঠ করিয়া মোহিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। তদীয় রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি, এ উভয়ের একত্র সংঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্তই, ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

৩। অদ্বিতীয় গুণগ্রাহী নিরতিশয় বিদ্যোৎসাহী বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়জন অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি নবরত্ন নামে সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে কালিদাস সর্বপ্রধান রত্ন ছিলেন। চিরস্মরণীয় উজ্জয়িনীপতি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, উহার নাম সংবৎ। অদ্য সংবতের ১৯২৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইল। সুতরাং কালিদাস উনবিংশতি শত বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

৪। কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ, অত্যন্ত স্ত্রৈণতাবশতঃ, আপন কর্মে অবহেলা করাতে, তিনি তাহাকে এই অভিশাপ দেন, তোমায় একাকী এক বৎসরকাল রামগিরিতে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তদনুসারে সে, অলকা হইতে নির্বাসিত হইয়া, রামগিরিতে আট মাস বাস করিয়া, স্বীয় প্রিয়ার অদর্শনদুঃখে উন্মত্তপ্রায় হয়। পরিশেষে, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, নভোমণ্ডলে অভিনব মেঘের আবির্ভাব দেখিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার নিমিত্ত, মেঘকে সচেতনবোধে সম্বোধন করিয়া, তৎসমীপে দৌত্যভারগ্রহণ প্রার্থনা জানাইল এবং রামগিরি হইতে আপন আলয় পর্যন্ত পথনির্দেশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল।

৫। কালিদাস, যক্ষের পথনির্দেশ উপলক্ষে, এই খণ্ডকাব্যে নানা গিরি, নদী, গ্রাম, নগর, জনপদ, দেবালয়, রাজধানী, হিমালয়, কৈলাস, অলকা, যক্ষের আলয় ইত্যাদির, এবং পরিশেষে যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন। এই সমস্ত বর্ণনে এরূপ কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূতব্যতিরিক্ত আর কোনও কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া সর্বত্র অঙ্গীকৃত হইতেন।

৬। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা, বারাণসী ও মুম্বয়ী নগরে মেঘদূত মল্লিনাথকৃতসঞ্জীবনীটীকাসহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ তিনখানি ও কলিকাতায়

সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়স্থিত হস্তলিখিত একখানি, চারি পুস্তকের মেলন করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত হইল। সঞ্জীবনীর স্থানে স্থানে পাঠের এরূপ বৈকল্য ঘটিয়াছে যে যদিও সংশোধনবিষয়ে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই, তথাপি ঐ সকল স্থল প্রকৃত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। কতিপয় স্থল নিতান্ত অশুদ্ধ ও অসংলগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে।

৭। অনেকেই সংস্কৃত কাব্যের ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যপ্রকাশ বা সহৃদয়তাপ্রদর্শন বিষয়ে মল্লিনাথের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না। বস্তুতঃ, মল্লিনাথ কাব্যব্যাখ্যাবিষয়ে অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি অভ্রান্ত পুরুষ ছিলেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভ্রম ও প্রমাদ লক্ষিত হইয়া থাকে। মেঘদূত-ব্যাখ্যার যে যে স্থলে তাদৃশ দোষস্পর্শ ঘটিয়াছে তাহা এই পুস্তকের শেষ ভাগে দর্শিত হইল।

৮। মল্লিনাথের সঞ্জীবনীর ন্যায় মালতী, সুবোধা, সঙ্গতা, মুক্তাবলী, সৌদামিনী ও তাৎপর্যদীপিকা নামে মেঘদূতের আর ছয়খানি টীকা আছে। তন্মধ্যে মালতী কল্যাণমল্লপ্রণীত, সুবোধা ভরতমল্লিকরচিত, সঙ্গতা হরগোবিন্দ বাচস্পতিকৃত, মুক্তাবলী রামনাথতর্কালঙ্কারসঙ্কলিত, সৌদামিনী মকরন্দভট্টাচার্যলিখিত, তাৎপর্য-দীপিকা সনাতনগোস্বামিবিরচিত। এই ছয় টীকার মধ্যে মালতী ও সুবোধা অনেক অংশে প্রশংসনীয়; কিন্তু সঞ্জীবনী অপেক্ষা সর্বতোভাবে নিকৃষ্ট।

৯। লিপিকরপ্রমাদ বা অন্যাদৃশ কারণ বশতঃ, মেঘদূতের অনেক স্থলে পাঠের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। ব্যাখ্যাকর্তাদিগের মধ্যে যিনি যে স্থলে যে পাঠ অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসমুদয় পাঠাদিবিবেকে সবিস্তর প্রদর্শিত হইল। (১) তন্মধ্যে মল্লিনাথের অবলম্বিত পাঠ অধিক স্থলেই সমীচীন; কিন্তু কোনও কোনও স্থলে অন্যান্য ব্যাখ্যাকর্তাদিগের অনুমোদিত পাঠ সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তদ্ব্যতিরিক্ত, পুস্তকবিশেষে যে যে পাঠান্তর লক্ষিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ও তত্তৎস্থলে উদ্ধৃত হইল।

১০। পাঠবৈলক্ষণ্যের ন্যায়, মেঘদূতে শ্লোকসংখ্যারও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত কালেজের পুস্তকে ১১৬, কলিকাতামুদ্রিত পুস্তকে ১১৮, বারাণসী-মুদ্রিত পুস্তকে ১২১, মুম্বয়ীমুদ্রিত পুস্তকে ১২৫, শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদয়ে শ্লোকসংখ্যা ১২৭। তন্মধ্যে ১১২টি শ্লোক সকল পুস্তকেই সন্নিবেশিত আছে, আর ১৫টি শ্লোকের মধ্যে কোনও পুস্তকে কোনও কোনও শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(১) পাঠাদিবিবেকমুদ্রিত হইলে পর, সৌদামিনী আমার হস্তে আইসে; এজন্য, পাঠভেদাদি-নির্দেশস্থলে মকরন্দের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হইবেক না। আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, সুবোধা, সঙ্গতা, মুক্তাবলী ও তাৎপর্যদীপিকার সহিত সৌদামিনীর বড় বিভিন্নতা নাই। ভরতমল্লিক প্রভৃতি যে স্থলে যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন ও যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মকরন্দও তত্তৎস্থলে প্রায়ই সেইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন ও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এরূপ সংখ্যাবৈলক্ষণ্যের কারণ এই বোধ হয়, কোন কোন ব্যক্তি, ক্ষমতাপ্রদর্শন-বাসনায়, দুই একটি শ্লোক রচনা করিয়া মেঘদূতে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই প্রক্ষেপক্রিয়া এক দেশে বা এক সময়ে সম্পন্ন হয় নাই; তৎপ্রযুক্তই, সকল পুস্তকে সমস্ত প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

১১। ১২৭ শ্লোকের মধ্যে কোন্ কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, তাহার নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ নহে। কালিদাসের রচনার এরূপ অসাধারণ বৈচিত্র্য আছে যে সহৃদয় ব্যক্তিরা, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশসহকারে মেঘদূত পাঠ করিলে, কোন্ কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত তাহা অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারেন। সংস্কৃত কালেজের পুস্তকে একটি, কলিকাতামুদ্রিত পুস্তকে তিনটি, বারাণসীমুদ্রিত পুস্তকে ছয়টি, মুম্ময়ীমুদ্রিত পুস্তকে সাতটি, শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ আছে। মেঘদূত পাঠ করিয়া আমার যেরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, তদনুসারে ১১০টি শ্লোক কালিদাসপ্রণীত, অবশিষ্ট ১৭টি তদীয় লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে।

১২। প্রক্ষিপ্তবর্গের মধ্যে দুই তিনটি শ্লোক রচনা বা ভাবসঙ্কলন বিষয়ে নিতান্ত নিন্দনীয় নয়, কিন্তু অবশিষ্টগুলির এরূপ কোন গুণ নাই যে তাহারা, কালিদাসগ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়া, তৎপ্রণীত বলিয়া সহৃদয়সমাজে পরিগৃহীত হইতে পারে। উহারা যথাসম্ভব পৌনরুক্ত্য, দূরান্বয়, কষ্টকল্পনা, ন্যূনপদতা, অধিকপদতা, অস্ফুটার্থতা, ব্যর্থবিশেষণতা প্রভৃতি দোষে আঘ্রাত। আমার বোধে যে যে শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, তাহা পাঠাদিবিবেকে প্রদর্শিত হইল।

কলিকাতা। **শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা**
সংবৎ ১৯২৫। ৩০এ চৈত্র।

UTTARACHARITA : A SANSKRIT DRAMA

by BHAVABHUTI

With Notes And Explanations for the use of Candidates

For

The First Examination in Arts of the Calcutta University

by ISWARACHANDRA VIDYASAGARA

1872

উত্তরচরিতম্

ভবভূতি ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান কবি। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দেশ, বোধ হয়, অসঙ্গত নহে। ভবভূতির সবিশেষ প্রশংসনীয় কতিপয় অসাধারণ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থে অর্থের যেরূপ ঔদার্য ও গাম্ভীর্য আছে, অন্যান্য কবির

গ্রন্থে প্রায় সেরূপ লক্ষিত হয় না। ভবভূতি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য কবির কাব্যে গিরি, নদী, অরণ্য প্রভৃতির প্রকৃতরূপ বর্ণনা নিতান্ত বিরল। অন্যান্য কবিরা অনাবশ্যক স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু ভবভূতি সে দোষে দূষিত নহেন। তিনি, অনাবশ্যক স্থলে, স্বীয় রচনাকে কদাচ আদিরসে কলুষিত করেন নাই; আবশ্যক স্থলেও আদিরসবর্ণনাকালে অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন অসাধারণ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই অসাধারণ দোষও লক্ষিত হইয়া থাকে। তদীয় কাব্যের অনেক স্থলে অনায়াসে অর্থগ্রহ হওয়া দুর্ঘট, এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে, যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসগ্রহ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে। নাটকে কথোপকথনস্থলে সেরূপ দীর্ঘ সমাস অবলম্বন অত্যন্ত দোষাস্পদ।

২। বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব এই তিনখানি নাটক ভবভূতিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে, বীরচরিত ভবভূতির প্রথম নাটক। বীরচরিতে বিবাহ অবধি রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বীররসাশ্রিত নাটক। এই নাটকে ভবভূতির কবিত্বশক্তি বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকিলে নাটক প্রশংসনীয় হয়, তৎসমুদয় অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় না। তথাপি, রামচরিতের এই অংশ লইয়া, অন্যান্য কবিরা যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, বীরচরিত তৎসর্বাপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই।

৩। উত্তরচরিত রামের রাজ্যাভিষেকের উত্তরকালীন চরিত অবলম্বনপূর্বক রচিত। রামচরিতের এই অংশ বাল্মীকিরামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নিবদ্ধ আছে। কিন্তু উত্তরচরিতে, অশ্বমেধীয় অশ্বনিরোধ উপলক্ষে, অশ্বরক্ষক রামসৈন্যের সহিত লবের যে যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে, রামায়ণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। এই বৃত্তান্ত পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড-রামাশ্বমেধপ্রকরণ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। উত্তরচরিত করুণরসাশ্রিত নাটক। এই নাটক কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর ও প্রগাঢ়। করুণরসবিষয়ে ভবভূতির উত্তরচরিত সংস্কৃতভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য। এই নাটকের পাঠসময়ে, সহৃদয় ব্যক্তিদিগকে অনেকস্থলে মোহিত হইতে, ও অশ্রুপাত করিতে হয়।

৪। মালতীমাধব আদিরসাশ্রিত নাটক। ভবভূতি এই নাটকে স্বীয় অসাধারণ কবিত্বশক্তির ও অসাধারণ রচনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং প্রস্তাবনাতে গর্বিত বাক্যে কহিয়াছেন, "যে কেহ আমার এই নাটকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে; তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়; আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোনও ব্যক্তি কালে উৎপন্ন হইতে পারেন, অথবা কোথাও বিদ্যমান আছেন; কারণ, কালের অবধি নাই, এবং পৃথিবী বহুবিস্তীর্ণা। (১) কিন্তু

---

(১) যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং। জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ॥
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা। কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

ভবভূতি, নাটকের উৎকর্ষসম্পাদনার্থে, যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং প্রস্তাবনাতে যেরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছেন ; তাঁহার মালতীমাধব, নাটকাংশে তত উৎকৃষ্ট হয় নাই।

এই গ্রন্থে রচনার বিলক্ষণ চাতুর্য ও মাধুর্য আছে, এবং অর্থেরও অসাধারণ গাম্ভীর্য আছে। সহৃদয় লোকে, মালতীমাধব পাঠ করিয়া, ভবভূতির কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিবেন ; কিন্তু ইহাকে অত্যুৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত হইবেন না। বোধ হয়, ভবভূতি স্বপ্রণীত নাটকত্রয়ের মধ্যে মালতীমাধবকে সর্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়াছিলেন ; কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই উত্তর-চরিতকে ভবভূতির সর্বোৎকৃষ্ট নাটক জ্ঞান করিয়া থাকেন। অর্থবোধের ব্যতিক্রম ও দীর্ঘসমাসঘটিত বাক্যবিন্যাস প্রভৃতি ভবভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, তৎসমুদয় মালতীমাধবে সর্বাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে উপলব্ধ হইয়া থাকে।

৫। এই তিন নাটক ভিন্ন ভবভূতি আর কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি কোন্ সময়ের লোক, তাহাও নিরূপণ করা সহজ নহে। কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি সহস্র বৎসরের কিছু পূর্বে ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বীরচরিত ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনাতে সূত্রধারমুখে তিনি আপনার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে তদতিরিক্ত আর কিছু জানিবার উপায় নাই। সে পরিচয় এই—বিদর্ভদেশের অন্তঃপাতী পদ্মপুর নগর তাঁহার জন্মভূমি, পিতার নাম নীলকণ্ঠ, পিতামহের নাম গোপাল, মাতার নাম জাতুকর্ণী ; তিনি কাশ্যপগোত্রে জন্মপরিগ্রহ করেন, তাঁহার পূর্বপুরুষেরা বেদবিদ্যা ও বেদোদিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা বিলক্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

৬। কিছু দিন পূর্বে, আমি উত্তরচরিতের সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কোনও বিশিষ্ট হেতুবশতঃ তৎকালে তাহা হইতে বিরত হই। অনন্তর, এই নাটক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপুস্তক স্থিরীকৃত হইলে, কেহ কেহ, ইহার নূতন সংস্করণ প্রচারিত করিবার নিমিত্ত, অনুরোধ করেন। তদনুসারে এই সংস্করণ প্রচারিত হইল। চল্লিশ বৎসর পূর্বে, রাজকীয় শিক্ষাসমাজের আদেশে ও ব্যয়ে, উত্তরচরিত সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। কলিকাতাস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সাহিত্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যাপক পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট তদীয় অগ্রজ রঘূত্তম শিরোমণি মহাশয়ের হস্তলিখিত যে পুস্তক ছিল, প্রথম মুদ্রিত পুস্তক ঐ পুস্তকের প্রতিকৃতি। আট বৎসর অতীত হইল, উল্লিখিত বিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সংস্কৃতবিদ্যানুরাগী শ্রীযুত ই. বি. কাউএল মহাদয়ের উদ্যোগ ও ব্যয়ে, ঐ বিদ্যালয়ের অলঙ্কারশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়, প্রথমমুদ্রিত পুস্তক ও হস্তলিখিত অপর পুস্তকদ্বয় আশ্রয় করিয়া, সংক্ষিপ্তটীক সহিত এই নাটক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করেন। তত্রত্য বিজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট আছে, ঐ হস্তলিখিত পুস্তকদ্বয়ের একখানি বারাণসী হইতে সংগৃহীত, দ্বিতীয়খানি বিজয়নগর হইতে

অধিগত। উল্লিখিত মুদ্রিত পুস্তকদ্বয় ও অপর দুইখানি হস্তলিখিত পুস্তক অবলম্বনপূর্বক এই সংস্করণ সম্পাদিত হইল। শেষোক্ত পুস্তকদ্বয়ের একখানি বহু দিন অবধি আমার নিকটে আছে; দ্বিতীয়খানি বারাণসীস্থ সংস্কৃতবিদ্যালয় হইতে আনীত। আমার নিকটস্থ হস্তলিখিত পুস্তকখানি অতি প্রাচীন। পুস্তকের শেষে লেখকের রচিত একটি শ্লোক আছে, তদনুসারে, উহা ১৩৫০ শাকে লিখিত; সুতরাং, এক্ষণে উহার বয়ঃক্রম ৪৬২ বৎসর। (২) বারাণসীপুস্তক অনেকস্থলে খণ্ডিত; তাহাতে চতুর্থ অঙ্কের প্রায় অর্ধাংশ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কের সমগ্র, এবং প্রথম ও সপ্তম অঙ্কের কিয়দংশ নাই। এই পুস্তক প্রাচীন বটে; কিন্তু কোন্ সময়ে লিখিত, তাহার কোনও নিদর্শন নাই।

৭। উত্তরচরিতে পাঠের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। উল্লিখিত পুস্তক চতুষ্টয়ের মেলন করিয়া, পাঠসংশোধনবিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কত দূর কৃতকার্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। এই চারি পুস্তকের অনেক স্থলে পরস্পর পাঠের বিস্তর বিভিন্নতা আছে। তত্তৎ স্থলে আমার বিবেচনায় যে পাঠ প্রশস্ত বোধ হইয়াছে, তাহাই মূলে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কিন্তু, কেবল আমার বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়া, পাঠকগণ স্বয়ং বিবেচনা করিবার অবসর পাইবেন, এজন্য, পাঠভেদস্থলে, চারি পুস্তকের পাঠ নিম্নে পৃথক পৃথক প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ১ সংখ্যায়, দ্বিতীয় মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ২ সংখ্যায়, আমার নিকটস্থ পুস্তকের পাঠ ৩ সংখ্যায়, বারাণসীপুস্তকের পাঠ ৪ সংখ্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। অধিকাংশস্থলে, আমার নিকটস্থ পুস্তকের পাঠ প্রশস্ত বোধে অবলম্বন করিয়াছি। আক্ষেপের বিষয় এই, অত্যন্ত জীর্ণ ও কীটদষ্ট হওয়াতে, পুস্তকের অনেকস্থল এক কালে বিলুপ্ত হইয়াছে। স্থলবিশেষে, কোনও পুস্তকের পাঠই প্রকৃত পাঠ বলিয়া বোধ হয় নাই। ঐ সকল পাঠ লিপিকরপ্রমাদদূষিত, এই বিবেচনায়, পরিবর্তিত হইয়াছে। যেখানে নিম্নপ্রদর্শিত কোনও পাঠ মূলে পরিগৃহীত হয় নাই, তথায় পাঠ পরিবর্তিত হইয়াছে, বোধ করিতে হইবেক। কোনও কোনও স্থলে, ব্যাখ্যায় এই পরিবর্তনের উল্লেখ আছে।

৮। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকার্যের সৌকর্যার্থে দুরূহ স্থলের ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাদর্শনে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। বারাণসীনিবাসী রঙ্গনাথদীক্ষিতের পুত্র নারায়ণ ভট্ট, ১৬৮৬ সংবতে, (৩)

---

(২) উত্তরচরিতং শাকে ত্বরিতং লিলেখ শূন্যাগ্নিবেদেন্দৌ।
শ্রীলাচার্য্যশিরোমণিরনিশং যত্নেন সংশোধ্য ॥

(৩) বারাণসীনিয়তবাসপবিত্রমূর্ত্তেঃ শ্রীরঙ্গনাথবিদুষো বিহিতাধ্বরস্য।
শ্রীবালকৃষ্ণ ইতি যঃ প্রথিতস্তনূজস্তস্যাগ্রজেন রুচিরা বিবৃতির্ব্যধায়ি।
ঋতুগজরসচন্দ্রে বিক্রমার্কস্য শাকে
গতবতি শুভমাসে কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে।
প্রতিপদি পরিপূর্ণাকারি জিজ্ঞাসুতুষ্ট্যৈ
বিবৃতিরিযমুমেশাধিষ্ঠিতায়াং নগর্য্যাম্ ॥

অপেক্ষিতব্যাখ্যান নামে উত্তরচরিতের টীকা রচনা করিয়াছিলেন; কলিকাতায় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ঐ টীকার একখানি পুস্তক আছে। নারায়ণের টীকা অতি সংক্ষেপে সঙ্কলিত; অনেক দুরূহ স্থল এককালে উপেক্ষিত হইয়াছে; যে সকল দুরূহ স্থলের ব্যাখ্যা লিখিত আছে, তাহাও সর্বত্র সুসঙ্গত বোধ হয় না। তথাপি ঐ টীকা হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায় যে সকল স্থল দুরূহ বোধ হইয়াছে, তাহারই ব্যাখ্যা লিখিয়াছি। যে সকল বিদ্যালয়ে উত্তরচরিতের এই সংস্করণ ব্যবহৃত হইবেক, তত্রত্য অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা এই, তাঁহারা, যদি কোনও দুরূহ স্থল উপেক্ষিত হইয়াছে, বোধ করেন, দয়া করিয়া আমায় জানাইলে, অত্যন্ত উপকৃত হইব; আর, যে সকল ব্যাখ্যা অবিস্পষ্ট, অসংলগ্ন বা ভ্রমাত্মক বোধ হইবেক, তাহাও জানাইলে, অনুগৃহীত বোধ করিব।

কাশীপুর
সংবৎ ১৯২৭। ৭ই ভাদ্র শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

ABHIJNANASAKUNTALA
A SANSKRIT DRAMA
by
KALIDASA
EDITED
With notes and explanations
For the use of candidates
for
The B. A. Examination of the Calcutta University.
1871

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

অভিজ্ঞানশকুন্তল ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত। কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। যাঁহারা কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদে যথার্থ অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃতভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কোনও দেশের কোনও কবি, কালিদাসের ন্যায়, সর্ববিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।

২। কালিদাস যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, স্বপ্রণীত কাব্যসমূহে সেই শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তদীয় গ্রন্থপাঠে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়কন্দরে অনির্বচনীয় আনন্দরস উচ্ছলিত হইয়া উঠে। বর্ণনার চাতুর্য ও রচনার মাধুর্য বিষয়ে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তদীয় বর্ণনা পাঠ করিয়া মোহিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। তদীয় রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এরূপ রচনা, এরূপ কবিত্বশক্তি, এ উভয়ের একত্র সংঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্তই, ভারতবর্ষীয় লোকে, মুক্তকণ্ঠে, কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

৩। অদ্বিতীয় গুণগ্রাহী, নিরতিশয় বিদ্যোৎসাহী, বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভায় নয় জন অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি নবরত্ন নামে সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে কালিদাস সর্বপ্রধান রত্ন ছিলেন। চিরস্মরণীয় উজ্জয়িনীপতি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ। সংবতের ১৯২৭ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং কালিদাস ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

৪। অভিজ্ঞানশকুন্তল কালিদাসের সর্বপ্রধান কাব্য এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই অপূর্ব নাটকের, আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত, সর্বাংশই সর্বাঙ্গসুন্দর। ইহাতে হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজা দুষ্যন্তের এবং মহর্ষি কণ্বের পালিততনয়া শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্বে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার যে উপাখ্যান আছে তাহা অবলম্বন করিয়া, কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তল রচনা করিয়াছেন। উভয়বিধ শকুন্তলোপাখ্যান পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কালিদাস মহাভারতীয় অকিঞ্চিৎকর উপাখ্যানে কি অদ্ভুত কৌশল ও অলৌকিক চমৎকারিত্ব সমাবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ, অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাসের চমৎকারিণী কল্পনাশক্তি ও চিত্তহারিণী রচনাশক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নাটক পাঠ করিলে, সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে নিঃসংশয় এই প্রতীতি জন্মে, মানুষের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল অলৌকিক পদার্থ। ধন্য কালিদাস! ধন্য অভিজ্ঞানশকুন্তল! প্রলয়ের পূর্বে তোমাদের বিলয় নাই। ধন্য বিক্রমাদিত্য! এই কালিদাস তোমার বয়স্য ও সভাসদ ছিলেন; এই অভিজ্ঞানশকুন্তল, তোমার পরিতোষার্থে, সর্ব প্রথম উজ্জয়িনীর রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল।

৫। দ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতাস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অলঙ্কার-শাস্ত্রাধ্যাপক পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশ মহাশয় এ দেশে সর্বপ্রথম এই নাটক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তৎপরে বিংশতি বৎসর অতীত হইলে, উক্ত বিদ্যালয়ের পূর্বতন অধ্যক্ষ উদারচরিত শ্রীযুত ই বি কাউএল মহোদয়ের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে, তর্কবাগীশ মহাশয় সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত করেন। অনন্তর,

দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পূর্বস্থলীনিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণনাথন্যায়পঞ্চানন আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যাসহিত অভিনব সংস্করণ প্রচারিত করিয়াছেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সুপণ্ডিত ও কাব্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রবীণ। তদীয় যত্নে ও পরিশ্রমে এই নাটকের অনুশীলন-বিষয়ে সবিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

৬। শেষোক্ত উপাদেয় সংস্করণদ্বয় বিদ্যমান থাকিতে, নূতন সংস্করণে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, অভিজ্ঞানশকুন্তল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপুস্তক স্থিরীকৃত হইয়াছে।—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা আদেশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই নাটকের যেরূপ পুস্তক প্রচলিত আছে, পরীক্ষাদানার্থীরা সেই পুস্তক পাঠ করিবেন। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় অথবা ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় গৌড়দেশপ্রচলিত পুস্তকের সংস্করণ করিয়াছেন। গৌড়দেশপ্রচলিত ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলপ্রচলিত উভয়বিধ পুস্তকে পাঠের পরস্পর এত বিভিন্নতা ঘটিয়াছে যে একবিধ পুস্তকপাঠ করিলে, অপরবিধ পুস্তকপাঠের প্রয়োজন সম্যক্ সম্পন্ন হয় না। সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রচলিত পুস্তকের সংস্করণ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে।

৭। অষ্টাদশ বৎসর অতীত হইল, অকৃসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুত মনিয়র উইলিয়মস্ মহোদয় ইংলণ্ডদেশে উক্তবিধ পুস্তকের অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রচারিত করিয়াছেন। এই সংস্করণ প্রায় যাবতীয় দুরূহস্থলের ইঙ্গরেজীভাষালিখিত ব্যাখ্যা-মালায় অলঙ্কৃত। সংস্করণকার্যে উক্ত মহোদয়ের সবিশেষ যত্ন, যথোচিত পরিশ্রম ও সাতিশয় সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। অত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদানার্থীদিগের যেরূপ পুস্তকের প্রয়োজন, এই সংস্করণ সর্বাংশে সেইরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু তদীয় পুস্তক এদেশীয় বিদ্যার্থীদিগের পক্ষে সর্বতোভাবে সুলভ নহে। সুতরাং, তদ্দ্বারা এ দেশে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রচলিত পুস্তকের অসদ্ভাব নিরাকৃত হইতেছে না। সেই অসদ্ভাবের পরিহারবাসনায় এই সংস্করণ প্রচারিত হইল।

৮। এ দেশে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রচলিত পুস্তকের প্রচার নাই। উক্তবিধ পুস্তক প্রেরণের নিমিত্ত, আমি বারাণসীনিবাসী এক আত্মীয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া-ছিলাম। এই প্রার্থনা ফলবতী হয় নাই। এ বিষয়ে অন্যান্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারি নাই। ফলতঃ, পুস্তকপ্রাপ্তিবিষয়ে প্রথমতঃ বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিয়াছিল। পরে, আমি কার্যবশতঃ গত ফাল্গুন মাসে বারাণসীধামে গিয়াছিলাম। ঐ সময়ে উক্ত নগরী নিবাসী শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্রের সহিত আমার আলাপ হয়। এই মহোদয় দয়া করিয়া, স্বীয় পুস্তকালয় হইতে আমায় তিনখানি মূল, একখানি টীকা ও তিনখানি প্রাকৃতবিকৃতি দিয়াছিলেন। অনন্তর, কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর উদ্যোগে, বারাণসী সংস্কৃত বিদ্যালয় হইতেও দুইখানি মূল আমার হস্তগত হয়। এই পাঁচখানি মূল, একখানি টীকা ও তিনখানি প্রাকৃতবিকৃতি অবলম্বনপূর্বক, অভিজ্ঞানশকুন্তলের সংস্করণকার্য সম্পাদিত হইয়াছে।

৯। উল্লিখিত নয় পুস্তকের স্থলে স্থলে পাঠের বিভিন্নতা আছে। পাঠভেদস্থলে, আমার বিবেচনায় যে পাঠ প্রশস্ত বোধ হইয়াছে, তাহাই মূলে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কিন্তু, কেবল আমার মীমাংসার উপর নির্ভর না করিয়া, পাঠকগণ স্বয়ং বিবেচনা করিতে পারিবেন, এজন্য তত্তৎস্থলে, সকল পুস্তকের পাঠ নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাবু হরিশ্চন্দ্রের দত্ত তিনখানি মূলের মধ্যে দুইখানি সমগ্র, তন্মধ্যে একখানি নূতন, দ্বিতীয়খানি পুরাতন; নূতন পুস্তকের পাঠ ১ সংখ্যায়, পুরাতন পুস্তকের পাঠ ২ সংখ্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। তৃতীয় পুস্তক আদিমধ্যখণ্ডিত; এই পুস্তকের পাঠ ৩ সংখ্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। বারাণসীবিদ্যালয়প্রাপ্ত দুই পুস্তকই অন্তখণ্ডিত; তন্মধ্যে যে পুস্তকখানি অতিঅল্প অংশে খণ্ডিত, তাহার পাঠ ৪ সংখ্যায় অঙ্কিত, অপরখানির পাঠ ৫ সংখ্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। টীকানুযায়ী পাঠ ৬ সংখ্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। প্রাকৃতবিকৃতির মধ্যে, একখানি সমগ্র, অপর দুইখানি খণ্ডিত; সমগ্র পুস্তক অনুযায়ী পাঠ ৭ সংখ্যায়, খণ্ডিত দ্বিতয়ের মধ্যে প্রাচীনতর পুস্তক অনুযায়ী পাঠ ৮ সংখ্যায়, এবং অপর পুস্তকের অনুযায়ী পাঠ ৯ সংখ্যায় অঙ্কিত হইয়াছে।

১০। আমি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলপ্রচলিত পুস্তকের সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এজন্য আদ্যোপান্ত উল্লিখিত পুস্তক সমুদয়ের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছি। তবে, যেখানে তত্তৎপুস্তকানুযায়ী পাঠ কোনও রূপে সংলগ্ন হয় না, এরূপ বোধ জন্মিয়াছে, কেবল তাদৃশ কতিপয় স্থলে অগত্যা গৌড়দেশপ্রচলিতপুস্তকানুযায়ী পাঠ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, স্থলবিশেষে কোনও কোনও পাঠ, লিপিকরপ্রমাদদূষিত বিবেচনা করিয়া, কিঞ্চিদংশে পরিবর্তিত করিয়াছি। এইরূপে পরিবর্তিত পাঠ সকল স্বতন্ত্র প্রদর্শিত হইল।

১১। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকার্যের সৌকর্যার্থে দুরূহস্থলের ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। বাবু হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে যে টীকাখানি পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করিয়াছি। এই টীকা রাঘবভট্টপ্রণীত; নাম অর্থদ্যোতনিকা। টীকা-দর্শনে স্পষ্ট বোধ হয়, রাঘবভট্ট সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে সবিশেষ প্রবীণ ছিলেন। আমার বিবেচনায় যে সকল স্থলের ব্যাখ্যা লেখা আবশ্যক বোধ হইয়াছে, তৎসমুদয়ের ব্যাখ্যা লিখিয়াছি। যে সকল বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞানশকুন্তলের এই সংস্করণ ব্যবহৃত হইবেক, তত্রত্য অধ্যাপক মহাশয়দের নিকট প্রার্থনা এই, যদি কোনও দুরূহস্থল উপেক্ষিত হইয়াছে, বোধ করেন, দয়া করিয়া আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। আর যদি কোনও ব্যাখ্যা অবিস্পষ্ট, অসংলগ্ন বা ভ্রমাত্মক বোধ হয়, তাহাও জানাইলে, অনুগৃহীত বোধ করিব।

১২। স্থলে স্থলে নাটকীয় ব্যক্তিগণের উক্তিবিরামে কবিবাক্যে তদীয় ক্রিয়ার যে সমস্ত নির্দেশ আছে; গৌড়দেশপ্রচলিত পুস্তকে সেই সকল ক্রিয়ানির্দেশবাক্যের আদিতে ইতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা, ইতি শরসন্ধানং নাদয়তি, ইতি বিলোকয়ং স্থিতঃ, ইতি কলসমাবর্জয়তি ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল পুস্তক

অনুসারে এই সংস্করণ সম্পন্ন হইয়াছে, উহাদের অধিকাংশ স্থলেই তাদৃশ ইতিশব্দযোগ লক্ষিত হয় না। ফলতঃ, ঐরূপ ইতিশব্দযোজনা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। এজন্য, এই সংস্করণে উল্লিখিত ক্রিয়ানির্দেশবাক্যে ইতিশব্দ যোজিত হয় নাই।

১৩। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, বারাণসীনিবাসী শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্রের আনুকূল্য না পাইলে, আমি কোনও ক্রমে অভিজ্ঞানশকুন্তলের সংস্করণকার্য নির্বাহ করিতে পারিতাম না। আমার অভিজ্ঞানশকুন্তল পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা অবগত হইবামাত্র, এই সৌম্যমূর্তি, অমায়িক, নিরহঙ্কার, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী মহোদয় যেরূপ সৌজন্য ও উৎসাহসহকারে আমার হস্তে পুস্তক সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না।

কাশীপুর
সংবৎ ১৯২৮। ১লা আষাঢ়। **শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা**

নাটকে প্রযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অর্থ

অঙ্ক—যে স্থলে নাটকীয় ইতিবৃত্তের এক অংশের শেষ হয়, তথায় পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে; ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক। অঙ্কশেষে সমুদয় নট রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, পর অঙ্কে নূতন নূতন নট প্রবিষ্ট হইয়া অভিনয় আরম্ভ করে।

আত্মগত – স্বগত দেখ।

অপবার্য—অন্যে শুনিতে না পায়, এরূপ অনুচ্চ স্বরে গোপন করিয়া। যথা—'অরুন্ধতী। অপবার্য্য সহর্ষবাষ্পম্। ইদং নাম তত্ত্বাগীরথীনিবেদিতরহস্যং কর্ণামৃতম্'।

নট—যে নৃত্য করে, অর্থাৎ রঙ্গভূমিতে নৃত্য, গীত ও অভিনয় করা যাহার ব্যবসায়। সুতরাং, যাহারা নাটকের অভিনয় করে, তাহারা সকলেই নটশব্দবাচ্য; কিন্তু প্রস্তাবনাতে যেখানে নটের প্রবেশ বর্ণিত থাকে, তথায় নটশব্দে সূত্রধারের সহকারী নটবিশেষ অভিপ্রেত।

নান্দী—সূত্রধার রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া, অভিপ্রেত অভিনয়কার্যের নির্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তির নিমিত্ত, যে মঙ্গলাচরণ করে, তাহার নাম নান্দী। স্তবাদিদ্বারা দেবতাদিগকে আনন্দিত অর্থাৎ প্রসন্ন করে, এজন্য এই মঙ্গলাচরণ নান্দীশব্দে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। নাটকগ্রন্থের আরম্ভে যে এক বা তদধিক শ্লোক থাকে, তাহা নাটকের নান্দী নহে; নাট্যশাস্ত্রকারেরা নান্দীর যে যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ঐ সকল শ্লোক তৎসমস্ত-লক্ষণাক্রান্ত নয়। বস্তুতঃ ঐ সকল শ্লোক গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ। 'নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' এই অবধি গ্রন্থের আরম্ভ। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের যে প্রথা আছে, তদনুবর্তী হইয়া কবিরা স্বপ্রণীত নাটকের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন।

নান্দ্যন্তে নান্দীর পর, অর্থাৎ অভিনয় আরম্ভ করিবার পূর্বে দেবতাপ্রণামাদিরূপ নান্দী কীর্তন করিয়া। এই নান্দী নাটকের অঙ্গ নহে, অভিনেতৃবর্গের অধিকারী সূত্রধারের কার্য। সেই কার্য সম্পাদন করিয়া, সূত্রধার কহিয়া থাকেন, 'অলমতি-বিস্তরেণ'—অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ নান্দীর অধিক আড়ম্বর করিয়া সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন।

নেপথ্য—যে স্থলে নাটকের অভিনয় হয়, তাহার নাম রঙ্গভূমি। রঙ্গভূমির কিঞ্চিৎ অন্তরে যে স্থলে নটেরা বেশবিন্যাস করে, তাহার নাম নেপথ্য। নাটকের যে স্থলে 'নেপথ্যে' এইরূপ লিখিত থাকে, তাহার অর্থ এই, কোনও নট নাটকীয় ব্যক্তিবিশেষের বেশ পরিগ্রহ করিয়া, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবার পূর্বে, নেপথ্য হইতে কিছু বলিতেছে। যথা দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভে—'নেপথ্যে স্বাগতং তপোধনায়াঃ' ; নটবিশেষ বনদেবতার বেশ পরিগ্রহ করিয়া অধ্বগবেশা আত্রেয়ীনাম্নী তাপসীকে দেখিতে পাইয়া, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবার পূর্বে, নেপথ্য হইতে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতেছে।

প্রকাশ—অভিনয়কালে কোনও নট অন্যের নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত, বিষয়-বিশেষের মনে মনে আন্দোলন করিয়া, অথবা সন্নিহিত ব্যক্তিরা শুনিতে না পায় এরূপ অনুচ্চ স্বরে কহিয়া, সকলের গোচরে যাহা বলে, তাহাকে প্রকাশ কহে। যথা 'বাসন্তী। স্বগতম্। কষ্টমভ্যাপন্নো দেবঃ তদাক্ষিপামি তাবৎ। প্রকাশম্। চিরপরিচিতানেতান্ জনস্থানভাগানবলোকয়তু দেবঃ'। লক্ষ্মণঃ সলজ্জস্মিতমপবার্য্য। অয়ে উর্মিলাং পৃচ্ছত্যার্য্যা ভবত্বন্যতঃ সঞ্চারয়ামি। প্রকাশম্। আর্য্যে দৃশ্যতাং দ্রষ্টব্যমেতৎ'।

প্রস্তাবনা—সূত্রধার রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া নান্দীসমাধানান্তে, অনন্তরপ্রবিষ্ট নটবিশেষের সহিত কথোপকথনচ্ছলে, নাটকপ্রণেতা কবির ও অভিনেয়মান নাটকের উল্লেখ করে ; এবং প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দিয়া, স্বীয় সহচর সমভিব্যাহারে রঙ্গভূমি হইতে বহির্গত হয় ; তৎপরে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। এই অংশকে নাটকের প্রস্তাবনা কহে।

ভাব—প্রস্তাবনাতে কথোপকথনকালে অপর নট সূত্রধারকে ভাবশব্দে সম্বোধন করে। ভাবশব্দের অর্থ বিজ্ঞ, বোদ্ধা, বিদ্বান্।

মারিষ—প্রস্তাবনাতে কথোপকথনকালে সূত্রধার অপর নটকে মারিষশব্দে সম্বোধন করে। মারিষশব্দের অর্থ আর্য, মাননীয়, আদরণীয়।

বিষ্কম্ভক—নাটকীয় ইতিবৃত্তের নীরস অংশ সকল, প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণিত হইলে, সামাজিকবর্গের বিরক্তিকর হইতে পারে ; এজন্য নাটককর্তারা, অপ্রধান ব্যক্তির মুখে সেই সেই অংশের সংক্ষেপে কীর্তন করিয়া, সরস অংশের অবতরণ করিয়া দেন। নাটকের এই অংশকে বিষ্কম্ভক বলে। বিষ্কম্ভক অঙ্কের প্রস্তাবনাস্বরূপ, অঙ্কের আদিতে গ্রথিত হইয়া থাকে।

সূত্রধার—যে প্রধান নট সূত্র ধরে অর্থাৎ নাটকের সূত্রপাত করে, তাহার নাম সূত্রধার। ইদানীন্তন যাত্রাসম্প্রদায়ের অধিকারী সূত্রধারশব্দবাচ্য।

স্বগত—অভিনয়কালে কোনও নট, সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত, বিষয়বিশেষের মনে মনে যে আন্দোলন করে, তাহার নাম স্বগত। যথা, 'লক্ষ্মণঃ। বিহস্য স্বগতম্। অয়ে মধ্যমাম্বাবৃত্তমন্তরিতমার্য্যেণ।'

HARSHACHARITA
1883

হর্ষচরিতম্

হর্ষচরিত কাদম্বরীরচয়িতা মহাকবি বাণভট্টের প্রণীত। উভয় গ্রন্থই এক কবির লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত; এক প্রণালীতে রচিত; এবং উভয়ই অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত। এ তিন বিষয়ে উভয় গ্রন্থের কোনও বৈলক্ষণ্য নাই; কিন্তু, উৎকর্ষবিষয়ে, পরস্পর তুলনা করিলে, অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক। কাদম্বরীর চমৎকারিতা ও মনোহারিতা হর্ষচরিতে ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয় না। তদ্ভিন্ন, অনায়াসে অর্থ-বোধ জন্মে না, কাদম্বরীতে এরূপ স্থলের সংখ্যা অতি অল্প; হর্ষচরিতে তাদৃশ স্থলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক। ফলকথা এই, হর্ষচরিত কাদম্বরী অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট কাব্য। কাদম্বরী অপেক্ষা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু উহা যে এক প্রশংসনীয় গ্রন্থ, সে বিষয়ে সংশয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, তদনু-সারে হর্ষচরিত বাণভট্টের প্রথম কাব্য।

বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গদ্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, আমার পরম বন্ধু, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, অধুনা লোকান্তর-বাসী হারাধন বিদ্যারত্ন মহাশয়, জম্বু রাজধানীতে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি আমাকে, একখানি পুস্তক দেখাইয়া, কহিলেন, শ্রীযুত শেষ শাস্ত্রী নামে একটি পণ্ডিত, পুরস্কারলাভের প্রত্যাশায়, আমার নিকট এই পুস্তকখানি দিয়াছেন। ইহার নাম হর্ষচরিত; ইহা বাণভট্টপ্রণীত। বাণভট্টপ্রণীত, এই কথা শুনিয়া, আমি, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইলাম, এবং পুরস্কারদানের অঙ্গীকার করিয়া, কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে, পুস্তকখানি লইলাম। এইরূপে অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব, অপূর্ব এক গদ্যকাব্য হস্তগত হওয়াতে, আমি, কালবিলম্ব না করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম।

কিন্তু, অল্প দিনেই বুঝিতে পারিলাম, একমাত্র পুস্তক অবলম্বন করিয়া, হর্ষচরিত মুদ্রিত করিলে, সম্যক্ শুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলকথা এই, এত স্থল অশুদ্ধ ও অসংলগ্ন প্রতীয়মান হইতে লাগিল, যে পুস্তকান্তরের সাহায্য না পাইলে, হর্ষচরিত

মুদ্রিত করা পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইল না। সুতরাং, হর্ষচরিতের মুদ্রাঙ্কনকার্য স্থগিত রাখিতে হইল। আমার সবিশেষ স্নেহভাজন শ্রীযুত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, জম্মু রাজধানীতে, এক প্রধান রাজপুরুষের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রসঙ্গক্রমে হর্ষচরিতের কথা উত্থাপিত হইলে, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তিনি কাশ্মীর দেশ হইতে দুইখানি পুস্তক পাঠাইয়া দেন। এইরূপে তিন পুস্তক হস্তগত হইলে, আমি, সাহস করিয়া, হর্ষচরিতের মুদ্রাঙ্কনকার্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হই।

এক্ষণে, হর্ষচরিত মুদ্রিত হইল। এ বিষয়ে আমি যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি; কিন্তু তাদৃশ যত্নের ও পরিশ্রমের অনুরূপ ফললাভ হয় নাই। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পুস্তকের অনেক স্থল অশুদ্ধ ও অসংলগ্ন রহিয়া গেল। অর্ধ ভাগ পর্যন্ত মুদ্রিত হইলে, আমি, বিরক্ত হইয়া, পুনরায়, হর্ষচরিতের মুদ্রাঙ্কনকার্য হইতে বিরত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; কিন্তু, অনেকের সবিশেষ অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, সে সঙ্কল্পের অনুসরণ করিতে পারিলাম না। অনুরোধকারী মহাশয়েরা আমায়, নানা কারণ দর্শাইয়া, হর্ষচরিতের মুদ্রাঙ্কনকার্য হইতে, কোনও মতে, বিরত হইতে দিলেন না।

কলিকাতা
১লা অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৩৯।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

RAGHUVANSA
AN EPIC POEM
by
KALIDASA
Edited by
Eshwar Chandra Vidyasagar
Principal of the Sanskrit College.
Calcutta
Printed at the Sanskrit Press
1853

কিছু দিবস হইল সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মল্লিনাথ-প্রণীত সঞ্জীবনীনামক সর্বপ্রধান টীকা সমেত রঘুবংশ মুদ্রিত করিয়াছেন। এই মহাকাব্য যেরূপে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের প্রযত্নে ও পরিশ্রমে তাহাই হইয়াছে; তথাপি পুনর্মুদ্রিত করিতে উদ্যত হইবার তাৎপর্য এই যে সটীক মুদ্রিত গ্রন্থ যে মূল্যে বিক্রীত হইতেছে সেই মূল্যে ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে সংস্কৃতবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অনেকেরই এরূপ অবস্থা নহে। এই নিমিত্ত মূলমাত্র মুদ্রিত হইল। আর যদিও এই সংস্কৃতভাষার সর্বপ্রধান মহাকাব্যের আদি অবধি

অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গসুন্দর তথাপি কোন কোন অংশ ও কোন কোন শ্লোক এরূপ আছে যে ছাত্রদিগের অধ্যয়নযোগ্য নহে। এই নিমিত্ত সেই সমস্ত বর্জনীয় অংশ ও বর্জনীয় শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। রঘুবংশ যে প্রণালীতে মুদ্রিত হইল কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত প্রভৃতিও সেই প্রণালীতে মুদ্রিত হইবেক।

সংস্কৃত কালেজ। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
২৩এ জ্যৈষ্ঠ ; ১৯১০ সংবৎ।

ইংরাজিতে লিখিত 'বিজ্ঞাপন'

THE
BYTAL-PACHEESEE
OR
The Twenty-Five Tales of the Demon

PREFACE

The Bytal Pacheesee is a collection of Legendary Stories relating to that celebrated character in Hindu Annals, Raja Vikramaditya. The work contains no traces of art or genius in its composition; but on the contrary exhibits those clumsy attempts at the wonderful, sometimes bordering on childishness, which are so general in the Legends of a dark age. It is, however, very popular among the great mass of the people of this country and expresses accurately their ideas and feelings on many subjects. This fact, and the circumstance of the Hindee version being highly idiomatic and correct in its style, render this work an excellent Text book for students of the Hindee Language.

The Original of these tales is to be found in the Kathasaritsagara, an ancient and voluminous collection of Tales and Legends in Sanskrit verse, by Somadeva Bhatta, under the title of Betala-panchavinsatika. There exists also, under the same title, a Sanskrit prose version.

In the reign of Muhammad Shaha, Surat Kabishwar, by order of Raja Jye Singh, translated the work from Sanskrit into Braj Bhakha. This version was translated, by direction of Dr. Gilchrist,

in the time of Marquis Wellesley, into Hindoostanee by Muzhar Ali Khan, whose poetical name was Vila, aided by Lallu Lal Kab, the elegant writer of Premsagar, both Moonshees of the College of Fort William This translation, of which the present is a new edition, was printed in 1805, having been revised, according to the instructions of Captain James Mouat, by Tarineecharan Mitra, the learned Head Moonshee of the above Institution.

A Bengali version of this translation was made by the Editor of the present edition, in the year 1847, by directions of Major G. T. Marshall, Secretary to the College of Fort William, and was adopted, under the title of Betalpanchabinshati, as a Text book for the Students of that College. A poetical version in Bengali also exists and seems to have been taken from the Original Sanskrit.

In bringing out the edition now presented to the public, the Original Text of 1805 and the Agra Edition of 1843, have been carefully collated. The former has been generally adhered to ; but the latter, though sometimes inferior in accuracy, has been occasionally followed in instances where it appeared judiciously modernised in its style of expression and orthography. The correct Sanskrit forms of the proper names, as far as they can be traced, have been inserted in the places where they occur, at the foot of the page. Some do not admit of Sanskrit equivalents ; and it is evident that the Translators were not particular in this point, and adopted popular epithets at their own pleasure.

Calcutta,
15th January, Ishwarchandra Sharma
1852.

BIBLIOTHECA INDICA
Collection of Oriental Works.
Published under the Patronage of the
Hon. Court of Directors of the East India Company.
And the Superintendence of the Asiatic Society of Bengal.
Nos. 63 and 142

SARVADARSANA SANGRAHA
Or An
Epitome of the different systems of Indian Philosophy
by
Madhavacharya
Edited by
Pandita Iswara Chandra Vidyasagara

The Sarvadarsanasangraha is a work by Madhavacharya, the well-known scholiast of the Vedas. It contains short notices of all the systems of Indian Philosophy, and as such is very valuable. It is natural to suppose that every Indian Sanskrit Scholar would have possessed a copy of a treatise of so much importance. But it is somewhat singular that manuscripts of the work are very rare, and that the great majority of the learned of this country are probably not even aware of its existence. If not printed now, the Sarvadarsanasanagraha would, in all probability, share the common fate of many other valuable relics of Sanskrit learning. To preserve the work from destruction I proposed to the Asiatic Soeiety of Bengal to edit the work for them if they would undertake to print it. My offer was kindly accepted, and the work, under their auspices, is printed and published.

When I first undertook to edit the work, I was under the impression that the task would be an easy one. There were two manuscripts in Calcutta, one in the Library of the Sanskrit College, and the other in that of the Asiatic Society. On first reading the book I thought that the former manuscript was sufficiently correct. But scrutinizing it with the care necessary for publication, I collated it with the copy in the Society's Library and found that without the aid of more manuscripts, the readings in several passages in which the two manuscripts differ,

could not be reconciled. No other manuscripts were however procurable in Bengal ; but by good fortune I procured three manuscripts from Benaras. These were essential service to me, and it was only after carefully collating them with the Texts in Calcutta that I have been able to edit the work.

I feel it my duty here to express my great obligations to Mr. Edward Hall, late of the Benaras College, through whose kind exertions the Benaras Manuscripts were received. Without his timely aid it would have been impossible for me to execute the task I had undertaken with the accuracy requisite. My obligations are also due to Professors Jayanarayana Tarkapanchanana and Taranatha Tarkavachaspati of the Sanskrit College for the material asistance that they afforded to me in the undertaking.

Sanskrit College,
The 20th January, 1858.

পরিশিষ্ট

১। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র

সংসারসুখে হতাশ হয়ে বিদ্যাসাগর এক সময়ে আত্মীয়দের যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন :

১। মাতৃদেবীকে লেখা

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মাতৃদেবী শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্বকং নিবেদনমিদম্

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোনও বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোনও সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে পূর্বের মত নানা বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি। মাতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি, তাহা বলা যায় না। এজন্য কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিবেন। আপনকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত মাস মাস যে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া থাকি যতদিন শরীর ধারণ করিবেন কোনও কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। তদ্ব্যতিরিক্ত আপনকার পিতৃকৃত্য ও মাতৃকৃত্যের ব্যয়নির্বাহার্থে বার্ষিক দুইশত টাকা প্রেষিত হইবেক। যদি কখনও কোনও বিষয়ে আমায় কিছু বলা আবশ্যক বোধ করেন পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমি অনেকবার আপনকার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি এবং পুনরায় শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি, যদি আমার নিকট থাকা অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব এবং আপনকার চরণ সেবা করিয়া চরিতার্থ হইব ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

২। শ্রী দিনময়ী দেবীকে লেখা চিঠি

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

গুণালঙ্কৃত শ্রীমতী দিনময়ী দেবী
কল্যাণনিলয়েষু
শুভাশীর্বাদপূর্বকমাবেদনমিদম্

আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার সে বিষয়ে অণুমাত্র স্পৃহা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা…। এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যদি কখনও কোনও দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে। তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তোমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয়নির্বাহের যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, বিবেচনাপূর্বক চলিলে, তদ্দ্বারা সচ্ছন্দরূপে যাবতীয় আবশ্যক বিষয় সম্পন্ন হইতে পারিবেক। পরিশেষে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধৈর্য অবলম্বন করিয়া চলিবে, নতুবা স্বয়ং যথেষ্ট ক্লেশ পাইবে এবং অন্যেরও বিলক্ষণ ক্লেশদায়িনী হইবে। ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

৩। মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে লেখা পত্রাংশ

এক্ষণে তোমাদের নিকট জন্মের মত বিদায় লইতেছি। যদি কখনও কোনও দোষ বা অসন্তোষের কার্য করিয়া থাকি দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। যদি কখনও কোনও বিষয় আমায় জানান আবশ্যক বোধ কর, পত্রদ্বারা জানাইবে, আর সাংসারিক ব্যয়নির্বাহার্থে মাসিক আনুকূল্য গ্রহণ অভিমত হইলে, তদর্থে মাসে মাসে ৭০ টাকা পাঠাইতে পারি। এককালীন অধিক দেওয়া আমার শক্তিবহির্ভূত।

৪। তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা পত্রাংশ

এক্ষণে তোমাদের নিকট…। তোমার সাংসারিক ব্যয়নির্বাহবিষয়ে যে আনুকূল্য করিতেছি, যতদিন আমার দিবার সঙ্গতি ও তোমার লইবার ইচ্ছা থাকিবেক ততদিন তাহা করিব, কোনও কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না।…পরিশেষে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, যথাসম্ভব সকল লোকের সহিত, বিশেষতঃ প্রতিবেশিবর্গের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবে, তাহা হইলে নির্বিরোধে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে।

ঙ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রকে লেখা পত্রাংশ

…যদি সাংসারিক ব্যয়নির্বাহার্থে অভিরুচি হয়, মাস মাস ত্রিশ টাকা পাঠাইতে পারি। তুমি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছ তদ্বিষয়ে কিছু সাহায্যও করিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত আর পারিব না। কারণ এককালীন অধিক দেওয়া আমার শক্তিবহির্ভূত।

চ। বিদ্যাসাগর তাঁর দেশের বাড়ির অন্যতম পরিচারক গদাধর পালকে এই চিঠি লেখেন

নানাগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত গদাধর পাল ভাইজী কল্যাণভাজনেষু
শুভাশীর্বাদপূর্বকমাবেদনমিদম্

নানা কারণবশতঃ স্থির করিয়াছি আমি আর বীরসিংহায় যাইব না। তুমি গ্রামের প্রধান, এজন্য তোমা দ্বারা গ্রামস্থ সর্বসাধারণ লোকের নিকট এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্বাদ জানাইয়া বিনয়বাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি, যদি কখনও কোনও দোষ করিয়া থাকি, সকলে দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। সাধারণের হিতার্থে গ্রামে যে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে এবং গ্রামস্থ নিরুপায় লোকদিগের মাস মাস যে কিছু কিছু আনুকূল্য করিয়া থাকি, আমার শক্তি থাকিতে ঐ সকল বিষয় রহিত হইবে না। কিছুকাল হইল আমার মনের ও শরীরের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। সুতরাং অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। যত দিন বাঁচিব, যদি শুনিতে পাই, তোমরা সকলে সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছ, তাহা হইলে যার পর নাই সুখী হইব। ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল। শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

ছ। পিতাকে লেখা

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণিপাতপূর্বক নিবেদনম্

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোনও বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোনও সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূব পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। সঙ্কল্প করিয়া শ্রীমতী মাতৃদেবী প্রভৃতিকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার প্রতিলিপি শ্রীচরণসমীপে প্রেরিত হইতেছে, যদি ইচ্ছা হয় দৃষ্টি করিবেন।

সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি। কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি,

সে বিষয়ে কোনও অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না, এই প্রাচীন কথা কোনও ক্রমেই অযথা নহে। সংসারী লোক যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণে আমার বক্তব্য এই, পিতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বচনে শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিবেন।

কার্যগতিকে ঋণে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইয়াছি। ঋণ পরিশোধ না হইলে, লোকালয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যাহাতে সত্বর ঋণমুক্ত হই, তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি। ঋণে নিষ্কৃতি পাইলেই কোনও নির্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব।···আপনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয়নির্বাহার্থে যাহা প্রেরিত হইয়া থাকে, যতদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন, কোনও কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

৮। পুত্রবধূ ভবসুন্দরী দেবীকে লেখা চিঠি

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

বৎসে ভবসুন্দরি

শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ অনেক দিন তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। সেজন্য বোধ করি তুমি অতিশয় দুঃখিত আছ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছ। আমি এতদিন তোমায় পত্র না লিখিয়া অন্যায় কর্ম করিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই।

আমি কলিকাতায় অতিশয় অসুস্থ হইয়া দশ দিবস হইল কর্মাটাঁড় আসিয়াছি। কলিকাতায় বিলক্ষণ অসুখ ভোগ করিয়াছি, এখানে আসিয়াও ভালরূপ আরাম হইতে পারি নাই। এখানে আর ৮।১০ দিন থাকিয়া পুনরায় কলিকাতায় যাইব। কলিকাতায় গিয়া যেন তোমার পত্র পাই। কুন্দ বোধ করি এতদিনে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাকে বসাইয়া খাওয়াইতে বড় ইচ্ছা হয়। তাহার সম্ভাষণ-বাক্যগুলি সর্বদাই মনে পড়ে। ইতি ১লা চৈত্র ১২৮৫ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

৯। পৌত্রী মৃণালিনীকে লেখা চিঠি

সস্নেহ সম্ভাষণমাবেদনমিদম্

তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমার জননীদেবীর পেটের অসুখ ভাল হইয়াছে এবং তোমরা সকলে ভাল আছ আর তুমি বস্তুবিচার পড়িতেছ, কুন্দমালা কথামালা পড়িতেছে, এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তোমরা মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। ভাল শিখিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে অতিশয় ভালবাসিব। তুমি মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখিবে। আর কুন্দ যদি লিখিতে পারে, তাহাকে পত্র লিখিতে বলিবে। তোমাদের পত্র পাইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইব।

প্রায় এক মাস হইল আমার পেটের অসুখ হইয়াছে। এখনও ভাল হইতে পারি নাই। অতিশয় দুর্বল হইয়াছি। আজ তিন দিন হইল কিছু ভাল আছি। বোধ হইতেছে আর ৪।৫ দিনে ভাল হইতে পারিব। তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। তোমার ঠাকুরমা, পিসিমারা এবং সুরেশ, যতীশ, হরিমোহন, রামকমল প্রভৃতি এবং রানীরা সকলে ভাল আছেন। তোমার জননী, কুন্দ, প্যারী, মতি ইহাদিগকে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহসম্ভাষণ বলিবে। দুর্বল আছি বলিয়া তোমার জননীকে পত্র লিখিতে পারিলাম না। তোমাকে না লিখিলে হয়ত তুমি রাগ করিবে এজন্য তোমাকে লিখিলাম। আজ আর লিখিতে পারিব না। ইতি—১লা আষাঢ় ১২৯১ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

১০। পৌত্র প্যারীমোহনকে লেখা চিঠি

শ্রীহরিঃ
শরণম্

প্রাণাধিক ভাই প্যারীমোহন

তুমি পত্র লিখিতে পারিয়াছ ইহাতে আমি কত আহ্লাদিত হইয়াছি বলিতে পারি না। তুমি মন দিয়া লেখাপড়া করিবে, তাহা হইলে আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইব। তুমি প্রতি মাসে দুইবার আমাকে পত্র লিখিবে।

তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে আহ্লাদিত হইলাম। আমি এখন অনেক ভাল আছি। বাটীর আর সকলে ভাল আছেন। মতিমালা, কুন্দমালা, মৃণালিনী ও তোমার জননীকে আমার স্নেহসম্ভাষণ জানাইবে। ইতি ২৭শে পৌষ, ১২৯২।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

১১। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে লিখিত চিঠি

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকার

ভ্রাতঃ।—প্রায় দুই সপ্তাহ কাল আমি অত্যন্ত অসুস্থ ও একটি দৌহিত্র উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। এজন্য পরিচারকদিগকে বলিয়াছিলাম কাহাকেও আসিতে দিও না। বলিবে আমি অতিশয় অসুস্থ আছি, দেখা হইবেক না। অনেকে এই কথায় ক্ষান্ত না হইয়া চিরকুটে আপন নাম ও পরিচয় লিখিয়া পরিচারকদিগকে দিতেন, তাহারা ঐ সকল চিরকুট আমার নিকটে আনিত আর যদি কেহ কাহারও পত্র আনিতেন, তাহাও আনিয়া দিত। এইরূপ চিরকুট ও পত্র প্রত্যহ অন্ততঃ পঁচিশখান তাহারা আনিয়া দিয়াছে। এক গোস্বামীর পুত্রকে তুমি যে পত্র দাও, তাহাও আনিয়া দিয়াছে; তোমার প্রেরিত যে পত্রের উত্তর লিখিতেছি তাহাও আনিয়া দিয়াছে, এমন স্থলে তোমার উল্লিখিত Gentleman's Son (ভদ্রলোকের ছেলেটি) যে পত্র আনিয়াছিলেন, কেবল সেইখানি আনিয়া আমায় দিতে অসম্মত হইল কেন বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার পত্র পাইয়া পরিচারকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, 'কোনও ব্যক্তি পত্র আনিয়াছিলেন তাহা লইয়া আপনাকে দিতে অসম্মত হইয়াছি, যদি কেহ এরূপ কথা বলিয়া থাকেন, তিনি অন্যায় করিয়াছেন; আমরা পত্র লইয়া যাইব না, এরূপ কথা কাহাকেও বলি নাই; যিনি যখন পত্র আনিয়াছেন তখনই ঐ পত্র আপনার নিকট আনিয়া দিয়াছি। যাহা হউক সমুদয় অনুধাবন করিয়া পরিচারকদিগকে অপরাধী করিতে সাহস হইতেছে না এবং আপনাকেও অপরাধী ভাবিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তুমি এখানকার বৃত্তান্ত কিছুই জান না, সুতরাং তোমার Gentleman's Son (ভদ্রলোকের ছেলেটি) যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে নির্ভর করিয়া উচিত ও আবশ্যক বোধে আমায় যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছ। ফলকথা এই, আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দয়; সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এই সংস্কার অনেক দিন পূর্বে আমার হৃদয়ে প্ররূঢ় হইয়া ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, এজন্য তোমার পত্র পাঠ করিয়া সবিশেষ ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইলাম না। ইতি—১৫ই মাঘ ১২৮৭ সাল।

ত্বদেকশর্মশর্মণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

১২। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

আপনার নির্বিঘ্নে পঁহুছান সংবাদ পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু যাইয়া কিছু অসুস্থ হইয়াছেন পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। মেদিনীপুর স্থান ভাল, ত্বরায় সুস্থ হইবেন ও ভাল থাকিবেন কোনও সন্দেহ নাই, তবে সে স্থান নূতন, এখানে যেমন সর্বদা আত্মীয়বর্গের মধ্যে থাকিতেন ও সর্বদা তাঁহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেন, সেখানে আপাততঃ তাহা দুর্লভ, সুতরাং এ নিমিত্ত কিছু দিন মনের অসুখে থাকিবেন, ক্রমে তথায়ও আত্মীয়সঙ্ঘটন হইবেক। সংসারে এই রীতি। লিখিয়াছেন Second Master (দ্বিতীয় শিক্ষক) অধ্যক্ষবর্গের প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁহার সহিত অস্বরস হইলে, অসুখের বিষয় ঘটিতে পারে, অতএব আমার মতে তাঁহার সহিত মিল করিয়া লওয়া ভাল। আর তিনি অভদ্র হন, ঘরের ভাত অধিক করিয়া খাইবেন, আপনি ধর্মতঃ আপন কর্ম নির্বাহ করিবেন, তাহা হইলে ধর্মদ্বারে খালাস।

লোকাল কমিটি (Local Committee) মধ্যে যে সাহেবকে ভদ্র দেখিবেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গেলেও হানি নাই। বোধ করি, সাক সাহেব তথায় মাজিস্ট্রেট। আমি শুনিয়াছি তিনি ভদ্র বটেন ও বুদ্ধিজীবীও বটেন, বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অনুরাগ আছে।

সর্বদা সাবধানে থাকিবেন এবং অনুগ্রহপূর্বক মধ্যে মধ্যে মঙ্গলসংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বিগ্ন ও সুস্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক।

ত্বদেকশর্মশর্মণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

১৩। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

আপনার কন্যার বিবাহ বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফলকথা এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোনও ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, ব্রাহ্মধর্মে আপনকার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্রবাবু যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়িনী বলিয়া আপনকার বোধ থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রণালী অনুসারেই আপনকার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ যদি আপনি দেবেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবে। ব্রাহ্মপ্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কিনা, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এ সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোনও পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। তবে এইমাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সহসা কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, এরূপ বিষয়ে অন্যের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে ; ঈদৃশ স্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয় তদনুসারে কর্ম করাই কর্তব্য, কারণ যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তির নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায় তদনুসারে পরামর্শ দিবেন, আপনকার হিতাহিত বা কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।

এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া উপস্থিত বিষয়ে স্বয়ং কর্তব্য নিরূপণ করিলেই আমার মতে সর্বাংশে ভাল হয়।

ভবদীয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

১৪। মহারানী স্বর্ণময়ীকে লেখা চিঠি

মহারানী স্বর্ণময়ী, সি. আই. মহোদয়া সমীপেষু,
বিনয়বহুমানশুভাশীর্বাদপূর্বকং নিবেদনম্।

বহুদিন হইল, কার্যবিশেষ উপলক্ষে টাকার আত্যন্তিক প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে, অধুনা লোকান্তরবাসী নিরতিশয় উদারচরিত রাজীবলোচন রায় দেওয়ানজী মহাশয় সাতিশয় দয়াপূর্বক শ্রীমতীর অনুমতি অনুসারে রাজধানীর ধনাগার হইতে ৭৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন, এ টাকার সুদ দিতে হইবেক না। যখন সুবিধা হইবেক, পরিশোধ করিবেন।

এই টাকা পাইয়া আমি কি পর্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম, তাহা বলিবার নয়, যতকাল জীবিত থাকিব, এই মহোপকার আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবেক। লোকের উপকার করিবার জন্যই শ্রীমতীর জন্মগ্রহণ। দেশে অনেক ঐশ্বর্যশালী লোক আছেন। কিন্তু কেহই শ্রীমতীর ন্যায় সর্বসাধারণের যথার্থ ধন্যবাদের আস্পদ ও উপকৃতবর্গের আন্তরিক আশীর্বাদের ভাজন হইতে পারেন নাই।

দীর্ঘকাল, এই ঋণের পরিশোধের সুবিধা না হওয়াতে, আমি অতিশয় কুণ্ঠিত ছিলাম, এক্ষণে আমার সুবিধা হইয়াছে, এজন্য এই পত্রের মধ্যে সাত হাজার পাঁচশত টাকার নোট পাঠাইতেছি, অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়া, আমায় ঋণে মুক্ত হইতে আজ্ঞা হয়, কিমধিকমিতি।

নিয়তগুণানুকীর্তনশুভানুচিন্তনকর্মণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

১৫। শম্ভুচন্দ্রের চাকরির প্রস্তাব শুনে বিদ্যাসাগর এই পত্র লেখেন

প্রিয়তম,

তুমি এক্ষণে আমার একমাত্র ভরসা স্থান এই বিবেচনা করিয়া চলিবে ও সকল কর্ম করিবে। আমি যতশীঘ্র পারি বাটী যাইতেছি, স্ত্রীলোকের বা ইতর জনের বাক্যে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইবে না। কোনও কারণে বা কাহারো কথায় আমি কখনও তোমার উপর বিরক্ত হইব ইহা মনেও স্থান দিবে না। যাহাতে তোমার

মান ও প্রতিপত্তি থাকে সে বিষয়ে আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত অনবহিত হইব না ইহা নিশ্চিত জানিবে ইতি। রবিবার

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

১৬। ভায়েরা পৃথক হবার পর শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত পত্র

হরিঃ

শুভাশিষঃ সন্তু,

৭০০ সাত শত টাকার নোট পাঠাইতেছি আষাঢ় মাসের হিসাবে বিলি করিবে।

মাতাঠাকুরাণী	৩০৲	স্কুল	২২০৲
দীনবন্ধু	৭০৲	ডাক্তারখানা	২২৲
শম্ভুচন্দ্র	৭০৲	স্ব-মাসহারা	৭০৲
ছোট বৌ	৮৲	গ্রাম মাসহারা	৫৫৲
			৩৬৭৲
মনোমোহিনী	১৫৲	মাতামহীদেবীর	
দিগম্বরী	৫৲	একোদ্দিষ্ট	১০০৲
মন্দাকিনী	৫৲		
সর্বেশ্বর	১৫৲		
	২১৮৲		৪৬৭৲
			২১৮৲
			৬৮৫৲

স্ব-সম্পর্কীয় মাসহারা দুই টাকা অধিক যাইতেছে, ঐ দুই টাকা পাতুলের উমা মাসীকে দিবে, তিনি আষাঢ় অবধি মাস মাস দুই টাকা পাইবেন। খরচ বাদে অবশিষ্ট পনর টাকা মজুদ রাখিবে আগামী মাসে ঐ পনর টাকা বাদে পাঠাইব। ভৈরবকে বলিবে সত্বর মাসহারা বিলি করিয়া অবিলম্বে বিধবা-বিবাহের মাসহারার বহি লইয়া কলিকাতায় আইসে। পস্‌পুরে টাকা দিয়া তথা হইতে আসিতে বলিবে। মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি ঝড়বৃষ্টির দিন প্রস্থান করিয়াছেন অবিলম্বে তাঁহাদের পঁহুছ সংবাদ দ্বারা নিরুদ্বেগ করিবে। ইতি ১৮ শ্রাবণ

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

মাতামহীদেবীর একোদ্দিষ্টের টাকা মাতৃদেবীর হস্তে দিবে।

ঈশ্বর

১৭। শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত পত্র

শ্রীশ্রীহরিঃ

শুভাশিষঃ সন্তু—

৪৮০ চারশত আশী টাকার নোট পাঠাই নিম্নলিখিতভাবে বিনিয়োগ করিবে।

বাটীর খরচ	২১৮ টাকা	
স্বসম্পর্কীয় মাসহারা	৬৮ ,,	
বাটীর খরচ		
মাতৃদেবী	৩০ ,,	
দীনবন্ধু	৭০ ,,	
শম্ভুচন্দ্র	৭০ ,,	
ছোট বৌ	৮ ,,	
মনোমোহিনী	১৫ ,,	
মন্দাকিনী	১০ ,,	
সর্বেশ্বর	১৫ ,,	
	২১৮ ,,	

পৌষমাস	
গ্রামস্থ মাসহারা	৫৫ টাকা
স্কুল	১২০ ,,
ডাক্তারখানা	২২ ,,
স্বসম্পর্কীয় মাসহারা	
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩ ,,
শ্যামাচরণ ঘোষাল	৫ ,,
নীলাম্বর ন্যায়ালঙ্কার	৫ ,,
বিন্ধ্যবাসিনী দেবী	১ ,,
হরদাস তর্কালঙ্কার	৪ ,,
রাধামণি দেবী	১ ,,
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩ ,,
তারাচরণ মুখো	১০ ,,
রামেশ্বর মুখো	৫ ,,
কালিদাস মুখো	৪ ,,
প্রসন্নময়ী দেবী	২ ,,
বরদা দেবী	২ ,,
মোক্ষদা দেবী	২ ,,
তারাসুন্দরী দেবী	১০ ,,
গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী	৫ ,,
ভৈরবী দেবী	২ ,,
ভগবতী দেবী	২ ,,
নৃত্যকালী দেবী	২ ,,
	৬৮ ,,

মনোমোহিনী ও মন্দাকিনীর নাম স্বসম্পর্কীয় মাসহারার মধ্য হইতে উঠাইয়া বাটীর খরচের ফর্দ মধ্যে নিবেশিত হইল তুমিও সেখানে সেইরূপ করিয়া লইবে। শিবচন্দ্র এখানে তাঁহার টাকা লইয়াছেন তাহা বাদে স্কুলের ১২০৲ টাকা পাঠাইলাম।

পত্রের পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। দীনবন্ধু টাকা লইতে সম্মত হইয়াছেন এজন্য টাকা পাঠাইলাম। যদি তিনি বাটীতে না লিখিয়া থাকেন মেজো বৌ লইতে সম্মত হইবেন না এজন্য লিখিতেছি যদি না লিখিয়া থাকেন তথাপি তাঁহাকে লইতে বলিবে আমি দীনবন্ধুর হস্তের লিপি পাইয়াছি। ইতি ২১ মাঘ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

সমুদয়ে ৪৮৩৲ টাকা তিন টাকা পাঠাইবার সুবিধা নাই তজ্জন্য ৪৮০৲ পাঠাইলাম অন্য সকলকে সম্পূর্ণ দিবে তুমি ৩৲ টাকা কম লইবে। দুই মাস পরে একখানা ১০ টাকার নোট পাঠাইব তাহা হইলে তোমার বাকী মাসিক ৩৲ টাকা পাইবে। যদি দ্বারবানেরা সেখানে না থাকে ঠিকা লোক করিয়া মাসহারার টাকা পাঠাইয়া দিবে তাহাতে যাহা খরচ লাগে আপাততঃ তুমি দিবে পরে আমি দিব।

শ্রীঈ

১৮। পিতাকে লিখিত পত্র

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনম্

আপনার আজ্ঞাপত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। আমি যেদিন কর্মাটাঁড়ে আসিব স্থির করিয়া আপনাকে পত্র লিখিলাম কিন্তু কার্যগতিকে আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। ৬ আশ্বিন আসিবার সময় শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের বরাত চিঠি লিখিয়াছিলাম। অদ্য কার্যানুরোধে পুনরায় কলিকাতা যাইতে হইল। পিতামহদেবের শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হইবার সংবাদ অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতায় লিখিবেন। আমি অদ্যাপি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই, সুস্থ হইলেই আপনকার চরণ দর্শন করিব। আপনি অতিশয় দুর্বল হইয়াছেন, এই সংবাদে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। শম্ভুচন্দ্র যাইতেছেন ইঁহার প্রমুখাৎ সকল সংবাদ জ্ঞাত হইবেন। ইনি আপনকার নিকট থাকিলে আমি অনেক অংশে নিশ্চিন্ত থাকি। ইনি সেখান হইতে আসিলেই আমার অত্যন্ত ভয় ও উদ্বেগ জন্মে। বিশেষতঃ ইঁহার অনুপস্থিতে আপনাকে এ অবস্থায় পাক করিতে হইতেছে। ইনি যাইতেছেন আর দুর্ভাবনা রহিল না। ইনি সাধ্যানুরূপ পিতৃসেবা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতেছেন। আমার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটিতেছে না। নানা কারণে এরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি যে কোনও বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ কর্ম করিতে পারি না। নতুবা আমিই আদ্যোপান্ত আপনকার নিকটে থাকিয়া চরণসেবা করিতাম ইতি।

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ